মোহাম্মদ আলী মনসুর

বিচার বিভাগের স্বাধীনতার ইতিহাস

বাংলাদেশ ইসলামিক ল'রিসার্চ এন্ড লিগ্যাল এইড সেন্টার

বিচার বিভাগের স্বাধীনতার ইতিহাস

মোহাম্মদ আলী মনসুর

বাংলাদেশ ইসলামিক ল' রিসার্চ এন্ড লিগ্যাল এইড সেন্টার

www.pathagar.com

বিচার বিভাগের স্বাধীনতার ইতিহাস
মোহাম্মদ আলী মনসুর
বি আই এল আর এল এ সি-৬

ISBN:

প্রথম প্রকাশ
ফেব্রুয়ারী ২০১০

গ্রন্থস্বত্ব সংরক্ষিত

প্রকাশক
এডভোকেট মোহাম্মদ নজরুল ইসলাম
জেনারেল সেক্রেটারী
বাংলাদেশ ইসলামিক ল' রিসার্চ এন্ড লিগ্যাল এইড সেন্টার
৫৫/বি পুরানা পল্টন, ১৩/বি, নোয়াখালী টাওয়ার, ঢাকা-১০০০
ফোন ঃ ০২-৭১৬০৫২৭
E-mail : islamiclaw_bd@yahoo.com
Web : www.ilrcbd.com

প্রাপ্তিস্থান
সকল সম্ভ্রান্ত লাইব্রেরি

কম্পোজ ও মুদ্রণ
আল-ফালাহ প্রিন্টিং প্রেস
৪২৩ বড় মগবাজার, ঢাকা-১২১৭
ফোন ঃ ৯৩৫৮৪৩২, ৯৩৪৫৭৪১

মূল্য ঃ ৩০০ টাকা

www.pathagar.com

উৎসর্গ

আমার সাংবাদিক জীবনে যিনি
পরম করুণাময় মহান আল্লাহ্‌র কাছে
নিজেকে সমর্পণের পথ দেখিয়েছেন
সেই সর্বজন শ্রদ্ধেয় উৎসর্গীত প্রাণ
জননেতা মকবুল আহমদ'কে –

–মোহাম্মদ আলী মনসুর

www.pathagar.com

প্রকাশকের কথা

আমাদের দেশে বিচার ব্যবস্থার স্বাধীনতার কথা জোরেশোরে উচ্চারিত হচ্ছে। কারণ ইংরেজরা এদেশ শাসন করার সময় বিচার ব্যবস্থাকে তাদের করতলগত করে রেখেছিল। ইংরেজ চলে যাবার ছয় দশক পরও এখনো আমরা তার জের টেনে চলছি। অথচ ইতিপূর্বে মুসলমানদের ছয় সাতশো বছরের শাসন আমলে বিচার ব্যবস্থায় কোনো রাজকীয় ও প্রশাসনিক হস্তক্ষেপ ছিল না। সমগ্র উপমহাদেশে বিচার বিভাগ পূর্ণ স্বাধীনতা ভোগ করছিল।

আমাদের বিজ্ঞ লেখক মোহাম্মদ আলী মনসুর মানব সভ্যতার আদিযুগ থেকে বর্তমান যুগ পর্যন্ত বিচার ব্যবস্থার ইতিহাস আলোচনা করেছেন। 'বাংলাদেশ ইসলামিক ল' রিসার্চ এন্ড লিগ্যাল এইড সেন্টার' ইসলামী আইন ও বিচার ব্যবস্থা সম্পর্কে বাংলা ভাষাভাষী জনগণের সচেতনতার লক্ষে তাঁর এই জ্ঞানগর্ভ রচনাটি প্রকাশের উদ্যোগ নিয়েছে। লেখক একজন সাংবাদিক ও গবেষক। তিনি তার বিস্তারিত আলোচনার মাধ্যমে বিচার ব্যবস্থার স্বাধীনতার নামে এদেশের বিচার ব্যবস্থায় সৃষ্ট জটিলতাসমূহ চিহ্নিত করেছেন। এই সংগে মানুষের তৈরী আইনে প্রতিষ্ঠিত বিচার ব্যবস্থার বিচ্যুতি ও ক্ষতিকর দিকগুলোও বলিষ্ঠভাবে তুলে ধরেছেন।

আমরা আশা করি গ্রন্থটি আইন সম্পর্কে উৎসাহী ছাত্র, শিক্ষক, গবেষক, আইনজীবী ও উলামাসহ সকল শ্রেণীর সাধারণ পাঠকদের জন্য উপকারী প্রমাণিত হবে। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আমাদের এই ক্ষুদ্র প্রচেষ্টাকে কবুল করুন এবং এই প্রকাশনার সাথে সংশ্লিষ্ট সবাইকে উত্তম পুরস্কারে ভূষিত করুন।

এডভোকেট মোহাম্মদ নজরুল ইসলাম
জেনারেল সেক্রেটারী
বাংলাদেশ ইসলামিক ল' রিসার্চ এন্ড লিগ্যাল এইড সেন্টার

www.pathagar.com

সূচিপত্র

লেখকের নিবেদন ৭
ভূমিকা ৯

অধ্যায়-এক
আইন ও বিচার শাস্ত্রে প্রাচীন সভ্যতার অবদান ১১
- রোমান, সিন্ধু, বৌদ্ধ, হিন্দু, ইসলামী, সুমেরীয়, মিশরীয়, ইহুদী, পারস্য, চীন, গ্রীস, অ্যাসেরীয়, ইনকা ১২-৩৮
- ইংল্যান্ড ২৯
- ফ্রান্স ৩৯
- রাশিয়া ৪৫
- আমেরিকা ৫২

অধ্যায়-দুই
প্রাচীন ভারতীয় সমাজে হিন্দু বিচার ব্যবস্থা ৬৯
- ভারতবর্ষে ইসলামী বিচার ব্যবস্থার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস ৭৬
- প্রাচীন বাংলার সমাজ ও বিচার ব্যবস্থা ৮৫
- বঙ্গে ইসলামী বিচার ব্যবস্থা ৯৬
- বাংলায় ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির বিচার ব্যবস্থার গোড়া পত্তন ১০১

অধ্যায়-তিন
ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক বিচার ব্যবস্থা : ভূলুণ্ঠিত মানবাধিকার ১১১
- ঔপনিবেশিক বিচার বিভাগীয় তাণ্ডব ১১৯
- জমিদার : ঔপনিবেশিক বিচার ও ভূমি ব্যবস্থার স্থানীয় খুঁটি ১২৮
- ব্রিটিশ বিচার ব্যবস্থা : দরিদ্র বানাবার কারখানা ১৩৯
- দেশবাসীর প্রতি বিচার ব্যবস্থার প্রবক্তাদের ঘৃণাবিদ্বেষ ১৪২
- এক নজরে ঔপনিবেশিক বিচার ব্যবস্থার কাঠামো ১৫১
- মনীষীরা যা বলেছেন ১৬০

www.pathagar.com

অধ্যায়-চার

রক্তস্নাত স্বাধীনতাত্তোর পাক-ভারত বিচার ব্যবস্থা : কি পেল জনগণ? ১৬৭

- ঔপনিবেশিক বিচারের নিক্তিতে বিদ্যমান পাক-ভারত বাস্তবতা ১৭২
- পাকিস্তান আমলের বিচার ব্যবস্থা : ঔপনিবেশিক, ইসলামী ও সামরিক আইনের জগাখিচুড়ী ১৭৯
- বাংলাদেশের বিচার ব্যবস্থা ১৮৯
- দেওয়ানি ফৌজদারী বিচার : যেভাবে নির্যাতিত নিঃস্ব হয় নাগরিক ২১৩
- বিলম্বিত ব্যয়বহুল বিচার ব্যবস্থা : দারিদ্রতা যার উপসংহার ২১৭
- প্রচলিত আইনের নির্ভরযোগ্য সংকলন নেই ২২০

অধ্যায়-পাঁচ

ভূমি ব্যবস্থাপনা : মামলা উৎপাদন কারখানা ২২৫

- আমাদের বিচার ব্যবস্থার খণ্ড চিত্র ২৩২
- বিচার বিভাগের স্বাধীনতার জয়জয়কার ২৪১
- বিচারকের দুর্নীতির বিরুদ্ধে বিচারের আইনী হেঁয়ালী ২৫০
- আদালত অবমাননা আইনের ঘাপলা ২৫৩
- ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতায় বিচার বিভাগের স্বাধীনতা ২৫৫
- বিচার ব্যবস্থার আধুনিকায়নে কিছু সুপারিশ ২৬২

www.pathagar.com

লেখকের নিবেদন

বিচার বিভাগের স্বাধীনতার ইতিহাস, এই শিরোনামে লেখাটি গত পহেলা মার্চ ২০০৬ থেকে পরবর্তী ১শ' ২৯ দিন ধারাবাহিকভাবে দৈনিক খবরপত্রে প্রকাশিত হয়েছে। শেষ অংশটুকু পরবর্তী সময়ে লেখা। ওই সময়ে সম্মানিত পাঠকদের কৌতূহল, উৎসাহ, উদ্দীপনা আমাকে অভিভূত করেছে। অনেকেই অনুরোধ করেছেন লেখাগুলো গ্রন্থাকারে প্রকাশের জন্য। তাঁদের সেই চাহিদার প্রতি সম্মান জানিয়ে দেরিতে হলেও লেখাগুলো গ্রন্থাকারে প্রকাশ করা হলো।

প্রচলিত আইন ভঙ্গ করে কয়েকজন বিচারক কর্তৃক মানবাধিকার লুণ্ঠনের শিকার হয়ে আমার বাবার মর্মান্তিক মৃত্যু ও আমাদের পরিবারটির ছিন্নভিন্ন হওয়ার ঘটনাটি নিঃসন্দেহে এই গ্রন্থ রচনায় আমাকে শক্তি ও সাহস যুগিয়েছে। বিষয়টির গভীরে অনুসন্ধান করতে গিয়ে দেখতে পাই ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসকদের পরিত্যক্ত আমাদের আইন ব্যবস্থাতে রয়েছে প্রচুর ফাঁকফোকর আর ব্যয়বহুল বিচার ব্যবস্থায় রয়েছে অন্তহীন হয়রানী। তাই আমাদের মতো অসংখ্য মানুষ বিচিত্র পন্থায় বিচার বঞ্চিত হয়ে মাথা কুটে মরছে যুগের পর যুগ ধরে যা এদেশের সামাজিক অস্থিরতা ও দরিদ্রতার অন্যতম প্রধান কারণ। বৃহত্তর জাতীয় স্বার্থে প্রচলিত আইন ও বিচার ব্যবস্থার ত্রুটি-বিচ্যুতি তুলে ধরে তা সংস্কার ও যুগোপযোগী করার তীব্র তাগিদ অনুভব করি। এই তাড়না থেকে সুদীর্ঘকাল ব্যাপী তথ্য সংগ্রহ করে আমার লেখার কাজ এগিয়ে চলে।

এদেশে ন্যায় বিচারপ্রাপ্তি সহজসাধ্য নয়। মিথ্যা মামলার বিরুদ্ধে কঠোর ও কার্যকর আইনী প্রতিকার নেই। মিথ্যা মামলায় দুর্বল প্রতিপক্ষকে সর্বস্বান্ত করতে ফৌজদারী আইনের জুড়ি নেই। ২০/৫০ বছরের মধ্যে কবে দেওয়ানি মামলা শেষ হবে তা বিচারপ্রার্থীরা কেউ জানেনা। যে কোন ধরনের মামলা পরিচালনা করা অত্যন্ত জটিল, ব্যয়বহুল, বিলম্বিত ও হয়রানীমূলক। আইন ও বিচার ব্যবস্থা এদেশের জনগণের হাতে তৈরী নয়। ব্রিটিশ ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির মতো একটা বিদেশী ব্যবসায়ী সংগঠনের লাভ-লোকসানের হিসেবে দেড়/দু'শো বছর আগে পরাধীন আমলের তৈরী এ আইন ও বিচার ব্যবস্থাকে আমাদের জাতীয় নেতৃবৃন্দ যখন বাংলাদেশের আইন ও বিচার ব্যবস্থা বলে দাবী করেন তখন জাতির প্রতি তাদের বিশ্বাসঘাতকতা, অযোগ্যতা ও দায়িত্বহীনতাকেই তুলে ধরে। ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসকদের স্বার্থানুকূল মান্ধাতা আমনের এ আইন ও বিচার ব্যবস্থার সুফলভোগী স্বদেশী সাহেবরা স্বাধীনতার ৩৮ বছরেও তা পরিবর্তনের উদ্যোগ নেয়নি। জরাজীর্ণ আইনী ব্যবস্থার বাধ্যবাধকতা বা সীমাবদ্ধতার কারণে আমাদের

www.pathagar.com

বিচারকগণের আন্তরিকতা, সততা ও সদিচ্ছা থাকা সত্ত্বেও তাঁরা বহু ক্ষেত্রেই ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠায় ব্যর্থ হচ্ছেন। অন্যদিকে যথাযথভাবে রায় দেয়া হচ্ছে কিনা তা তদারকিতে সুষ্ঠু কোন ব্যবস্থা নেই আর বিচার বিভাগে এ সম্পর্কিত নেই কোন জবাবদিহিতা। এই অব্যবস্থায় বিচার বঞ্চিত জনগণের হাহাকার থেকে সৃষ্ট ক্ষোভ-বিক্ষোভে রূপান্তরিত হয়ে গণতন্ত্রকে দেশছাড়া করে বার বার । কোন সরকার স্থিতি পাচ্ছে না। এর উপসংহার হচ্ছে দরিদ্রতা। স্বাধীনতা অর্জনের তিন যুগ পরেও দরিদ্র বাংলাদেশ বিশ্বের করুণার পাত্র।

বহু দিনের অনুসন্ধানে ঔপনিবেশিক ব্রিটিশদের অনেক অপকীর্তি ও বিচার ব্যবস্থা সম্পর্কিত অসংখ্য মূল্যবান তথ্য সংগ্রহ করি যা এই গ্রন্থে জাতির সামনে তুলে ধরা হলো। সিদ্ধান্তের ভার পাঠকের। গ্রন্থটিতে কোন ভুল-ত্রুটি থাকলে তা সংশোধনে কারো কোন সুপরামর্শ থাকলে সাদরে গৃহীত হবে ও পরবর্তী সংস্করণে অন্তর্ভুক্ত হবে। এ গ্রন্থের লেখায় আমার প্রিয় দেশবাসীর কারো কোন উপকার হলে আমার পরিশ্রম যথার্থ হবে।

দৈনিক মিল্লাত সম্পাদক চৌধুরী মোহাম্মদ ফারুক, দৈনিক সোনার আলো সম্পাদক রফিকুল ইসলাম, জামায়াতে ইসলামীর সিনিয়র সহকারি সেক্রেটারী জেনারেল মুহাম্মদ কামারুজ্জামান, সাবেক বিচারপতি নির্মলেন্দু ধর, সাবেক জেলা জজ সিরাজুল ইসলাম, সাবেক সহকারি এটর্নি জেনারেল এডভোকেট শেখ রেজাউল করিম, এডভোকেট আজাদ রহমান, কবি মুহাম্মদ ইউসুফ, বন্ধুবর মাহবুব আলম কমল, মজিবুর রহমান খান, ইয়াদী মাহমুদ, ড. নুরুল ইসলাম মঞ্জু, মামা আব্দুল মান্নান পাটোয়ারী, খালা সৈয়দা সোহেলা লাকী আফিন্দী, সাংবাদিক কাজিম রেজা, জয়নাল আবেদীন আব্দুল্লাহ্, শিরীন সুলতানা, রেজা রায়হান, ফরহাদ খাঁ, জাহাঙ্গীর ফিরোজ, কাজী হাফিজুর রহমান, আলম মাসুদ, আবু তাহির মুস্তকীমসহ যাঁরা গ্রন্থটির লেখায় নৈতিক সমর্থন ও প্রেরণা যুগিয়েছেন তাদের কাছে কৃতজ্ঞ রইলাম।

মোহাম্মদ আলী মনসুর
পহেলা সেপ্টেম্বর ২০০৯

www.pathagar.com

ভূমিকা

গত ৩৫ বছর ধরে বিচার বিভাগের স্বাধীনতার সীমারেখা খুঁজে আজো এর কুলকিনারা পাইনি। আমার এই কৌতূহলী অনুসন্ধানের নেপথ্যে কারণটি হচ্ছে, বিচার বিভাগীয় তদন্তে আদালতের একটি রায় জাল করার অপরাধ প্রমাণিত হওয়ায় প্রধান বিচারপতির নির্দেশে এক আদালত কর্মচারী চাকরিচ্যুত হন। ইতিপূর্বে ওই জাল রায়টির ওপর ভিত্তি করে আমার বাবার বিরুদ্ধে বেআইনিভাবে প্রথম ও দ্বিতীয় আপিল বিচার প্রক্রিয়া চলাকালীন বাবা লিখিতভাবে বারবার জাল রায়টির প্রতি সম্মানিত আদালতের দৃষ্টি আকর্ষণ করে সংশ্লিষ্ট জালিয়াতদের বিরুদ্ধে বিচার প্রার্থনা করেন। কিন্তু মহামান্য হাইকোর্টের দু'জন সম্মানিত বিচারপতি হাতে-কলমে জালিয়াতির বিষয়টি অবগত হওয়া সত্ত্বেও সজ্ঞানে ওই জাল রায়টি এড়িয়ে লিখিতভাবে মন্তব্য করেন, তারা এই প্রশ্নে আগ্রহী নন। (সূত্র: ২২ নং ঢাকা ল' রিপোর্টার-এর ৫৮৯ পৃষ্ঠা) এভাবে জাল রায়টি উচ্চআদালতে আইনগত বৈধতা পাওয়ার ফলাফল হলো শাস্তি থেকে বেঁচে যাওয়া ওই জালিয়াতদের নির্মম নির্যাতনে আমার হতভাগা নিরপরাধ বাবা হার্টফেল করে মারা যান। মৃত্যুর আগেই বাবা বুঝেছিলেন দায়বদ্ধহীন স্বাধীনতা সভ্য জগতের নীতি আদর্শের তোয়াক্কাহীন- কখনও প্রলংকারী। আর বাবার মৃত্যুর পর আমরা বুঝেছি জবাবদিহিবিহীন এ স্বাধীনতা অস্তিত্ব বিনাশী সর্বগ্রাসী। সংসারের একমাত্র উপার্জনক্ষম বাবার অকাল মৃত্যুর পর দারিদ্র্যের সাথে যুদ্ধে পরাস্ত আমাদের পরিবারটি ধ্বংস হয়ে গেছে। প্রতিবাদ করার ক্ষমতা নিঃশেষ হওয়ায় আমাদের গ্রামের বাড়িটি জবরদখল করেছে বাবার চাচাতো ভাইরা। দারিদ্র্য পীড়িত ভাই বোনকে শিক্ষিত করে সমাজ, দেশ ও জাতির কাজে লাগাতে পারিনি। অর্থকষ্টে থাকা মা, এক বোন ও ভাই মারা গেছে এক প্রকার বিনা চিকিৎসায়। পরিবারের অবশিষ্ট বেঁচে থাকা সদস্য আমরা আজ নিঃস্ব। সেই মান্যবর দুই বিচারপতির ছবি অতিযত্নে সংরক্ষণ করে চলেছি বাবার মৃত্যু ও আমাদের পরিবারটির ধ্বংযজ্ঞের স্মারকচিহ্ন হিসেবে। দেশবাসীর বিশ্বাসের অতি পবিত্রতম স্থান বিচার বিভাগকে কলুষিত করা এই জালিয়াতির ঘটনার প্রধান সাক্ষী সাবেক প্রধান বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহমদ আজো বেঁচে আছেন। ১৯৯১ সালে অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি, তত্ত্বাবধায়ক সরকারপ্রধান এবং প্রধান বিচারপতি পদে থাকাকালে তার কাছে

www.pathagar.com

বিচার চেয়েছি। লাভ হয়নি। এই ঘটনায় জড়িত কুশীলবদের অনেককেই দেখেছি আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা আর বিচার বিভাগের স্বাধীনতা রক্ষায় উচ্চকণ্ঠ। তাদের এসব ভণ্ডামিতে আমার হৃদয়ে রক্তক্ষরণ শুরু হয় ধমনী ছিঁড়ে। পাঁজর ভেঙ্গে যেতে চায় দীর্ঘশ্বাসে। স্মৃতিপটে ভেসে ওঠে বৈধতার সিলমারা জাল রায়ের দানবীয় থাবা থেকে প্রাণ বাঁচাতে ভীরু শশকের মতো অসহায় বাবার নিষ্ফল ছোটাছুটি শেষে নিদারুণ মৃত্যু যন্ত্রণা, পারিবারিক বিপর্যয়, সহায়-সম্পদ লুট। জাল রায়টির পাটাতনের নিচে পিষ্ট বাবা'র কফিনে মমতামাখা পরশ বুলিয়ে অশ্রুসিক্ত মা ভাই বোনদের আর্ত বিলাপ আজো কানে বাজে অবিকল। গত ৩৫ বছর ধরে যন্ত্রণাদগ্ধ স্মৃতি প্রতিনিয়ত ক্ষত-বিক্ষত করে চলেছে আর এই দীর্ঘ সময় ধরে বিচার বিভাগের স্বাধীনতার বিষুবরেখা, সীমারেখা ও গভীরতা পর্যবেক্ষণ করে চলেছি। বিশেষ করে ১৯ বছর আগে সাংবাদিকতার পেশায় আসার পর আমার পর্যবেক্ষণের বিষয়টি অনুসন্ধান ও গবেষণায় রূপান্তরিত হয়। এই অনুসন্ধান চলাকালে ভিন্ন আদালতের আরো এমন দুটি রায় সংগ্রহ করি যা উপযুক্ত বিধায় গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত করি। এর লক্ষ ছিল মানব সভ্যতায় বিভিন্ন দেশে আইন আদালতের উৎপত্তি, বিকাশ ও বাংলাদেশে এর বিবর্তনের ধারা, আমাদের প্রচলিত আইন, বিচারক ও বিচার ব্যবস্থার স্বাধীনতার সীমারেখা, আইনের ভাষ্য, সমাজ ও জাতির ওপর এর ফলাফল, আমার বাবার প্রাণ রক্ষায় রাষ্ট্রের ব্যর্থতার কারণ নির্ণয় ইত্যাদি। আমার অনুসন্ধান ও গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্যের ওপর নির্ভর করেই মূলত আজ এই নাতিদীর্ঘ গ্রন্থটির আত্মপ্রকাশ।

মোহাম্মদ আলী মনসুর

পহেলা মার্চ-২০০৬

www.pathagar.com

অধ্যায় : এক

আইন ও বিচার শাস্ত্রে প্রাচীন সভ্যতার অবদান

প্রাচীন বিশ্বে বর্বর ও প্রস্তর যুগ পেরিয়ে যখন মানুষ সভ্যতার দিকে ধীরে ধীরে অগ্রসর হয় তখনই সে নিয়ম কানুনের তাগিদ অনুভব করে। প্রকৃতি থেকে শিক্ষা নিয়ে সে দেখতে পায় পিঁপড়া, মৌমাছির মতো কীটপতঙ্গ ও বহু পশুপাখি সুশৃংখল সমাজবদ্ধভাবে বাস করছে। আদিম যুগের মানুষ তখন মনের ভাব আদান-প্রদানের জন্য বিভিন্ন ভাষা আবিষ্কারের সাথে সাথে পরিবার, সমাজ ও গোষ্ঠীভুক্ত হতে থাকে। লেখার নিরাপদ কলাকৌশল আয়ত্তের আগে বিভিন্ন সংকেত চিহ্ন ছিল ভাষা আদান-প্রদানের মাধ্যম। আধুনিক বিশ্বে আবিষ্কৃত প্রাচীন সভ্যতাগুলোর ধ্বংসাবশেষ থেকে উদ্ধারকৃত শিলালিপির মধ্যে এসব সংকেত চিহ্নের খোদাইকৃত নিদর্শন পাওয়া যায়। এক সময় পরিবার ও সমাজকে শৃংখলাবদ্ধ করতে গিয়ে দেখা যায় প্রবলের হাতে মার খাওয়া দুর্বল প্রতিকার প্রার্থনায় প্রবলের বিরুদ্ধে ফরিয়াদ জানায়। তখন পরিবার বা গোষ্ঠী প্রধান সমাজ ও পরিবারের শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখতে যে আদেশ নির্দেশ দিতেন তা সবার জন্য অবশ্য পালনীয় ছিল যা কালক্রমে প্রথাগত আইনে পরিণত হয়। পরিবার বা গোষ্ঠী প্রধানের সালিশির মাধ্যমে প্রদত্ত সিদ্ধান্ত থেকে আদালত সৃষ্টির ধারণা আসে। উপমহাদেশে প্রচলিত হিন্দু আইনের এক বিরাট অংশ প্রথা থেকে উদ্ভূত। গ্রীকদের মতে প্রথার উদ্ভব হয়েছে পৌরাণিক দেবদেবীর অনুজ্ঞা থেকে। রোমানরা মনে করেন, প্রথার মূল শক্তি নিহিত আছে প্রয়োজনীয়তার মধ্যে। ইংরেজদের মতে, প্রথার মূল চালিকাশক্তি এর প্রাচীনত্বে। মনীষী অস্টিনের মতে প্রথা তখনই শক্তিশালী হয়ে ওঠে যখন সার্বভৌম রাষ্ট্রশক্তি এর মর্যাদা দেয়। আল্লাহ প্রদত্ত মহাগ্রন্থ পবিত্র আল কোরআনে মারূফ ও মুনকার বলে যে শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে তা আসলে প্রথা বা উরফের সাথে সংযুক্ত। প্রথা বৌদ্ধ আইনকেও প্রভাবিত করেছে। বৌদ্ধদের মধ্যে দত্তক প্রথা প্রচলিত এবং প্রথাগতভাবে বৌদ্ধদের মধ্যে বহু বিবাহে কোন বাধা নেই। প্রথা নানা রকম হতে পারে। পারিবারিক প্রথাকে 'কুলাচার' এবং স্থানীয় প্রথাকে বলা হয় 'দেশাচার'। প্রথামূলক আইনগুলো এক সময় বিধিবদ্ধ করার প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। কারণ সময়ের ধারায় জন্ম নেয়া অসংখ্য প্রথা সমাজ প্রভুদের আর মুখস্থ রাখা সম্ভবপর ছিল না। প্রথার যুগ অবসানের পর আসে বিধির যুগ। (Epoch of Law)। হিন্দুদের বিধি ও রোমানদের

www.pathagar.com

বিধি পৃথিবীর প্রাচীনতম বিধি হিসেবে পরিগণিত। আইনশাস্ত্রে রোমান সভ্যতার ভিত্তি রচিত হয়েছিল প্রাচীন গ্রীক পণ্ডিতদের সহায়তায়।

আধুনিক বিশ্বের আইন ব্যবস্থাতেও রোমান আইনের বিপুল প্রভাব অনস্বীকার্য। তবে খৃষ্টপূর্ব ২১০০ অব্দে ব্যাবিলনের রাজা হামুরাবি রচিত আইনবিধি কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। এক বিশাল ফলকে খোদাই করা এই আইনবিধি ১৮৯৮ সালে ইরাকের সুসায় আবিষ্কৃত হয়। এতে বিভিন্ন বিষয়ে ৩০০টি আইন লিপিবদ্ধ রয়েছে। অনেক ঐতিহাসিক মনে করেন বিশ্ব ইতিহাসে এটা প্রাচীনতম আইনলিপি। খৃষ্টপূর্ব ২০২৩-৮১ সালে রাজা হামুরাবির আইনে দৈব শাস্তি থেকে ইহলৌকিক শাস্তি, শারীরিক শাস্তির পরিবর্তে অর্থদণ্ডের বিধান প্রচলিত ছিল। সরকার পরিচালিত আদালতে যে কেউ মামলা করতে পারতেন এবং তখন কোন আইনজীবী ছিল না। হত্যা ও লুণ্ঠনের শাস্তি ছিল মৃত্যুদণ্ড। তবে সরকারের তরফ থেকে মামলা মোকদ্দমাকে সাধারণত নিরুৎসাহিত করে আপোষ মীমাংসাকেই বেশি গুরুত্ব দেয়া হতো। নিম্ন আদালতের রায়ের বিরুদ্ধে আপিল এবং আপিল রায়ের বিরুদ্ধে রাজার সিদ্ধান্তই ছিল চূড়ান্ত। লুটেরা ধরা না পড়লে রাষ্ট্র ক্ষতিগ্রস্তকে ক্ষতিপূরণ দিতে বাধ্য ছিল। ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা থাকায় সেকালের ব্যাবিলনীয় সভ্যতা ছিল শীর্ষস্থানীয়।

রোমান

পুরাকালে রোমে যখন প্রথম বিধিবদ্ধ আইনের উদ্ভব হয়নি তখন ছিল রাজতন্ত্রের যুগ। সে যুগে রোমের জনসাধারণ দু'শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল। প্রথমত প্যাট্রিসিয়ান (Patrician) যারা ছিল অভিজাত শ্রেণীর। আর দ্বিতীয় শ্রেণী ছিল প্লেবিয়ান (Plebian) সমাজের শ্রমজীবী দরিদ্রজন। এই দুই শ্রেণীর মধ্যে সংঘর্ষ সংঘাত চলেছে যুগের পর যুগ ধরে। হলিউডে নির্মিত বিশ্ব বিখ্যাত 'ফল অব দ্য রোমান অ্যাম্পেয়ার' চলচ্চিত্রে এই প্যাট্রিসিয়ান ও প্লেবিয়ানদের লড়াই দেখানো হয়েছে। অর্থ, ক্ষমতা, সামাজিক মর্যাদার দিক থেকে প্যাট্রিসিয়ানরা সব ধরনের ন্যায় অন্যায় সুযোগ ভোগ করত। অন্যদিকে প্লেবিয়ানরা ছিল ঋণজর্জরিত, মর্যাদাহীন, সর্বহারা এবং সব ধরনের রাষ্ট্রীয় সুবিধাবঞ্চিত দাসানুদাস শ্রেণী। প্যাট্রিসিয়ানদের বিরুদ্ধে লিখিত কোন আইন না থাকায় প্লেবিয়ানদের অর্জিত অধিকার সংরক্ষণে সংঘাতময় ছিল সেকালের রোম সাম্রাজ্য। শেষে খৃষ্টপূর্ব ৪৬২ অব্দে প্লেবিয়ান নেতা টারেনটিলাস আরসা'র নেতৃত্বে ৮ বছরব্যাপী প্রচণ্ড সংগ্রামের পর প্লেবিয়ানদের প্রবল দাবির মুখে কয়েকজন রাজকর্মচারীকে গ্রীসের বিভিন্ন রাষ্ট্রের লিখিত আইন সম্পর্কে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা অর্জনের জন্য পাঠানো হয়। তারা দীর্ঘ অনুসন্ধান শেষে দেশে ফিরে রাজার কাছে বিবরণী পেশ করেন। ফলশ্রুতিতে ১০ জন আইনজ্ঞকে নিয়ে একটি কমিশন গঠন করে তাদের হাতে আইন প্রণয়ন ও দেশ শাসনের চূড়ান্ত ক্ষমতা হস্তান্তর করা হয়। তাদের অক্লান্ত পরিশ্রমে ১২টি অধ্যায় নিয়ে রোমে প্রথম লিখিত আইনের সূত্রপাত হয়। বিশ্বের অতি পুরনো বিখ্যাত এই বিধিবদ্ধ আইনের নাম 'দ্বাদশ টেবিলের আইন'। সমগ্র রোমান আইনের ভিত্তি হল এই Laws of the twelve

www.pathagar.com

tables. এতে বিবদমান দু'পক্ষকে শুনবার ও এক পক্ষের অনুপস্থিতিতে একতরফা সিদ্ধান্ত গ্রহণের নির্দেশ দেয়া হয়েছে। এ আইনে ডিক্রিকৃত টাকা আদায়ের ব্যবস্থা বর্ণনা আছে। মহাজনকে অধিকার দেয়া হয়েছে টাকা আদায়ের জন্য খাতককে বন্দী, ক্রীতদাস হিসেবে বিক্রি এমনকি তার প্রাণ বধ করতে। এতে বিকলাঙ্গ সন্তানকে হত্যা করার অধিকার দেয়া হয়েছে এবং অভিভাবকত্ব ও উত্তরাধিকারের সূত্র বর্ণনা করা হয়েছে। এ আইনে স্থাবর সম্পত্তি দু'বছর ও অস্থাবর সম্পত্তি এক বছর ভোগ দখল করলে মালিকানাস্বত্ব প্রতিষ্ঠা, ম্যাজিস্ট্রেটের রায়ের বিরুদ্ধে আপিলের অধিকার, নিম্ন আদালতকে উচ্চআদালতের রায়ের নজির অনুশীলন, অঙ্গহানির বদলে পাল্টা অঙ্গহানি, মানহানির অপরাধে নাগরিকত্ব বাতিল, উইল, ক্রীতদাসের মর্যাদা পশুতুল্য এবং প্যাট্রিসিয়ান প্লেবিয়ানদের মধ্যে বিয়ে নিষিদ্ধ করে পূর্বের নিয়ম স্থায়ী করা হয়। পরে অবশ্য এ আইনকে কিছুটা গণমুখী করা হয়। তবে ৩০ খৃষ্টাব্দে রোমান সম্রাট জাস্টিনিয়ান সে দেশে প্রচলিত সমগ্র আইনের একটি কোষ সংকলন করেন। কারণ সে দেশে আদেশমূলক আইনের সংখ্যা ক্রমান্বয়ে এত বেশি হয়ে পড়েছিল যে, তিনটি বিশেষ বিধিতে নিবদ্ধ থাকা সত্ত্বেও সেগুলো জনগণের কাছে দুর্বোধ্য হয়ে উঠেছিল। রোম সাম্রাজ্যের স্থায়িত্বকাল ছিল সুদীর্ঘ ১৩শ' বছর। আধুনিক যুগেও বাংলাদেশসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশের আইন ব্যবস্থায় এই রোমান বিধির প্রভাব লক্ষণীয়। যে কারণে বিশেষ করে দরিদ্র দেশগুলোতে অভিজাত শাসক শোষক শ্রেণীর সাথে শোষিত নির্যাতিত মানুষের সংঘাত সংঘর্ষ চলছেই সে প্যাট্রিসিয়ান প্লেবিয়ানদের মতো। বিভিন্ন সভ্যতা ও দেশের প্রাচীন বিচার ব্যবস্থা ছাড়াও জার্মান, শ্লাভ, কেল্ট জাতির প্রাচীন বিচার ব্যবস্থা ছিল। রোম সাম্রাজ্যের পতনের যুগে এসব জাতি রোম সাম্রাজ্য আক্রমণ করে এই প্রাচীন রোম সভ্যতা ধ্বংস করেছিল। রোমানদের চোখে এসব জাতি ছিল বর্বর ও অসভ্য এবং তাদের আইনও ছিল তাদের কাছে বর্বর। কিন্তু তাদের নিজস্ব প্রথা পদ্ধতিতে আঘাতের পরিবর্তে আঘাত ও হত্যার পরিবর্তে হত্যা করার শাস্তির বদলে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি বা মৃত ব্যক্তির ওয়ারিসদের ক্ষতিপূরণ দিতে অপরাধীকে বাধ্য করা হতো। তবে রোমানদের মধ্যে আসামীকে নির্যাতন করে স্বীকারোক্তি আদায় করার পদ্ধতি দেখতে পেয়ে এ সকল বর্বর জাতির লোকেরা হতবাক হয়ে যেত। এ থেকে ধারণা করা যায় বর্বর জাতিদের বিচার ব্যবস্থাও অনেক ক্ষেত্রে তখনকার সভ্য জাতিদের বিচার ব্যবস্থা থেকে অনেক বেশি মানবিক ছিল।

সিন্ধু

বিশ্বের প্রাচীনতম সভ্যতার মধ্যে সিন্ধু সভ্যতা অন্যতম। খ্রিষ্টের জন্মের চার থেকে পাঁচ হাজার বছর আগে এর গোড়া পত্তন হয়। এর প্রধান দু'টি কেন্দ্র মহেনজোদারো ও হরপ্পাকে কেন্দ্র করেই গড়ে উঠেছিল এ প্রাচীন সভ্যতা। ধ্বংস প্রাপ্ত প্রাচীনতম নগরী দু'টি যথাক্রমে বর্তমানে পাকিস্তানের লারকানা জেলায় ও দক্ষিণ পাঞ্জাবে অবস্থিত। সৃষ্টি কর্মের উন্নতি সত্ত্বেও এটি ছিল নগর ও বাণিজ্য ভিত্তিক সভ্যতা।

www.pathagar.com

মিসরের প্রাচীন সভ্যতার তুলনায় সিন্ধু সভ্যতা ছিল অনেক বেশি অগ্রসর ও উন্নত। খনন করে এ সভ্যতার অনেক মূল্যবান নিদর্শন উদ্ধার করা হয়েছে। প্রাচীনকালে এ সভ্যতার ব্যাপক প্রভাব চারদিকে ছড়িয়ে পড়েছিল। পরে আর্য হিন্দুদের আক্রমণে খ্রীষ্টপূর্ব ১৫শ' সালের কাছাকাছি সময় এ সভ্যতার বিনাশ ঘটে। খননকার্যে উদ্ধারকৃত লিপির পাঠোদ্ধার করা যায়নি বলে আজো প্রাচীন সিন্ধু সভ্যতার ইতিহাস তেমন স্পষ্ট করে জানা যায়নি।

বৌদ্ধ

আইন সৃষ্টিতে বৌদ্ধ সভ্যতার দানও কম নয়। প্রাচীন ভারতের বৌদ্ধ সভ্যতার মহান অবদান 'পঞ্চশীলা' বিশ্বে সুপরিচিত। পঞ্চশীলায় প্রাচ্যের তৎকালীন আইন ব্যবস্থার ইতিহাস পাওয়া যায়। পঞ্চশীলার মূল ভিত্তি হলো, সৎ চিন্তা, সৎ আচরণ, সৎ আদর্শ, সৎ মনোবৃত্তি, সৎ দৃষ্টি, সৎ শ্রম, সৎ বাক্য, সৎ জীবনের অনুশীলন। মহামতি গৌতম বৌদ্ধ এসব ছাড়াও চুরি ত্যাগ, মিথ্যা না বলা, হিংসা ও পরনিন্দা ত্যাগ, পশু বধ নিষেধসহ বিভিন্ন উপদেশ দিয়েছেন। প্রাচীন ভারতে রাজার আদেশই ছিল আইন। বৌদ্ধ সম্রাট অশোকের প্রদত্ত বিধি-নিষেধের মধ্যে একটা গভীর নীতিবোধের পরিচয় পাওয়া যায়। বাংলাদেশেও কুমিল্লার ময়নামতি, বগুড়ার মহাস্থানগড়সহ বিভিন্ন স্থানে প্রাচীন বৌদ্ধ সভ্যতার বহু নিদর্শন মাটিচাপা পড়ে আছে। বৌদ্ধ সভ্যতার সঞ্চিত অনুদঘাটিত অনেক অধ্যায় খননকার্যের মাধ্যমে উদ্ধার করেছেন আমাদের প্রত্নতাত্ত্বিক বিভাগ।

মেগাস্থিনিস তার পাটলীপুত্রের পাটনা বিবরণ দিয়ে বলেছেন, সে আমলে বৌদ্ধ সাম্রাজ্যের পাটলীপুত্র একটি সুশাসিত নগর ছিল। সেখানে বিচার বিভাগও ছিল সুনিয়ন্ত্রিত। লৌকিক আচার, ধর্ম শাস্ত্র এবং রাজার অনুশাসন মতে হতো বিচার কাজ। শাস্ত্র ব্যাখ্যা দিতে ৩ জন ব্রাহ্মণের উপস্থিতিতে বাদী-বিবাদীর বক্তব্য শুনে বিচার করতেন বিচারক। আজকের মতো সে আমলেও বাদী বিবাদীকে সওয়াল জবাব এবং সাক্ষ্য গ্রহণের নিয়ম ছিল। অপহরণ, চুরি, বিষ প্রয়োগ, মুদ্রা জাল, অনধিকার প্রবেশ, দ্রব্য পরিমাপে শঠতা, সমাজের নিয়ম লংঘন ইত্যাদি অপরাধের বিরুদ্ধে বেত্রদণ্ডসহ বিভিন্ন শাস্তির বিধান ছিল।

হিন্দু

মহামতি মেইন-এর মতে পৃথিবীর প্রাচীনতম আইনগুলোর মধ্যে হিন্দু আইন সর্বাগ্রে স্থান পাওয়ার যোগ্য। সুমেরীয় ও ব্যাবিলনীয় আইনের উত্তরসূরী হলেও হিন্দু আইন ও বিচার ব্যবস্থা ছিল পীড়ন ও দমনমূলক। সেনাবাহিনী ও পুরোহিত তন্ত্রের ওপর নির্ভরশীল এসব আইন কার্যকর করা হতো ধর্মের নামে, দেবতা অসুরের নামে। হিন্দু আইনের উৎস সম্পর্কে মোটামুটি অর্ধশতাধিক গ্রন্থের তথ্য পাওয়া যায়। এসব গ্রন্থ খৃষ্টপূর্ব ১৬শ' অব্দ থেকে খৃষ্টীয় ১৭ শতকের মধ্যে রচিত হয়েছে। উল্লেখযোগ্য গ্রন্থগুলোর মধ্যে খৃষ্টপূর্ব ১৬শ' অব্দে রচিত 'উপনিষদ' গ্রন্থ নৈতিক ও ধর্মীয় নীতিতে পরিপূর্ণ। খৃষ্টপূর্ব ১৩শ'

www.pathagar.com

অব্দে আর্য সম্প্রদায় পাঞ্জাবের আম্বালায় বসতি স্থাপনের সময় মহর্ষী ব্যাস রচনা করেন ঋগ-বেদ। এভাবে খৃষ্টপূর্ব এক হাজার অব্দে 'সামবেদ' এবং ৮শ' অব্দে রচিত হয়েছে মনু সংহিতা। হিন্দু সম্প্রদায় এ গ্রন্থকে পবিত্রতার দিক থেকে বেদের পরবর্তী মনে করে। এছাড়া হরিও, গৌতম, হিরণ্যাকেশী, বৌধায়ন, বিষ্ণু, বশিষ্ট, যম, লিখিড়, দেবালা, কাত্যায়ন, নারদ, আঙ্গিরাস, পরাসর, আত্রি, মেধাতিথি, সংখ্যায়ন, অস্যালয় গ্রন্থাবলীও রয়েছে। এভাবে ৩৫০ সালে যাজ্ঞবল্ক্য, ১১৫০ সালে মিতফরা, ১১৩০ সালে লক্ষীধর রচিত কলুতরু, ১৬শ' সালে নীলকান্ত রচিত ব্যবহার বিধি, ১৪শ সালে কুলুকভট্ট রচিত কুলুক ধর্মসার এবং একই সালে রচিত দায়ভাগ, ১৫৫০ সালে কারাভিরা রচিত বিবাদ চন্দ্রিকা ও চন্দ্রেশ্বর ঠাকুর রচিত বিবাদ রত্নাকর এবং ১৭শ' সালে মিত্রমিশ্র রচিত বিত্রমিত্রদয় সহ অর্ধশতাধিক গ্রন্থের তথ্য পাওয়া যায়। (মিত্রমিশ্র ছিলেন ভারতের মোঘল সম্রাট আকবরের রাজসভার মন্ত্রী। আইনী আকবরীর রচয়িতা আবুল ফজলকে হত্যা করেছিলেন মিত্রমিশ্র।) এসব প্রাচীন গ্রন্থ হিন্দু ধর্মের বিধি-বিধান পৌরাণিক কিংবদন্তি ও দেবদেবী বন্দনার হাজার হাজার শ্লোকসমৃদ্ধ। হিন্দু আইনে নীতি ও ধারার ভাষ্যকারগণের মতে দশজন ঋষী সৃষ্টি হলো। তারা ঈশ্বর থেকে মনু'র বিধি প্রাপ্ত হলেন। মনু হিন্দু ধর্ম ও সমাজ জীবনের যে বিভিন্ন বিধি-বিধান লিখে গেছেন তার নাম 'মানব ধর্ম শাস্ত্র'। কোন কোন ঐতিহাসিকের মতে, গ্রন্থটির আসল রচয়িতা হলেন ভ্রিসু নামে একজন। ভ্রিসু বলেছেন মনু হলেন বিশ্বের প্রথম মানব। মনুর বিধান এই প্রথম মানবের সময়কাল থেকেই চলে আসছে। সম্পূর্ণ ধর্মশাস্ত্রটি বিশুদ্ধ সংস্কৃত ভাষায় রচিত। এতে ১২টি অধ্যায় ও ২৬৮৪টি শ্লোক রয়েছে। মনু সংহিতায় রাজাকে দেবতা এবং মানুষরূপে বিষ্ণু বলে গণ্য করা হয়েছে। মনুর বিধান মতে যেহেতু রাজার মধ্যে দেবতা অধিষ্ঠান করেন সেহেতু রাজার আদেশ ও আইন প্রজাগণের অবশ্য পালনীয় কর্তব্য। সেনা প্রধান ও একই সাথে ধর্মপালনে প্রজাদের বাধ্য করতে রাজা সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী। হিন্দু সমাজের বড় বৈশিষ্ট্য হল বর্ণাশ্রম ব্যবস্থা (Cast system)। মনু হিন্দু সমাজকে ৪টি বর্ণ এবং ৫০টি জাতিতে বিভক্ত করেছেন। প্রথম উচ্চ বর্ণ হলো ব্রাহ্মণ। এরা হল সবার সেরা। জ্ঞান চর্চা ও দেবদেবীর পূজা করা এদের প্রধান কাজ। দ্বিতীয় বর্ণ ক্ষত্রিয়। এদের কাজ যুদ্ধবিগ্রহ ও দেশ পরিচালনার জন্য রাজা হওয়া। তৃতীয় বর্ণ বৈশ্যদের কাজ হলো ব্যবসা ও চাষাবাদ করা। আর চতুর্থ বর্ণ শুদ্র হলো দাস। শুদ্রদের দায়িত্ব হচ্ছে অপর তিন বর্ণের হুকুম মেনে চলা ও তাদের সেবা করা। শুদ্রদের মধ্যে যারা নিম্নশ্রেণী ডোম, চামার তারা হিন্দু সমাজে 'দলিত' সম্প্রদায় হিসেবে পরিচিত। শুদ্র ও হিন্দু মহিলাদের বেদ পাঠ নিষিদ্ধ, আর বেদের ব্যাখ্যা শুধু ব্রাহ্মণরাই দেবে। মনুর বিধানে বলা হয়েছে ব্রাহ্মণ কোন দোষ করলেও তার শাস্তি হওয়া উচিত নয়। কারণ সে উচ্চবর্ণের ব্রাহ্মণ। সে সম্মানীয়, এ বিধান মতে মানুষ জন্মগতভাবেই একে অপর থেকে আলাদা। তাই হিন্দু সমাজের জাতিভেদ প্রথায় বিভিন্ন বর্ণের মধ্যে মেলামেশা, খাওয়া ও বিয়ে শাস্ত্র বিরুদ্ধ, যদিও আধুনিক হিন্দু সমাজ আজকাল এ সব মানতে চায় না। তবে ব্রাহ্মণরা আজো নিজেদের

www.pathagar.com

ছাড়া আর সবাইকে নিকৃষ্ট মনে করে। নারদ বলেন, দোষী রাজাকেও আঘাত করা যাবে না। কারুর এমন অপরাধ ১০০ ব্রাহ্মণ হত্যার চেয়েও নিকৃষ্ট হওয়ায় তাকে জীবন্ত দগ্ধ করতে হবে। কোন পিতা তার সন্তানকে শাসনের জন্য যে কোন শাস্তি দিলেও পিতার কোন বিচার করা যাবে না। শিক্ষক ছাত্রকে শাসন করতে হলে ছাত্রের মাথা ও বুক ছাড়া শরীরের অন্যত্র পাতলা দড়ি ও বাঁশের কঞ্চি দিয়ে শাস্তি দেবেন। মনু'র বিধানে বলা হয়, শুদ্র যদি ক্ষত্রিয়ের ব্যবসা অনুসরণ করে তাহলে তাকে সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত করে নির্বাসনে পাঠাতে হবে। শুদ্র অপর বর্ণের কাউকে আঘাত করলে শরীরের যে অংশ দিয়ে আঘাত করেছে তা কেটে ফেলতে হবে। বিষ্ণু বলেন, কোন ব্রাহ্মণকে পেঁয়াজ খেতে বাধ্য করা হলে অপরাধীকে ১শ' মোহর জরিমানা এবং খারাপ পানীয় পান করতে বাধ্য করলে মৃত্যুদণ্ড দেয়া যাবে। তবে এসব অপরাধের জন্য যাজ্ঞবল্ক্য এক হাজার মোহর জরিমানা ধার্য করেছেন। তিনি বলেন, যে ব্যক্তি অপবিত্র কম্বল দিয়ে মৃতদেহ ঢাকা, গুরুজনের সাথে বেয়াদবি করে কিংবা বিনা অনুমতিতে রাজার শকট, পাল্কি ও রথে চড়ে তাকে ৫শ' পণ জরিমানা করা যাবে। যদি কোন শুদ্র ব্রাহ্মণের বাহ্যিক রূপ ধারণ করে জীবিকা নির্বাহ করে তাকে ৮শ' পণ জরিমানা করা যাবে। কেউ ঘুষ খেলে তাকে ঘুষের ৮ গুণ জরিমানা করা যাবে। প্রাচীন হিন্দু শাস্ত্রীয় আইনে নারদ বলেছেন, খুন করলেও ব্রাহ্মণকে মৃত্যুদণ্ড দেয়া যাবে না। তবে তাদের মাথা কামানো যেতে পারে, নির্বাসিত করা যেতে পারে, কপালে দগ্ধ লোহার চিহ্ন এবং গাধার পিঠে চড়ানো যেতে পারে। ব্রাহ্মণ যদি ক্ষত্রিয়, বৈশ্য বা কোন শুদ্রকে খুন করে তাহলে দোষী সাব্যস্ত ব্রাহ্মণকে যথাক্রমে ২ হাজার গাভী ও একটি ষাঁড়, ১শ গাভী ও ১টি ষাঁড় এবং ১০টি গাভী ও ১টি ষাঁড় জরিমানা করা যাবে। বৌধ্যায়ন বলেন, অন্য বর্ণের কেউ ব্রাহ্মণকে হত্যা করলে তাকে ফাঁসি দিয়ে তার সব সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হবে। তবে নিম্ন শ্রেণীর কেউ একে অপরকে খুন করলে অপরাধীর সামর্থ্য অনুসারে শারীরিক শাস্তি ও জরিমানা করতে হবে। কাত্যায়ন ও বৃহস্পতি বলেন, পাঁচ প্রকারের দুর্নীতির মধ্যে খুন সর্বাপেক্ষা বড় ও জঘন্য। তাদেরকে যন্ত্রণাদায়ক মৃত্যুদণ্ড ছাড়া জরিমানা করা যাবে না। যাজ্ঞবল্ক্য বলেন, মৃত্যুদণ্ডের জন্য দোষী সাব্যস্ত হলে ব্রাহ্মণকে ১শ' মোহর জরিমানা করা যাবে। চুরি, ডাকাতিতে দোষী সাব্যস্ত হলেও ব্রাহ্মণকে কখনোই শারীরিক শাস্তি দেয়া যাবে না। তবে তাকে নিরাপদ স্থানে বেঁধে রেখে শারীরিক পরিশ্রমের কাজ করানো যাবে বলেছেন যম। তিনি রাজকীয় ভাণ্ডার থেকে চুরি, বিদ্রোহ ঘোষণা এবং রাজার শত্রুদের উত্তেজিত করার দায়ে দোষী ব্যক্তিকে যন্ত্রণাদায়ক মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করার কথা বলেছেন। নারদের মতে দস্যুবৃত্তি ৩ প্রকার। প্রথমত, কারুর ফল, জমি, পানি নষ্ট করে ক্ষতিসাধন, দ্বিতীয়ত, অপরের খাদ্যদ্রব্য, গৃহপালিত পশু এবং গার্হস্থ্য সামগ্রী বিনষ্ট করা ও তৃতীয়ত, বিষ প্রয়োগ, অস্ত্র বহন, বলৎকার এবং নরহত্যা। প্রথম ও দ্বিতীয় ধরনের অপরাধের জন্য ১শ' পণ জরিমানা এবং তৃতীয় ধরনের অপরাধের জন্য ক্ষতির সমপরিমাণ বা দ্বিগুণ জরিমানা করা যেতে পারে। শেষ পর্যায়ে তৃতীয় শ্রেণীর অপরাধের জন্য জরিমানা

www.pathagar.com

আদায়ের পর অপরাধীকে ফাঁসি, তার সমুদয় সম্পত্তি বিক্রি, যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর, উত্তপ্ত লৌহ শলাকা দ্বারা অসম্মানজনকভাবে শরীরে চিহ্ন দেয়া বা যে সব অঙ্গ প্রত্যঙ্গ দ্বারা অপরাধ করেছে সেগুলো কেটে ফেলতে হবে। কাত্যায়ন বলেন, ব্রাহ্মণের প্রতি কোন শুদ্র থুথু নিক্ষেপ করলে রাজা তার ওষ্ঠদ্বয় কর্তন করবেন। কোন শুদ্র ব্রাহ্মণের সম্মুখে পেশাব করলে তার লিঙ্গচ্ছেদ করতে হবে। যদি সে তার প্রভুর শরীরের কোন অংশে বায়ু ত্যাগ করে অপমান করে তবে রাজা তার গুহ্যদ্বার কেটে ফেলবেন। ব্রাহ্মণের চুল, পা কিংবা অণ্ডকোষ ধরলেও শুদ্রকে শাস্তি হিসেবে হস্তদ্বয় কর্তন করতে হবে। যদি কোন ব্যক্তি প্রকাশ্য দাঙ্গায় অপরকে জখম করে তাহলে ক্ষতের পরিমাণ মতো প্রহার করতে হবে। নারীর সাথে অবৈধ সম্পর্কের অপরাধে বিষ্ণু সর্বোচ্চ অর্থদণ্ডের বিধান করেছেন। কিন্তু নিম্নবর্ণের নারীর সাথে একই অপরাধ করলে ব্রাহ্মণকে শাস্তি হিসেবে কিছুদিন ভিক্ষাপাত্র হাতে দুয়ারে দুয়ারে ঘুরতে হবে এবং তিন বছর অবিরাম গায়ত্রী মন্ত্র জপ করতে বলা হয়েছে। কোন শুদ্র যদি ব্রাহ্মণ রমণীর সাথে অবৈধ সম্পর্ক করে তাহলে তার অঙ্গচ্ছেদসহ আরো বহু কঠিন শাস্তির বিধান করেছেন মনু। তবে দণ্ড প্রদানের ব্যাপারে কোটিল্য অনেকটা সাম্যবাদী। তিনি বলেছেন, দণ্ড প্রয়োগে রাজা শৈথিল্য দেখালে তাকেও শাস্তি দিতে হবে। ব্রাহ্মণকে যদিও প্রাণদণ্ড দেয়া যাবে না কিন্তু তাকে অন্যান্য শাস্তি দেয়া যাবে। কারণ অপরাধী কখনো ক্ষমাযোগ্য নয়। এসব দণ্ডবিধি ছাড়াও হিন্দু আইনে বিয়ে সম্পত্তির উত্তরাধিকারসহ বিভিন্ন বিধি বিধান রয়েছে।[১]

ইসলামী

অপেক্ষাকৃত কম প্রাচীনত্ব হলেও ১৪শ' বছর আগে ইসলামী আইন এসেছে মানব সভ্যতার অগ্রযাত্রার আশীর্বাদ হিসেবে। সাম্যবাদের আলোকবর্তিকা নিয়ে আবির্ভূত ইসলামী আইন এসেছে জীবনের প্রতিটি স্তরে সত্য ও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার অঙ্গীকার নিয়ে। ইসলামী আইনের প্রথম প্রধান এবং শ্রেষ্ঠতম উৎস হচ্ছে মহান আল্লাহ প্রদত্ত মহাগ্রন্থ পবিত্র কোরআন। জ্ঞান বিজ্ঞান চর্চাকে ইসলাম ধর্মে ইবাদত হিসেবে গণ্য করা হয়। আরবী ভাষায় আসমানী কিতাব কোরআন হচ্ছে মানুষের পরিপূর্ণ জীবন বিধান। মহানবী হযরত মুহাম্মদ স.-এর মাধ্যমে মহান আল্লাহ প্রদত্ত আসমানী কিতাব পবিত্র কোরআনের ১১৪টি সূরার মধ্যে একটি ছাড়া আর সব কয়টিতে প্রথমেই বলা হয়েছে আল্লাহ দয়াশীল ও সহানুভূতি সম্পন্ন। চৌদ্দশ' বছর আগে আরবে ইসলামী সভ্যতা প্রতিষ্ঠারও বহু আগে থেকে প্রাচীন সভ্যতা প্রতিষ্ঠিত ছিল। "অতি প্রাচীনকালে বিশ্বের অন্যতম সমৃদ্ধ সভ্যতার একটি ছিল এই আরব সভ্যতা। ঐতিহাসিকদের মতে খ্রীষ্টপূর্ব ৩৫০০ অব্দ থেকে ৫শ' অব্দের মধ্যে সেমেটিক জাতির বিভিন্ন অংশ দজলা-ফোরাত উপত্যকা, মেসোপটেমিয়া (আজকের ইরাক), সিরিয়া, প্যালেস্টাইন ও সিনাই উপত্যকা জুড়ে ছড়িয়ে পড়ে বিভিন্ন সভ্যতা গড়ে তোলে। খ্রীষ্টপূর্ব নবম শতাব্দীর অ্যাসেরীয় উৎকীর্ণ লিপি থেকে জানা যায়, আরব বলতে আরব উপদ্বীপের সুদূর উত্তরাঞ্চলের

www.pathagar.com

যাযাবরদেরকেই বোঝানো হত। এরপর সমগ্র আরব উপদ্বীপের এবং মধ্য প্রাচ্যের মরু এলাকার অধিবাসীদের আরব বলে অভিহিত করা হতে থাকে। মধ্যযুগে তারা অভিহিত হতো 'স্যারাসেন' নামে। এরা ছিল মূর্তি ও প্রকৃতি পূজক। আরব সভ্যতা প্রাথমিকভাবে মিসরীয় ও মেসোপটেমীয় সভ্যতা দ্বারা গভীরভাবে প্রভাবিত হয়। প্রাচীনকালে আরব অঞ্চলে দু'টি রাজতন্ত্র গড়ে ওঠে। খ্রীস্টপূর্ব ৭শ' অব্দ থেকে খ্রীস্টপূর্ব ৩শ' অব্দ সময়সীমার মধ্যে প্রতিষ্ঠিত ছিল মিনায়েম রাজতন্ত্র। অন্যটি সাবাতিয়ান রাজতন্ত্রকে ঘিরে একটি রাষ্ট্র গড়ে ওঠে খ্রীস্টপূর্ব ৭৫০ অব্দ থেকে খ্রীস্টপূর্ব ১১৫ অব্দ সময়সীমার মধ্যে। খ্রীস্টপূর্ব প্রথম সহস্রাব্দে দক্ষিণাঞ্চলীয় এ দু'টি আরব রাজতন্ত্রের আমলে বিভিন্ন দেশের সংগে সমুদ্র পথে বাণিজ্যের ব্যাপক প্রসার ঘটে। শিল্প সাহিত্যের ক্ষেত্রে এই সভ্যতার অবদান কম নয়। 'আরব্য রজনী' বিশ্ব সাহিত্যের এক অমূল্য সম্পদ। নবম শতাব্দীতে আরবীয় সঙ্গীত কলার প্রভূত বিকাশ ঘটে। তাদের কাছ থেকেই ভারতীয়রা তবলা নামের বাদ্যযন্ত্র এবং ইউরোপীয়রা লিউট নামের বীণাযন্ত্র গ্রহণ করে।"[২] রোম সাম্রাজ্য যখন সভ্যতার উচ্চ শিখরে অবস্থান করছিল তখন আরব দেশ ছিল অন্ধকারে নিমজ্জিত। রোমান সম্রাট জাস্টিনিয়ানের মৃত্যুর পাঁচ বছর পর আরবের মক্কা নগরীতে মহানবী হযরত মুহাম্মদ সা. জন্মগ্রহণ করেন। তখন আরব দেশ ছিল বিভিন্ন গোত্রে বিভক্ত।[৩] আরবের গোত্রীয় লোকদের মধ্যে তখন কোন ঝগড়া বিবাদ হলে গোত্র প্রধান তার বিচার করতেন। এক গোত্রের লোক অপর গোত্রের লোককে ক্ষতিগ্রস্ত করলে তা মীমাংসা করতে প্রচলিত প্রথানুযায়ী অপরাধীকে শাস্তি গ্রহণের জন্য ক্ষতিগ্রস্ত গোত্রের কাছে সমর্পণ না করা হলে বা ক্ষতিগ্রস্ত লোককে ক্ষতিপূরণ না দেয়া হলে গোত্রে গোত্রে নিরবচ্ছিন্ন হানাহানি লেগে থাকত। তবে এ ধরনের বিরোধ নিষ্পত্তি করতে নিরপেক্ষ সালিস (আল হাকিম) ও বিচারক (আল কাজি) নিযুক্ত করার নিয়ম তখন প্রচলিত ছিল।[৪] মহানবী হযরত মুহাম্মদ সা. নবুয়ত লাভের ১৩ বছর পর মক্কা নগরী থেকে তার অনুসারী কোরাইশ মুসলমানদের সঙ্গে নিয়ে মদিনায় হিজরত করেন এবং সেখানে যারা ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন তাদের কাছে আশ্রয় নেন। মদিনায় তিনি সর্ব প্রথম একটি মসজিদ প্রতিষ্ঠা করে সেখানে বসে তার অনুসারী মুসলমানদের বিভিন্ন সমস্যার সমাধান করতেন। কিছুকাল পর তিনি মুসলমানদের পক্ষে মদিনার ইহুদি গোত্রগুলোর সাথে এক চুক্তি করেছিলেন যা মদিনা সনদ নামে খ্যাত। ওই চুক্তিপত্রে মক্কা ও মদিনার গোত্রগুলোর মধ্যে প্রচলিত নরহত্যার পরিবর্তে নরহত্যা বা ক্ষতিপূরণ দান, আঘাতের পরিবর্তে আঘাত, বন্দিমুক্তির জন্য মুক্তিপণ প্রদান, গোত্রের প্রচলিত প্রথা পদ্ধতি ভঙ্গকারীকে গোত্র থেকে বহিষ্কার করা, গোত্র বহিষ্কৃত ব্যক্তিকে ভিন্ন গোত্রে আশ্রয় প্রদান নিষিদ্ধ করার স্বীকৃতি দেয়া হয়েছিল। ওই চুক্তিপত্রে মুসলমানদের নেতা হিসেবে স্বীকৃতি এবং চুক্তিবদ্ধ গোত্রগুলোর বিরোধ মীমাংসার দায়িত্ব ন্যস্ত করা হয়েছিল মহানবী সা.-এর ওপর।[৫] তখন থেকে মদিনায় তিনি শাসক ও বিচারক হিসেবে সর্বময় ক্ষমতা পরিচালনা করতে থাকেন। মক্কা বিজয়ের পর তিনি গোত্রপ্রথা বিলুপ্ত করে বিদায় হজ্জের বাণীতে সাদা কালো আরব অনারব

www.pathagar.com

নির্বিশেষে সকল মুসলমানকে এক সমাজ বা উম্মাহ বলে ঘোষণা করেন। মদিনার বাইরে ইসলামী শাসন বিস্তার লাভ করলে শাসন ও বিচার কার্য পরিচালনা করার জন্য মহানবী হযরত মুহাম্মদ সা. সেখানে প্রশাসক নিযুক্ত করে তাদের ওপর দেশ শাসন ও বিচারকার্যের ভার অর্পণ করেছিলেন। বিচারের ক্ষেত্রে সাক্ষ্য প্রদান এবং সাক্ষ্যের গ্রহণযোগ্যতা, অপরাধীকে দোষী সাব্যস্ত করা ও দণ্ডদানের নিয়ম কানুনও তিনি সুনির্ধারিত করেন। ইয়েমেনে হযরত আলীকে বিচারক নিযুক্ত করে পাঠাবার সময় তিনি তাকে নির্দেশ দিয়েছিলেন যে অপর পক্ষের বক্তব্য না শোনা পর্যন্ত এবং নিজের প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্তে না পৌঁছা পর্যন্ত ফরিয়াদির পক্ষে কোন আদেশ দিবেন না। চুরিকে তিনি খুবই ঘৃণ্য অপরাধ বিবেচনা করে বলতেন, তোমাদের আগে যারা ধ্বংস হয়েছে তারা এ কারণে ধ্বংস হয়েছে যে তাদের অভিজাত বা উচ্চ পদে আসীন কেউ চুরি করলে তারা তাকে কোন সাজা দিতনা।[৬] মধ্যযুগে ইসলামী বিচার ব্যবস্থা সারাবিশ্বকে এতো গভীরভাবে প্রভাবিত করেছিল যে, ইসলামের ইতিহাসে এক স্বর্ণোজ্জ্বল দীর্ঘ অধ্যায় সংযোজিত হয়েছিল তুরস্কের ওসমানী (Ottoman Empiar) খেলাফতের আমলে। এর প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন গাজী ওসমান। পারস্য উপসাগর থেকে ভূমধ্য সাগর পর্যন্ত বিস্তীর্ণ অঞ্চল, সমগ্র মিশর, ইউরোপের কৃষ্ণ সাগরের পশ্চিম তীর থেকে শুরু করে অড্রিয়েটিক সাগরের পূর্বতীর পর্যন্ত সমগ্র ভূখণ্ড, এশিয়া মাইনর আনাতোলিয়া এবং ইউরোপের দক্ষিণ পূর্ব অংশ, সমগ্র বলকান উপদ্বীপ, বুলগেরিয়া, আলবেনিয়া, বসনিয়াসহ বিশাল অঞ্চল ছিল ওসমানী খেলাফতের অন্তর্ভুক্ত।[৭] ইসলাম কোন পুরোহিত ব্যবস্থা বা মানুষে মানুষে বিভেদ কিংবা জাতিভেদ প্রথা স্বীকার করে না। স্ত্রী, কন্যা, জননী যেই হোক না কেন ইসলামী আইন নারীর মর্যাদাকে করেছে মহীয়ান। শুধু মানুষ নয় সৃষ্টির সব প্রাণীর প্রতি নিষ্ঠুরতার বিরুদ্ধে ইসলাম। চুরি, নরহত্যা, ব্যভিচারসহ বিভিন্ন অপরাধের ক্ষেত্রে ইসলামী দণ্ডবিধিতে ক্ষেত্রবিশেষে কঠোর ও বিভিন্ন শাস্তির বিধান রয়েছে।

ইসলাম ধর্ম অবমাননা ও রাষ্ট্রদ্রোহিতা, খাদ্যে ভেজাল, বলৎকার, ওজনে কম দেয়া, প্রতারণাসহ নানা অপরাধের জন্য ইসলামী দণ্ডবিধিতে পৃথক শাস্তির বিধান রয়েছে। চুরির শাস্তি হাত কর্তন এবং তা সরাসরি পবিত্র কোরআন নির্দেশিত। আল্লাহপাক বলেন, 'পুরুষ কিংবা নারী চুরি করলে তাদের হাত ছেদন কর। এটি তাদের কৃতকর্মের ফল এবং আল্লাহর নির্ধারিত আদর্শ দণ্ড, আল্লাহ পরাক্রমশালী প্রজ্ঞাময়।'[৮] এ বিষয়ে বিখ্যাত ফিকাহ গ্রন্থে বলা হয়েছে, কোন অপ্রাপ্ত বয়স্ক বুদ্ধিমান ব্যক্তি যদি কমপক্ষে ১০ দিরহাম অথবা ৪.৫৭ গ্রাম স্বর্ণ বা সমমূল্যের চেয়ে অধিক মূল্যের অস্থাবর দ্রব্য চুরি করে তাহলে তার হাত কাটার দণ্ড দেয়া যাবে। এর কম মূল্যের দ্রব্য চুরির অপরাধে এ দণ্ড দেয়া নিষেধ।[৯] তবে ক্ষুদ্র দ্রব্য যেমন পচনশীল খাদ্য দ্রব্য, বাঁশ, ঘাস, বই পুস্তক, পবিত্র কোরআন, মসজিদের দরজা, দুধ, ফুল, মাদক দ্রব্য, শুকর, বাদ্যযন্ত্র চুরি এবং নিজের বাবা, মা, দাদা, দাদী, সন্তান, ভাই, বোন, ফুফু, খালা, মামা, স্বামী, স্ত্রী, মেহমান, চাকর বা কর্মচারী, চুরি করতে বাধ্য করা হয়েছে এমন ব্যক্তি এবং গ্রেফতারের আগে

www.pathagar.com

আত্মসমর্পণকারী ব্যক্তির জন্য হাত কাটার দণ্ড প্রযোজ্য নয়। এদের শাস্তি হবে 'তাযির' তথা বিচারকের বিবেচনামূলক শাস্তির আওতায়। হিদায়া গ্রন্থে বলা হয়েছে প্রথমবার চুরির অপরাধে ডান হাতের কব্জি পর্যন্ত, ২য় বারের অপরাধে বাঁহাত কাটা যাবে এবং শাস্তি কার্যকরের পর তার প্রাণ রক্ষায় চিকিৎসা দিতে হবে। সামাজিক নিরাপত্তা রক্ষায় এ কঠোর শাস্তি প্রতিকারমূলক হলেও এরকম কঠোর শাস্তি শর্তসাপেক্ষে কার্যকর করতে হবে। সবচেয়ে যৌক্তিক শর্ত হলো, একটি ইসলামী রাষ্ট্র তখনই হাত কাটার নির্দেশ দেয় যখন রাষ্ট্রে শিশু, নারী, বৃদ্ধ, পঙ্গু, অসুস্থসহ প্রতিটি নাগরিকের নিম্নতম মৌলিক অধিকারসমূহ যেমন শিক্ষা, চিকিৎসা, খাদ্য, বস্ত্র ও বাসস্থানের নিশ্চয়তা দেয়া সত্ত্বেও নিছক বদ অভ্যাসের বশে কেউ চুরি করে। যে সমাজ বা রাষ্ট্র মানুষের সামাজিক নিরাপত্তা বিধানে অক্ষম বা অবহেলা করে, অন্যায়ভাবে ধনী হবার বাসনা অপ্রতিরোধ্য এবং সামাজিক নিরাপত্তা অকার্যকর সেখানে হাতকাটার বিধান অপ্রযোজ্য। ইতিহাস সাক্ষী প্রথম ৪শ' বছরের মধ্যে চুরির ইসলামী দণ্ড মাত্র ৬ বার প্রয়োগ হয়েছে এবং এখনো সউদী আরবে ইসলামী দণ্ডবিধি কার্যকর থাকায় অপরাধের হার সারাবিশ্বের চেয়ে নিম্নে।'[১০] চিরন্তন সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত ইসলামী আইন মানব সমাজের জন্য একটি জীবন্ত গতিশীল জীবনাদর্শ। এ আইনের বিরুদ্ধবাদীরাও ইসলামী উত্তরাধিকার (ফরায়েজ) আইনকে পরিপূর্ণ বলে স্বীকার করেছেন। ইসলামী আইনে শাস্তির ক্ষেত্রে রাষ্ট্রনায়ক ও দরিদ্র প্রজার মধ্যে কোন প্রভেদ রাখা হয়নি। আল্লাহর আনুগত্য, সত্য, শান্তি, ভ্রাতৃত্ব, শ্রেষ্ঠ নৈতিক আদর্শ আর সাম্যবাদই হচ্ছে ইসলামী আইনের মূল কথা। পবিত্র কোরআনে যে বিধি পাওয়া যায়, মহানবী হযরত মুহাম্মদ সা.-এর সুন্নাহর মধ্যে যে বিধি বিধৃত এবং আইন বিশারদগণ যে অভিমতে পৌঁছেছেন এই তিনে মিলে হয়েছে ইসলামী আইন। আইনবিদগণ যেখানে মতৈক্যে পৌঁছেছেন তাকে বলা হয়েছে 'ইজমা' এবং যেখানে আইনের ব্যাখ্যায় সাদৃশ্যমূলক অনুমান তাকে বলা হয়েছে 'কিয়াস'। যে উৎস ও মূলনীতির ওপর ইসলামী আইন প্রতিষ্ঠিত সে সম্পর্কে মুসলিম সমাজে কোন মতভেদ নেই। ৮০ থেকে ১৫০ হিজরী সনে ইসলামী আইনের প্রধান ভাষ্যকার ছিলেন ইমাম আবু হানিফা। (খৃষ্টীয় সাল ৬৯৯-৭৬৬) ইসলামী আইনের উসুল ও ফিক্‌হের তিনিই ছিলেন প্রথম প্রবর্তক। তিনি ইসলামী আইনের বিজ্ঞানভিত্তিক গবেষণা করে ন্যায়নীতি ও ইনসাফভিত্তিক একটি সূত্রের প্রবর্তন করেন যাকে বলা হয় ইস্তিহসান। ইসলামী আইনের বিভিন্ন উৎস সম্পর্কে তিনি যে বিজ্ঞানভিত্তিক আলোচনা করেছেন তাকে বলা হয়েছে ইলমুল উসুল এবং উসুলের মাধ্যমে যে অসংখ্য হানাফী আইনের সূত্র বিধিবদ্ধ করেছেন তাকে বলা হয় ইল্‌মুল ফিক্‌হ। ইমাম আবু হানিফা তার ৪০ জন অনুসারীসহ দীর্ঘ ৩০ বছর পরিশ্রম করে হানাফি মাযহাবের ইসলামী আইন বিধিবদ্ধ করে গেছেন। তার অনুসারীদের মধ্যে জাফর ছিলেন 'কিয়াস' পদ্ধতিতে আইনের সূত্র প্রতিষ্ঠায় অপ্রতিদ্বন্দ্বী। কাশেম ইবনে নঈম ছিলেন আরবী সাহিত্যে মহাপণ্ডিত। আর ইমাম আবু ইউসুফ ছিলেন আব্বাসীয় খলিফা আল মানসুরের রাজত্বকালে মুসলিম

www.pathagar.com

সাম্রাজ্যের প্রধান বিচারপতি। মুঘল বাদশাহ আওরঙ্গজেব আলমগী কর্তৃক সংকলিত 'ফতওয়াই আলমগীরী' গ্রন্থখানা ইমাম আবু ইউসুফের বিচার ফায়সালাগুলোর এক সমৃদ্ধ সংগ্রহ যা বর্তমান যুগে ল'রুলিংস হিসেবে পরিচিত। জীবন সায়াহ্নে ইমাম আবু হানিফা বাগদাদের প্রধান বিচারপতির পদ প্রত্যাখ্যান করলে খলিফা আল মানসুর তাকে কারারুদ্ধ করেন এবং সেখানেই এ মহাপুরুষের ইন্তেকাল হয়। বাংলাদেশ, ভারত, আফগানিস্তান, পাকিস্তান, তুরস্ক, মিসর, আরব ও চীনের কোটি কোটি অধিবাসী ইমাম আবু হানিফার অনুসারী।

পবিত্র কোরআনে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার কথা বার বার বলা হয়েছে। কোরআনের সূরা আন নিসার ৫৮ আয়াতে আল্লাহ পাক বলেছেন, 'আর যখন তোমরা মানুষের মধ্যে বিচার মীমাংসা করতে আরম্ভ কর, তখন মীমাংসা কর ন্যায়ভিত্তিক এবং ১৩৫ আয়াতে বলা হয়েছে, 'হে ঈমানদারগণ তোমরা ন্যায়ের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাক, আল্লাহর ওয়াস্তে ন্যায়সঙ্গত সাক্ষ্যদান কর, তাতে তোমাদের বা পিতা-মাতার অথবা আত্মীয় স্বজনের যদি ক্ষতি হয় তবুও। কেউ যদি ধনী কিংবা দরিদ্র হয় তবে আল্লাহ তাদের শুভাকাঙ্ক্ষী তোমাদের চেয়ে বেশি, অতএব তোমরা বিচার করতে গিয়ে রিপুর কামনা বাসনার অনুসরণ করোনা। আর যদি তোমরা ঘুরিয়ে পেঁচিয়ে কথা বল কিংবা পাশ কাটিয়ে যাও, তবে আল্লাহ তোমাদের যাবতীয় কাজকর্ম সম্পর্কে অবগত।' পরবর্তী সূরা আল মায়িদাহর ৮ নং আয়াতে বলা হয়েছে, 'হে মুমিনগণ তোমরা আল্লাহর উদ্দেশ্যে ন্যায় সাক্ষ্যদানে অবিচল থাকবে এবং কোন সম্প্রদায়ের শত্রুতার কারণে কখনো ন্যায় বিচার পরিত্যাগ করো না। সুবিচার কর। এটাই খোদাভীতির অধিক নিকটবর্তী। আল্লাহকে ভয় কর। তোমরা যা কর নিশ্চয় আল্লাহ সে বিষয়ে খুব জ্ঞাত এবং ৪২নং আয়াতে বিধর্মীদের মামলাতেও ন্যায় বিচার করতে বলা হয়েছে। সূরা আল হাদিদের ২৫নং আয়াতে বলা হয়েছে, আমি আমার রসূলগণকে সুস্পষ্ট নিদর্শন প্রেরণ করেছি এবং তাদের সাথে অবতীর্ণ করেছি কিতাব ও ন্যায়নীতি, যাতে মানুষ ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করে।[১১] ইসলাম ধর্মের বিধান শুধু মুসলমানদের প্রতিই প্রযোজ্য। মুসলমানদের শাসনাধীন কোন রাজ্যের অমুসলিমদের প্রতি এসব বিধিবিধান প্রযোজ্য নয়। মুসলমানদের বিচার করতেন কাজি। অমুসলমানদের বিচারের ভার অর্পিত হতো তাদের নিজ ধর্মীয় বিচারকের ওপর। কিন্তু মুসলমান অমুসলমানের বিরোধ নিষ্পত্তি হতো ইসলামী আইনানুযায়ী।[১২] ইসলামী আইনে ব্যভিচারের জন্য বিবাহিতের শাস্তি পাথর ছুঁড়ে হত্যা ও অবিবাহিতের শাস্তি একশ কশাঘাত, ব্যভিচারের মিথ্যা অভিযোগকারীর শাস্তি ৮০ কশাঘাত, মদ পানের শাস্তি ৮০ কশাঘাত এবং রাজপথে লুণ্ঠনের শাস্তি হাত বা পা কেটে দেয়া। এসব অপরাধ প্রমাণ হলে শাস্তি দিতে বিচারক বাধ্য ছিলেন। ইসলামী আইনে নরহত্যা ও শারীরিক আঘাতের পরিবর্তে অপরাধীকে একই শাস্তি দেয়া হয় যা কিসাস বা প্রতিশোধমূলক। তবে অভিযোগকারী উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ পেয়ে সন্তুষ্ট হলে বিচারক আসামীকে খালাস দিয়ে দেন।[১৩] দেওয়ানি প্রতিকারের বেলায় কোন সম্পত্তি খোয়া গেলে বা নষ্ট হলে বা কেউ

www.pathagar.com

তার সম্পত্তি হতে অন্যায়ভাবে দখলচ্যুত হলে সে সম্পত্তি বা ক্ষতিপূরণসহ অনুরূপ সম্পত্তি বাদীকে ফেরত দিতে বিবাদীকে বাধ্য করা হতো। তাছাড়া ওই সম্পত্তি থেকে বিবাদী উপসত্ব বা লাভ ভোগ করে থাকলে তাও বাদীকে ফেরত দিতে হত।[১৪] এ আইনে বিবদমান পক্ষগণ তাদের মানীত সালিশ দ্বারা বিরোধ নিষ্পত্তি করতে পারতেন এবং সালিশের প্রদত্ত রোয়েদাদ পক্ষদের ওপর বাধ্যকর ছিল। তবে কাজি (বিচারক) পদে নিযুক্ত হওয়ার যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তিই সালিশ নিযুক্ত হতেন। রায় দেয়ার আগে যে কোন পক্ষ ইচ্ছা করলে সালিশ বর্জন করতে পারত। তবে সালিশের রায় কাজি উপযুক্ত মনে করলে বাতিল করতে পারতেন।[১৫] হযরত মুহাম্মদ সা. ও চার খলিফাগণ মদিনায় এবং তাদের পর উমাইয়া খলিফাগণ দামেস্কে, তাদের পতনের পর আব্বাসীয় খলিফাগণ বাগদাদে ও তাদের পতনের পর অটোম্যান তুর্কি খলিফাগণ তুরস্কের কনস্টান্টিনোপলে রাজত্ব করতেন। শিয়া মতাবলম্বি ফাতেমি খলিফাগণ মিসরের কায়রোতে এবং আব্বাসীয়দের নিকট পরাজিত হবার পর উমাইয়া বংশের একটি অংশ স্পেনে রাজত্ব করতেন। তাছাড়া খলিফাদের ক্ষমতা হ্রাস পেলে অনেক স্থানীয় মুসলমান শাসক স্বাধীন রাজবংশ প্রতিষ্ঠা করে স্বাধীনভাবে দেশ শাসন করতেন। ওই সকল খলিফাদের এবং মুসলমান রাজা বাদশাহদের আমলে ইসলামী আইনের বিধান মতো বিচার করা হতো। তবে ইসলামী আইনের মূলনীতি অক্ষুণ্ন রেখে দেশ ও কালের প্রয়োজনে ইসলামী বিচার ব্যবস্থাও বিবর্তিত হয়েছে। পূর্বে স্থানীয়ভাবে কাজি বিচার করতেন এবং তার উপরে প্রাদেশিক প্রশাসক ও সকলের ওপর বিচারক ছিলেন খলিফা। পরে কাজি উল কুজ্জাত বা প্রধান বিচারপতি খলিফা বা বাদশার পরেই সর্বোচ্চ বিচারক ছিলেন। সাধারণত কাজি উল কুজ্জাত বা প্রধান বিচারপতির উপর বিচার ব্যবস্থা তদারক করার ভার ন্যস্ত করে খলিফা বা বাদশাহ দেশ শাসনে মনোযোগ দিতেন। নিয়মিত আপিল আদালত না থাকলেও খলিফা রাষ্ট্রপ্রধান হিসেবে আপিল আদালতের দায়িত্ব পালন করতেন। ভারতবর্ষে মুসলমান সম্রাট ও বাদশাহগণ খলিফাদের আমলে যে বিচার ব্যবস্থা ছিল তা অক্ষুণ্ন রাখেননি। দেশ শাসনের প্রয়োজনে তারা ইসলামী আইনের মূলনীতি অক্ষুণ্ন রেখে বিচার ব্যবস্থা পরিবর্তন করেছেন। তারাও প্রধান বিচারপতি পদে কাজি উল কুজ্জাত নিযুক্ত করে তার উপর অধস্তন কাজিদের কাজের তদারক ও তাদের রায়ের বিরুদ্ধে আপিল বিচারের ক্ষমতা দিয়েছিলেন।

কাজি উল কুজ্জাতের বিচারে কেউ ক্ষুব্ধ হলে বাদশাহ স্বয়ং তার রায়ের বিরুদ্ধে আনীত আপিলের বিচার করতেন। বর্তমান বিশ্বে সৌদি আরবসহ মধ্যপ্রাচ্যের কয়েকটি দেশে ইসলামী দণ্ডবিধি প্রচলিত। সে সব দেশে ইসলামী বিধান মতে চুরির শাস্তি হাত কর্তন, নরহত্যার শাস্তি শিরচ্ছেদ, ব্যভিচারের শাস্তি মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হয়। সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম রাষ্ট্র বাংলাদেশে মুসলিম উত্তরাধিকার আইন ছাড়া কার্যক্ষেত্রে দণ্ডবিধির রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি নেই।

আইন ও বিচার ব্যবস্থার বিবর্তন সম্পর্কে ঐতিহাসিক উইল ডুরান্টের মতে, সম্পত্তি,

www.pathagar.com

বিয়ে এবং সরকারের উদ্ভবের সঙ্গেই আইন আবির্ভূত হয়েছে। নিম্ন শ্রেণীর সমাজ আইন ছাড়াই চলতো। এর কারণ ছিল এই শ্রেণীর সমাজগুলো ছিল প্রথার দ্বারা পরিচালিত, যা আইনের মতোই অলংঘনীয় ও কঠোর। আইনের বিবর্তনের প্রথম ধাপ ছিল প্রতিকার হিসেবে প্রতিশোধ গ্রহণ। দ্বিতীয় ধাপ ছিল প্রতিশোধের পরিবর্তে ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা গ্রহণ। তৃতীয় ধাপে ছিল বিবদমান পক্ষগুলোর মধ্যে মুষ্টিযুদ্ধ, দ্বন্দ্বযুদ্ধ, ভাগ্য পরীক্ষা বা অন্য কোন প্রকার প্রতিযোগিতার মাধ্যমে বিরোধ নিষ্পত্তির চেষ্টা। চতুর্থ বা শেষ ধাপে ছিল বর্তমানের মতো রাজনৈতিক প্রধান বা রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রিত বিচারালয়ের মাধ্যমে অন্যায়ের প্রতিরোধ ও শাস্তি বিধানের মাধ্যমে প্রতিকার করা।[১৬]

আদিকাল থেকে কিভাবে মানুষ সমাজে নানা উপায়ে পরস্পরের মধ্যে হানাহানি বন্ধ করার চেষ্টা করেছে এবং কিভাবে সভ্যতার দ্বারপ্রান্তে পৌঁছেছে তা গবেষক, নৃতাত্ত্বিক, সমাজতাত্ত্বিক ও ঐতিহাসিকদের গবেষণালব্ধ জ্ঞান থেকে আজ আমরা জানতে পেরেছি। কয়েক হাজার বছর আগে বিশ্বে অনেক সভ্য জাতির উত্থান-পতন ঘটেছে। অনেক সভ্যতা বিলুপ্ত হলেও অনেক সভ্যতা নানা পরিবর্তনের মাধ্যমে এখনো টিকে আছে। সুমেরীয়, ব্যবিলনীয়, অ্যাসিরীয়, মিসরীয়, পারসিক, চীনা, গ্রীক, রোমান, সেমেটিক প্রভৃতি প্রাচীন সভ্যতার অনেক নিদর্শন প্রত্নতাত্ত্বিক খনন কার্যের মাধ্যমে আবিষ্কৃত হয়েছে। এছাড়া প্রাচীন ইতিহাস, মহাকাব্য, ধর্মগ্রন্থ, ভ্রমণ বৃত্তান্ত, শিলালিপি ইত্যাদি থেকেও ওই সকল সভ্য জাতির জীবন পদ্ধতি, আচার-আচরণ সম্পর্কে আধুনিক বিশ্বের মানুষ জানতে পেরেছে।

সুমেরীয়

ঐতিহাসিকদের মতে, পৃথিবীর সবচেয়ে প্রাচীন সভ্যতা হচ্ছে সুমেরীয় সভ্যতা। খৃষ্টপূর্ব ৩ হাজার সাল থেকে সুমেরীয় সভ্যতার বিবরণ মাটির ফলকে লেখা হয়েছিল। খৃষ্টপূর্ব ৪ হাজার সাল থেকেই সুমেরীয় সভ্যতা ধীরে ধীরে বিকশিত হচ্ছিল। সুমেরীয় রাজা উরএনগুর সমগ্র পশ্চিম এশিয়া তার রাজ্যভুক্ত করে শাসন করতেন এবং এ জন্য তিনি আইন সংকলন করেছিলেন। তাহলে এটা ধরে নেয়া যায় বিশ্বে মানব সভ্যতার প্রথম বিকাশ ঘটেছিল এশিয়া মহাদেশ থেকেই। রাজা উরএনগুর আইনের উদ্দেশ্য ছিল সমাজে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করা। তার পুত্র ডুংগিও আইন সংকলন করেন। এ সকল আইনে ব্যবসা-বাণিজ্য, অর্থ লেনদেন, চুক্তি, ক্রয়-বিক্রয়, দত্তক গ্রহণ, ইচ্ছাপত্র এবং নরনারীর যৌন সম্পর্ক নিয়ন্ত্রণ করত।

তখন বিচারআদালত বসত মন্দিরে। বিচারকদের বেশিরভাগ ছিলেন পুরোহিত এবং উচ্চতর আদালতে দক্ষ বিচারকরা বিচার কাজ পরিচালনা করতেন। ওই বিচার ব্যবস্থার সর্বশেষ উপাদান ছিল মামলা-মোকদ্দমা পরিহার করার জন্য সালিশের মাধ্যমে বিরোধ নিষ্পত্তির বিধান এবং সালিশদারের কর্তব্য ছিল মামলা পরিহার করার জন্য আপোষ নিষ্পত্তি করে দেয়া।[১৭]

www.pathagar.com

মিসরীয়

সুমেরীয় সভ্যতার উত্তরসুরি মিসরীয় সভ্যতাও ছিল ৬ হাজার বছরের প্রাচীন সভ্যতা। উত্তর ও দক্ষিণ মিসরকে একত্রিত করে রাজা মেনেস সমগ্র মিসরকে একটি রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করেন। তিনি রাজ্যে যে আইনবিধি জারি করেন তা দেবতাদের প্রদত্ত বলে দাবি করতেন। প্রাচীন মিসরীয় আইনের দৃষ্টিতে বর্তমানের মতো সবাই সমান ছিল। ব্রিটিশ যাদুঘরে রক্ষিত মিশরীয় একটি মামলার নথিতে উত্তরাধিকার সংক্রান্ত মামলার জটিল বিবরণ রয়েছে। ওই নথিটিই বিশ্বের সর্বপ্রাচীন আইন সংক্রান্ত দলিল। মিসরীয় আদালতে তখন মৌখিক সওয়াল জবাবের পরিবর্তে লিখিত আর্জি, জবাব, যুক্তিতর্ক ও তার প্রতিউত্তর দাখিল করতে হতো। স্থানীয় আদালতের রায়ের বিরুদ্ধে রাজধানীতে প্রধানমন্ত্রীর কাছে প্রথম আপিল এবং মিসরের সম্রাট ফারাও বা ফেরাউনের কাছে সর্বশেষ ব্যয়বহুল আপিল করা যেত। মিথ্যা সাক্ষীর জন্য মৃত্যুদণ্ডের বিধান ছিল। লাঠির আঘাত, হাত, নাক, জিহ্বা কেটে, শ্বাসরোধ, শিরচ্ছেদ বা পুড়িয়ে মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করে অপরাধীকে শাস্তি দেয়া হতো। উচ্চ পদমর্যাদার অপরাধীকে জনসমক্ষে মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করার লজ্জা থেকে রেহাই দিতে আত্মহত্যা করার অনুমতি দেয়া হতো।[১৮] প্রাচীন মিসরের ফারাও সম্রাটদের মৃত্যুর পর তাদের শবদেহ অনন্তকালের জন্য সংরক্ষণ করতে রাসায়নিক পদার্থ দিয়ে মমি বানিয়ে বিশেষ কফিন বাক্সে রাখা হতো। কফিনের সাথে সম্রাটের দাস দাসীকেও হত্যা করে মমির সাথে রাখা হতো। এছাড়া সম্রাটের ব্যক্তিগত ব্যবহারের ধনরত্নাদিও সাথে দিয়ে পাহাড়সম উঁচু পিরামিড নির্মাণ করে তার মধ্যে সবকিছু সংরক্ষণ করা হতো। প্রাচীন মিসরীয় শাসকদের বিশ্বাস ছিল এর মাধ্যমে মৃত্যুর পরেও সম্রাটগণ সুখে স্বচ্ছন্দ্যে থাকবেন। আজকের বিশ্বের বিভিন্ন দেশ থেকে প্রতিদিন হাজার হাজার পর্যটক ওই মমি ও পিরামিড দেখতে মিসরে ভিড় জমান।

ইহুদী

জুডিও বা ইহুদী সভ্যতা গড়ে উঠেছিল প্যালেস্টাইনের জেরুজালেম নগরীকে কেন্দ্র করে। এ সভ্যতার প্রধান উপাদান ছিল পিতৃ প্রধান পরিবার আর গোত্র প্রধান সমাজ। এ জাতির প্রধান ভাষা হিব্রু আজো টিকে আছে। এদের প্রধান ধর্মগুরু ছিলেন মোজেজ যা ইসলাম ধর্মে হযরত মুসা আ. হিসেবে স্বীকৃত। এ জাতির ধর্মগ্রন্থ হচ্ছে বাইবেলের ওল্ড টেস্টামেন্ট বা তৌরাত কিতাব। প্রাচীন ইহুদি সমাজে পরিবারের স্থান ছিল ধর্ম মন্দির ও পুরোহিতদের ওপর। পরিবার প্রধানই পরিবারের দণ্ডমুণ্ডের কর্তা। প্রয়োজনবোধে অভাবে পড়লে তিনি নিজের অবিবাহিতা কন্যাকে বিক্রি করতে পারতেন। ওই সমাজে ধর্মীয় বিধানই ছিল একমাত্র আইন। ওল্ড টেস্টামেন্টের দশটি হুকুম (টেন কমান্ডমেন্টস) ছিল তাদের আইনের ভিত্তি। ১নং হুকুমে ধর্মদ্রোহীকে মৃত্যুদণ্ড, পঞ্চম হুকুমে পরিবারকে সমাজের ভিত্তি হিসেবে স্বীকৃতি, ষষ্ঠ হুকুমে নরহত্যা নিষিদ্ধ, সপ্তম হুকুমে বিয়েকে পরিবারের ভিত্তি হিসেবে স্বীকৃতি দেয়া হয়েছে। তবে বাসর রাতে কোন বধূ অক্ষত যোনী

www.pathagar.com

নয় বলে প্রমাণিত হলে তাকে পাথর ছুঁড়ে হত্যা এবং ব্যভিচারের অপরাধে পুরুষ ও মহিলাকে মৃত্যুদণ্ড দেয়ার বিধান ছিল। অষ্টম হুকুমে ব্যক্তিগত সম্পদকে পবিত্রতা দান এবং ধর্ম ও পরিবারের সাথে ইহুদি সমাজের অন্যতম তিনটি ভিত্তিকে বৈধতা দেয়া হয়েছে। এ ভিত্তিগুলো হচ্ছে যুদ্ধবন্দী ও দণ্ডিত অপরাধীকে দাস হিসেবে ব্যবহার করা যাবে, তবে মালিকের দ্বারা দাস হত্যা নিষিদ্ধ এবং দাস নিজে সম্পত্তি অর্জন করতে ও মুক্তিপণ দিয়ে শৃঙ্খলমুক্ত হতে পারতো। এছাড়া দেনার দায়ে নিজেকে ও সন্তানকে অন্যের দাসত্ব বন্ধনে আবদ্ধ করতে পারতো। সুদখোর মহাজন পাওনা আদায়ে মন্দিরের পুরোহিতের কাছে মামলা দায়ের করতেন। ধর্মমন্দির ছিল বিচারালয়। নবম হুকুমে বিচারালয়ে সাক্ষীকে স্রষ্টার নামে শপথ নিয়ে সাক্ষ্য দিতে হতো এবং মিথ্যা সাক্ষ্য প্রমাণিত হলে বিবাদীর পাওনা সাজাই ভোগ করতে হতো মিথ্যা সাক্ষ্য দানকারী ব্যক্তিকে। দশম হুকুমে পরস্ত্রী, চাকর চাকরানী, গৃহপালিত পশু ও অন্যান্য সম্পত্তির প্রতি লোভ লালসা নিবারণের নির্দেশ দেয়া হয়েছে। হত্যা, অপহরণ, মূর্তিপূজা, পিতামাতাকে আঘাত বা অভিশাপ দেয়া, ব্যভিচার, দাস অপহরণ ও পুরোহিতের রায় অমান্য করার অপরাধে মৃত্যুদণ্ড দেয়া হতো। সাধারণত হত্যার বদলে হত্যা, হাত-পা, দাঁত চোখ বিনষ্টকারীকে একইভাবে অঙ্গচ্ছেদ করা হতো। নগণ্য অপরাধের জন্য স্বীকারোক্তি দেয়া হলে বিবাদীকে ক্ষমা প্রার্থনা এবং ক্ষতিপূরণ দিতে বাধ্য করা হতো।[১৯]

পারস্য

প্রাচীন পারস্য সাম্রাজ্যে (আজকের ইরান) রাজার ইচ্ছাই ছিল আইন। রাজা দাবি করতেন সৃষ্টিকর্তার ইচ্ছাকেই তিনি আইনে রূপ দিয়েছেন। প্রথমদিকে রাজার পক্ষে বয়োবৃদ্ধ জ্ঞানী অনুচররা আইন প্রয়োগ করতেন। পরে বিচারের ভার ন্যস্ত হতো পুরোহিতদের ওপর। পরবর্তীকালে সাধারণ লোকের মধ্য থেকে বিচারক নিয়োগ হতো। বিচারকের ঘুষ নেয়া বা বিচারকের ঘুষ দেয়ার শাস্তি ছিল মৃত্যুদণ্ড। ন্যায়নীতি বর্জিত অসৎ বিচারককে জীবিতাবস্থায় শরীরের চামড়া ছাড়িয়ে মৃত্যুদণ্ড দেয়া হতো এবং সে চামড়া দিয়ে আসনে আচ্ছাদন পেতে সে মৃত বিচারকের পুত্রকেই তার স্থলে নতুন বিচারক নিযুক্ত করে ওই আসনে বসে বিচার করতে দেয়া হতো। স্থানীয় আদালতের রায়ের বিরুদ্ধে রাজার সর্বোচ্চ আদালতে শেষ আপিল করা যেতো। সামান্য অপরাধের শাস্তি ছিল বেত্রাঘাত। গুরুতর অপরাধের শাস্তি ছিল জ্বলন্ত ছ্যাঁকা, অঙ্গচ্ছেদ, পঙ্গুত্ব, অন্ধত্ব, কারাদণ্ড বা মৃত্যুদণ্ড। মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হতো বিষপানে, শূলে চড়িয়ে, ক্রুশবিদ্ধ করে, ফাঁসি, পাথর নিক্ষেপ, বড় পাথর চাপায় মাথা গুঁড়িয়ে, গলা পর্যন্ত মাটিতে পুঁতে, গরম ছাইয়ের গাদায় চাপা দিয়ে এবং নৌকা চাপা দিয়ে। বিচার কাজে বিলম্ব রোধ করতে রায়ের সময়সীমা নির্ধারণ করা ছিল। গুরুতর অপরাধ ছাড়া ছোটোখাটো অপরাধে অভিযুক্তকে জামিন দেয়ার নিয়ম ছিল। আসামিকে শাস্তি দেয়ার আগে বিচারক আসামীর সৎকাজ ও জনসেবার খতিয়ান বিবেচনা করে দণ্ডের পরিমাণ নির্ধারণ করতেন।

www.pathagar.com

সৎ কাজের জন্য বিচারক পক্ষদের পুরস্কৃতও করতে পারতেন। মামলা পরিচালনায় আইনে অভিজ্ঞ ব্যক্তিরা বাদী বিবাদীকে পরামর্শ দিতে পারলেও এখনকার আইনজীবীদের মতো তারা আদালতে উপস্থিত থেকে মামলা পরিচালনা করতে পারতেন না। সামান্য অপরাধের জন্য রাজাও মৃত্যুদণ্ড দিতে পারতেন না। রাজদ্রোহ, সমকামিতা, ধর্ষণ, ব্যভিচার ও নরহত্যার শাস্তি ছিল মৃত্যুদণ্ড। তবে ব্যক্তিগত পর্যায়ের অপরাধের ক্ষেত্রে সালিশ মীমাংসাকে অগ্রাধিকার দেয়া হতো।[২০]

চীন

চীনা সভ্যতার ইতিহাসও সুপ্রাচীন। চীনা ঐতিহাসিকদের মতে, খৃষ্টপূর্ব ৩ হাজার অব্দ থেকে এ সভ্যতা শুরু। প্রাচীন চীনের ইতিহাসে সবচেয়ে নিষ্ঠুর শাসক হিসেবে কুখ্যাত হয়ে আছেন ঝিং বংশের সম্রাট হুংই। (১৩৬৮-৯৮) রাজত্বকালের প্রথমার্ধেই তিনি এত বেশি লোকের গর্দান নিয়েছিলেন যে সরকারী কর্মকর্তারা দরবারে যাওয়ার আগে পরিবারের সদস্যদের কাছ থেকে শেষ বিদায় নিতেন। সন্ধ্যার পর কোন সহকর্মীর সঙ্গে দেখা হলে তাকে অভিনন্দন জানাতেন তারা, নিজেরাও অভিনন্দিত হতেন সন্ধ্যা পর্যন্ত বেঁচে থাকার জন্য। এই বিদায়ের পালা ও অভিনন্দন তখন রীতিমত প্রথায় পরিণত হয়েছিল।[২১]

খৃষ্টপূর্ব ১৮৫২ সালে সম্রাট ফুসি তার বিদুষী সম্রাজ্ঞীর সহায়তায় চীন শাসন করতেন। তিনি চীনাদের জাল দিয়ে মাছ শিকার, পশুপালন, রেশম চাষ, বিবাহ প্রথা, লেখার পদ্ধতি, চিত্রকলা ও সঙ্গীত বিদ্যা শিখিয়েছিলেন। পরবর্তী সম্রাটদের মধ্যে সেননাংগ কৃষিকাজে কাঠের লাঙ্গল আবিষ্কার, ব্যবসা বাণিজ্যের জন্য বাজার স্থাপন এবং ভেষজ ওষুধ দিয়ে চিকিৎসা বিদ্যার প্রসার ঘটান। সম্রাট হুয়াংটির আমলে চাকা ও চুম্বক আবিষ্কার, ভূমি সংস্কার, ইটের দালান-কোঠা নির্মাণ ও মানমন্দির প্রতিষ্ঠা করে নক্ষত্রের গতিবিধি পর্যবেক্ষণ করে পঞ্জিকা সংশোধন করা হয়। পরবর্তী সম্রাট ইয়াও তার প্রাসাদের সামনে একটি ঢোল ও তক্তা রেখে দিতেন যেন প্রজারা ঢোল পিটিয়ে তাদের অভিযোগ শোনার জন্য তাকে ডাকতে পারেন এবং ওই তক্তায় লিখে তার সরকারকে শাসন কার্য সম্পর্কে উপদেশ দিতে পারেন। বহুকাল যাবত উন্নত সংস্কৃতি, সুশাসিত রাষ্ট্র ব্যবস্থা ও সরকার থাকার পরবর্তীকালে বিশাল চীন দেশ বহু সমাজ রাজ্যে বিভক্ত হয়ে পড়ে। ফলে প্রচলিত প্রথা পদ্ধতির সাথে সামন্ত প্রধানদের প্রবর্তিত আইনের সঙ্গে জনসাধারণের দ্বন্দ্ব শুরু হয়। সামন্ত রাজ্য চেং ও চীনে যথাক্রমে খৃষ্টপূর্ব ৫১২ ও ৫৩৫ অব্দে সামন্ত আইনগুলো সংকলিত হয়েছিল। এ সকল আইন সমাজের উঁচু স্তরের লোকদের প্রতি পক্ষপাতমূলক ছিল। তারা আইনের সুবিধা মতো প্রয়োগ করে নিজেদেরকে শাস্তি থেকে নিরাপদ রাখতে পারতো। কিন্তু এ দ্বন্দ্ব-সংঘাতের পর শেষ পর্যন্ত আপোষে স্থির হয় যে আইন দ্বারা রাষ্ট্রের নীতি নির্ধারিত হবে আর মানবিক ও গৌণ বিষয়গুলো প্রাচীন প্রথা ও পদ্ধতির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হবে। এই আইন ব্যবস্থা দ্বারা দু'হাজার

www.pathagar.com

বছর পর্যন্ত চীন দেশের সরকার পরিচালিত হয়েছে। চীনা আইন ও প্রথার অনুশাসনে প্রত্যেক পরিবারের যে কোন সদস্য অন্য সদস্যের কাজের জন্য দায়ী হতো। অনৈতিক কর্মকাণ্ডে দায়ী ব্যক্তিকে একঘরে করা হতো। প্রত্যেক প্রদেশে শাসনকর্তা, রাজস্ব সংগ্রাহক ও একজন বিচারক বিচারকার্য পরিচালনা করতেন। সালিশের মাধ্যমে নিষ্পত্তিযোগ্য না হলে বিচারকের নিকট মামলা দায়ের করা যেত। সালিশি মীমাংসাই জনগণের নিকট অধিক পছন্দ ছিল। কারণ তারা মনে করত আদালতে মামলা করে জয়লাভ করা প্রকারান্তরে অর্থব্যয় ও ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া ছাড়া আর কিছুই নয়। যে কারণে হাজার হাজার লোক অধ্যুষিত শহরেও বছরের পর বছর কোন মামলা দায়ের হতো না। আদালতে জুরি প্রথা ও উকিল রাখার নিয়ম ছিল না। সন্দেহভাজন লোকদের আঙ্গুলের ছাপ রাখা হতো। আসামিকে নির্যাতনের মাধ্যমে স্বীকারোক্তি আদায়ের নিয়ম ছিল। অপরাধীকে চুল কেটে, বেত্রাঘাত করে, দেশ থেকে বিতাড়িত করে অথবা মৃত্যুদণ্ডের শাস্তি দেয়া যেত। উচ্চপদস্থ ও প্রতিভাবান লোক গুরুতর অপরাধে দোষী সাব্যস্ত হলে তাকে শাস্তি দেয়ার পরিবর্তে আত্মহত্যা করার সুযোগ দেয়া হতো। সম্রাটের অনুমতি ছাড়া কাউকে মৃত্যুদণ্ড দেয়া যেত না। তাত্ত্বিকভাবে চীন দেশে আইনের চোখে সবাই সমান বলে গণ্য হতো। চীন দেশে সম্রাটের আদেশই ছিল আইন এবং সম্রাটই সর্বোচ্চ আদালত হিসেবে চূড়ান্ত রায় দিতেন।[২২]

গ্রীস

গণতান্ত্রিক শাসন, জ্ঞান বিজ্ঞান চর্চা, শিল্প ও ভাস্কর্য নির্মাণে প্রাচীন গ্রীসের এথেন্স রাজ্য তৎকালে সভ্যতার সর্বোচ্চ শিখরে পৌঁছেছিল। গ্রীকদের কাছে আইন ছিল দৈব অনুমোদিত, প্রকাশিত পবিত্র প্রথা ও রীতি যা দ্বারা বিশ্বে নৈতিক শৃঙ্খলা ও সমন্বয় সৃষ্টি হতো। প্রথমদিকে আইন ছিল ধর্মের অংশ। গোত্র প্রধান বা রাজা ধর্মীয় আইন ছাড়াও হুকুম জারির মাধ্যমে অনেক নিয়ম প্রতিষ্ঠা করেছিলেন যা প্রথমে শক্তি প্রয়োগে কার্যকর করলেও পরে নৈতিক সমর্থন ও অনুমোদন লাভ করে। এসকল আইন পরবর্তীতে ড্রাকো, সলোনসহ বিভিন্ন আইনপ্রণেতা দ্বারা সংগৃহীত, সমন্বিত ও লিপিবদ্ধ হলে আইন ধর্ম হতে মুক্ত হয়ে ইহজাগতিক বিধি বিধানে পরিবর্তিত হয়। অপরাধের যথারীতি তদন্ত ও ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তির প্রতিশোধ গ্রহণের পরিবর্তে অপরাধীকে আইনে নির্ধারিত শাস্তি দেয়ার বিধান ছিল। এথেনীয় বিভিন্ন গোত্র প্রধান, আর্কন তথা শাসনকর্তা হিসেবে বিরোধ মীমাংসা বা বিচার করতেন। বিচারকগণ ছোটখাটো ও স্থানীয় বিরোধের বিচার করতেন। তাদের রায়ের বিরুদ্ধে ডিসকটারির কাছে আপিল করা যেত। নরহত্যা ও দেশদ্রোহিতা ভিন্ন সব ধরনের বিচার করতেন ডিসকটারি। নরহত্যা ও দেশদ্রোহিতার জন্য সিনেট বা সর্বোচ্চ সভা ছিল। এথেনীয় আইনে দেওয়ানি ও ফৌজদারি বিচারে কোন পার্থক্য ছিল না। খুব গুরুত্বপূর্ণ মামলার বিচার করতেন অধিক সংখ্যক জুরি নিয়ে গঠিত ডিসকটারি আদালত। দর্শনশাস্ত্রের জনক সক্রেটিসের বিচার করেছিল ১২ সদস্যের জুরি

www.pathagar.com

বোর্ড। এফিয়েলটিস ও পেরিক্লিসের আমলে আর্কন ও সিনেটের হাত থেকে সব ক্ষমতা হেলিয়াইতে ন্যস্ত হয়। অর্থাৎ উচ্চবিত্ত ভূস্বামীদের মধ্য হতে নির্বাচিত আর্কন ও সিনেটের হাত থেকে বিচারের সর্বময় ক্ষমতা সাধারণ লোকদের মধ্য হতে গঠিত হেলিয়াইর নিকট ন্যস্ত করা হয়। বিশ্বে এথেন্সেই বিচার ব্যবস্থা সর্বপ্রথম পুরোহিত ও রাজন্যদের হাত থেকে ছিনিয়ে নিয়ে সাধারণ মানুষ দ্বারা গঠিত বিচারালয়ে ন্যস্ত করা হয়। মামলা দায়েরের পর বাদী বিবাদীর হলফ, বক্তব্য ও সাক্ষ্য প্রমাণ গ্রামাটিয়স বা আদালতের কেরানী লিপিবদ্ধ করার পর তা বাক্সবন্দি করে রাখা হতো। পরে নির্বাচিত জুরিগণ বা ডিসকটারি বাক্স থেকে প্রমাণপত্র খুলে পরীক্ষা করে রায় দিতেন। সরকার পক্ষে কোন মামলা দায়ের করা যেত না। যে কোন নাগরিক যে কারো বিরুদ্ধে আদালতে মামলা দায়ের করতে পারতেন। তখন সাইকোফেন্ট নামের এক শ্রেণীর মামলাবাজ শ্রেণীর উদ্ভব হয় যারা মামলায় হয়রানির ভয় দেখিয়ে অর্থ আদায় করতো। বাদী তার মামলা প্রমাণ না করতে পারলে তাকে জরিমানা দিতে হতো এবং এক পঞ্চমাংশের কমসংখ্যক জুরি ভোট দিলে সে বেত্রদণ্ডেও দণ্ডিত হতো। বিবাদীর বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রমাণিত হলে তাকেও জরিমানা করা হতো এবং আদায়কৃত এসব জরিমানার অর্থ দ্বারা আদালতের ব্যয় নির্বাহ হতো। প্রথমদিকে ব্যক্তিগতভাবে বাদী বিবাদী আদালতে দাঁড়িয়ে বক্তব্য পেশ করতেন। পরবর্তীতে পক্ষগণ আইন সম্পর্কে অভিজ্ঞ রেটর বা বক্তাদের কাছ থেকে পরামর্শ নিয়ে বক্তব্য লিখে আদালতে পাঠ করে শোনাতেন। এই রেটরগণই ছিলেন আইনজীবীদের পূর্বসুরি। পরবর্তীকালে রেটরগণ আদালতে প্রচলিত আইন সম্পর্কে অনভিজ্ঞ জুরিদেরকে আইনের জটিল ব্যাখ্যা সম্পর্কে সাহায্য করতেন। জুরিদের সামনে আদালতে হলফ করে সাক্ষী দিতে হতো কিন্তু সাক্ষীকে জেরা করার কোন নিয়ম ছিল না। মিথ্যা সাক্ষ্যদানের প্রবণতা তখন এতো বৃদ্ধি পেয়েছিল যে হলফ করা সাক্ষ্য অগ্রাহ্য করেও মামলার রায় দেয়া হতো। মহিলা ও শিশুদের সাক্ষ্য শুধু হত্যা মামলায় গ্রহণ করা হতো। নির্যাতনের মাধ্যমে আদায়কৃত দাসদের সাক্ষ্য গ্রহণ করা হতো। প্রচলিত বিশ্বাস ছিল নির্যাতনের মাধ্যমেই কেবলমাত্র দাসরা সত্য সাক্ষ্য দেয়। সম্রাট পেরিক্লিসের আমল থেকে নাগরিকদের নির্যাতন নিষিদ্ধ করা হয়। জেল দণ্ডের প্রচলন না থাকায় সাধারণ লোকের সম্পদ বাজেয়াপ্ত এবং দাসকে দৈহিক শাস্তি দেয়া হতো। বাদী ও বিবাদী অর্থদণ্ড বা দৈহিক শাস্তির প্রস্তাব দিলে আদালত প্রস্তাবিত শাস্তির যে কোনটি বেছে নিতেন।

রাষ্ট্রদ্রোহ, নরহত্যা, পবিত্র স্থান থেকে চুরিসহ অনেক ছোট অপরাধের শাস্তিও ছিল মৃত্যুদণ্ড ও সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা। মৃত্যুদণ্ড এড়াতে স্বেচ্ছায় নির্বাসন বরণ অথবা সম্পত্তি ত্যাগ করা যেত। অপরাধী ব্যক্তি নির্বাসনে যেতে না চাইলে তাকে হেমলক বিষপানে মৃত্যুবরণ করতে বাধ্য করা হতো। বিশ্ববিখ্যাত দার্শনিক সক্রেটিসও এ বিষপানে মারা গিয়েছিলেন। দাসদের মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হতো মুগুরপেটা করে। নরহত্যার অপরাধীর মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হতো নিহতের আত্মীয়স্বজনের উপস্থিতিতে। এথেনীয়

www.pathagar.com

আইন হামুরাবির আইন থেকে যদিও কিছুটা উন্নতমানের ছিল কিন্তু এথেন্সের এক সপ্তমাংশ অধিবাসীর মধ্যে যাদের নাগরিক অধিকার ছিল তারাই এর দ্বারা উপকৃত হয়েছে। নারী, শিশু, বিদেশী ও দাসদের কোন নাগরিক অধিকার ছিল না। তবে এথেন্সবাসীদের আইনের প্রতি গভীর শ্রদ্ধাবোধের কারণে সেদেশে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।[২৩] গ্রীসের স্পার্টা রাজ্যের নাগরিকগণ প্রতি বছর পাঁচজন এফোর নির্বাচন করতেন। তাদের কাজ ছিল মামলার বিষয় তদন্ত করা, মামলার বিচার করা ও রায় কার্যকর করা। এদের মধ্যে একজন জনপ্রতিনিধি সভা সিনেট ও আইনসভায় পৌরহিত্য করতেন।[২৪]

ইংল্যান্ড

বিচার ব্যবস্থার বিবর্তনে রোমান আইনের পরই ব্রিটিশদের বিচার ব্যবস্থা বিশেষভাবে অবদান রেখেছে। মধ্যযুগে ইংরেজ জাতি বিশ্বের বিভিন্ন দেশে উপনিবেশ স্থাপন করে তাদের আইন ও বিচার ব্যবস্থা চালু করেছে। বর্তমান বিশ্বের অনেক দেশেই বিচার ব্যবস্থার মূল ভিত্তি হচ্ছে ইংরেজদের প্রবর্তিত আইননির্ভর। অথচ বৃটেন তথা ইংল্যান্ড শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে রোম সাম্রাজ্যের একটি উপনিবেশ ছিল মাত্র। বিভিন্ন শহরে ছিল রোমান সৈন্যদের ছাউনি। প্রখ্যাত রোমান আইনজ্ঞ পেপিয়ান তখন কিছুকাল ইয়র্ক শহরের প্রিফেক্ট ছিলেন। ৪১১ সালে রোমান সৈন্যদের ইংল্যান্ড ত্যাগের সাথে সাথে রোমান আইনের কার্যকারিতা ইংল্যান্ড থেকে অপসারিত হয়।[২৫] প্রাচীন বিশ্বের বহু দেশের বিচার ব্যবস্থা থেকে ইংল্যান্ডের আদি বিচার ব্যবস্থা কোন অংশে কম ছিল না। স্থানীয় সম্প্রদায় তাদের প্রচলিত প্রথা পদ্ধতির মাধ্যমে নিজেদের মধ্যে বিরোধ নিষ্পত্তি করতেন। প্রথমদিকে গ্রামের গণ্যমান্য লোকজন একত্রে বসে তাদের পুরুষানুক্রমিক আচার ও প্রথা পদ্ধতির মাধ্যমে নিজেদের মধ্যে বিরোধ নিষ্পত্তি করতেন। তখন ইংল্যান্ড বেশ কিছু শায়ার বা জেলায় বিভক্ত ছিল। শায়ারকে বিভক্ত করা হতো হান্ড্রেডে যা ছোট শহর বা গ্রামে বিভক্ত ছিল। হান্ড্রেড কোর্টের বিচারকগণ ছিলেন স্থানীয় জনসাধারণের নির্বাচিত প্রতিনিধি। এ বিচারকরা কোন গাছের নিচে বা পাহাড়ের উন্মুক্ত স্থানে বসে স্থানীয় লোকদের ছোটখাটো বিচার মীমাংসা করতেন। প্রতিমাসে একবার হান্ড্রেড কোর্টের অধিবেশন বসতো। ওই কোর্টের সভাপতিকে বলা হতো জেরিফা বা রীভি। গুরুত্বপূর্ণ বিচারকার্য হতো শায়ার কোর্টে। নরম্যান বিজয়ের পূর্বে এবং তার পরবর্তী কয়েক শতাব্দী পর্যন্ত প্রতি বছর নির্দিষ্ট সময়ে দু'বার বিচারকগণ শায়ারের কেন্দ্রীয় শহরে তাদের সম্মুখে আনার পর বিচার করতেন। নরম্যান বিজয়ের আগে শায়ার আদালতে সম্ভ্রান্ত ভূস্বামী, বিশপ ও ধর্মযাজক ছিলেন বিচারক, শেরিফ ছিলেন আদালতের নির্বাহী প্রধান ও রাজ প্রতিনিধি[২৬] শায়ার কোর্টের রায়ে বাদী বিবাদীর মধ্যে কোন পক্ষ প্রমাণ দেবে এবং কি ধরনের প্রমাণ দেবে তা সাব্যস্ত করা হতো। অর্থাৎ মামলা প্রমাণের আগেই রায় ঘোষিত হতো। কারণ স্থানীয় বিচারকগণ মামলার বিরোধীয় বিষয় সম্পর্কে পূর্বাহ্নে

www.pathagar.com

অবগত থাকায় তারা বাস্তব বিচার করতে পারতেন এবং অনেক ক্ষেত্রে প্রমাণের আবশ্যকতা ছিল না। বাদীকে হলফ করে বিবাদীর উপস্থিতিতে অভিযোগ দায়ের এবং তার সমর্থনে এক বা দু'জনকে হলফ করে আদালতে সাক্ষ্য দিতে হতো। বিবাদীকেও হলফনামার মাধ্যমে বাদীর দাবি স্বীকার বা অস্বীকার করা হতো। মামলা প্রমাণ পদ্ধতি ছিল বাদী বিবাদীর মধ্যে দ্বন্দ্ব যুদ্ধ, আইনের বাজি, দৈব প্রমাণ এবং সাক্ষ্য গ্রহণ। দৈব প্রমাণে সাধারণত গরম পানিতে আসামির হাতের কনুই পর্যন্ত ডুবিয়ে, তাকে ঠাণ্ডা পানিতে ফেলে দিলে সে ডুবে যায় কি সাঁতার কাটে দেখে, উত্তপ্ত লোহার টুকরা তার শরীরে স্পর্শ করে বা কোন অভিশপ্ত খাদ্য তাকে খেতে বাধ্য করে গুরুতর অপরাধে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে পরীক্ষা করা হতো। এসব পরীক্ষায় কোন আসামী আঘাতপ্রাপ্ত বা অসুস্থ হলে তাকে দোষী সাব্যস্ত করা হতো আর না হলে সে নির্দোষ বিবেচিত হতো। দৈব প্রমাণ প্রয়োগ করার আগে ধর্মযাজক ধর্মীয় অনুষ্ঠান পরিচালনা করতেন। ১২১৫ সালে পোপ ইন্নোসেন্ট ধর্মযাজকদের দৈবপ্রমাণ প্রয়োগে ধর্মীয় অনুষ্ঠান পরিচালনা নিষিদ্ধ করলে দৈব প্রমাণ পদ্ধতিও বন্ধ হয়ে যায়। সাধারণত দ্বন্দ্ব যুদ্ধের দ্বারা বিরোধীয় ভূমির মালিকানা নির্ধারিত হতো। অন্যায়ভাবে ভূমি থেকে বেদখল করা হলে বাদীর মামলার প্রেক্ষিতে অভিযুক্ত ব্যক্তি এই বিচার পদ্ধতি বেছে নিতে পারতেন। বিচারকের উপস্থিতিতে মধ্যরাত পর্যন্ত উভয় পক্ষের মধ্যে দ্বন্দ্বযুদ্ধ চলতো, যদি এর আগেই দ্বন্দ্বযুদ্ধ আহ্বানকারী তার প্রতিপক্ষকে কাপুরুষ বা আত্মসমর্পণ শব্দ উচ্চারণে বাধ্য করতে না পারতেন অথবা দ্বন্দ্বযুদ্ধে আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য করতে না পারতেন তাহলে অর্থাৎ মধ্যরাত পর্যন্ত যুদ্ধ চললে দ্বন্দ্বযুদ্ধ আহ্বানকারী বিবাদী বা অভিযুক্ত ব্যক্তি হেরে যেতেন। এসইজি বা জুরি বিচার পদ্ধতি প্রবর্তিত হওয়ার পর দ্বন্দ্বযুদ্ধের মাধ্যমে বিচার পদ্ধতি জনপ্রিয়তা হারাতে থাকে এবং ১৮১৯ সালে এ পদ্ধতি বাতিল করে দেয়া হয়। এ বিচার পদ্ধতি চালু করেছিলেন নরম্যানরা। তখন অবশ্য বর্তমানের মতো প্রত্যেক পক্ষের সাক্ষীর জবানবন্দি ও জেরা করার নিয়ম ছিল না। তখন সাক্ষীকে শপথবাক্য উচ্চারণ করে বাদীর দাবি সত্য কি মিথ্যা বলতে হতো এবং বাদী বিবাদী নিজেদের সমর্থনে সাক্ষী হাজির করতেন। যে পক্ষের সাক্ষীর সংখ্যা বেশি হতো তারা এক বাক্যে সে পক্ষের দাবির সত্যতা সম্পর্কে সাক্ষ্য দিলে ওই পক্ষই সাধারণত মামলায় জয়লাভ করতো। যে মামলায় জয়ী হতেন সে পক্ষের প্রার্থনার প্রেক্ষিতে আদালত পরাজিত পক্ষকে রায় মানতে বাধ্য করে বিচারের রায় কার্যকর করতেন।[২৭] রোমান সম্রাট জুলিয়াস সীজার ব্রিটেন সম্পর্কে তার ডায়েরীতে লিখেছেন, দেশটি পাহাড়ি বলে জঙ্গলে ঘেরা। তরিতরকারী ও গম উৎপাদন ছাড়া এদের তেমন কোন ফসল নেই। তিনি ব্রিটিশদের বলেন, Barbarian বা বর্বর। ব্রিটিশরা ছিল পৌত্তলিক। একদা রোমের বাজারে ধর্মযাজক গ্রেগরি কয়েকজন সুন্দর সুঠাম দেহের বালক দাস হিসেবে বিক্রি হচ্ছে দেখে তাদের পরিচয় নিয়ে জানতে পারেন তারা ব্রিটিশ ও ধর্মজ্ঞানহীন।

www.pathagar.com

কয়েক বছর পর গ্রেগরি পোপ পদে অধিষ্ঠিত হলে তিনি ধর্মযাজক সেন্ট অগস্টাইনের অধীনে একটি মিশন বিলেতে পাঠান এবং ইংরেজদের খৃষ্টধর্মে দীক্ষিত করেন। ইংরেজদের গণতান্ত্রিক ধারা দেশপ্রেম ও জাতীয়তাবোধ হাজার বছরে গড়ে উঠেছে। অজস্র মানুষের সংগ্রাম আর রক্তদানের ফলে সে দেশে বিকাশ লাভ করেছে গণতান্ত্রিক শাসন পদ্ধতি। সপ্তদশ শতাব্দীতে জনগণের অধিকার আদায় করতে সংঘটিত হয়েছিল গৃহযুদ্ধ। রাজা প্রথম চার্লসের অত্যাচার ছিল অমানবিক। প্রকাশ্য স্থানে বেত্রাঘাত, কানকাটা, নাককাটা, গালে উত্তপ্ত লোহা দ্বারা দাগ দেয়া সাধারণ শাস্তিতে পরিণত হয়। তাই প্রজাসাধারণ অস্ত্র ধরে রাজার বিরুদ্ধে। গৃহযুদ্ধে রাজার পতনের পর দেশদ্রোহিতার অপরাধে পার্লামেন্টে বিচার শেষে রাজাকে মৃত্যুদণ্ড দেয়া হয়। রাজার গণবিরোধী মন্ত্রী স্টাফোর্ডের শিরোচ্ছেদ করা হয়। রাজার অন্যায় কাজের সমর্থক বিলাতের প্রধান ধর্মযাজক ক্যান্টাবেরীর আর্চ বিশপ লর্ডেরও প্রাণদণ্ড হলো। দেশে প্রতিষ্ঠিত হলো পার্লামেন্টারী প্রজাতন্ত্র। প্রজাতন্ত্রের প্রধান হলেন, বিপ্লবী সেনাপতি ওলিভার ক্রমওয়েল, কিন্তু কয়েক বছরের মধ্যেই তিনি সেনাবাহিনীর নিয়ন্ত্রণে স্থাপন করেন স্বৈরতন্ত্র। পার্লামেন্ট বিলুপ্ত করে সদস্যদের পার্লামেন্ট ভবন থেকে বের করে সেখানে তালা ঝুলিয়ে দেন। এর সাথে উপাধি ধারণ করেন লর্ড প্রটেক্টর অর্থাৎ রক্ষাকারী প্রভু। স্বেচ্ছাচারী রাজার চেয়েও তিনি হয়ে ওঠেন অত্যাচারী। উত্তরাধিকার প্রটেক্টর মনোনীত করেন পুত্র রিচার্ডকে। দেশকে বারোটি অঞ্চলে ভাগ করে সামরিক কাউন্সিলের অধীনে আঞ্চলিক প্রশাসক নিযুক্ত হয় একজন করে মেজর জেনারেল। ক্রমওয়েলের স্বৈরশাসনে বিলেতে গণবিদ্রোহ দেখা দেয়। স্কটল্যান্ড ও আয়ারল্যান্ডের গণবিদ্রোহ দমনে সেনাবাহিনী ঝাঁপিয়ে পড়ে। সেনা নৃশংসতায় আয়ারল্যান্ডে নিহত হয় তিন হাজার ব্যক্তি আর ওয়াকফিল্ডের রাজপথ হয় রক্ত রঞ্জিত। শ' শ' আইরিশ আমেরিকায় বিক্রি হয় দাস রূপে। ১১ বছর চরম নির্যাতনমূলক শাসনকার্য পরিচালনা করে ক্রমওয়েল মারা যান। তার ছেলে রিচার্ড ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়ে মাত্র দশ মাসের মাথায় গণআন্দোলনে পদত্যাগ করে তার পল্লীগ্রামে চলে যান। এরপর কয়েকমাস দেশে অরাজকতা চলার পর ক্রমওয়েলের আমলে নিযুক্ত স্কটল্যান্ডের শাসক জেনারেল মংক সসৈন্যে দেশে প্রত্যাবর্তন করে পার্লামেন্ট আহ্বান করেন। এ পার্লামেন্ট রাজতন্ত্রের পুনঃপ্রতিষ্ঠা করে চার্লস-এর পুত্র হল্যান্ডে নির্বাসিত দ্বিতীয় চার্লসকে সিংহাসনে অধিষ্ঠিত করে। জনগণের ক্রোধের বহিঃপ্রকাশ হিসেবে ক্রমওয়েল ও তার পরামর্শদাতা জামাতা আয়ারানটনের কংকাল কবর থেকে উত্তোলন করে ফাঁসিকাষ্ঠে ঝোলানো হয়। তাদের মরণোত্তর কংকালকে ফাঁসির কাষ্ঠে ঝুলিয়ে গণমানুষ অত্যাচারের প্রতিবাদে ঐতিহাসিক দৃষ্টান্ত স্থাপন করে। এরপর দেশে পার্লামেন্টের ক্ষমতা সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। রাজ্য পরিচালনায় আইনের শাসনের নীতিও একই সাথে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। জনগণের চরম আক্রোশের বহিঃপ্রকাশ হিসেবে ক্রমওয়েলের কংকালকে ফাঁসির কাষ্ঠে চড়ালেও তার নেতৃত্বে অত্যাচারী রাজা প্রথম চার্লস-এর বিরুদ্ধে যে মহাবিদ্রোহ সংঘটিত হয়েছিল ইংরেজ জাতি পরবর্তীকালে তার

www.pathagar.com

স্বীকৃতি দিতে কার্পণ্য করেনি। তাই পরবর্তী সময়ে বৃটিশ পার্লামেন্টের সামনে স্থাপন করা হয়েছে ক্রমওয়েলের এক ঐতিহাসিক প্রতিমূর্তি।[২৮]

১১১৬ সালে রাজা দ্বিতীয় হেনরী প্রদত্ত আইনের বিধানে অগ্নিসংযোগ, নরহত্যা, দস্যুতা, জাল মুদ্রা তৈরি এবং দাঙ্গা হাঙ্গামাকে রাজার শান্তির বিরুদ্ধে অপরাধ এবং অপরাপর অপরাধকে সাধারণ অপরাধ হিসেবে ঘোষণা করা হয়। তখন সকল গুরুতর অপরাধের জন্য অপরাধীকে মৃত্যুদণ্ড, অঙ্গহানি, দাসত্ব বরণ ও দেশ থেকে বিতাড়িত করে শাস্তি দেয়া হতো।[২৯] নরম্যান বিজয়ের পর নরম্যান রাজাগণ প্রথমে ইংল্যান্ডের ভূমি ব্যবস্থায় আমূল পরিবর্তন করেন। নতুন ব্যবস্থায় দেশের সকল ভূমি রাজার অধীনস্থ করা হয়। ভূমি মালিকদের আনুগত্য লাভে রাজধানীতে কিউরিয়া রেজিস নামে রাজসভা গঠন করে দেশের শাসন ও বিচার ব্যবস্থা রাজার নিয়ন্ত্রণে আনা হয়। দেশের সামন্ত প্রধানদের নিয়ে গঠিত কিউরিয়া রেজিস দেশ শাসনের জন্য নতুন নতুন আইন প্রণয়ন, বড় বড় সামন্তদের বিচার এবং গুরুত্বপূর্ণ ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি করতেন। কালক্রমে এই আদালত শান্তি শৃঙ্খলা ভঙ্গসহ সব ধরনের অপরাধের বিচার করতে থাকে। দেশে গড়ে ওঠে কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণাধীন বিচার ব্যবস্থা। এজন্য কিউরিয়া রেজিসকে ইংল্যান্ডের বর্তমান বিচার ব্যবস্থার উৎস হিসেবে গণ্য করা হয়। রাজা প্রথম উইলিয়ামই প্রথম রাজসভা থেকে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে রাজ প্রতিনিধি পাঠিয়ে শাসনকার্য তদারক করতে শুরু করেন। ছোটখাটো অপরাধে অর্থদণ্ড এবং গুরুতর অপরাধের দায়ে রাজ প্রতিনিধিরা ভ্রাম্যমাণ বিচারক হিসেবে মৃত্যুদণ্ড দিতেন। এ বিচারকগণ প্রথম দিকে দৈবপ্রমাণ বা আইনের বাজি পদ্ধতি প্রয়োগ করে ফৌজদারি মামলার আসামীদের বিচার করতেন। ১২১৫ সাল থেকে দৈব প্রমাণ নিষিদ্ধ করা হলে বিচারকগণ জুরিদের মতামতের ভিত্তিতে আসামীদের বিচারে সম্মত করতেন। মিসডিমেনর বা সামান্য অপরাধ ও রাজদ্রোহের অভিযোগে অভিযুক্ত আসামী তাতে রাজি না হয়ে নীরব থাকলে তাকে দোষী সাব্যস্ত করা হতো। কিন্তু গুরুতর অপরাধে অভিযুক্ত আসামীকে নির্যাতন করে জুরি বিচার মেনে নিতে বাধ্য করা হতো। দোষী সাব্যস্ত হওয়ার আগে নির্যাতনে কোন আসামী মারা গেলে তার সম্পত্তি সরকার বাজেয়াপ্ত করত। ১৭৭২ সালের আইনে আসামী নীরব থাকলে দোষী সাব্যস্ত এবং ১৮২৭ সালে এ বিধান পরিবর্তন করে আসামীর বিচার করে তাকে দোষী সাব্যস্ত করার নিয়ম প্রবর্তন করা হয়। রাজা তৃতীয় হেনরির আমল থেকে প্রতি সাত বছর অন্তর একবার জেনারেল আয়ার করার নিয়ম করা হয়েছিল। জেনারেল আয়ারের তদন্তে ভ্রাম্যমাণ বিচারকদের কাজের গাফিলতি প্রকাশ পেলে তাদের জরিমানা এমনকি গুরুদণ্ডে দণ্ডিত করা হতো। ভ্রাম্যমাণ বিচারকগণ যখন কোন কাউন্টি বা জেলায় যেতেন তখন ওই এলাকার স্থানীয় আদালতের কার্যক্রম বন্ধ হতো এবং রাজার প্রতিনিধির আদালতে ওই জেলার বিচারাধীন মামলার বিচার হতো। সাধারণ আইনের জটিল পদ্ধতি বা দারিদ্র্যের কারণে মামলা দায়ের করতে না পারলে ভ্রাম্যমাণ বিচারকদের কাছে দরখাস্ত দিলে তা নিষ্পত্তি করা হতো। বিচারের রায় দিতে ভ্রাম্যমাণ বিচারকদের বিভিন্ন এলাকায়

www.pathagar.com

গিয়ে জুরির মতামত নিতে অধিবেশনে বসাকে এসআইজে বলা হতো।[৩০] রাজা দ্বিতীয় হেনরিই দেশের সকল প্রজা যেন রাজার বিচারালয়ে বিচার পেতে পারে সে ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিলেন। স্থানীয় আদালতে কোন মামলা গ্রহণ না করলে ভুক্তভোগী রাজার কাছে প্রার্থনা করে দরখাস্ত করতেন। ১২৭৮ সালে গ্লোচেস্টার আইনে বিধান করা হয়েছিল যে ৪০ শিলিং বা দু'পাউন্ড কম দাবির মামলা স্থানীয় আদালত বিচার করবে এবং এর অধিক দাবির মামলার বিচার হবে রাজার আদালতে। পরবর্তীতে উচ্চআদালতের বিচারকগণ ওই আইনের ব্যাখ্যা করে রায় দেন যে মামলার দাবি সংক্রান্ত ঐ সীমা শুধু কোন ব্যক্তির কাছ থেকে অর্থ আদায়ের দাবির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে। এর ফলে ওইরূপ মামলা ছাড়া রাজধানীর কেন্দ্রীয় আদালতে ও রাজা নিযুক্ত ভ্রাম্যমাণ বিচারআদালতে সকল গুরুত্বপূর্ণ দেওয়ানি মামলা বিচারের জন্য গ্রহণ করা হতে থাকে।[৩১] এলাকার প্রথা পদ্ধতির ওপর নির্ভরশীল ছিল স্থানীয় আদালতের বিচার প্রক্রিয়া। কিন্তু এক এলাকার প্রথার অন্য এলাকার প্রথার সাথে মিল ছিল না। অর্থাৎ সারাদেশে বিভিন্ন ধরনের প্রথা পদ্ধতি প্রচলিত ছিল। এ সমস্যা নিরসনে রাজার ভ্রাম্যমাণ বিচারকরা কোন এলাকার প্রথা পদ্ধতি ভাল মনে করলে অন্য এলাকার মামলা বিচারে তা প্রয়োগ করা শুরু করেন। এতে করে মন্দ প্রথাগুলো লোপ পেতে থাকে এবং উত্তম প্রথাগুলো সারাদেশে প্রচলিত হয়ে দেশের সাধারণ আইন হিসেবে গণ্য হয়। বিচারকালে বিচারকরাও নতুন নতুন পন্থা উদ্ভাবন করে স্থানীয় প্রথার সাথে মিশিয়ে আইন ব্যবস্থাকে উন্নত করতে থাকেন। সে জন্যই বলা হয় ইংল্যান্ডের সাধারণ আইন বা কমন ল' সে দেশের বিচারকদের অবদান। তবে এখন কমন ল' বলতে আইন সভার আইন ও উচ্চআদালতের বিচারকদের সৃষ্ট নজির আইন উভয়কেই বুঝায়।[৩২] কিউরিয়া রেজিসের আদালতে প্রজাদের দায়েরকৃত মামলা বিচারের জন্য দ্বিতীয় হেনরির আমলে ৫ জন বিচারক নিয়ে কোর্ট অব কমন প্লিজ বা সাধারণ বিচারালয় গঠিত হয়েছিল। এ আদালত লন্ডনের ওয়েস্ট মিনিস্টার প্রাসাদে বসে বিচার কাজ করতেন। ১২৭২ সালে এ আদালতে একজন প্রধান বিচারপতি ও বিচারকের সংখ্যা বাড়ানোর পর সেখানে ভূমি, ঋণ চুক্তি ও মালামাল আটক সংক্রান্ত দেওয়ানি মামলার বিচার কাজ চলতো। ১৭ শতাব্দী থেকে এ আদালতে হেবিয়াস কর্পাস ও প্রহিবিশন রিট জারি করা হতে থাকে। ১৮৭৫ সালে আদালতটি বিলুপ্ত করে এর এখতিয়ার হাইকোর্টে স্থানান্তরিত হয়। মামলার ফি থেকে বিচারকগণ তখন বেতনের পরিবর্তে কমিশন পেতেন। এ আদালতে ব্যারিস্টারদের মামলা পরিচালনা করার অধিকার ছিল না। শুধু সার্জেন্ট এট ল' নামের ব্যয়বহুল জ্যেষ্ঠ আইনজীবীগণ এ আদালতে মামলা পরিচালনা করতে পারতেন। তাছাড়া এ আদালতে মামলা দায়ের করার পদ্ধতি জটিল ও ব্যয়বহুল ছিল। এ অবস্থা নিরসনে ১৬৬১ সালে আদালতের প্রধান বিচারপতি নর্থ এ আদালতে মামলা দায়েরের সহজ পদ্ধতি বের করেন।[৩৩] কিউরিয়া রেজিস থেকে সর্বশেষ কোর্ট অব কিংস বেঞ্চ বা রাজার আদালত প্রতিষ্ঠা করা হয়। ১২৬৮ সাল থেকে এ আদালতে একজন প্রধান বিচারপতি নিযুক্ত করা হয়। এ আদালতে পূর্বের মতো রাজা প্রথম

www.pathagar.com

জেমস-এর বসার প্রচেষ্টা প্রধান বিচারপতি কোক ব্যর্থ করে দেয়ার পর থেকে আর কোন রাজা এ আদালতে বিচারের সময় বসতেন না। এ আদালত কোর্ট অব চেঙ্গরি ছাড়া সব আদালতের কাজের তদারকি ছাড়াও প্রহিবিশন রিট জারি করে অন্য আদালতে ক্ষমতার অপব্যবহার বন্ধ করতেন। রাজার বিশেষ ক্ষমতা প্রয়োগের অধিকার ছিল এ আদালতের। ফলে এ আদালত অন্য আদালতে বিচারাধীন ও নিষ্পত্তিকৃত ফৌজদারি মামলা সারসিওর‍্যারী রিট জারি করে রাজার আদালতে বা অন্য কোন আদালতে বিচারে পাঠাতেন বা মিথ্যা রায় বাতিল করে দিতেন। এরপর রিট জারি করে নিম্ন আদালতের দেওয়ানি মামলার রায় বাতিল, কুওয়ারন্টো রিট জারি করে কোন কর্মকর্তার স্বপদে বহাল থাকার অধিকার পরীক্ষা এবং তার নির্দেশে আইনগত ক্ষমতা বহির্ভূত ঘোষণাসহ ধর্মীয় আদালতকে এখতিয়ারবহির্ভূত বিচার কার্য হতে নিবৃত্ত করতে পারতো এ আদালত। ১৬৪১ সালের আইনে রাজসভার বিচার করার ক্ষমতা লোপ পেলেও পরবর্তীকালে ব্রিটিশ শাসনাধীন উপনিবেশের উচ্চআদালতের রায়ের বিরুদ্ধে আপিল শুনতে রাজসভা, অভিজ্ঞ আইনজ্ঞ ও উপনিবেশের উচ্চআদালতের বিচারকদের নিয়ে প্রিভি কাউন্সিলের বিচারসভা বা জুডিশিয়াল কমিটি গঠন করা হয়। তখন দেশের কোন আদালতের রায়ের বিরুদ্ধে প্রিভি কাউন্সিলের আপিল শোনার ক্ষমতা ছিল না এবং হাউস অব লর্ডস দেশের সর্বোচ্চ আদালত হিসেবে অন্য আদালতের রায়ের বিরুদ্ধে আপিল শুনতেন।[৩৪]

বণিক ও সওদাগরদের মধ্যে ব্যবসায়িক বিরোধের মামলা বিচার করতেন বাজারে ও সামুদ্রিক বন্দরে অবস্থিত বরা কোর্ট, ফেয়ার কোর্ট এবং কোর্ট অব স্টেপল বা পণ্য আদালত। অনেক ক্ষেত্রে মেলাচলাকালীন পৌর কর্মকর্তারা বিদেশী বণিকদের ঢুকতে দিত না। শুল্ক আদায়ের স্বার্থে রাজা বিদেশী বণিকদের ইংল্যান্ডে বিনা বাধায় ব্যবসা করার অধিকার দিয়েছিলেন। ১৩৫৪ সালের পণ্য আইনে বিদেশী বণিকদের কাছ থেকে শুল্ক আদায়ের সুবিধার্থে ইংল্যান্ডের কয়েকটি প্রধান শহরে তাদের পণ্য বিক্রির সুবিধা দেয়া হয়েছিল। এ সকল শহরের পণ্য আদালতে বিদেশী বণিকদের ঋণ, চুক্তি ভঙ্গ ও অনধিকার প্রবেশ সংক্রান্ত মামলা বিচার করতেন শহরের মেয়র বা শাসনকর্তা ও দু'জন বিচারক।

বিচারকালে বিদেশী বণিকদের পক্ষে এসেসর এবং আনুপাতিক হারে বিদেশী জুরি নিযুক্ত করা হতো। বিদেশে সম্পাদিত চুক্তিসংক্রান্ত মামলা সাধারণ আদালতে বিচার্য ছিল না বলেই এ পণ্য আদালত গঠন করা হয়েছিল।[৩৫] এ সকল আদালতের মধ্যে প্রত্যেক আদালতের স্ব স্ব এখতিয়ার থাকা সত্ত্বেও এক আদালতের এখতিয়ারের সাথে অন্য আদালতের বিশেষ করে চ্যান্সেলর আদালতের বিরোধ দেখা দিয়েছিল। এ সমস্যা নিরসনে মহারানী ভিক্টোরিয়ার আমলে ১৮৭৩-১৮৭৫ সালের আইনে সুপ্রিম কোর্ট অব জুডিকেটর বা সর্বোচ্চ বিচারালয় প্রতিষ্ঠা করে বিভিন্ন প্রকার আদালতকে সুসংগঠিত করা হয়। পরবর্তী ১৯২৫ ও ১৯৮১ সালের পৃথক আইনে দেশের সর্বোচ্চ আদালতের আরো

www.pathagar.com

পরিবর্তন করা হয়।[৩৬] ১৪৯৫ সাল থেকে ইংল্যান্ডে দরিদ্র লোকদের বিনা খরচে মামলা করার ও বিনা ফিতে আইনজীবীর সহায়তা লাভের বিধান করা হলেও ১৯৮৮ সালে লিগ্যাল এইড আইন প্রণয়নের আগে তা ব্যাপকভিত্তিক ছিল না। এ আইনের বিধানমতে লিগ্যাল বোর্ডের স্থানীয় ডিরেক্টর দরখাস্তকারীর বার্ষিক আয় ২৬৪৫ পাউন্ডের কম হলে এবং তার পুঁজি তিন হাজার পাউন্ডের কম হলে দেওয়ানি মামলার পরিচালনা ও আইনজীবীর সম্পূর্ণ খরচ লিগ্যাল বোর্ড বহন করে। প্রার্থীর বার্ষিক আয় উক্ত অংকের বেশি ও ৬৩৫০ পাউন্ডের কম হলে এবং মূলধন ৬৩১০ পাউন্ডের কম হলে মামলার আংশিক খরচ ও আইনজীবীর ফি বহন করে বোর্ড। ওই আইন মতে আদালতের আদেশ বলেও ফৌজদারি মামলায় বোর্ড আসামীর আইনজীবীর ফি বহন করে।[৩৭] ১৯৪৯ সালে সরকারি তহবিল থেকে দরিদ্রদের মামলার খরচ দেয়ার বিধান করার পর তখন বছরে ১০ লাখ পাউন্ডের কম খরচ হতো। ১৯৯৫ সাল নাগাদ এ খরচ গিয়ে দাঁড়ায় ১৫শ' কোটি পাউন্ডের বেশি। এরমধ্যে ৫শ' কোটি পাউন্ড খরচ হয় ফৌজদারি মামলার ক্ষেত্রে। পুলিশের হাতে আটক আসামী আইনজীবী রাখতে অপারগ হলে তার পক্ষে সরকারি খরচে সলিসিটর নিযুক্ত করা হয়। ১৯৯৪ সাল নাগাদ পাঁচ বছরে দেওয়ানি মামলার খরচ বেড়ে দ্বিগুণ হওয়া এবং বিবাহ বিচ্ছেদ ও ক্ষতিপূরণের মামলার সংখ্যা বেড়ে যাওয়ায় লর্ড চ্যান্সেলর আইনগত সহায়তা দানের ক্ষেত্র সংকুচিত করতে বিভিন্ন পদক্ষেপ নিয়েছেন।[৩৮] ইংল্যান্ডে আইনের শাসনের প্রভাব জানতে হলে সে দেশের বিচার ব্যবস্থার বিবর্তনের সাথে সে দেশের ইতিহাসও কিঞ্চিত পর্যালোচনা করা দরকার। নরম্যান বিজয়ের পর ইংল্যান্ডের রাজা একচ্ছত্র ক্ষমতার অধিকারী হয়ে বিচার ব্যবস্থাও তার নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসেন। রাজার নিযুক্ত বিচারকগণ দেশের প্রচলিত প্রথা পদ্ধতিকে প্রথমে সাধারণ আইনে পরিণত করেন। এতে করে রাজার সাথে ক্ষমতার দ্বন্দ্বে ইংল্যান্ডের সামন্ত প্রধানগণ ১২১৫ সালে রাজা জনকে বিখ্যাত ম্যাগনাকার্টা সনদে স্বাক্ষরদানে বাধ্য করেছিলেন। ওই সনদে অনেক বিষয়ের মধ্যে দেশের প্রচলিত আইন ছাড়া কোন নাগরিককে বিনা বিচারে শাস্তি দেয়া যাবে না বলে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হয়েছিলেন রাজা জন। রাজা প্রথম জেমস-এর আমলে সাধারণ আইন ও আদালতের ওপর রাজার চ্যান্সেলর আদালতের প্রাধান্য প্রশ্নে প্রধান বিচারপতি এডওয়ার্ড কোক ও রাজার চ্যান্সেলর এলেসমেরের মধ্যে বিরোধ দেখা দিলে রাজা চ্যান্সেলর আদালতকে প্রাধান্য দেয়ার পর সাধারণ আইন আদালতের প্রাধান্য ক্ষুণ্ন হয়। তখন কোক রাজার স্বৈরাচারী ক্ষমতার প্রতিবাদ করে ১৬১১ সালে প্রোকলামেশন মামলার রায় দিয়ে ঘোষণা করেন রাজা দেশের প্রচলিত আইনের দ্বারা দেশ শাসন করতে পারেন মাত্র, কিন্তু রাজা বিশেষ অধিকার প্রয়োগ করে নতুন করে অপরাধ সৃষ্টি করতে পারেন না। শেষ পর্যন্ত রাজা ১৬১৬ সালে কোককে প্রধান বিচারপতি পদ থেকে অপসারণ করেন। এরপর কোক রাজতন্ত্রীদের বিপক্ষে সাধারণতন্ত্রীদের দলে যোগ দিয়ে পার্লামেন্ট সদস্য নির্বাচিত হয়ে

www.pathagar.com

আইনের শাসন দাবি করতে থাকেন। পরবর্তী রাজা প্রথম চার্লস-এর সাথে পার্লামেন্টের সম্মতি ভিন্ন করধার্য ও অন্যান্য স্বেচ্ছাচারী রাজ ক্ষমতার প্রশ্নে পার্লামেন্টের দ্বন্দ্ব শুরু হয়। সাধারণতন্ত্রীদের পক্ষে পার্লামেন্ট ওলিভার ক্রমওয়েলকে প্রধান সেনাপতি নিযুক্ত করেন। গৃহযুদ্ধে রাজা ও রাজতন্ত্রী দল পরাজিত হবার পর বিচারে রাজা দণ্ডিত হয়ে প্রাণ হারান এবং ১৬৪১ সাল থেকে রাজতন্ত্রের অবসান হয়ে ইংল্যান্ড একটি সাধারণতন্ত্রে পরিণত হয়। ক্রমওয়েলের মৃত্যুর পর তার পুত্রের শাসনকালে ১৬৬০ সালে পার্লামেন্ট রাজা দ্বিতীয় চার্লসকে সিংহাসনে আরোহণের সুযোগ দিলে ইংল্যান্ডে রাজতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠা হলেও কর ধার্য ও আদায় পার্লামেন্টের নিয়ন্ত্রণে থাকে। তখন থেকে রাজা আইনের অধীন হয়ে পড়েন। পার্লামেন্ট ১৬৬০ সালে সৈনিকদের জায়গীরপ্রথা বন্ধ এবং ১৬৯০ সালে বিনাবিচারে আটক বন্ধে হেবিয়াস কর্পাস আইন ও প্রতারণার বিরুদ্ধে ১৬৭৭ সালে প্রতারণা নিরোধ আইন প্রণয়ন করে। মিথ্যা সাক্ষ্য দ্বারা আদালতের মাধ্যমে সম্পত্তি উদ্ধার এবং মিথ্যা চুক্তি বন্ধে এ আইনে লিখিত দলিল করার বিধান করা হয়েছিল।[৩৯]

রাজা দ্বিতীয় চার্লস-এর পর রাজা দ্বিতীয় জেমস আবার পার্লামেন্টের সাথে ক্ষমতার দ্বন্দ্বে অবতীর্ণ হয়ে দেশে স্বৈরাচারী শাসন চাপাতে গিয়ে জনমতের চাপে ১৬৮৮ সালে সিংহাসন ও রাজ্য ত্যাগে বাধ্য হন। এরপর রাজা উইলিয়াম ও রাণী মেরী সিংহাসনে আরোহণ করেন। এ ঘটনাকে ইংল্যান্ডের ইতিহাসে গৌরবপূর্ণ বিপ্লব বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। তখন নাগরিক অধিকার ও পার্লামেন্টের সার্বভৌমত্ব রক্ষায় পার্লামেন্ট বিল অব রাইটস পাস করলে ১৬৮৯ সালে রাজা-রানী তাতে সম্মতি দিলে তা আইনে পরিণত হয়। এরপর থেকে আইনের শাসনের প্রতিষ্ঠা, রাজার একচ্ছত্র ক্ষমতা লোপ পেয়ে পার্লামেন্টের প্রাধান্য নিশ্চিত হয়। ১৭০১ সালে বিচারকদের স্বাধীনতা নিশ্চিত করতে এ্যাক্ট অব সেটেলমেন্ট পাস করে বিচারকদের বেতন নির্দিষ্ট করে দেয়া হয়। শুধু অসদাচরণের জন্য পার্লামেন্টের উভয় কক্ষের সম্মতিতে তাদের চাকুরিচ্যুত করার বিধান করার ফলে রাজা ইচ্ছামতো বিচারকদের চাকরিচ্যুত করার অধিকার হারান।[৪০] বর্তমানে ইংল্যান্ডে আইনের চোখে সবাই সমান, সরকারি কর্মচারী বেসরকারি নাগরিক কেউ আইনের উর্ধ্বে নয় এবং সবাই প্রচলিত আইন মেনে চলতে বাধ্য। প্রত্যেক নাগরিকের অধিকার সমুন্নত রাখতে আদালতে প্রতিকার পাওয়ার ব্যবস্থা সংরক্ষিত। সাধারণ আদালতে বিচার ছাড়া সরকার স্বেচ্ছাচারিভাবে কাউকে শাস্তি দিতে পারে না। ইংল্যান্ডের বিচারআদালতগুলো নাগরিক অধিকার ও স্বাধীনতার রক্ষাকবচ। আদালত মামলা বিচারকালে উচ্চ নিচ ভেদে সকলের প্রতি সমভাবে আইন প্রয়োগ করেন, সুবিচার হয়েছে তা দেখাতেও সচেষ্ট থাকেন। সে দেশে আইন প্রণয়ন করে পার্লামেন্ট এবং নির্বাহী কর্তৃপক্ষ তা প্রয়োগ করেন। এতে সংক্ষুব্ধ কেউ আদালতের দ্বারস্থ হলে আদালত ওই আইন সম্পর্কে যে ব্যাখ্যা দেন তা সবারই ওপর বাধ্যকর। ইংল্যান্ডের উচ্চআদালত ভারত, বাংলাদেশ বা আমেরিকার উচ্চআদালতের মতো কোন আইন সংবিধান বিরোধী

www.pathagar.com

বলে বাতিল করতে না পারলেও পার্লামেন্ট প্রণীত আইনের প্রকৃত অর্থ ও তাৎপর্য সম্পর্কে চূড়ান্ত ব্যাখ্যা দিতে পারেন।

এছাড়া ইংল্যান্ডের উচ্চআদালত পার্লামেন্টের আইনকে ব্যাখ্যার মাধ্যমে সংকুচিত বা সম্প্রসারিত, অস্পষ্টতা দূর এবং ব্যাখ্যার মাধ্যমে নতুন আইন সৃষ্টি করতে পারেন। এসব নতুন আইন নজির হিসেবে অধস্তন আদালতের ওপর বাধ্যকর। তবে পার্লামেন্ট নজির আইনের পরিপন্থী কোন নতুন বিধান প্রণয়ন করলে তা সকলের ওপর বাধ্যকর এবং সংশ্লিষ্ট নজির আইন তখন অকার্যকর হয়ে যায়। ইংল্যান্ডের উচ্চআদালত পার্লামেন্টের কোন আইনকে ব্যাখ্যার মাধ্যমে পূর্বে বেআইনী ঘোষণা করতে না পারলেও ইউরোপিয়ান কমিউনিটি আইনের পরিপন্থী হলে এখন ইংল্যান্ডের নিম্ন থেকে উচ্চআদালত তা অকার্যকর ঘোষণা করতে পারেন।[৪১]

অ্যাসেরীয়

অ্যাসেরীয় সভ্যতার বিকাশ হয়েছিল মেসোপটেমিয়া (আজকের ইরাক)'র উত্তরাংশ থেকে। ক্যাসাইটদের আক্রমণে প্রাচীন ব্যাবিলন সাম্রাজ্যের পতন ঘটলে তারা এই সভ্যতার উত্তরাধিকার লাভ করে। খ্রিষ্টপূর্ব ১৩শ' অব্দের মধ্যেই অ্যাসেরীয়গণ সমগ্র উত্তর মেসোপটেমিয়া দখল করে নেয়। অ্যাসেরীয় সম্রাটদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ছিলেন আশুরবানিপাল। (খ্রিষ্টপূর্ব ৬২৬-৬৬৮ অব্দ) অ্যাসেরীয়রা মূলত ব্যাবিলনীয় সভ্যতার দ্বারা প্রভাবিত হলেও বিশ্বসভ্যতার ইতিহাসে তাদের নিজস্ব অবদানও কম নয়। স্থাপত্য, ভাস্কর্য, চিত্রকলা, কারুশিল্প ইত্যাদি ক্ষেত্রে তাদের মৌলিক উদ্ভাবনী ক্ষমতার ছাপ সুস্পষ্ট। সম্রাট আশুরবানিপাল রাজধানী নিনেভাহকে এমন সব জমকালো প্রাসাদ ও রাজপথ দ্বারা সুশোভিত করেন যে, তাকে সৌরকোজ্জ্বল নগরী নামে অভিহিত করা হতো। তিনি নিজে ছিলেন সুপণ্ডিত। রাজধানী নিনেভাহকে তিনি শুধু সামরিক কেন্দ্রেই নয়, শিক্ষা সংস্কৃতিরও এক বৃহৎ কেন্দ্রে পরিণত করেন। তিনি প্রতিষ্ঠা করেন এমন এক বিশাল পাঠাগার সেমিটিক জগতে যা ছিল সর্ববৃহৎ ও সমৃদ্ধতম। অ্যাসেরীয় সমাজে দাসপ্রথা প্রচলিত থাকলেও দাসদের অবস্থা মোটামুটি সম্পন্ন ছিল। তবে নারী সমাজের অধিকার নানাভাবে খর্ব করা হয়। এই সমাজেই প্রথম মেয়েদের পর্দা প্রথার প্রচলন শুরু হয়েছিল। কেবল অভিজাত শ্রেণীর নারীরা রাজনৈতিক ক্ষেত্রে বিশেষ ভূমিকা গ্রহণের অধিকারী ছিল। তাদের অনেকেই প্রাদেশিক শাসনকর্তার পদও অলংকৃত করেছিলেন। অ্যাসেরীয়রা প্রথম বৃত্তের ডিগ্রী নিরূপণ এবং অক্ষাংশ ও দ্রাঘিমাংশ নির্ণয় করতে সক্ষম হন। জ্যোতির্বিদ্যার ক্ষেত্রে তাদের অবদান অতুলনীয়। তারাই প্রথম পাঁচটি গ্রহ আবিষ্কার করে। চিকিৎসা বিজ্ঞান, রোগ নির্ণয় ও প্রতিকার ব্যবস্থার ক্ষেত্রেও তাদের অগ্রগতি ছিল উল্লেখযোগ্য। অ্যাসেরীয়দের বলা হয় এশিয়ার রোমান। রোমানরা যেমন গ্রীক সভ্যতাকে পৃথিবীব্যাপী ছড়িয়ে দিয়েছিল, অ্যাসেরীয়রাও একই ধরনের ভূমিকা পালন করেছিল ব্যাবিলনীয় সভ্যতা বিশ্বময় ছড়িয়ে দেয়ার ক্ষেত্রে। তাদের সভ্যতার প্রভাব কমবেশি বিশ্বের সকল জাতির ওপর পরিলক্ষিত হয়।[৪২]

www.pathagar.com

ব্যাবিলনীয় সভ্যতার উত্তরসূরি অ্যাসেরীয় সভ্যতা সেনাবাহিনী ও পুরোহিততন্ত্রের ওপর নির্ভরশীল ছিল। দেবতা অসুরের নামে সব আদেশ-নির্দেশ ও আইন ঘোষিত হত। যদিও অ্যাসেরীয় আইনের ভিত্তি ছিল সুমেরীয় ও ব্যাবিলনীয় আইন, তবু অ্যাসেরীয় আইন ছিল দমনমূলক। অনেক সময় বিচারকার্য করা হতো আসামীকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করে নদীতে নিক্ষেপ করে ভাগ্য পরীক্ষার মাধ্যমে। যদি সে বেঁচে উঠতো তবে নির্দোষ প্রমাণিত হয়ে ছাড়া পেত। নইলে পানিতে ডুবে মৃত্যুই ছিল তার নিয়তি। বেত্রাঘাত করে, নাক ও কান কেটে দিয়ে, জিহ্বা ও চোখ উপড়ে ফেলে, খোজা করে দিয়ে, শূলে চড়িয়ে বা শিরচ্ছেদ-এর মাধ্যমে প্রাণদণ্ড কার্যকর করে দোষী ব্যক্তিকে শাস্তি দেয়া হতো। আবার কখনো দোষী ব্যক্তিকে বিষপানে বাধ্য করে বা তার পুত্র-কন্যাকে দেবতার বেদীতে জীবন্ত পুড়িয়ে শাস্তি দেয়া হতো। ব্যভিচার, নারী ধর্ষণ, গর্ভপাত করা এবং কতিপয় চুরির অপরাধে মৃত্যুদণ্ড দেয়া হতো। পুরোহিতগণ বা সামন্ত প্রধানগণ নিজ নিজ এলাকায় বিচারকার্য পরিচালনা করতেন। পরবর্তীকালে শাসনকার্য ও বিচারকার্য পরিচালনা করতেন রাজার নিযুক্ত স্থানীয় শাসনকর্তা।[৪৩]

ইনকা

১৪৩৮ সালে দক্ষিণ আমেরিকায় ইনকা সভ্যতার বিস্তার ঘটে যা বাংলায় মায়া সভ্যতা নামে পরিচিত। ইনকা সাম্রাজ্যের রাজধানী কুজকো থেকে পরবর্তী ৫০ বছরে দক্ষিণ আমেরিকার পেরু, বলিভিয়া, উত্তর আর্জেন্টিনা, এবং ইকোয়েডরের বিশাল অংশ পর্যন্ত এর বিস্তৃতি ছিল। মোট ১৩ জন ইনকা সম্রাটের মধ্যে সাপা ইনকা, কাপাক আপু, ইনটিপ করি'র নাম উল্লেখযোগ্য। ইনকারা ছিল যোদ্ধা জাতি। মাত্র একশ' বছরের মধ্যে তারা ধন-সম্পদ, জ্ঞানচর্চা, কৃষিকাজ আর নির্মাণ স্থাপত্যে বিশেষত্ব অর্জন করেছিল। ওই সময় হাইড্রলিক ইঞ্জিনিয়ারিং, কৃষি, লৌহ ও বুনন শিল্পে তারা বিশেষত্ব অর্জন করেছিল। ইনকা সাম্রাজ্যের সবচেয়ে শক্তিশালী সম্রাট পাখাকুটি ও তার পুত্র টোপা ইনকার সময়েই এ সভ্যতার সবচেয়ে বেশি বিকাশ ঘটে। ইনকাদের রাস্তা নির্মাণ কৌশল আধুনিক বিশ্বের সামনে আজো বিস্ময়কর।

দক্ষিণ আমেরিকার প্যাসিফিক উপকূল ঘেঁষে প্রায় ১৪ হাজার মাইল দীর্ঘ এ রাস্তা তৈরি করেছিল তারা পাথর, মাটি ও ঘাস দিয়ে। ইনকা জাতির প্রতিটি গোষ্ঠী নিয়ন্ত্রণ করতো একজন সর্দার। প্রশাসনিক ক্ষমতা ছিল রাজার হাতে। রাজার পরবর্তী ক্ষমতাধর ব্যক্তি ছিলেন সেনাপতি। সেনাপতিকে সাহায্য করত চারজন প্রাদেশিক সেনাপ্রধান। পরবর্তী গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি ছিল মন্দিরের পুরোহিত। তাদের মন্দিরগুলো ছিল সোনা আর রুপার তৈরি। সেখানকার নিয়মানুযায়ী প্রতিটি পরিবারকে বছরের ৬৫ দিন সাংসারিক কাজ শেষে বাকি সময় খনি থেকে সোনা ও রুপা সংগ্রহ করে মন্দির গড়তে হতো। বৃদ্ধ ছাড়া আর সবাইকে কাজ করতে হতো এবং তাদের ভাষা ছিল কুচু উয়ান। যেহেতু রাজা দেশবাসীর থাকা, খাওয়া ও পরার ব্যবস্থা করতেন সেহেতু সেখানে কোন অভাব ছিল না

www.pathagar.com

এবং সোনা রুপা ছিল মূল্যহীন। ইনকাদের রাজ্যে অপরাধ বলে কোন কিছুর অস্তিত্ব ছিল না। সেখানে মানুষের কোন অভাব ছিল না বলে তারা কোন অপরাধের সাথে জড়িত হতো না। ফলে সেখানে কারাগারের কোন ধারণা ছিল না। ইনকা সাম্রাজ্যে সবচেয়ে বড় অপরাধ ছিল দেবতার বিরুদ্ধে কিছু বলা। সূর্য ছিল তাদের বড় দেবতা এবং তারা মনে করত তাদের সম্রাটরা সূর্যেরই সন্তান। কেউ দেবতার অবমাননাজনক অপরাধ করলে তাকে শাস্তি হিসেবে পাহাড়ের ওপর থেকে নিচে ফেলে দিয়ে মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হতো। সময় নিরূপণের জন্য ইনকারা তৈরি করেছিল সূর্যঘড়ি। সোনা-রুপার লোভে স্পেনীয়দের আক্রমণে ইনকা সভ্যতা ধ্বংস হয়ে যায়। এখন পর্যন্ত পেরুর পাহাড়ের ওপর পাথরের তৈরি সূর্যঘড়ি বিলুপ্ত ইনকা সভ্যতার অস্তিত্ব ঘোষণা করে চলেছে। ইনকাদের সভ্যতা, সংস্কৃতি এবং জীবন প্রণালী এখন পর্যন্ত নৃতাত্ত্বিকদের গবেষণার বিষয়। ইট বিছানো রাস্তা, অনিন্দ্য সুন্দর আর জটিল সব দুর্গ ছিল পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ আর ইনকা সভ্যতার অহংকার। আর তাদের ছিল রাশি রাশি সোনা। স্পেনীয় নিষ্ঠুর সেনানায়ক ফ্রান্সিসকো পিজারো ওই সোনার লোভে তদানিন্তন ইনকা সম্রাট আতাহুয়ালপা'র সাথে আলোচনার নামে প্রতারণা করে সম্রাটকে বন্দি করেন। নিজের মুক্তির জন্য সম্রাট স্পেনীয় সেনাপতিকে একঘর ভর্তি সোনা দেন। বিশ্বাসঘাতক পিজারো এর পরও সম্রাটকে আগুনে পুড়িয়ে হত্যা করেন। সম্রাটকে হত্যা করার পর রক্তাক্ত হত্যাযজ্ঞে দৃষ্টিনন্দন নগর, দুর্গসহ ইনকা সাম্রাজ্য ধ্বংস হয়ে যায় স্পেনীয়দের আক্রমণে। পুরো সাম্রাজ্যে আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয় স্পেনের।[৪৪]

ফ্রান্স

অষ্টাদশ শতাব্দীতে ইউরোপের বহু রাষ্ট্রে স্বৈরাচারী রাজতন্ত্র প্রচলিত ছিল। ফ্রান্স এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ। এ রীতি অনুযায়ী রাজাই ছিলেন জাতির প্রতিভূ। প্রশাসনিক ব্যাপারে জাতির কোন ভূমিকা ছিল না বললেই চলে। জনকল্যাণমূলক-আদর্শ অবলম্বন করে রাজা রাজ্য শাসন করলেও তিনি ছিলেন সার্বভৌম। প্রুশিয়ার রাজা ফ্রেডারিক এর উপযুক্ত উদাহরণ। তিনি নিজেকে 'জাতির প্রথম সেবক' বলে ঘোষণা করেছিলেন। তার আগে ১২০৯ সালে দক্ষিণ ফ্রান্সে প্রভাবশালী 'নব্যতন্ত্র' আলবিগেনসেসদের বিরুদ্ধে রক্তক্ষয়ী ধর্মযুদ্ধ চালিয়ে ফরাসি বাহিনী ভূমধ্যসাগরের উপকূলবর্তী শহর বেজিয়ার্স দখল করে। শহরটি ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয় প্রায় সঙ্গে সঙ্গে। কিন্তু সমস্যা দেখা দিল, শহরবাসীদের মধ্যে কারা 'ঘৃণিত নব্যতন্ত্রী' আর কারা খাঁটি খ্রিস্টান তা নির্ণয় করা নিয়ে। তখন ফরাসি সেনাধ্যক্ষ চতুর্থ সাইমন দ্য মঁৎফর্ত (অথবা সম্ভবত, পোপ তৃতীয় ইনোসেন্ট-এর প্রতিনিধি) বললেন, এটা কোনও সমস্যাই নয়। সকলকেই হত্যা করো। ঈশ্বর খাঁটি বান্দাদের ঠিকই চিনে নেবেন।' যে কথা সে-ই কাজ। কয়েক লাখ নর-নারী ও শিশুকে হত্যা করা হলো ধর্মের নামে।[৪৫] ফরাসি বিপ্লবের পূর্বে একমাত্র ইংল্যান্ড ছাড়া ইউরোপীয় আর কোন দেশে সুষ্ঠু বিচার ব্যবস্থার প্রচলন ছিল না। বিচারকরা রাজা কর্তৃক

www.pathagar.com

নিযুক্ত হতেন। রাজবংশের স্বার্থ ক্ষুণ্ন হয় এরূপ রায় দেয়ার ক্ষমতা তাদের ছিল না। অনেক ক্ষেত্রে বিচারালয়গুলোর কোন সুনির্দিষ্ট বিচার ক্ষমতা থাকত না। এমনকি আইন-কানুনগুলো সংকলন করা হতো না। কোন কোন রাষ্ট্রে ঐশী রাজতন্ত্র প্রচলিত ছিল। তখন মনে করা হতো যে, ইউরোপীয় রাজন্যবর্গ ঐশী ক্ষমতাবলে ঈশ্বরের প্রতিনিধি হিসেবে দেশ শাসন করেন। কাজেই তাদের কার্যকলাপের সমালোচনা করার অধিকার জনগণের ছিল না। তারা নিজেদের ইচ্ছানুযায়ী রাজ্য শাসন করতেন। নির্যাতন, নিপীড়ন, উৎপীড়ন এ সবই তারা করতে পারতেন। বিপ্লব প্রাক্কালে ইউরোপের সামাজিক অবস্থার দিকে নজর দিলে দেখা যায়, সমাজ ছিল তিনটি শ্রেণীতে বিভক্তঃ যাজক শ্রেণী, অভিজাত শ্রেণী এবং সাধারণ শ্রেণী। যাজক এবং অভিজাতগণ ছিল যথাক্রমে সমাজের প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিক। মোট জনসংখ্যার তুলনায় তারা ছিল খুবই কম, কিন্তু ধন-সম্পদ ও পদমর্যাদার দিক দিয়ে তারা ফরাসী জাতীয় জীবনে পূর্ণ আধিপত্য বিস্তার করেছিল। তখন ভূমিই ছিল সামাজিক মান-সম্মানের স্তম্ভ। আর যাজক ও অভিজাত শ্রেণীর লোকেরাই ছিল বেশিরভাগ ভূমির মালিক। অপরদিকে সাধারণ শ্রেণীর লোকেরা ছিল সমাজের সবদিক থেকে অবহেলিত। অষ্টাদশ শতাব্দীতে ইউরোপীয় রাষ্ট্রে অভিজাত শ্রেণী ছিল সর্বাধিক প্রতিপত্তি ও সুবিধাভোগী শ্রেণী। তারা সাধারণ শ্রেণীর লোকদের অত্যন্ত ঘৃণার চোখে দেখত। এমনকি তাদের সাথে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন করতে ঘৃণাবোধ করত। অভিজাতরা বিশ্বাস করতো যে, মেহনতি মানুষের শ্রমভিত্তিক জীবন নিয়তিই নির্দিষ্ট করে দিয়েছে। মধ্যযুগীয় সমাজ ব্যবস্থা পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, সেখানে ভূমি ও ক্রীতদাস প্রথা প্রচলিত ছিল। ভূমিকর্ষণকারী ক্রীতদাসদের প্রতি যেরূপ নির্যাতন করা হতো সেরূপ নির্যাতিত ও নিষ্পেষিত আর কেউই ছিল না। কোনরূপ সম্পত্তি দখল করার অধিকার তাদের ছিল না। এমনকি হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রম করেও তারা উপযুক্ত পারিশ্রমিক পেত না। অভিজাত শ্রেণী তাদের যন্ত্র হিসেবে ব্যবহার করত। প্রাক-বিপ্লব যুগে ইউরোপের বিভিন্ন রাষ্ট্রে অর্থনৈতিক সংকট চরম আকার ধারণ করে। সমাজের নিম্নস্তরের জনগণের এমনিতেই কোন আয়ের পথ ছিল না, তদুপরি তাদের সর্বাধিক কর প্রদান করতে হত। শুধু তাই নয়, তারা চরম লাঞ্ছনা ও অপমানের মধ্যে দিনাতিপাত করত। তাই সমাজে তাদের কোন অধিকার ছিল না। বিলাস-ব্যসন ও জাঁকজমকপূর্ণ জীবনযাত্রা নির্বাহের অধিকার ছিল একমাত্র অভিজাত শ্রেণীর। তারা ভোগ-বিলাসে অধিক অর্থ ব্যয় করতে থাকে। ফলে রাজকোষ শূন্য হয়ে যায়। অর্থ সংকটের কারণে ইউরোপীয় রাষ্ট্রসমূহ বিভিন্ন রাষ্ট্র থেকে সাহায্য গ্রহণ করতে বাধ্য হয়। অষ্টাদশ শতাব্দীতে ইউরোপে ফ্রান্সের সামরিক পরাজয়, ফরাসি রাজতন্ত্রের অসারতা ও হীনবীর্যতা প্রতিপন্ন করে। সাত বছরব্যাপী যুদ্ধে ইউরোপে, আমেরিকায় ও ভারতে ইংরেজদের নিকট ফ্রান্সের শোচনীয় পরাজয় ঘটে, ফরাসি ব্যবসা-বাণিজ্যের বিরাট অবনতি ঘটে এবং এর ফলে ফরাসি রাজকোষ অর্থশূন্য হয়ে যায়। এরূপ শোচনীয় অবস্থার মূল কারণ ছিল ফরাসি রাজতন্ত্রের শোচনীয় ব্যর্থতা। বিপ্লব-পূর্ব ফ্রান্সে জনগণের

www.pathagar.com

রাজনৈতিক স্বাধীনতা ছিল না। ষোড়শ লুই বলতেন, 'আমি যা ইচ্ছা করি তাই আইন'। তদুপরি এ সর্বাত্মক ক্ষমতা জনকল্যাণে নিবেদিত ছিল না। মধ্যবিত্ত শ্রেণী এবং শোষিত কৃষক ও শ্রমিক শ্রেণী ক্রমেই এ স্বেচ্ছাচারী শাসন ব্যবস্থার বিরুদ্ধে বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে। ভার্সাই রাজপ্রাসাদ ছিল বিলাস-ব্যসনের এবং ঐশ্বর্যের ইন্দ্রপুরী। আঠার হাজার কর্মচারী রাজপরিবারে নিয়োজিত ছিল। সভাসদগণের মধ্যে কোটি কোটি মুদ্রা পুরস্কারস্বরূপ বিতরণ করা হত। ফরাসি রাজাগণ নিজেদের ক্ষমতা ঈশ্বর প্রদত্ত এবং রাষ্ট্রের সকল ক্ষমতা তাদের হাতে কেন্দ্রীভূত বলে মনে করতেন। রাজা ষোড়শ লুই ছিলেন দুর্বল ব্যক্তিত্বসম্পন্ন। সৎসাহসের অভাবে তিনি সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে প্রায়ই ব্যর্থ হতেন। কখনো সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলে অভিজাত বা যাজক শ্রেণীর বিরোধিতার মুখে তিনি সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করতেন। তার এ দুর্বলতা রাজতন্ত্রের পতন অনিবার্য করে তোলে। রাজশক্তির দুর্বলতার সুযোগে দুর্নীতিপরায়ণ ও স্বার্থপর অভিজাত আমলাগণ প্রাধান্য বিস্তার করতে থাকে। তারা ইনটেনডেন্টদের সাহায্যে দেশ শাসনের নামে শোষণ করত এবং খেয়াল খুশিমত 'রাজকীয় গ্রেফতারী পরোয়ানা' ব্যবহার করত। জনগণের চোখে তারা ছিল 'অর্থলোলুপ নেকড়ে বাঘ।' ১৭৮৯ সালের ১৪ জুলাই বাস্তিল দুর্গের পতনের মধ্য দিয়ে ফরাসি বিপ্লবের সূচনা হয়। ফ্রান্সে এখনো দিনটি জাতীয় দিবস। বিপ্লবীরা ক্ষমতায় আসে এক পর্যায়ে। বাস্তিল দুর্গের পতনের প্রায় দুই বছর পর ১৭৯১ সালে ফরাসি রাজা ষোড়শ লুই ছদ্মবেশে ভার্নাতে পালাতে গিয়ে ধরা পড়েন ২০-২১ জুন। তার প্রায় দেড় বছর পর তাকে গিলোটিনের সামনে হাজির করা হয়। মাটিতে গড়িয়ে পড়ে রাজার মাথা। প্রখ্যাত কোন মানুষ হিসেবে তাকেই সম্ভবত গিলোটিনে প্রাণ হারাতে হয়। এভাবে কত মাথাই যে গড়িয়ে পড়েছে, তার হিসাব নেই। পরে ফরাসি রানীকে গিলোটিনে প্রাণ দিতে হয়েছিল। তাই ফরাসি বিপ্লব থেকে আলাদা করা যায় না গিলোটিনকে, বাস্তবে ফরাসি বিপ্লবের একটি নেতিবাচক দিক ছিল এই গিলোটিন যা কাঠের ফ্রেমের মধ্যে আসামীর গলা আটকিয়ে পাঁঠা বলি দেয়ার মতো ধারালো ছুরির সাহায্যে শিরচ্ছেদ করার যন্ত্রবিশেষ। ১৭৯২ সালের ২৫ এপ্রিল ডি গ্রিভ, শহরের একটি উন্মুক্ত প্রান্তরে গিলোটিন স্থাপন করা হয় এবং সর্বপ্রথম একজন 'হাইওয়ে ম্যান'কে এর শিকার বানানো হয় অর্থাৎ তার মুণ্ডুচ্ছেদ করা হয়। এরপর অবিরাম গতিতে যন্ত্রটি কাজ করে যেতে থাকে। সে বছরই প্যারিসের ডি লা কনকর্ডে প্রায় ৪০০০ মানুষের শিরচ্ছেদ করা হয় এই যন্ত্রের সাহায্যে। এই যন্ত্রের শিকারদের মধ্যে ছিলেন রানী মারি আঁতোয়ানেৎ জিরদ্যাঁ, মাদাম রোঁলা, জর্জ দাঁত প্রমুখ। ১৭৭৩ সালের নভেম্বর থেকে ১৭৯৪ সালের জুলাই অবধি এই যন্ত্রের শিকার হয় ২৬০০০ মানুষ।[৪৬]

ইংরেজদের বিচার ব্যবস্থাকে কমন ল' আর ফরাসিদের বিচার ব্যবস্থাকে সিভিল ল' তথা মহাদেশীয় বিচার ব্যবস্থা বলা হয়, ইংল্যান্ডের বিচারপতিরা দেশের প্রচলিত প্রথা পদ্ধতিকে সংহত করে সৃষ্টি করেছেন কমন ল' এবং এর ভিত্তি কোন আইনসভার প্রণীত আইন ছিল না। আর ফ্রান্সে ১৭৮৯ সালে সাম্য, মৈত্রী ও স্বাধীনতার মহান আদর্শে

www.pathagar.com

পরিচালিত ফরাসি বিপ্লবের পর নেপোলিয়ান বোনপোর্ট কোড নেপোলিয়ান জারি করে ফ্রান্সে সিভিল ল' তথা বিধিবদ্ধ আইন সৃষ্টি করেন। এই সিভিল ল' বা আইনসভার প্রণীত বিধিবদ্ধ আইনের ভিত্তি হচ্ছে রোমান সম্রাট জাস্টিনিয়ানের কর্পাসজুরিস সিভিল বা আইন সংহিতা। আর জাস্টেনিয়নের আইনকোষের ভিত্তি হচ্ছে রোম নগর রাষ্ট্রের আইনসভার প্রণীত আইন ও পরবর্তীতে রোম সম্রাটদের জারিকৃত ও রোমান সিনেটে অনুমোদিত আইন। এ জন্য ফ্রান্সের বিচার ব্যবস্থা রোমান বিচার ব্যবস্থা থেকে উদ্ভূত বিচার ব্যবস্থা হিসেবে পরিগণিত। ইংল্যান্ডের মতো ফ্রান্সও এক সময় রোম সাম্রাজ্যের অধীনস্থ ছিল। কমন ল' বিচার ব্যবস্থা যেমন ইংল্যান্ড ছাড়াও বৃটিশ সাম্রাজ্যের অধীন এশিয়া, আফ্রিকা ও আমেরিকা মহাদেশের অনেক ঔপনিবেশিক দেশে প্রচলিত ও প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং সেসব উপনিবেশ বৃটিশ সাম্রাজ্যের অধীনতা ছিন্ন করে স্বাধীন হলেও সেখানে আজো কমন ল' বিচার ব্যবস্থা বহাল আছে। তেমনি সিভিল ল' বিচার ব্যবস্থা ফ্রান্সসহ ইউরোপের অনেক দেশে, রাশিয়া, ল্যাটিন আমেরিকা ও আফ্রিকার অনেক দেশে প্রচলিত, প্রতিষ্ঠিত এবং আজো বহাল আছে। ল্যাটিন আমেরিকা ও আফ্রিকায় ফ্রান্স, স্পেন, পর্তুগাল প্রভৃতি সাম্রাজ্যের যেসব উপনিবেশ ছিল এসব দেশের সাম্রাজ্যবাদীরা তাদের দেশের প্রচলিত সিভিল ল' বিচার ব্যবস্থার সেখানে প্রচলন ও প্রতিষ্ঠা করেছিল। ল্যাটিন আমেরিকা ও আফ্রিকার সাবেক উপনিবেশগুলো পরবর্তীকালে স্বাধীনতা লাভ করলেও এখনো সেসব দেশে সিভিল ল' বিচার ব্যবস্থা বহাল রয়েছে। নেপোলিয়ানের আইন সংকলনের পর ১৯৫৯ সালে ফরাসি প্রেসিডেন্ট দ্য গল সাবেক আইন ও বিচার ব্যবস্থার ব্যাপক সংস্কার করেন। পরবর্তীতে ফরাসি আইন ও বিচার ব্যবস্থার আমূল সংস্কার করা হয়েছে।[৪৭] ফরাসি বিচার ব্যবস্থার আরেকটি বৈশিষ্ট্য হচ্ছে সাধারণ বিচারআদালত ও প্রশাসনিক বিচারআদালত নামে দু'টি ভিন্ন প্রকৃতির আদালতের সহাবস্থান। ১৭৯০ সালের ১৬-২৪ আগস্ট প্রণীত সাংবিধানিক আইনের ১৩ অনুচ্ছেদ মতে বিচারিক আদালতের একটি পৃথক ব্যবস্থা যা প্রশাসনিক কাজ থেকে আলাদা হবে এবং বিচারপতিরা প্রশাসনিক কাজে হস্তক্ষেপ করলে চাকরিচ্যুত হবেন। এতে সাধারণ আদালত প্রশাসনের কাজে হস্তক্ষেপ করতে না পারায় প্রশাসনের অবৈধ হস্তক্ষেপে ক্ষতিগ্রস্ত নাগরিকদের স্বার্থ রক্ষায় প্রশাসনিক আদালত সৃষ্টি করা হয়। সাধারণ আদালতে দেওয়ানি, ফৌজদারি, ব্যবসা-বাণিজ্য, শিল্পবিরোধ, সামাজিক নিরাপত্তা, পারিবারিক বিরোধ ইত্যাদির বিচার এবং প্রশাসনিক বিচারাদালতে সরকার বা সরকারি কর্মচারীর বিরুদ্ধে কোন নাগরিকের অভিযোগের প্রতিকার করা হয়। অভিযোগটি সাধারণ আদালত নাকি দেওয়ানি আদালতের এখতিয়ারাধীন হবে সে সম্পর্কে বিরোধ দেখা দিলে ত্রিব্যুনাল দ্য কঁ ফ্লি নামের ৮ সদস্যের আদালতের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত। এ আদালতের প্রধান হলেন ফ্রান্সের বিচারমন্ত্রী। ৮ জন বিচারপতি সমভাবে বিভক্ত হলে বিচারমন্ত্রী মামলার বিচারআদালত নির্ধারিত করতে ভোটাধিকার প্রয়োগ করে থাকেন।

www.pathagar.com

বর্তমানে ফ্রান্সের আদালতগুলোর নাম, স্তর ও শ্রেণীবিন্যাস হচ্ছে ত্রিব্যুনাল পুখ অঁফঁ (কিশোর আদালত), ত্রিব্যুনাল দে দোয়েখ (রাজস্ব আদালত), ত্রিব্যুনাল দে বা খুখো (কৃষি পত্তন আদালত), কঁসেই দপ্রুধম (শ্রম আদালত), ত্রিব্যুনাল দ্য কমেখস (বাণিজ্যিক আদালত), ত্রিব্যুনাল দাঁসতঁস (অধস্তন দেওয়ানি আদালত), ত্রিব্যুনাল দ্য গ্রঁদ আঁসতঁস (উর্ধ্বতন দেওয়ানি আদালত), কুপ দাপেল (আপিল আদালত), ত্রিব্যুনাল দ্য পোলিশ (অধস্তন ফৌজদারি আদালত), ত্রিবুনাল দ্য কখেক সিওনেল (মধ্যবর্তী ফৌজদারি আদালত), কুখ দাসিজ (উর্ধ্বতন ফৌজদারি আদালত), ত্রিব্যুনাল আদমিনিসত্রাতিফ (প্রশাসনিক আদালত), কুখ ও আর্দসিত্রাতিফ দাপেল (প্রশাসনিক আপিল আদালত), ল্য কঁসেই দেতা (প্রশাসনিক রাষ্ট্রীয় পরিষদ) এবং ত্রিব্যুনাল দ্য কঁফ্লি কুখ দ্য কাসার্সিয় তথা সুপ্রিম কোর্ট।[৪৮] ফ্রান্সে আইনজীবীদের কাউকে বিচারপতি, সরকারি কৌসুলি বা বিচার বিভাগীয় কর্মকর্তা পদে নিয়োগ দেয়া হয় না। একজন ছাত্রকে সিদ্ধান্ত নিতে হয় সে ভবিষ্যতে আইন পেশা, বিচারক, সরকারি কৌসুলি অথবা বিচার মন্ত্রণালয় কোনটাতে যোগ দেবে। আইন পেশায় গেলে প্রচলিত আইনের ৬টি বিশেষ বিষয়ের একটিতে অধ্যয়ন করতে হয়। এ ৬টি বিষয়ের মধ্যে আভোকা বা সাধারণ আদালতে ওকালতি করার শিক্ষা, আভুয়ে বা সলিসিটর হওয়ার শিক্ষা এবং আগখিয়ে বা বাণিজ্যিক আদালতে ওকালতি করার শিক্ষা। ১৯৭২ সাল থেকে এগুলোকে ক্রমান্বয়ে একত্রিত করা হয়েছে। অপর ৩টি বিষয়ের মধ্যে রয়েছে নেতাখি বা দলিলপত্র মুসাবিদা ও রেজিস্ট্রি সংক্রান্ত শিক্ষা, ফিদুসিয়েখ বা কর আইন সম্পর্কিত ওকালতি শিক্ষা ও কঁসইয়ে জুখিদিখ বা আইন সম্পর্কে সাধারণ পরামর্শ দান করা সংক্রান্ত শিক্ষা। আর আইনের সেসব ছাত্র ভবিষ্যতে বিচারপতি, সরকারি কৌসুলি বা আইন মন্ত্রণালয়ের অধীনে চাকরি করার সিদ্ধান্ত নেয় তাদের শিক্ষাক্রমও ভিন্ন। ফ্রান্সের সংবিধানের ৬৪ অনুচ্ছেদে বিচারপতিদের ইচ্ছামতো চাকুরিচ্যুত করা যায় না এবং ৬৫ অনুচ্ছেদ মতে কঁসেই সুপেখিয়ুখ দ্যলা মজিসত্রাতুখ বা প্রধান বিচার পরিষদের ওপর উচ্চপদস্থ বিচারপতিদের নিযুক্ত করার ও তাদের বিরুদ্ধে অসদাচরণের অভিযোগ তদন্ত করে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেয়ার ক্ষমতা ন্যস্ত করা হয়েছে। এই পরিষদের প্রধান হলেন ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট।[৪৯] ফ্রান্সের বিচার ব্যবস্থা ইংরেজদের ফৌজদারি বিচার ব্যবস্থার মতো প্রতিদ্বন্দ্বিতার মাধ্যমে অভিযোগের প্রমাণমূলক নয়, বরং তা তদন্তমূলক। ইংরেজদের বিচার ব্যবস্থায় বিচারে দোষী সাব্যস্ত হওয়ার আগ পর্যন্ত আসামীকে নির্দোষ বলে গণ্য করা হয়। কিন্তু ফ্রান্সের বিচার ব্যবস্থায় আদালতে দোষ খণ্ডন করার আগ পর্যন্ত আসামীকে দোষী হিসেবে গণ্য করা হয়। আসামী অভিযোগ অস্বীকার করলে তার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য-প্রমাণ হাজির করে দোষী সাব্যস্ত করতে হয় বাদীপক্ষকে। আসামী দোষ স্বীকার করলে বাদীকে আর সাক্ষ্য-প্রমাণ হাজির করতে হয় না। তবে এই বিচার ব্যবস্থায় আসামীকে দোষ স্বীকারে বাধ্য করা যায় না। আসামী তার বিরুদ্ধে আনা সাক্ষীকে জেরা করতে পারেন এবং নিজেকে জামিনে মুক্তি দেয়ার আবেদনও করতে

www.pathagar.com

পারেন। বিচারক প্রথমে সাধারণত উভয়পক্ষের মধ্যে নিরপেক্ষ সালিশের ভূমিকা পালন করেন। তবে বিচারক ন্যায়বিচারের স্বার্থে সাক্ষীকে প্রশ্ন করতে এমন কি সত্য উদঘাটনের জন্য ঘটনার তদন্তও করতে পারেন। তদন্ত কাজে তিনি বিভিন্ন পন্থা অবলম্বন করতে পারেন। ফ্রান্সে ফৌজদারি মামলার প্রাথমিক তদন্ত করতে পারেন তদন্তকারী বিচারপতি। পুলিশ কোন অপরাধের তদন্তকালে আদালতে অভিযোগ দায়েরের প্রয়োজন হলে জুঝদাঁত্রকসিঁয় কাছে প্রাথমিক অভিযোগ দায়ের করেন। তখন জুঝদাঁত্রকসিঁয় সাক্ষ্য গ্রহণ, সাক্ষীদের জেরা, যে কোন চিঠিপত্র খোলা ও টেলিফোনে আড়িপাতাসহ আসামিকে অনির্দিষ্টকাল জেলে আটক রাখার আদেশ দিতে পারেন। তবে ১৯৭৪ সাল থেকে ছোটখাটো অপরাধে অভিযুক্তদের ৬ মাস পর্যন্ত জেলে আটক রাখার সময়সীমা নির্ধারণ করা হয়েছে। তিনি প্রয়োজনবোধে কোন বিশেষজ্ঞকে ঘটনার অনুসন্ধানী তদন্ত রিপোর্ট দেয়ার আদেশ দিতে পারেন। পরস্পরবিরোধী সাক্ষ্য পাওয়া গেলে উভয়পক্ষের সাক্ষীদের মুখোমুখি হাজির করে জেরার নিয়ম চালু থাকায় ফ্রান্সে মিথ্যা সাক্ষ্যদানের প্রবণতা প্রায় নির্মূল হয়ে গেছে।[৫০] ফ্রান্সের বিচার ব্যবস্থার আরেকটি বৈশিষ্ট্য হলো সেদেশের উচ্চ আদালত অধস্তন আদালতের ওপর বাধ্যকর নজির আইন সৃষ্টি করতে পারেন না। ফ্রান্সের সিভিল কোডের ৪ অনুচ্ছেদ মতে, বিচারপতিরা মামলা বিচারে আইনের নীরবতা, অপ্রতুলতা বা অস্পষ্টতার অজুহাতে কাউকে ন্যায়বিচার থেকে বঞ্চিত করতে পারেন না। আইনে কোন ত্রুটি থাকলে ন্যায়বিচারের স্বার্থে বিচারআদালতের একটি পন্থা উদ্ভাবন করতে হয়। ফ্রান্সে উচ্চআদালতের বিচারপতিরা সব অধস্তন আদালতের ওপর বাধ্যকর নজির আইন সৃষ্টি করতে না পারলেও তাদের রায়ে তারা যেসব নতুন নিয়ম সৃষ্টি করেন তা সাধারণত অধস্তন আদালতগুলো মামলা বিচারের সময় মেনে চলেন।[৫১]

এদিকে ২০০৫ সালের নভেম্বর মাসে টানা দু'সপ্তাহ ধরে দাঙ্গা, ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগের ঘটনায় প্রমাণ হয়েছে ফ্রান্সের বিচার ব্যবস্থা একবিংশ শতাব্দীর উপযোগী করতে আরো সংস্কার করতে হবে। প্যারিস থেকে বার্তা সংস্থা রয়টার্স পরিবেশিত সংবাদের বরাত দিয়ে দৈনিক খবরপত্রের ২০০৫ সালের ১২ নভেম্বরের এক রিপোর্টে বলা হয়, ফ্রান্সে দু'সপ্তাহ ধরে বিরাজমান টান টান উত্তেজনা দৃশ্যত কমে আসায় শুক্রবার দেশটি দীর্ঘ ছুটিতে প্রবেশ করেছে। তবে একজন পুলিশ প্রধান জানান, তিনি আশঙ্কা করছেন দাঙ্গাকারীরা সম্ভবত প্যারিসের কেন্দ্রস্থলে বিক্ষোভের পরিকল্পনা করছে। এদিকে ফরাসি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেছেন, এই দাঙ্গায় প্রমাণিত হয়েছে যে, আমাদের ৪০ বছরের রাজনীতি ব্যর্থ হয়েছে। এদিকে পুলিশ জানায়, টানা ১৫ রাত ধরে সহিংসতার প্রেক্ষাপটে পুলিশ শুক্রবার স্থানীয় সময় রাত ১টার দিকে ১শ একজন দাঙ্গাকারীকে গ্রেফতার করেছে এবং দাঙ্গাবাজরা ২শ' ৭টি গাড়ি পুড়িয়ে দিয়েছে।

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সারকোজী অব্যাহতভাবে রুক্ষ বাক্যবাণ চালিয়ে যাচ্ছেন। বৃহস্পতিবার তিনি দাঙ্গাকারীদের 'ঠগ' ও 'বাজে লোক' বলে উল্লেখ করেন। একই সময়ে তিনি বলেন,

www.pathagar.com

সহিংসতা থেকে ফ্রান্সের কঠিন শিক্ষা নেয়া উচিত। সারকোজ ফ্রান্সের টেলিভিশন-২ কে বলেন, 'গত ৪০ বছর যাবৎ আমরা এদেশে যে রাজনীতির চর্চা করেছি, তা থেকে আমাদের বেরিয়ে আসা দরকার এবং এটা প্রামাণিত হয়েছে যে, আমাদের রাজনীতি ব্যর্থ হয়েছে। অর্থমন্ত্রী থিয়ারী ব্রেটন বলেন, অধিক কর্মসংস্থানের জন্য তিনি বহু প্রস্তাব তৈরি করেছেন। ফরাসি অর্থমন্ত্রী বৃটেনের ফাইনানসিয়াল টাইমস পত্রিকাকে বলেন, 'গত বিশ বছরে আমরা উপ-শহরগুলোতে অনেক টাকা ঢেলেছি। কিন্তু তা যথেষ্ট নয়।'

পুলিশের তাড়া খেয়ে দুই যুবকের দুর্ঘটনাবশত মৃত্যুর পর ফ্রান্সে দাঙ্গা শুরু হয় এবং দরিদ্র উত্তর আফ্রিকান ও আফ্রিকান বংশোদ্ভূতরা এ দাঙ্গাকে বিক্ষোভে রূপ দেয়। প্রেসিডেন্ট জ্যাক শিরাক বৃহস্পতিবার বলেন, বর্ণবাদ, দারিদ্র্য, বেকারত্ব ও সুযোগ-সুবিধার অভাবে জর্জরিত উপ-শহরগুলোর সমস্যা সমাধানের জন্য সরকার উদ্যোগ নিয়েছে। শিরাক বলেন, 'আমাদের শহরগুলোর আশপাশ সুবিধাবঞ্চিত নাগরিকরা যেসব সীমাহীন সমস্যা মোকাবেলা করছে সেগুলো খুব দ্রুততার সাথে ও দৃঢ়ভাবে আমাদের সমাধান করতে হবে।'

রাশিয়া

জার শাসন রাশিয়ার শাসন ইতিহাসের এক কঠিন অধ্যায়। এ সময় রাশিয়ায় রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও ধর্মীয় অবস্থায় চরম বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয়। শোষিত হয় নিম্নশ্রেণীর জনগণ। এই জারতন্ত্র ছিল স্বৈরতান্ত্রিক। এই শাসকদের মধ্যে অধিকাংশই ছিল স্বৈরশাসক। 'রাশিয়ার স্বঘোষিত জার চতুর্থ ইভান (১৫৩০-৮৪) ইতিহাসে কুখ্যাত হয়ে আছেন 'আইভান দ্য টেরিবল' নামে। ১৫৫৫ সালে মস্কোতে সেন্ট বাসিলস চার্চ নির্মাণের নির্দেশ দেন তিনি। নির্মাণ শেষে অত্যন্ত খুশি হয়ে দুই স্থপতি পস্তনিক ও বারমাকে অন্ধ করে দেন তিনি এই যুক্তিতে যে, ওই চার্চের চেয়ে সুন্দর কোন স্থাপত্য নির্মাণে তারা যেন ব্যর্থ হন।'[৫২] তবে জার দ্বিতীয় আলেকজান্ডার ছিলেন এর ব্যতিক্রম। তিনি ছিলেন সর্ববিষয়ে উদারনীতির পৃষ্ঠপোষক। স্বদেশের প্রতি তার ছিল গভীর প্রেম।

১৮৫৫ সালে জার প্রথম নিকোলাসের মৃত্যুর পর তার দ্বিতীয় পুত্র জার দ্বিতীয় আলেকজান্ডার রাশিয়ার সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি যখন শাসনভার গ্রহণ করেন তখন দেশে বিরাজ করছিল এক সংকটময় পরিস্থিতি। তিনি লক্ষ্য করেন, তার পিতা নিকোলাসের অত্যাচারী শাসনব্যবস্থার ফলে জনগণের মাঝে তীব্র অসন্তোষের সৃষ্টি হয়েছে। তাই পরিস্থিতির চাপে তিনি জনকল্যাণমুখী প্রশাসনিক সংস্কার সাধনের উদ্যোগ নেন।

শাসনভার গ্রহণ করেই তিনি কতিপয় উদারনৈতিক নির্দেশ জারি করেন। তিনি রাজদ্রোহের অপরাধে পিতা নিকোলাস কর্তৃক নির্বাসিত 'ডিসেমব্রিস্ট' আন্দোলনকারীদের মুক্তি প্রদান করেন। সংবাদপত্রের উপর থেকে বিধিনিষেধ অনেকটা হ্রাস করেন। জনগণকে বিদেশ ভ্রমণের সুযোগ করে দেন এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর উপর থেকে সরকারি নিয়ন্ত্রণ হ্রাস করেন।

www.pathagar.com

দ্বিতীয় আলেকজান্ডারের শ্রেষ্ঠ কীর্তি হল, রাশিয়ার বহু প্রাচীন ঘৃণ্য সার্ফ (ভূমিদাস) প্রথার বিলোপ সাধন। রাশিয়ায় সার্ফদের মোট সংখ্যা ছিল সাড়ে চার কোটি। এর মধ্যে প্রায় তিন কোটি জারের অধীনে এবং বাকি অংশ যাজক ও অভিজাতদের অধীনে কাজ করত। কুখ্যাত প্রথার ফলে রাশিয়ার লাখ লাখ ক্রীতদাসের জীবন অভিশপ্ত হয়ে পড়েছিল। ফলে ১৮২৮ সাল থেকে ১৮৫৫ সাল পর্যন্ত সময়ে প্রতিবছর গড়ে ২৩ বার কৃষক বিদ্রোহ ঘটে। দ্বিতীয় আলেকজান্ডারই সর্বপ্রথম এ সুপ্রাচীন সামাজিক ব্যাধি দূর করার দৃঢ় পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। তিনি ১৮৫৮ সালে জারের জমিতে কর্মরত সকল ভূমিদাসদের মুক্তিদান করেন। ১৮৬১ সালে তিনি একটি 'মুক্তি নির্দেশ' আইন ঘোষণা করে ভূমিদাসদের বা সার্ফ সম্প্রদায়কে মুক্তি প্রদান করেন। এ মুক্তির নির্দেশ অনুসারে সার্ফ সম্প্রদায় দাসত্ব থেকে মুক্ত এবং নাগরিক অধিকার লাভ করে। সার্ফগণ জমিদারগণের নিকট থেকে জমি ক্রয় করার অধিকার লাভ করে। ভূমিদাস কর্তৃক চাষকৃত জমির অর্ধাংশ রাষ্ট্র ক্রয় করে তা ভূমিদাসকে দিবে এবং ভূমিদাস ৪৯ বছরব্যাপী দীর্ঘমেয়াদী কিস্তিতে জমির মূল্য পরিশোধ করবে। ক্রয়লব্ধ জমি 'মীর' নামক সমবায় সংস্থার অধীনে থাকবে বলে স্থির হয়।

দ্বিতীয় আলেকজান্ডার বিচার বিভাগেরও গুরুত্বপূর্ণ সংস্কার সাধন করেন। শাসন বিভাগকে বিচার বিভাগ থেকে পৃথক করা হয়। বিচারকগণ যাতে নির্ভয়ে বিচারকার্য পরিচালনা করতে পারেন তজ্জন্য তাদের স্বাধীনতা দেয়া হয়। বিচারকদের চাকরির স্থায়িত্ব বিধান, প্রকাশ্য বিচার ও জুরির সাহায্যে বিচারের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। দেওয়ানী ও ফৌজদারি আইন বিধিরও পরিবর্তন সাধন করা হয়। সাধারণ মামলা বিচারের জন্য 'জাস্টিস অব দি পিস' নামে স্থানীয় সাধারণ জনসাধারণ কর্তৃক নির্বাচিত একশ্রেণীর বিচারক নিয়োগ করা হয়।

১৮৬৪ সালে দ্বিতীয় আলেকজান্ডার 'জেমসটভো' নামক আইনের মাধ্যমে স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন ব্যবস্থার সংস্কার সাধন করেন। এ আইন অনুযায়ী সমস্ত রাশিয়াকে ৩৬০টি জেলায় বিভক্ত করে প্রত্যেক জেলায় 'জেমসটভো' নামে একটি করে কাউন্সিল ও কর্মপরিষদ গঠন করা হয়। স্থানীয় সকল শ্রেণীর প্রতিনিধি নিয়ে এ কাউন্সিল গঠিত হয়। একইভাবে ৩৪টি প্রদেশে জেলা কাউন্সিল কর্তৃক নির্বাচিত সদস্য নিয়ে প্রাদেশিক কাউন্সিল গঠিত হয়। প্রতিবছর একবার করে জেলা ও প্রাদেশিক কাউন্সিলের অধিবেশন বসবে এরূপ করা হয়। স্থানীয় প্রতিনিধিদের হাতে নির্বাচন, রাস্তা, প্রাথমিক শিক্ষা, জনস্বাস্থ্য প্রভৃতির তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব দেয়া হয়।

১৮৭০ সাল পর্যন্ত শহরগুলো অনুন্নত অবস্থায় ছিল। অতঃপর শহরের বিবিধ উন্নয়নমূলক কার্যাদি সম্পাদনের জন্য প্রতি শহরের করদাতাগণ কর্তৃক নির্বাচিত পরিষদ গঠিত হয়। জেলা ও প্রাদেশিক কাউন্সিলগুলোর ন্যায় শহরের কাউন্সিল বা পরিষদগুলো সরকারি কর্তৃত্বাধীনে রাখার ব্যবস্থা করা হয়। এছাড়া জার দ্বিতীয় আলেকজান্ডার মাধ্যমিক শিক্ষাব্যবস্থাকে উন্নততর করেন। নারী শিক্ষার জন্য প্রায় ৬০০-৭০০ উচ্চ

www.pathagar.com

বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। অর্থনৈতিক ব্যবস্থার উন্নতিকল্পে তিনি শিল্প, ব্যবসা-বাণিজ্যে উৎসাহ দান করেন। তিনি দেশের প্রতিরক্ষা বাহিনীরও সংস্কার সাধন করেন এবং রেলপথের বিস্তার করেন।

কিন্তু জার দ্বিতীয় আলেকজান্ডার তার সংস্কারকার্যে প্রাথমিক সাফল্য অর্জন করলেও পরবর্তী পর্যায়ে তাকে ব্যর্থতা বরণ করতে হয়। অবশ্য এর পেছনে অনেকগুলো কারণও ছিল। এ কারণগুলোর মধ্যে কয়েকটি নিম্নরূপ– তার শাসনামলে দেশে শিক্ষিত ও মধ্যবিত্ত শ্রেণী না থাকায় রাশিয়ায় রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক উন্নতি ঘটেনি।

রাশিয়ার বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায় ক্রমশ উপলব্ধি করেন যে, দেশের সার্বিক মঙ্গলের জন্য শাসনতান্ত্রিক কাঠামোর আমূল পরিবর্তন প্রয়োজন। তখন রাশিয়াতে 'নিহিলিজম' নামে একটি জনপ্রিয় প্রগতিশীল ও সামাজিক আন্দোলন শুরু হয়।

সার্ফদের মুক্তি দেয়া হয়েছিল সত্য কিন্তু বাস্তবক্ষেত্রে তাদের এ মুক্তি অর্থনৈতিক অবস্থার বিশেষ পরিবর্তন সাধন করতে পারেনি। সার্ফদের জমিদারদের হাত থেকে উদ্ধার করে 'মীর'-এর কর্তৃত্বাধীনে রাখা হয়। এ ব্যবস্থায় সার্ফগণ নানাবিধ করভারে জর্জরিত হতে থাকে। ফলে সার্ফগণ তাদের মুক্তি সম্পর্কে নিরাশ হয়ে পড়ে।

দ্বিতীয় আলেকজান্ডারের প্রবর্তিত বিচার ও শাসন বিভাগীয় সংস্কারসমূহ কার্যকর করার মতো প্রয়োজনীয় দক্ষ ও সৎ কর্মচারী তার ছিল না। ফলে তার সংস্কারসমূহ ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। তাছাড়া তার সংস্কার প্রচেষ্টার মূলে কোন মৌলিক আদর্শ ছিল না। রাজত্বের শুরুতে তিনি উদারনৈতিক মনোভাব দেখালেও পরবর্তীকালে সংস্কারকামী মনোভাব রক্ষা করতে ব্যর্থ হন। ... তিনি উদারনীতি দ্বারা পোল্যান্ডকে স্বায়ত্বশাসন প্রদান করেন। কিন্তু পোলগণ সম্পূর্ণ স্বাধীন হবার জন্য তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে। এ বিদ্রোহ ও নিহিলিস্ট আন্দোলন দমন করতে গিয়ে আলেকজান্ডার দমননীতি গ্রহণ করেন। দমননীতির অংশ হিসেবে সংবাদপত্র ও শিক্ষাকেন্দ্রগুলোর স্বাধীনতা হরণ করা হয়, ব্যক্তি স্বাধীনতা বিলুপ্ত হয় এবং রাশিয়ার কুখ্যাত গোয়েন্দা বিভাগ পুনরুজ্জীবিত করা হয়। অবশেষে জার দ্বিতীয় আলেকজান্ডারের সংস্কারকার্যগুলো ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়।[৫৩]

সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক বিচার ব্যবস্থা : মেহনতি মানুষের শোষণ মুক্তির জন্যে কার্লমার্ক্স ও ফ্রেডরিক এঙ্গেলসের সমাজতন্ত্রের আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে লেনিনের নেতৃত্বে রাশিয়ায় ১৯১৭ সালের অক্টোবরে যে বিপ্লব অনুষ্ঠিত হয় ঐ বিপ্লবের পর জার শাসিত রাশিয়া ও রুশ সাম্রাজ্যের শাসনাধীন দেশগুলো নিয়ে সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রসংঘ বা ইউনিয়ন অব সোভিয়েত সোসালিস্ট রিপাবলিকস সংক্ষেপে ইউএসএসআর গঠিত হয়েছিল। ১৯৯১ সালের শেষ ভাগে ইয়েলৎসিনের নেতৃত্বে গণবিপ্লবের মাধ্যমে পতন হওয়ার পূর্বে ৭৪ বছর পর্যন্ত সোভিয়েত ইউনিয়নে সমাজতন্ত্র ও সাম্যবাদ প্রতিষ্ঠার পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা হয়েছে। ব্যক্তিগত সম্পত্তি বিলোপ করার লক্ষ্যে উৎপাদনের

www.pathagar.com

সর্বপ্রকার উপকরণ ব্যক্তিগত মালিকানা থেকে ঐ দেশে সরকারের নিয়ন্ত্রণে আনা হয়েছিল এবং সমাজতন্ত্র ও সাম্যবাদ প্রতিষ্ঠা করার জন্য সোভিয়েত ইউনিয়নে এক নতুন বিচার ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল।

কমরেডস কোর্ট

সোভিয়েত ইউনিয়নের সর্বনিম্ন বিচার প্রতিষ্ঠান ছিল কমরেডস কোর্ট নামক আদালত। প্রত্যেক গ্রামে, কৃষি খামারে, বহুতল ও বহু স্বয়ংসম্পূর্ণ কক্ষবিশিষ্ট আবাসন, কারখানা বা অন্য কর্মস্থলের অধিবাসী বা কর্মচারীদের মধ্যে কোনো বিরোধ উপস্থিত হলে প্রতিটি মামলা নিষ্পত্তি করার জন্যে ঐ স্থানের অধিবাসী বা কর্মচারীদের মধ্য হতে বিচারপতি নির্বাচন করে অস্থায়ী ভিত্তিতে কমরেডস কোর্ট গঠন করা হতো। যে এলাকা বা কর্মস্থলের মামলা বিচার করার জন্য কমরেডস কোর্ট গঠন করা হতো ঐ এলাকা বা কর্মস্থলের সকল অধিবাসী বা কর্মচারী বিচারপতি নির্বাচনে অংশগ্রহণ করতে পারতেন। এ আদালত ছোটখাট চুরির প্রথম অপরাধ, ছোটখাট গুন্ডামি, ছোটখাট ফটকাবাজারি, কর্মস্থলে শৃঙ্খলাভঙ্গ বা যৌথ আবাসনের আচরণনীতি ভঙ্গ করা জনিত অপরাধের বিচার করে আসামীকে তিরস্কার, সামান্য পরিমাণ জরিমানা, ক্ষমা প্রার্থনার আদেশ দান করতে বা অপরাধীকে প্রকাশ্যে নিন্দাজ্ঞাপন করতে আদেশ দিতে পারতেন। তাছাড়া ঐ আদালত অপরাধীকে যৌথ আবাসন থেকে উচ্ছেদ করতে বা তাকে তার বর্তমান চাকরি থেকে কম বেতনের চাকরিতে বদলি করতে বা ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিকে আসামি কর্তৃক ৫০ রুবল পর্যন্ত ক্ষতিপূরণ দিতে প্রস্তাব করতেও পারতেন। ঐ আদালতের রায় তার উপরিস্থ পিপলস কোর্ট বা গণআদালত কর্তৃক বাতিলযোগ্য ছিল। তবে বিশেষ কমরেডস কোর্ট ফটকাবাজারি, গুন্ডামি, ইচ্ছাকৃতভাবে বেকার থাকা বা অসমাজতান্ত্রিক আচরণের অভিযোগে কারো বিচার করে তাকে তার আবাসন থেকে বহিষ্কারের আদেশ দিলে ঐ রায় পিপলস কোর্ট বাতিল করতে পারত না। তবে স্থানীয় সোভিয়েত বা আইন পরিষদ তা বাতিল করতে পারত। এখানে উল্লেখ্য যে, পৃথিবীতে একমাত্র সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রসংঘেই সকল নাগরিকের পূর্ণ কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা হয়েছিল এবং সেদেশে ইচ্ছাকৃতভাবে বেকার থাকা অপরাধ ছিল।[৫৪]

পিপলস কোর্ট বা গণ আদালত: সোভিয়েত ইউনিয়নে কমরেডস কোর্টের উপরিস্থ আদালত ছিল পিপলস কোর্ট বা গণআদালত। প্রত্যেক নগর ও জেলায় গণআদালত ছিল। এ আদালতে কম গুরুত্বপূর্ণ যাবতীয় আদি দেওয়ানি ও ফৌজদারি মামলার বিচার করা হতো। এ আদালত কমরেডস কোর্টের রায়ের বিরুদ্ধে আপিল ও বিচার করত। যে কোন সোভিয়েত রিপাবলিক বা স্বায়ত্তশাসিত রিপাবলিক, প্রদেশ বা অঞ্চলের মন্ত্রিসভা কোনো জেলা বা নগরে কয়টি গণআদালত প্রতিষ্ঠিত হবে তার সংখ্যা নির্ধারণ করত। গণআদালতের বিচারপতিকে চেয়ারম্যান বলা হতো। তাকে ঐ জেলা বা নগরের অধিবাসীগণ পাঁচ বছরের জন্যে নির্বাচিত করত। গণআদালতে চেয়ারম্যান ভিন্ন দু'জন

www.pathagar.com

এসেসর বা মামলার গুণাগুণ নির্ধারণকারী সদস্য ছিল। এসেসরদের ঐ জেলা বা নগরের অধিবাসীগণ দু'বছরের জন্যে নির্বাচিত করত। সাধারণত, চেয়ারম্যান নির্বাচিত হতেন আইনজ্ঞদের মধ্য হতে, যদিও তদ্রুপ কোনো আইনগত বাধ্যবাধকতা ছিল না। আর এসেসরগণ নির্বাচিত হতেন সাধারণ নাগরিকদের মধ্য হতে। এসেসরগণ পাশ্চাত্যের অন্য দেশের মতো জুরি ছিলেন না এবং সোভিয়েত বিচার ব্যবস্থায় কখনও জুরি প্রথা প্রয়োগ করা হয়নি। এসেসরগণ সাধারণত বছরে দু'সপ্তাহ যাবত বিচার কাজে অংশগ্রহণ করতেন। তারা বিচারপতি চেয়ারম্যানের মতো সক্ষমতার অধিকারী ছিলেন। মামলার ঘটনা ও আইনের প্রশ্নে তারা ভোট দিতে পারতেন এবং তাদের মধ্যে মতদ্বৈততা হলে সংখ্যাগরিষ্ঠের মতানুযায়ী মামলার রায় ঘোষণা করা হতো।[৫৫]

মধ্যবর্তী আদালত: পিপলস কোর্টের বা গণ আদালতের উপরিস্থ আদালত ছিল যে কোনো সোভিয়েত রাষ্ট্রের সুপ্রিম কোর্টের অধীনস্থ মধ্যবর্তী আদালত। এ আদালতসমূহ সোভিয়েত ইউনিয়ন রিপাবলিক, স্বায়ত্তশাসিত রিপাবলিক, স্বায়ত্তশাসিত প্রদেশ, স্বায়ত্তশাসিত অঞ্চল ও অঞ্চলে বিভক্ত ছিল। ঐ সকল অঞ্চল, স্বায়ত্তশাসিত অঞ্চল, প্রদেশ বা রিপাবলিকের প্রত্যেকটিতে একটি আদালত ছিল এবং ঐ সকল আদালতের মধ্যে পর্যায়ক্রমে একটি অপরটির অধীনস্থ ছিল। অঞ্চল, স্বায়ত্তশাসিত অঞ্চল, প্রদেশ বা রিপাবলিকের সোভিয়েত বা আইনসভা পাঁচ বছরের জন্য পাঁচজন পেশাজীবী বিচারপতি ও এসেসরদের নির্বাচনের মাধ্যমে একটি তালিকা প্রস্তুত করতেন। ঐ বিচারপতিদের প্রধানকে চেয়ারম্যান, উপপ্রধানকে ডেপুটি চেয়ারম্যান ও অপর তিনজনকে সদস্য বলা হতো এবং এসেসরদের পিপলস এসেসর বলা হতো। ঐ সকল মধ্যবর্তী আদালতে রাষ্ট্রদ্রোহিতা, রাষ্ট্রীয় সম্পত্তি লুটপাট করা প্রভৃতি গুরুতর অপরাধ ও রাষ্ট্র ও রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান বা জনসাধারণের কোনো প্রতিষ্ঠানের আর্থিক ক্ষতি সংক্রান্ত দেওয়ানি মামলার বিচার করা হতো। তাছাড়া এসকল আদালত গণ-আদালতের রায়ের বিরুদ্ধে আনীত আপিল মামলার বিচার করত।[৫৬]

ইউনিয়ন রিপাবলিক সুপ্রিম কোর্ট: মধ্যবর্তী আদালতের উপরের স্তরে প্রত্যেক সোভিয়েত রিপাবলিকের সর্বোচ্চ আদালত ছিল ইউনিয়ন রিপাবলিকের সুপ্রিম কোর্ট। ইউনিয়ন রিপাবলিকের সুপ্রিম সোভিয়েত বা আইনসভা ঐ আদালতের পাঁচজন পেশাজীবী বিচারপতি ও অগুণতি সংখ্যক এসেসরদের পাঁচ বছরের জন্যে নির্বাচিত করতেন। ঐ সকল আদালতে আদি ও আপিল মামলার বিচার করা হতো। ঐ আদালত যে কোনো অধস্তন আদালতের রায় বাতিল করে দিতে পারতেন। এবং ঐ আদালতের আপিল মামলার সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত ও বাধ্যকর ছিল। ঐ আদালতে প্রকিউরেতর জেনারেল বা ইউএসএসআর সুপ্রিম কোর্টের চেয়ারম্যান বা অন্য কোনো অধস্তন কর্মকর্তা নিম্ন আদালতের যে কোনো রায়ের বিরুদ্ধে আপত্তি জানাতে পারতেন। ঐ আদালতে খুব গুরুতর অপরাধের ও গুরুত্বপূর্ণ আদি দেওয়ানি মামলার বিচারও করা হতো। সাধারণত

www.pathagar.com

উচ্চপদস্থ সরকারি কর্মকর্তাদের আইন ও নিয়ম ভঙ্গ করে রাষ্ট্রীয় সম্পত্তির ক্ষতিসাধন করার জন্যেই তাদের বিরুদ্ধে ঐ আদালতে আদি ফৌজদারি ও দেওয়ানি মামলার বিচার করা হতো। ঐ আদালতের রায় চূড়ান্ত ছিল।[৫৭]

ইউএসএসআর সুপ্রিম কোর্ট: ইউনিয়ন রিপাবলিক সুপ্রিম কোর্টের উপরের স্তরে ছিল ইউএসএসআর-এর সর্বোচ্চ আদালত অর্থাৎ ইউএসএসআর সুপ্রিম কোর্ট। ঐ আদালতের একজন চেয়ারম্যান, দু'জন ভাইস চেয়ারম্যান, নয়জন পেশাজীবী বিচারপতি সদস্য এবং বিশজন পিপলস এসেসরকে পাঁচ বছরের জন্য ইউএসএসআর-এর সুপ্রিম সোভিয়েত নির্বাচিত করত। তাছাড়া ইউএসএসআর-এর পনেরটি ইউনিয়ন রিপাবলিকের সুপ্রিম কোর্টের চেয়ারম্যানগণ পদাধিকার বলে ঐ আদালতের বিচারপতি সদস্য ছিলেন। ঐ আদালতের নিয়মিত সদস্যগণ তিনটি তালিকা বা কলেজিয়ায় বিভক্ত হয়ে দেওয়ানি, ফৌজদারি ও সামরিক বিষয়ে বিচার করত। প্রতি তিন মাস অন্তর একবার ঐ আদালতের বিচারপতিগণ পূর্ণ অধিবেশনে বা প্লেনামে বসে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সিদ্ধান্ত দিতেন। যে কোনো মামলা বিচারের সময় ঐ আদালতের চেয়ারম্যান সভাপতিত্ব করতে পারতেন এবং তিনি ঐ আদালতের প্লেনামে আপত্তি দেয়ার অজুহাতে নিম্ন আদালত থেকে যে কোনো মামলা উঠিয়ে আনতে পারতেন এবং ঐ প্লেনামে প্রকিউরেতর জেনারেলকে অবশ্যই যোগদান করতে হতো। ইউএসএস আর সুপ্রিম কোর্ট প্রধানত আপিল ও পর্যালোচনাকারী আদালত ছিল। এ আদালতের বিচার ব্যবস্থা সম্পর্কিত আইনের খসড়া সম্পর্কে সুপ্রিম সোভিয়েতের নিকট সুপারিশ করার ক্ষমতা ছিল। ঐ আদালতের কোনো আইনের ব্যাখ্যা করার ক্ষমতা না থাকলেও ঐ আদালত সুপ্রিম সোভিয়েতের প্রেসিডিয়ামের নিকট কোনো আইনের ব্যাখ্যা গ্রহণ করার জন্যে পরামর্শ দিতে পারত। জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ আদি দেওয়ানি ও ফৌজদারি মামলার বিচার করতেন ঐ আদালতের দেওয়ানি বা ফৌজদারি কলেজিয়ার একজন বিচারপতি সদস্যকে চেয়ারম্যান ও দু'জন এসেসরকে সদস্য করে গঠিত আদালত। তাছাড়া ঐ আদালতে আপিল ও পর্যালোচনা করার সময় সব বিচারপতি-সদস্যগণই অংশ গ্রহণ করতেন।

সামরিক কলেজিয়া গুরুত্বপূর্ণ রাষ্ট্রদ্রোহিতা, গুপ্তচর বৃত্তি ও রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে অন্যান্য গুরুতর অপরাধের বিচার করতেন। ঐ কলেজিয়া অধস্তন সামরিক আদালতের রায়ের বিরুদ্ধে আনিত আপিল বা আপত্তিকর বিচার করতেন। ইউএসএসআর-এর সুপ্রিম কোর্টের রায় চূড়ান্ত ও বাধ্যকর ছিল। তবে তার বিরুদ্ধে সুপ্রিম সোভিয়েতের প্রেসিডিয়ামে আপিল করার বিধান ছিল। সোভিয়েত ইউনিয়নের সকল স্তরের বিচারপতিদের জনসাধারণ বা আইনসভা নির্দিষ্ট সময়ের জন্য নির্বাচিত করলেও জনসাধারণ বা আইনসভা তাদের কার্যকালের মধ্যে তাদের প্রত্যাহার করারও বিধান ছিল।[৫৮]

www.pathagar.com

প্রকিউরেতর জেনারেল

সোভিয়েত ইউনিয়নে মন্ত্রণালয় ও অন্য প্রতিষ্ঠানগুলো আইনসম্মতভাবে কাজ করছে কিনা তা দেখার জন্য এবং সরকারের সকল স্তরে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সরকারি আইনের সঠিক ব্যাখ্যা ও প্রয়োগ হচ্ছে কিনা তা দেখার জন্যে বিচার বিভাগের উপরে সুপ্রিম সোভিয়েত পাঁচ বছরের জন্যে প্রকিউরেতর জেনারেল পদে কমিউনিস্ট দলের একজন বিশ্বস্ত সদস্যকে নিযুক্ত করতেন। প্রকিউরেতর জেনারেল প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে ইউনিয়ন রিপাবলিক ও স্বায়ত্তশাসিত রিপাবলিক, প্রদেশ ও স্বায়ত্তশাসিত অঞ্চলের প্রকিউরেতরদের পাঁচ বছরের জন্যে নিযুক্ত করতেন। প্রকিউরেতর জেনারেল দেশের মন্ত্রণালয় ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠান, সকল কর্মচারী ও নাগরিকগণ কঠোরভাবে আইন মান্য করছে কিনা তা দেখতেন, গুপ্ত পুলিশ (কেজিবি) সাধারণ পুলিশের মতো অপরাধ সম্পর্কে তদন্ত করে অপরাধীকে বিচারের জন্য আদালতে সোপর্দ করতে পারতেন, ওমবুডসমেনের মতো যে কোনো কর্তৃপক্ষ ও কর্মকর্তার বিরুদ্ধে অভিযোগ তদন্ত করে দেখতে ও প্রতিকারের ব্যবস্থা করতে পারতেন, যে কোন দেওয়ানি মামলায় যে কোনো এক পক্ষের পক্ষে মামলা আদালতে হাজির হতে পারতেন, ফৌজদারি মামলার বিচার সমাপ্ত হওয়ার দু'বছরের মধ্যে তার বিরুদ্ধে আপত্তি জানানোর মাধ্যমে ঐ মামলার পুনঃবিচারের ব্যবস্থা করতে পারতেন এবং ইউএসএসআর সুপ্রিম কোর্টের পূর্ণ আদালতের (প্লেনাম) রায়সহ যে কোনো নিম্ন আদালতের রায় পর্যালোচনা করতে পারতেন। অধিকন্তু প্রকিউরেতর জেনারেল ইউএসএসআর-এর সুপ্রিম কোর্টের পূর্ণ অধিবেশনে (প্লেনাম) রায়সহ যে কোন নিম্ন আদালতের রায় পর্যালোচনা করতে পারতেন। সংক্ষেপে প্রকিউরেসি (প্রতিউরাতুরা) যেমন যে কাউকে বিচারার্থে আদালতে সোপর্দ করতে পারতেন তেমনি যে কোন সরকারি সংস্থা, সরকারি কর্মচারী এবং সাধারণ নাগরিক আইন সঠিকভাবে প্রয়োগ ও মান্য করছেন কিনা তার তত্ত্বাবধানও করতেন।[৫৯]

১৯৯১ সালে সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার পতনের পর সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রসংঘের প্রত্যেকটি অঙ্গরাষ্ট্র বর্তমানে স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছে। এ রাষ্ট্রসংঘের বৃহত্তম অঙ্গরাষ্ট্র রাশিয়া বর্তমানে একটি গণতান্ত্রিক যুক্তরাষ্ট্র বা ফেডারেশন। ৭৪ বছরের সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র ব্যবস্থাকে রাতারাতি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র ব্যবস্থায় পরিবর্তিত করা সম্ভব না হলেও সেদেশে জনসাধারণের ভোটে রাষ্ট্রপতি ও আইনসভার সদস্যগণ নির্বাচিত হচ্ছেন, একাধিক রাজনৈতিক দল নির্বাচনে অংশগ্রহণ করছে এবং দেশের সংবিধান জনসাধারণের ভোটে অনুমোদিত হয়েছে।

গণতান্ত্রিক রাশিয়ার বিচার ব্যবস্থা

কমিউনিস্টদের শাসনামলে সেদেশে স্বাধীন বিচার ব্যবস্থা ছিল না। তারা আদালতকে সামাজিক নিয়ন্ত্রণের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করত। তখন বিচারপতিগণ মামলার রায় ঘোষণা করার পূর্বে কমিউনিস্ট দলের স্থানীয় কর্মকর্তার সাথে মামলা সম্পর্কে টেলিফোনে

www.pathagar.com

আলাপ করে রায় ঘোষণা করতেন। বর্তমানে সেদেশের বিচারপতিগণ সেদেশের সংবিধানের আলোকে স্বাধীনভাবে বিচার কাজ সম্পাদন করার চেষ্টা করছেন। ১৯৯৫ সালের আগস্ট মাসে সেদেশের আইনসভা একটি আইনের খসড়া পাস করে বিচারপতিদের ও জুরিদের কাজে অবৈধ হস্তক্ষেপ বন্ধ করার বিধান করেছেন। ১৯৯৪ সালে সেদেশের আদালতগুলো অবৈধভাবে বিনা বিচারে আটক ৬৫,০০০ জন বন্দির মধ্যে ১৩,০০০ বন্দিকে মুক্তির আদেশ দিয়েছেন। ১৯১৮ সালে জুরিপ্রথা বাতিল করার পর বর্তমানে সে দেশে ধীরে ধীরে জুরিপ্রথা পুনঃপ্রবর্তন করা হচ্ছে। সেদেশের নয়টি অঞ্চলে ১৯৯৪ সালে তিনশ'র বেশি মামলা জুরির সাহায্যে বিচার করা হয়েছে এবং শিগগিরই আরো বারটি অঞ্চলে জুরির সাহায্যে মামলা বিচার করা হবে। সেদেশে বর্তমানে আইনজীবীর সংখ্যা লোকসংখ্যার অনুপাতে খুব কম। সেদেশের সরকারি অভিশংসক খুব শক্তিশালী। যদিও দেশের সংবিধানে ও ১৯৯৪ সালের আইনের খসড়ায় আদালতকে আসামীর বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারির ক্ষমতা দেয়া হয়েছে, তবু এখনও সেদেশের সরকারি অভিশংসক পূর্বের মতো আদালতের পরোয়ানা ছাড়াই আসামীকে গ্রেফতার করার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারেন।

সেদেশের ফেডারেল নিরাপত্তা বিভাগ এখনো আদালতের পরোয়ানা ছাড়া যে কোন আবাসস্থল, ব্যবসাস্থল ও সরকারি কার্যালয় তল্লাশী করতে পারে এবং পুলিশ আসামীর বিরুদ্ধে আদালতে অভিযোগ পেশ না করে তাকে ৪৮ ঘণ্টা পর্যন্ত আটক রাখতে পারে। এরূপ আটককাল ৩০ দিন পর্যন্ত বর্ধিত করে সেদেশের রাষ্ট্রপতি একটি আদেশ জারি করা সত্ত্বেও তা সংবিধানবিরোধী বিধায় ৪৮ ঘণ্টার বেশি আটকাধীন বন্দিদের আদালত মুক্তি দেয়ার আদেশ দিচ্ছেন।

১৯৯৪ সালে সেদেশের সুপ্রিম কোর্ট এ মর্মে এক রায় ঘোষণা করেছেন যে, কোনো সন্দেহভাজন ব্যক্তির টেলিফোনে আড়িপাততে হলে বা তার চিঠি খুলতে হলে নিরাপত্তা বিভাগের কর্মচারীদের আদালতের পূর্ব অনুমতি গ্রহণ করতে হবে। স্বাভাবিক গণতন্ত্রে পরিণত হতে হলে রাশিয়ায় একটি নিরপেক্ষ ও শ্রদ্ধাভাজন আইন ব্যবস্থা গড়ে তোলা প্রয়োজন। সেদেশে অপরাধ ও দুর্নীতির ছড়াছড়ি সত্ত্বেও ধীরে ধীরে আইন সংস্কার হচ্ছে এবং নিরপেক্ষ ও উদার মতাবলম্বী বিচারপতিগণ ও আইন সংস্কারপন্থীগণ সেদেশের সরকারের স্বৈরাচারনীতির বিরুদ্ধে অবস্থান গ্রহণ করছে।[৬০]

আমেরিকা

ক্রিস্টোফার কলম্বাসের আমেরিকা আবিষ্কার নানা কারণেই বহুল আলোচিত একটি ঘটনা। তিনি ১৪৯২ সালের ১২ অক্টোবর আবিষ্কার করেন আমেরিকা। আল সালভাডোরে পৌছান তিনি। তবে তিনি মনে করেছিলেন ইন্ডিয়ায় পৌছে গেছেন। তিনি ছিলেন

www.pathagar.com

তখনকার ইউরোপের সবচেয়ে শক্তিশালী সাম্রাজ্য স্পেনের প্রতিনিধি। পরবর্তীকালে আমেরিগো ভেসপুচি নামক অপর নাবিক জানান, কলম্বাস আবিষ্কৃত ভূখণ্ডটি ইন্ডিয়া নয়। সেটি একটি নতুন মহাদেশ। ১৫৩৮ সালে তার নামানুসারে মহাদেশটির নাম রাখা হয় আমেরিকা। পর্তুগালের এই প্রতিনিধি আমেরিকায় পৌছেছিলেন ১৫০২ সালে।

কলম্বাসের আমেরিকা আবিষ্কারের অনেক আগে থেকেই ভূখণ্ডটি ছিল অত্যন্ত সমৃদ্ধ। এশিয়া থেকে ১০ হাজার থেকে ৩০ হাজার বছর আগে মানুষ সম্ভবত সেখানে পাড়ি জমিয়েছিল বেরিং প্রণালী অতিক্রম করে। কলম্বাসের সময় সেখানে রেড ইন্ডিয়ানের সংখ্যা ছিল আনুমানিক ১৫ লাখ। প্রায় দুই হাজার ভাষায় কথা বলতো তারা। রেড ইন্ডিয়ানরা হয়তো বৈষয়িক দিক থেকে সমৃদ্ধ ছিল না কিন্তু তারা নিজেরা নিজেদের নিয়ে সন্তুষ্টই ছিল। ইনকা, মায়া, আজটেক নামে কয়েকটি সভ্যতা গড়ে তুললেও তারা সাধারণভাবে ছিল উপজাতীয় ধরনের। বন জঙ্গলেই তারা বসবাস করতো। শিকার করাই ছিল প্রধান অবলম্বন। প্রকৃতির স্বাধীন সন্তান হিসেবেই তারা জীবন কাটিয়ে দিচ্ছিল। কিন্তু সেই সহজ জীবনকে শেষ করে দিয়েছিল 'সভ্য' হিসেবে পরিচয় দানকারী ইউরোপীয়ানরা। তারা ইউরোপীয়ান জীবন দর্শন, ধর্ম, সংস্কৃতি গ্রহণে বাধ্য করার জন্য সেখানকার লাখ লাখ আদিবাসীকে পুরোপুরি ধ্বংসের দিকে ঠেলে দিয়েছিল। খোদ কলম্বাসের কথাতেই পাওয়া যায়, রেড ইন্ডিয়ানদের সহজ-সরল জীবন পদ্ধতির পরিচয়। তিনি স্পেনের রাজা ও রানীকে লিখেছিলেন, 'এখনকার মানুষজন এতোই সুবোধ ও শান্তিপ্রিয় যে মহামান্য সম্রাটের নিকট আমি শপথ করে বলতে পারি সারা দুনিয়ায় এদের চেয়ে ভাল কোন জাতি আর নেই। প্রতিবেশিদের তারা একান্ত আপনজনের মতোই ভালবাসে। তাদের আচার-আচরণও খুবই ভদ্র এবং তাদের মিষ্টিমুখে সব সময়ে হাসি লেগেই থাকে। এটা অবশ্য ঠিক যে তারা বেশ কিছুটা নগ্ন, তবু তাদের ব্যবহার ও সৌন্দর্যবোধ অতীব প্রশংসাযোগ্য।[৬১] অথচ শুধু কলম্বাস নয়, ক্রমাগত নতুন বিশ্বে পদার্পণের পর ইউরোপীয়ানদের বাঁচিয়েই রেখেছিল রেড ইন্ডিয়ানরা। পানির উৎস, তামা, স্বর্ণ, রৌপ্য ইত্যাদির খনি আবিষ্কারে আদিবাসীদের সাহায্য নিতে হতো। তাছাড়া তুষারপাদুকা তৈরি, স্লেজগাড়ি নির্মাণ, ডিঙি নৌকায় পারাপার ইউরোপিয়ানদের কাছে অজানা ছিল। সবচেয়ে বড় কথা খাদ্য ছিল ইউরোপিয়ানদের প্রতি দেয়া রেড ইন্ডিয়ানদের প্রধান উপহার। ভুট্টা, নাশপাতি, চীনাবাদাম, গোলমরিচ, আনারস, আলু, স্কোয়াশ, টমেটো ইত্যাদি তারা প্রথমবারের মতো দেখে সেখানে গিয়ে। তামাক পর্যন্ত ইউরোপিয়ানদের জানা ছিল না। ইউরোপিয়ানদের নিকট থেকেও অনেককিছু শিখেছিল রেড ইন্ডিয়ানরা। ধাতব যন্ত্রপাতি, বন্দুক, ঘোড়া যাদের সাথে রেড ইন্ডিয়ানদের পরিচিতি ঘটে ইউরোপিয়ানদের মাধ্যমেই। রেড ইন্ডিয়ানদের জমি জমা, খনিজসম্পদ ইত্যাদি দখল করার জন্য তারা প্রতারণা শঠতা, জোর-জবরদস্তি সম্ভাব্য সবকিছুই করেছে।

www.pathagar.com

কলম্বাসকে স্থানীয় রেড ইন্ডিয়ানরা বেশ ভালভাবেই আশ্রয় দিয়েছিল। তাকে খাবার ও আশ্রয় দিয়ে বাঁচিয়ে তুলেছিল। বিনিময়ে তিনি ১০ জন রেড ইন্ডিয়ানকে ধরে নিয়ে যান স্পেনিশ সম্রাটের পদযুগলে উপহার দেয়ার জন্য। তাদের জাহাজেই খ্রিস্টধর্মে দীক্ষা দেয়া হয়েছিল। আদিবাসী এইসব জনগোষ্ঠী খ্রিষ্টধর্ম প্রচারেও বাধা দেয়নি। কিন্তু 'কিম্ভুতকিমাকার' পোশাকে সজ্জিত ইউরোপীয়ানরা যখন স্বর্ণ ও অন্যান্য মূল্যবান ধাতুর সন্ধানে পুরো দ্বীপ চষে ফেলতে লাগলো, তখন তারা বাধা দিতে বাধ্য হলো। স্পেনীয়রা তার বদলা নিল গ্রামের পর গ্রাম লুট করে, জ্বালিয়ে পুড়িয়ে শেষ করে দিয়ে। হাজার হাজার নারী, পুরুষ, শিশুকে অপহরণ করে জাহাজের খোলে পুরে দাস হিসেবে বিক্রি করে দিল। কলম্বাসের সেখানে পা রাখার মাত্র ১৩ বছরের মধ্যে একটি সমৃদ্ধ জনপদ পুরোপুরি নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল। পরবর্তীকালের ইতিহাস আরো মারাত্মক ভয়াবহ ও বীভৎস। পঙ্গপালের মতো একের পর এক ইউরোপীয় অভিযাত্রী দল আমেরিকার পথে পাড়ি দিতে থাকলো। তারা গ্রামের পর গ্রাম লুট করতে লাগলো। তাদের সব ঘরবাড়ি আগুনে পুড়িয়ে দিল। নারী ও শিশুদেরকে দাস হিসেবে বিক্রি করে দিতে লাগলো। কোন কোন স্থানে তাদের জন্য সংরক্ষিত এলাকার সৃষ্টি করা হলো। উর্বরা জমিগুলো কেড়ে নিয়ে লবণাক্ত অনুর্বর জমিতে রেড ইন্ডিয়ানদের থাকতে বাধ্য করা হলো। সেইসব সংরক্ষিত এলাকা থেকে তাদের কোন অবস্থাতেই বের হওয়ার সুযোগ ছিল না। স্বর্ণ ও খনিজ সম্পদ আবিষ্কারের পর সেই বীভৎসতা আরো বেড়ে গেল।

১৬৫০ সালে সেখানে ৫২ হাজার অভিবাসী ছিল। ১৭০০ সাল নাগাদ তা বেড়ে আড়াই লাখে দাঁড়ায়। ১৭৬০ সালে শ্বেতাঙ্গ অভিবাসীর সংখ্যা দাঁড়ায় ১৭ লাখে। ১৮২০ থেকে ১৮৬০ সাল পর্যন্ত প্রায় ৫০ লাখ ইউরোপিয়ান আমেরিকায় গমন করে। এদের প্রতি ১০ জনের মধ্যে ৯ জনই ছিল ইংল্যান্ড, আয়ারল্যান্ড ও জার্মানির। কৃষিখামার এবং খনিতে কাজ করার জন্য আফ্রিকা থেকে কৃষ্ণাঙ্গদের দাস শ্রমিক হিসেবে আমদানি করা হতে থাকে। ১৭০০ সাল পর্যন্ত আফ্রিকা থেকে দাস আমদানি কমই ছিল। কিন্তু ১৮ শতকের মধ্যভাগে তা দ্রুতগতিতে বাড়তে থাকে। ১৬৭০ সালে ভার্জিনিয়াতে দাসের সংখ্যা ছিল দুই হাজার থেকে ২৩ হাজার। ১৭১৫ সালে তা বেড়ে দাঁড়ায় দেড় লাখে। অন্যদিকে সাউথ ক্যারোলিনায় ১৭০০ সালে দাসের সংখ্যা ছিল আড়াই হাজার। ১৭৬৫ সালে তা দাঁড়ায় ৮০ থেকে ৯০ হাজারে। এমনকি অনেক স্থানে শ্বেতাঙ্গ প্রভুদের চেয়ে কৃষ্ণাঙ্গ দাসের সংখ্যা ছিল বেশি। খোদ মার্কিন জাতির পিতা জর্জ ওয়াশিংটনও এদিক থেকে পিছিয়ে ছিলেন না। তিনি নিজে রেড ইন্ডিয়ানদের উচ্ছেদ করে নিজের খামারের আয়তন ক্রমাগত সম্প্রসারণ করে যাচ্ছিলেন মিসিসিপি নদী বরাবর ঔপনিবেশ সম্প্রসারণের চেয়ে আনন্দদায়ক কাজ তার আর কিছু ছিল না। এ কাজে তার সফলতায় মুগ্ধ হয়ে সেখানকার শ্বেতাঙ্গরা ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনে তাকে নেতা করে।[৬২]

www.pathagar.com

যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধানে এই বিধান রয়েছে যে, আমেরিকান জনগণ চাইলে দেশে ভাগাভাগির পদ্ধতিতে সরকার পরিচালিত হতে পারে। যাতে দেশের জনগণকে নির্যাতনমূলক ব্যবস্থার শিকার না হতে হয়, তার জন্যে যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠাতা পুরুষগণ মনে করেছিলেন যে, সরকারের নির্বাহী আইনবিষয়ক ও বিচার বিভাগীয় শাখাসমূহে পৃথক পৃথকভাবে ক্ষমতা বণ্টনের নীতি সরকার পরিচালনার পদ্ধতির অঙ্গ হিসেবে থাকতে পারে।

গ্রেট বৃটেনের ঔপনিবেশিক প্রাধান্যের দরুন আমেরিকাবাসীর যে অভিজ্ঞতা হয়, তারই ফলশ্রুতি হচ্ছে ক্ষমতা বণ্টনের এই চিন্তাধারা। জাতির প্রতিষ্ঠাতা পুরুষগণ এটা চাননি যে, লন্ডনের একতরফা ক্ষমতা প্রয়োগের স্থলে নতুন স্বাধীনতা প্রাপ্ত দেশের ওয়াশিংটন সরকার একই ধরনের একতরফা ক্ষমতা প্রয়োগের অধিকারী হবেন। জাতির প্রথম প্রেসিডেন্ট জর্জ ওয়াশিংটন তার বিদায়ী বক্তব্যে বলেন, 'একইভাবে এটা জরুরি যে, একটি স্বাধীন দেশে যারা চিন্তা-ভাবনা করে থাকেন, তাদেরকে এটা হুঁশিয়ার করে দিতে হবে যে, যারা শাসনের দায়িত্ব নিয়েছেন, তারা যেন শাসনতান্ত্রিক গণ্ডির মধ্যে নিজেদেরকে আবদ্ধ রাখেন, তারা যেন এক বিভাগ কর্তৃক অন্য বিভাগের উপর কর্তৃত্ব করতে যাওয়ার অবস্থা সৃষ্টি না হতে দেন।'[৬৩]

আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের বিচার ব্যবস্থা

আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের ১৩টি অঙ্গরাজ্য স্বাধীনতা অর্জনের জন্য জর্জ ওয়াশিংটনের নেতৃত্বে যুদ্ধের মাধ্যমে বৃটিশ সাম্রাজ্যের অধীনতা থেকে মুক্ত হয়ে একটি স্বাধীন ও সার্বভৌম প্রজাতান্ত্রিক যুক্তরাষ্ট্র হিসেবে গড়ে উঠেছিল। পরবর্তীকালে সেদেশের অঙ্গ রাজ্যের সংখ্যা ৫০টিতে দাঁড়ায়। সেদেশে ফেডারেল আইন অনুযায়ী বিচার করেন লিখিত সংবিধানের ৩নং অনুচ্ছেদের অধীনে প্রতিষ্ঠিত ফেডারেল ডিস্ট্রিক্ট কোর্ট, ফেডারেল (সার্কিট) কোর্ট অব এপিল এবং সুপ্রিম কোর্ট। তা ছাড়া মিলিটারি কোর্ট, কমার্স কোর্ট, কোর্ট অব কাস্টমস, টেক্স কোর্ট, কোর্ট অব ক্লেইমস, কোর্ট অব মিলিটারি এপিলস, টেরিটরিয়াল কোর্ট, কোর্ট অব কাস্টমস এন্ড পেটেন্ট এপিলস প্রভৃতি আদালত সেদেশের আইনসভা কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত আদালত এবং এসকল আদালতও ফেডারেল আইন অনুযায়ী মামলা বিচার করেন। আর সেদেশের অঙ্গরাজ্যগুলোতে বিভিন্ন নিম্ন ও উচ্চ আদালত অঙ্গরাজ্যের আইন অনুযায়ী মামলা বিচার করে থাকেন। সেদেশে দুটি সমান্তরাল বিচার ব্যবস্থা বিদ্যমান থাকলেও আইন ও সংবিধানের প্রশ্নে অঙ্গরাজ্য ও ফেডারেল আদালতগুলোর শীর্ষ আদালত হিসেবে ফেডারেল সুপ্রিমকোর্ট চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত দেয়ার অধিকারী।

বিচার পদ্ধতি : আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের আদালতে মামলার পক্ষগণই বিচারের জন্য মামলা দায়ের করে থাকেন। দেওয়ানি মামলা যেমন ক্ষতিগ্রস্ত পক্ষ আদালতে দায়ের করে বিচারপ্রার্থী হয় তেমনি রাষ্ট্রের পক্ষে ফৌজদারি মামলা দায়ের করেন সরকারি

www.pathagar.com

অভিশংসক। কোনো অপরাধ সংঘটিত হলে পুলিশ আসামীকে গ্রেফতার করে আদালতে হাজির করে এবং তদন্তে সংগৃহীত তথ্য-প্রমাণ সরকারি অভিশংসকের নিকট উপস্থিত করে। তিনি ঐ সকল তথ্য প্রমাণ বিবেচনা করে আসামির বিরুদ্ধে আদালতে অভিযোগ করবেন কিনা বা অভিযোগ করলে কি অভিযোগ করবেন তা নির্ধারণ করেন। পুলিশের সংগৃহিত তথ্য প্রমাণের ভিত্তিতে আসামিকে আদালতে বিচারে দোষী সাব্যস্ত করা যাবে মনে করলেই তিনি তার বিরুদ্ধে আদালতে অভিযোগ দায়ের করার সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকেন। সেদেশে পুলিশ ফৌজদারি মামলার তদন্ত করে সরাসরি আদালতে আসামির বিরুদ্ধে অভিযোগ আনতে পারে না। সরকারি অভিশংসক আসামির বিরুদ্ধে আদালতে অপরাধের অভিযোগ দায়ের করলে আসামি অভিযোগ স্বীকার করে শাস্তি হ্রাস করার প্রার্থনা করতে পারে বা অভিযোগ অস্বীকার করে বিচার প্রার্থনা করতে পারে। সাধারণত আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে সরকারি অভিশংসক ও আসামির উকিলের মধ্যে আলাপ আলোচনার মাধ্যমে স্থির হয় আসামি অভিযোগ স্বীকার করবে কিনা। আসামির আইনজীবী আসামির বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ ও সংগৃহিত তথ্য-প্রমাণ পরীক্ষা করে যদি দেখেন যে মামলা বিচার হলে আসামির আদালতে অভিযোগ থেকে অব্যাহতি লাভ করার সম্ভাবনা কম তখন তিনি আসামির সম্মতি নিয়ে সরকারি অভিশংসকের নিকট প্রস্তাব দেন আসামির বিরুদ্ধে গুরুতর অপরাধের পরিবর্তে কম গুরুতর অপরাধের অভিযোগ আনলে বা আদালতে তার শাস্তি হ্রাস করার সুপারিশ করলে আসামি তার দোষ স্বীকার করতে পারে। সরকারি অভিশংসক আদালতে সাক্ষ্য-প্রমাণ হাজির করার ঝামেলা এড়াবার জন্যে অনেক সময় আসামি পক্ষের প্রস্তাবে রাজি হন। এ পদ্ধতিকে প্লিবার্গেন বা আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে দোষ স্বীকারের পদ্ধতি বলা হয়। এ পদ্ধতিতে আদালতে ফৌজদারি মামলার বিচার সংক্ষিপ্ত করতে বিচারকের কোন হাত নেই। কিন্তু আদি দেওয়ানি মামলায় আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের বিচারপতি মামলা বিচারপূর্ব বৈঠকের মাধ্যমে পক্ষদের আইনজীবীদের আদালতের বাইরে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে আপোষে মামলা নিষ্পত্তি করতে উৎসাহিত করতে পারেন। কোনো কোনো অঙ্গরাজ্যে এ পদ্ধতি কতিপয় দেওয়ানি মামলায় অবশ্য পালনীয় এবং কোনো কোনো অঙ্গরাজ্যে এ পদ্ধতি অবলম্বন করার কোনো বাধ্যবাধকতা নেই এবং তা বিচারকের ইচ্ছাধীন বিষয়।[৬৪]

আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের ফেডারেল ডিস্ট্রিক্ট কোর্টে বিচারাধীন দেওয়ানি মামলা দায়ের, জবাব দাখিল ইত্যাদি প্রাথমিক কাজগুলো সমাপ্ত হওয়ার পর মামলা বিচারের জন্য তালিকাভুক্তির পূর্বে বিচারপতি উভয় পক্ষের আইনজীবীকে নির্দিষ্ট তারিখে মামলার কাগজপত্রসহ তার নিকট হাজির হতে নোটিশ পাঠান। আইনজীবীকে তার মক্কেলের মামলার নথির সঙ্গে তার মক্কেলের পক্ষের সাক্ষীদের তালিকা ও দলিলপত্রের তালিকাও সঙ্গে আনতে বলা হয়। এ নোটিশ পাওয়ার পর উভয় পক্ষের সাক্ষীদের সঙ্গে আলাপ করে এবং নিজ নিজ পক্ষের দলিল পরীক্ষা করে মামলা সম্পর্কে ভালভাবে জেনে বিচারকের নিকট বিচারপূর্ব বৈঠকে হাজির হন। ওই বৈঠকে প্রত্যেক পক্ষের আইনজীবী

www.pathagar.com

অপর পক্ষের আইনজীবীর নিকট তার মক্কেলের পক্ষের সাক্ষীদের ও দলিলের তালিকা প্রদান করেন। এভাবে একপক্ষের আইনজীবী মামলায় অপর পক্ষের বক্তব্যের গুণাগুণ বুঝতে পারেন। বিচারকের খাস কামরায় অনুষ্ঠিত এ বৈঠকে বিচারপতি প্রত্যেক পক্ষের আইনজীবীকে তার মতে মামলার বিচার্য বিষয় কি তা সংক্ষেপে বলার সুযোগ দেন। উভয় পক্ষের বক্তব্য শুনে বিচারপতি তখন বিচার্য বিষয় নির্ধারণ করেন এবং এক পক্ষের আইনজীবীকে অপর পক্ষের আইনজীবীর নিকট তার কোন প্রশ্ন করার থাকলে তা করার সুযোগ দেন। এরপর বিচারপতি মামলা বিচারের তারিখ ধার্য করেন। বিচারপতি উভয়পক্ষের আইনজীবীকে মামলা আপস নিষ্পত্তি সম্ভাবনা আছে কি না তা জিজ্ঞাসা করেন। আইনজীবীরা যদি আপস নিষ্পত্তি সম্পর্কে আলাপ-আলোচনা আরম্ভ করেন এবং তারা কোন বিষয়ে একমত হতে না পারলে তখন বিচারপতি ওই বিষয়ে তার সম্ভাব্য মত প্রকাশ করেন। এরপর আইনজীবীরা মামলা শুনানির ধার্য তারিখের বিশ দিন পূর্বে স্ব স্ব পক্ষের সাক্ষীদের বক্তব্যের সংক্ষিপ্ত সার আদালতে দাখিল করেন। অনেক মামলায় সাথে সাথে পক্ষদের দলিলপত্রের তালিকাসহ দলিলের অনুলিপিও আদালতে দাখিল করা হয়। মামলা শুনানি ধার্য তারিখের দু'সপ্তাহ পূর্বে পুনরায় বিচারপতি ও পক্ষদের আইনজীবীদের দ্বিতীয় বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। এ বৈঠকেও পূর্বের মতো একপক্ষের আইনজীবী অপর পক্ষের আইনজীবীকে প্রশ্ন করতে পারে এবং মামলা নিষ্পত্তি করার জন্য আলাপ-আলোচনা করতে পারে এবং বিচারপতি উভয় পক্ষকে আপসে পৌছাতে কোন বিষয়ে তার সম্ভাব্য মতামত দিয়ে সাহায্য করতে পারেন। সাধারণত ক্ষতিপূরণের মামলার পক্ষরা ক্ষতিপূরণের পরিমাণ ঠিক করতে না পারলে বিচারপতি সে সম্পর্কে তার সম্ভাব্য মতামত ব্যক্ত করতে পারেন। তবে বিচারকের তদ্রূপ মতামত পক্ষরা মানতে বাধ্য নয়।[৬৫]

আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের ফেডারেল অধস্তন আদালতে জুরি প্রথার মাধ্যমে ফৌজদারি ও দেওয়ানি মামলার বিচার করা হয়ে থাকে। তবে কোন কোন মামলায় জুরি ছাড়াও বিচার করা হয়। ফৌজদারি মামলায় জুরির অভিমত বিচারকের ওপর বাধ্যকর, কিন্তু দেওয়ানি মামলায় বিচারপতি যুক্তিসঙ্গত কারণে জুরির অভিমত অগ্রাহ্য করতে পারেন। আর যুক্তরাষ্ট্রের কোন কোন অঙ্গরাজ্যে জুরি প্রথা প্রয়োগ করা হয়, কোন কোন অঙ্গরাজ্যে জুরি ব্যতীত বিচারপতিই মামলা বিচার করেন। যে অঙ্গরাজ্যে জুরি প্রথা আছে সে রাজ্যের আদালতে এবং ফেডারেল আদালতে আসামীকে বিচারের জন্য সোপর্দ করার পূর্বে গ্র্যান্ড জুরি তার বিরুদ্ধে সংগৃহীত সাক্ষ্য প্রমাণ প্রাথমিকভাবে বিবেচনা করে বিচারে সোপর্দ করার আদেশ দিলেই আদালত আসামীর বিচার করতে পারেন।[৬৬]

পৌর আদালত : জাস্টিস অব দি পিসের বা ম্যাজিস্ট্রেটের আদালতের উপরের স্তরে অনেক অঙ্গরাজ্যের আদালত হচ্ছে মিউনিসিপ্যাল কোর্ট বা পৌর আদালত। এ সকল আদালতকে ট্রাফিক কোর্ট, সিটি কোর্ট, নাইট কোর্ট ও পুলিশ কোর্ট বলেও অভিহিত করা হয়। আইন সম্পর্কে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের মধ্য থেকে পৌর আদালতের বিচারপতিদের

www.pathagar.com

নির্বাচন বা নির্বাহী আদেশ দ্বারা নিযুক্ত করা হয়। এ সকল আদালত দেওয়ানি বিষয়ে ৫০০ থেকে ১০০০ ডলার পর্যন্ত দাবির মামলা বিচার করে থাকেন। ফৌজদারি মামলা বিচার করার ক্ষমতা দেয়া হলে তখন এ সকল আদালতে সামান্য অপরাধের বিচার করা হয়। এ সকল আদালতে অল্প খরচে দ্রুত মামলা নিষ্পত্তি করা হয়। পৌর আদালত সামান্য অপরাধের মামলা বিচার করা ছাড়া গুরুতর অপরাধের অভিযোগের প্রাথমিক তদন্ত করে সাক্ষ্য-প্রমাণ পাওয়া গেলে আসামিকে খালাস দিতে পারেন। আর যে সকল অঙ্গরাজ্যে গ্রান্ড জুরিপ্রথা আছে সেখানে সরকারি অভিশংসক আদালতে গ্রান্ড জুরির নিকট সাক্ষ্য-প্রমাণ হাজির করেন। গ্রান্ড জুরির শুনানি গোপনে অনুষ্ঠিত হয়। গ্রান্ড জুরি আসামিকে উপরিস্থ আদালতে বিচারের জন্য সোপর্দ করার অনুমতি দিলে সরকারি অভিশংসক ঐ আসামির বিরুদ্ধে উপরিস্থ আদালতে অপরাধের অভিযোগ আনেন।[৬৭]

কাউন্টি কোর্ট ও অন্যান্য নিম্নআদালত : প্রত্যেক কাউন্টিতে অবস্থিত উপরিস্থ আদালত দেওয়ানি ও ফৌজদারি মামলা বিচার করা ছাড়াও নিম্ন আদালতের রায়ের বিরুদ্ধে আনীত আপিলের বিচারও করেন। পৌর আদালতের উপরের স্তরে আছে দেওয়ানি ও ফৌজদারি মামলা বিচারের জন্য কাউন্টি কোর্ট বা জেলা আদালত। এ স্তরে অন্য আদালত হচ্ছে দেওয়ানি বিষয়ে কমন প্লিস আদালত, ফৌজদারি বিষয়ে অয়ার এন্ড টার্মিনার আদালত ও কোয়ার্টার সেশন আদালত, ইচ্ছাপত্র বিষয়ে প্রবেট আদালত, কিশোর অপরাধীদের বিচারের জন্য কিশোর আদালত, পারিবারিক বিষয়ে বিচারের জন্য ডোমেস্টিক রিলেশন্স ও সারোগেট আদালত, ইকুইটি বিষয়ে বিচার করার জন্য চ্যান্সারি ও ইকুইটি আদালত। এ স্তরের আদালতগুলো সাধারণত বেশি দাবির দেওয়ানি মোকদ্দমা ও গুরুতর অপরাধ সংক্রান্ত ফৌজদারি মামলা বিচার করেন। আদালতের বিচারপতিগণ কোনো কোনো অঙ্গরাজ্যে নির্বাচনের মাধ্যমে ও কোনো কোনো অঙ্গরাজ্যে নির্বাহী কর্তৃপক্ষের আদেশের মাধ্যমে নিযুক্ত হন। কাউন্টি কোর্টে সাধারণত তদনিম্ন আদালতে বিচার্য দেওয়ানি মামলা ব্যতীত তদুর্ধ্ব দাবির যে কোনো দেওয়ানি মামলা, নিম্ন আদালতে বিচার্য সামান্য অপরাধের মামলা ব্যতীত অন্য সকল গুরুতর অপরাধের ফৌজদারি মামলা এবং উইল ও উত্তরাধিকার সংক্রান্ত মামলা বিচার করা হয়। প্রত্যেক কাউন্টি বা জেলার উপরোক্ত ধরনের মামলা কাউন্টি কোর্টে বিচার করা হয়। যে সকল অঙ্গরাজ্যে জুরিপ্রথা আছে ঐ সকল রাজ্যের কাউন্টি কোর্টের জুরির সাহায্যে মামলা বিচার করা হয়। যে সকল অঙ্গরাজ্যে কিশোর অপরাধীদের বিচারের জন্য বা পারিবারিক বিষয় বিচারের জন্য বা অন্য বিশেষ কোনো বিষয় বিচারের জন্য যে কাউন্টিতে কোনো ভিন্ন আদালত নেই সেখানে কাউন্টি কোর্ট ঐ সকল বিষয়ে মামলা বিচার করেন।

মধ্যবর্তী আপিল আদালত : কাউন্টি কোর্টের উপরের স্তরের মধ্যবর্তী আপিল আদালত হচ্ছে কোনো অঙ্গরাজ্যে স্টেট এপিলেট কোর্ট, কোনো অঙ্গরাজ্যে ইন্টারমিডিয়েট কোর্ট অব এপিল, কোনো অঙ্গরাজ্যে এপিলেট ডিভিশন এবং কোনো অঙ্গরাজ্যে সুপিরিয়র কোর্ট। এ সকল আদালত সাধারণত নিম্ন আদালতের রায়ের

www.pathagar.com

বিরুদ্ধে আপিলের বিচার করে থাকেন। তবে কোনো কোনো রাজ্যে এ সকল আদালতে রিট দরখাস্তও করা যায়। এ সকল আদালত পৌর আদালত, কাউন্টি আদালত বা অন্য কোনো অধস্তন আদালতের রায়ের বিরুদ্ধে আপিল মামলার বিচার করেন। প্রায় রাজ্যে এ সকল আদালতের রায় চূড়ান্ত। এ সকল আপিল আদালতের বিচারপতিগণ কোনো কোনো অঙ্গরাজ্যে নির্বাচনের মাধ্যমে ও কোনো কোনো অঙ্গরাজ্যে নির্বাহী কর্তৃপক্ষের আদেশের মাধ্যমে নিযুক্ত হন।

অঙ্গরাজ্যের সর্বোচ্চ আদালত : মধ্যবর্তী আপিল আদালতের উপরের স্তরে প্রত্যেক অঙ্গরাজ্যের সর্বোচ্চ আপিল আদালত হচ্ছে কোনো রাজ্যে সুপ্রিমকোর্ট, কোনো রাজ্যে সুপ্রিম জুডিশিয়াল কোর্ট ও কোনো রাজ্যে কোর্ট অব এপিলস। নিউইয়র্ক রাজ্যে সুপ্রিমকোর্ট হচ্ছে অধস্তন বিচারআদালত এবং কোর্ট অব এপিলস হচ্ছে সর্বোচ্চ আপিল আদালত। এ সকল অঙ্গরাজ্যের সর্বোচ্চ আপিল আদালত মধ্যবর্তী আপিল আদালতের রায়ের বিরুদ্ধে আইনের প্রশ্নে আপিল শুনেন। অঙ্গরাজ্যের কোনো আইনের প্রশ্নে এ সকল আদালতের রায় চূড়ান্ত ও বাধ্যকর। তবে ফেডারেশন সংক্রান্ত কোনো গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন রাজ্যের সর্বোচ্চ আদালতে উপস্থাপিত হলে পরাজিত পক্ষ ঐ বিষয়ে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের সর্বোচ্চ আদালত সুপ্রিমকোর্টে আপিল দায়ের করতে পারে। অর্থাৎ ফেডারেল আইনের ব্যাখ্যার গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নেই কেবল রাজ্যের সর্বোচ্চ আদালতের রায়ের বিরুদ্ধে আমেরিকার সুপ্রিমকোর্টে আপিল করা যায়। অঙ্গরাজ্যের এ সকল সর্বোচ্চ আদালতের বিচারপতিগণ সাধারণত রাজ্যের গভর্নর কর্তৃক মনোনীত এবং রাজ্যের আইনসভা বা নির্বাচকমণ্ডলী কর্তৃক অনুমোদিত বা নির্বাচিত হন। কোনো কোনো রাজ্যে নির্বাহী আদেশ দ্বারা নিযুক্তির পর এক বছরকাল অস্থায়ীভাবে বিচারকের পদে কাজ করার পর নির্বাচনের মাধ্যমে তাদের স্থায়ীভাবে নিযুক্ত করা হয়।

ফেডারেল ডিস্ট্রিক্ট কোর্ট : আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের ফেডারেল সাংবিধানিক আদালতগুলো হচ্ছে- ডিস্ট্রিক্ট কোর্টস, কোর্টস অব আপিলস ও সুপ্রিমকোর্ট। এগুলোর মধ্যে সর্বনিম্ন আদালত হচ্ছে ডিস্ট্রিক্ট কোর্ট এবং মধ্যবর্তী আদালত হচ্ছে কোর্ট অব এপিলস এবং সর্বোচ্চ আদালত হচ্ছে সুপ্রিমকোর্ট। যুক্তরাষ্ট্রের অধীনস্থ সমস্ত এলাকাকে ৯৫টি ফেডারেল ডিস্ট্রিক্ট এলাকায় বিভক্ত করে প্রত্যেক এলাকায় একটি ডিস্ট্রিক্ট কোর্ট স্থাপন করা হয়েছে। সাধারণ লোকসংখ্যা ও মামলার পরিমাণের ভিত্তিতে এ সকল এলাকা বিভক্ত করা হয়। ১৭৮৯ সালের বিচার বিভাগীয় আইনের অধীনে প্রতিষ্ঠিত এ সকল আদালতে ফেডারেল আইনের আওতাধীন সকল আদি দেওয়ানি ও ফৌজদারি মামলা দায়ের ও বিচার করা হয়। এ আদালতেই আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় সরকার সর্বপ্রকার ফৌজদারি মামলা দায়ের করেন এবং ঐ সকল মামলার বিচার করা হয়। গড়ে প্রতিবছর এ সকল আদালতে ছয় লাখের বেশি মামলা নিষ্পত্তি করা হয়। এ সকল আদালতের কোনোটিতে একজন ও কোনোটিতে একাধিক বিচারপতি আছেন।

www.pathagar.com

সাধারণত বৃহৎ নগরীগুলোতে অবস্থিত ডিস্ট্রিক্ট কোর্টে মামলার সংখ্যা অনেক বেশি। এজন্য মামলা নিষ্পত্তির স্বার্থে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের সুপ্রিমকোর্টের প্রধান বিচারপতি প্রয়োজনবোধে একজন বিচারপতিকে তার সম্মতিক্রমে তার এলাকা থেকে অন্য এলাকায় সাময়িকভাবে বদলি করতে পারেন। এসকল বদলি বিচারপতিকে ভিজিটিং বা ডেজিগনেটেড বিচারপতি বলা হয়। ডিস্ট্রিক্ট কোর্টের বিচারপতিগণের প্রত্যেক প্রায় ৪০০টি এলাকায় জুরির সাহায্যে মামলা বিচার করে থাকেন।

তবে কোনো কোনো গুরুত্বপূর্ণ মামলা দু'জন ডিস্ট্রিক্ট কোর্টের বিচারপতি ও একজন আপিল (সার্কিট) আদালতের বিচারপতি একত্রে বসে বিচার করারও বিধান আছে। এরূপ তিনজন বিচারপতি একত্রে বসে কোনো মামলা বিচার করে রায় দিলে তার বিরুদ্ধে সরাসরি সুপ্রিমকোর্টে আপিল করা যায়। অন্যথায় ডিস্ট্রিক্ট কোর্টের একজন বিচারকের রায়ের বিরুদ্ধে মধ্যবর্তী আপিল আদালতে অর্থাৎ (সার্কিট) কোর্ট অব এপিলসে আপিল দায়ের করতে হয়। ডিস্ট্রিক্ট কোর্টের বিচারপতিদের সহায়তা করার জন্য তারা কোর্টের ম্যাজিস্ট্রেট, ল' ক্লার্ক, বেইলিফ, কোর্ট রিপোর্টার, স্টেনোগ্রাফার, ক্লার্কস, প্রবেশন অফিসার, প্রভৃতি কর্মকর্তাদের নিযুক্ত করতে পারেন। ম্যাজিস্ট্রেটগণ মামলা বিচারপূর্ব প্রাথমিক কাজগুলো সম্পাদন করেন। তারা গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি করতে পারেন, আসামির বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ বিবেচনার জন্য গ্রান্ড জুরিতে উপস্থাপন করা হবে কিনা তা নির্ধারণ করার জন্য সাক্ষ্যগ্রহণ করতে পারেন এবং আসামিকে আটকে রাখতে বা জামিনে মুক্তি দিতে এবং তজ্জন্যে জামানতের পরিমাণ নির্ধারণ করতে পারেন এবং ফেডারেল আইনের অধীনে সামান্য অপরাধের মামলায় আসামি জুরির সাহায্যে বিচারকের নিকট বিচারের পরিবর্তে ম্যাজিস্ট্রেটের বিচারে সম্মত হলে ঐ সকল মামলা বিচার করতে পারেন। তাছাড়া পক্ষগণ রাজি হলে যে কোনো দেওয়ানি মামলা বিচার করতে পারেন সার্বক্ষণিক ম্যাজিস্ট্রেট। এসকল মামলায় ম্যাজিস্ট্রেট ছয় মাস পর্যন্ত কারাদণ্ড দিতে ও ৫০০ ডলার পর্যন্ত জরিমানা করতে পারেন। তাছাড়া ম্যাজিস্ট্রেট মামলার বিচারপূর্ব দরখাস্ত প্রাথমিক শুনানি করেন এবং দরিদ্র আসামিদের পক্ষে আইনজীবী নিযুক্ত করেন। ডিস্ট্রিক্ট কোর্টের বিচারপতিগণ চার থেকে আট বছরের জন্য আইনের স্নাতকদের বা আইনজীবীদের মধ্য থেকে প্রায় ৪৮৯ জন ম্যাজিস্ট্রেট নিযুক্ত করে থাকেন। যুক্তরাষ্ট্রের এটর্নি যাদের সাধারণত ডিস্ট্রিক্ট এটর্নি বলা হয় তাদের এবং যুক্তরাষ্ট্রের মার্শালদের ঐ দেশের প্রেসিডেন্ট বা রাষ্ট্রপতি সিনেটের সম্মতিক্রমে প্রত্যেক ডিস্ট্রিক্ট কোর্টে সহায়তা করার জন্য নিযুক্ত করেন। ডিস্ট্রিক্ট এটর্নি যুক্তরাষ্ট্রের এটর্নি জেনারেলের নির্দেশ অনুযায়ী ডিস্ট্রিক্ট কোর্টে সরকারের পক্ষে মামলা পরিচালনা করেন। তাকে সহায়তা করার জন্য এটর্নি জেনারেল একাধিক সহকারী এটর্নি নিযুক্ত করেন। এখানে উল্লেখ্য, এটর্নি জেনারেল যুক্তরাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় সরকারের আইনমন্ত্রী ও তার পরামর্শ অনুযায়ী প্রেসিডেন্ট বিচারপতিদের ও ডিস্ট্রিক্ট এটর্নি ও মার্শালদের নিযুক্ত করেন। আমেরিকার ৯৪ জন মার্শাল ও দু'হাজার প্রধান সহকারী ও সহকারী মার্শালদের দায়িত্ব

www.pathagar.com

হচ্ছে আদালতে শৃঙ্খলা রক্ষা করা, গ্রেফতারি পরোয়ানার বলে আসামিকে গ্রেফতার করা, আসামিদের পাহারা দেয়া ও জেল থেকে আনা-নেয়া করা, দণ্ডপ্রাপ্ত আসামিদের জেলে প্রেরণ করা, আদালতের পরোয়ানা জারি করা, আদালতে নথিপত্র পাহারা দেয়া ও এক স্থান থেকে অন্য স্থানে আনা নেয়া করা, সাক্ষীদের নিরাপত্তা বিধান করা ও আদালতের তহবিল বিতরণ করা।

ফেডারেল (সার্কিট) আপিল কোর্ট : ফেডারেল সাংবিধানিক আদালতগুলোর মধ্যে (সার্কিট) কোর্ট অব আপিল হচ্ছে মধ্যবর্তী আপিল আদালত। ১৮৯১ সালের বিচার বিভাগীয় আইনের অধীনে এ সকল আপিল আদালত গঠিত। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের এরূপ ১৩টি আপিল আদালত আছে এবং এ সকল আদালতের বিচারকের সংখ্যা হচ্ছে ১৭৯ জন। তাত্ত্বিকভাবে প্রত্যেকটি আপিল আদালতের প্রধান হচ্ছেন আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের সুপ্রিমকোর্টের ৯ জন বিচারকের মধ্যে একজন। প্রত্যেকটি আপিল আদালত ৪ থেকে ২৮ জন বিচারপতি নিয়ে গঠিত। প্রত্যেকটি আপিল আদালতের সর্বজ্যেষ্ঠ বিচারপতি হয় ঐ আদালতে প্রধান বিচারপতি। সাধারণত তিন থেকে দু'জন বিচারপতি একত্রে বসে মামলার বিচার করেন। বিশেষ ক্ষেত্রে তারা সকলে একত্রে বসেও মামলা বিচার করতে পারেন। তবে সাধারণত এরূপ ঘটনা দুর্লভ। ফেডারেল ডিস্ট্রিক্ট কোর্টের ৩ জন বিচারকের রায় বা ঐ আদালত কোনো মামলায় কোনো ফেডারেল আইনকে সংবিধান পরিপন্থী ঘোষণা করে রায় দিলে ওই রায়ের বিরুদ্ধে ব্যতীত ফেডারেল ডিস্ট্রিক্ট আদালতের জন্য সব রায়ের বিরুদ্ধেই এ আদালতে আপিলের বিচার করা হয়।

নিম্ন আদালতের নথিপত্র দেখেই আপিলের বিচার করা হয়। খুব গুরুত্বপূর্ণ মামলায় কোনো আইন সংবিধানসম্মত কিনা প্রশ্ন উঠলেই মাত্র এ আদালত বাচনিক বক্তব্য শুনেন এবং বেশিরভাগ মামলাই নথিপত্রের ভিত্তিতে বিচার করে থাকেন। এ সকল আপিল আদালত অধস্তন ডিস্ট্রিক্ট কোর্টের রায়ের বিরুদ্ধে আপিল শোনা ছাড়াও ন্যাশনাল লেবার রিলেশান্স বোর্ড, ডিপার্টমেন্ট অব লেবার, ইন্টার স্টেট কমার্স কমিশন, ফেডারেল কমিউনিকেশান্স কমিশন, সিভিল এরনটিকস বোর্ড ও ফেডারেল রিজার্ভ সিস্টেমের বোর্ড অব গভর্নরসের আধাবিচারমূলক সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে পুনর্বিবেচনার দরখাস্ত পর্যালোচনা করে সিদ্ধান্ত দিয়ে থাকেন এবং ঐ সকল ফেডারেল নির্বাহী কর্তৃপক্ষের আদেশ কার্যকর করার নির্দেশ দিয়ে থাকেন। সাধারণত যে কোনো ফেডারেল নির্বাহী কর্তৃপক্ষের আধাবিচারমূলক সিদ্ধান্ত এ আপিল আদালত পর্যালোচনা করতে পারেন।

ইউএস (ফেডারেল) সুপ্রিমকোর্ট : আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের সর্বোচ্চ আদালত হচ্ছে ফেডারেল সুপ্রিমকোর্ট। প্রধান বিচারপতি ও আটজন সহযোগী বিচারপতিকে নিয়ে এ আদালত গঠিত। এ আদালত আদি ও আপিল মামলার বিচার করেন। তবে আদালত আদি মামলার চেয়ে আপিল মামলাই সাধারণত বিচার করেন। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে কোনো অঙ্গরাজ্য অন্য অঙ্গরাজ্যের বিরদ্ধে মামলা করতে হলে ফেডারেল সুপ্রিমকোর্টে

www.pathagar.com

তা দায়ের করতে হয়। এ জাতীয় মামলা ছাড়া অন্য আদি মামলা ফেডারেল সুপ্রিমকোর্টে দায়ের করা যায় না। (সার্কিট) কোর্ট অব আপিলের রায়, ডিস্ট্রিক্ট কোর্টের নির্দিষ্ট রায় ও অঙ্গরাজ্যের সর্বোচ্চ আদালতের রায়ের বিরুদ্ধে সুপ্রিমকোর্টে আপিল করা যায়। তাছাড়া যুক্তরাষ্ট্রের কোর্ট অব ক্লেইমস এবং যুক্তরাষ্ট্রের কোর্ট অব কাস্টমস এন্ড পেটেন্ট আপিলের রায়ের বিরুদ্ধে এবং আইন দ্বারা প্রতিষ্ঠিত অন্য কোনো আদালত বা আঞ্চলিক আদালতের রায়ের বিরুদ্ধে এ আদালতে আপিল করার বিধান থাকলে সে সকল আদালতের রায়ের বিরুদ্ধেও সুপ্রিম কোর্টে আপিল করা যায়। তবে ফেডারেল আইন বা সংবিধানের ব্যাখ্যার প্রশ্নেই অঙ্গরাজ্যের সর্বোচ্চ আদালতের শুনানি হয়। সাধারণত অঙ্গরাজ্যের সর্বোচ্চ আদালত কোনো ফেডারেল আইন বা বৈদেশিক চুক্তির বা তার অংশবিশেষ সংবিধান পরিপন্থী ঘোষণা করলে, অঙ্গরাজ্যের সর্বোচ্চ আদালত ঐ রাজ্যের কোনো আইন বা রাজ্যসংবিধানের কোনো বিধানকে ফেডারেল আইন, সংবিধান বা চুক্তির পরিপন্থী বলে চ্যালেঞ্জ করা সত্ত্বেও অবৈধ ঘোষণা না করলে, কোনো ফেডারেল আদালত কোনো ফেডারেল আইন, বৈদেশিক চুক্তি বা তার অংশবিশেষ সংবিধান পরিপন্থী ঘোষণা করলে, ফেডারেল আপিল আদালত অঙ্গরাজ্যের কোনো আইনকে ফেডারেল আইন, সংবিধান বা বৈদেশিক চুক্তির পরিপন্থী ঘোষণা করলে এবং আইনে কোনো আদালতের রায়ের বিরুদ্ধে এ আদালতে আপিল করার বিধান থাকলেই মাত্র এ আদালতে আপিল দায়ের করা যায়। যে সকল মামলার রায়ের বিরুদ্ধে ফেডারেল সুপ্রিম কোর্টে আপিল করার বিধান নেই সে সকল মামলার রায়ের বিরুদ্ধে সংক্ষুব্ধ পক্ষ এ আদালতে সারশিওরাই দরখাস্ত দায়ের করে নিম্ন আদালতের নথি পর্যালোচনার প্রার্থনা করতে পারে। যেখানে দুটি (সার্কিট) কোর্ট অব আপিল অথবা দু'তিনজন বিচারপতি নিয়ে গঠিত ফেডারেল ডিস্ট্রিক্ট কোর্ট কোনো আইন সংবিধানসম্মত কিনা ঐ প্রশ্নে পরস্পর বিরোধী রায় দিয়ে থাকে; যেখানে অঙ্গরাজ্যের আদালত বা (সার্কিট) কোর্ট অব আপিল ফেডারেল সুপ্রিম কোর্ট বিবেচনা করেনি এরূপ ফেডারেল আইনের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকে; যেখানে নিম্ন আদালতের কোন রায় ফেডারেল সুপ্রিমকোর্টের কোন নজিরের সঙ্গে অসঙ্গতিপূর্ণ বা যেখানে কোন ফেডারেল অধস্তন আদালত বিচার সংক্রান্ত স্বীকৃত নিয়মনীতি পরিহার করে মামলা বিচার করেছে বলে অভিযোগ করা হয় সে সকল প্রশ্নেই মাত্র সারশিওরাই দরখাস্ত ফেডারেল সুপ্রিম কোর্ট বিবেচনা করেন। তবে সুপ্রিমকোর্ট যে কোন নিম্ন আদালতের ফেডারেল আইন বা সংবিধান পরিপন্থী রায় সারশিওরাই রিট দরখাস্তের ভিত্তিতে বাতিল করতে পারে। তাছাড়া এ আদালতে হেবিয়াস কর্পাস ও কুওয়ারান্টো রিট দরখাস্তও দায়ের করা যায়। আপিলে গুরুত্বপূর্ণ ফেডারেল প্রশ্ন উত্থাপিত না হলে এ আদালত নিম্ন আদালতের রায়ের বিরুদ্ধে সাধারণত হস্তক্ষেপ করেন না। ১৯৭৭-৭৮ সালে এ প্রশ্নেও এখতিয়ারের প্রশ্ন ৯১.৩% আপিলের দরখাস্ত বিবেচনার জন্য গ্রহণ না করা হলে প্রাথমিক অবস্থায় বাতিল করা হয়েছিল।

www.pathagar.com

সারশিওরাই দরখাস্ত বিবেচনার জন্য গ্রহণ করা হলে নিম্ন আদালতের নথি তলব করা হয়। এ আদালতের বিচারপতিদের সাপ্তাহিক সভায় চারজন বিচারপতি কোনো দরখাস্ত বিবেচনার জন্যে গ্রহণযোগ্য বলে মত দিলেই মাত্র সারশিওরাই দরখাস্ত আদালতের বিবেচনার জন্য গ্রহণ করে নিম্ন আদালতের নথি তলব দিয়ে এনে তা পর্যালোচনা করা হয়। এ আদালত সারশিওরাই দরখাস্তে কোন গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন উত্থাপিত না হলে ওই দরখাস্ত বিবেচনার জন্য গ্রহণ না করেই বাতিল করে দেন এবং দরখাস্ত বাতিল করার জন্যে কোনো যুক্তি প্রদর্শন করা হয় না। বিচারপতিরা স্বয়ং এ সকল দরখাস্ত পড়ে বা তাদের স্ব স্ব ল' ক্লার্কের সাহায্যে দরখাস্ত পড়িয়ে বা শুনে বা ল ক্লার্কদের তৈরি ওইসব দরখাস্তের সংক্ষিপ্তসার বা বিচারপতিদের সভার জন্যে তৈরি ওই সকল দরখাস্তের স্মারক বিবেচনা করেই ওই সকল দরখাস্ত বিবেচনার জন্য গ্রহণ করা বা বাতিল করা হয়। এ পদ্ধতিতে ৮৬% থেকে ৯০% সারশিওরাই দরখাস্ত বাতিল করে দেয়া হয়। আপিলের দরখাস্তগুলোও এ পদ্ধতিতে বিবেচনা করে গ্রহণ বা বাতিল করা হয়। এ আদালত যে সকল মামলা বিবেচনার জন্যে গ্রহণ করে তালিকাভুক্ত করেন এই তালিকাভুক্তির ৪৫ দিনের মধ্যে আপিলকারী বা দরখাস্তকারীকে মামলার ঘটনা, বিচার্য বিষয়, যে প্রশ্নে আপিল বা দরখাস্ত করা হয়েছে তা, নিম্ন আদালতের সিদ্ধান্ত, সকল প্রাসঙ্গিক আইন সম্পর্কিত যুক্তিতর্ক ও তৎসহ প্রযোজ্য আইন ও নজির উল্লেখ করে মামলার সংক্ষিপ্ত বিবরণী ছাপিয়ে তার ৪০ কপি আদালতের ক্লার্কের নিকট দাখিল করতে হয়। মামলার ওই সংক্ষিপ্ত বিবরণী দাখিলের ৩০ দিনের মধ্যে প্রতিপক্ষকে তার উত্তরের সংক্ষিপ্ত বিবরণী দাখিল করতে হয়। যে সকল মামলা দরিদ্র আপিলকারী বা দরখাস্তকারী হাতে লেখা বা টাইপ করা দরখাস্ত দ্বারা দাখিল করেন তারা মামলার সংক্ষিপ্ত বিবরণী হাতে লিখে বা টাইপ করে দাখিল করতে পারেন। আর্থিক অসংগতির জন্যে নিয়ম মাফিক মামলা দায়ের করতে পারছেন না বলে হলফান্তে দরখাস্ত দিলেই যে কোন দরিদ্র ব্যক্তি বা কয়েদির হাতে লেখা বা টাইপ করা দরখাস্ত গ্রহণ করা হয়। তালিকাভুক্ত মামলার মধ্যে সেগুলোতে এ আদালত যুক্তিতর্ক শোনার জন্য সম্মত হন সেগুলোতেই মাত্র প্রকাশ্য আদালত কক্ষে বসে প্রধান বিচারপতি ও তার আটজন সহযোগী বিচারপতি উভয়পক্ষের যুক্তিতর্ক শুনে থাকেন। এ আদালত প্রতি বছর ১২৫টি থেকে ১৫০টি মামলায় প্রকাশ্য আদালতে যুক্তিতর্ক শুনে থাকেন। বাকি মামলাগুলো এখতিয়ার বা কার্যপ্রণালীর ত্রুটির জন্য প্রকাশ্য আদালতে শুনানি ব্যতীত ডিসমিস করা হয়। যে সকল মামলা শুনানি হয় সেগুলোতে পূর্বের মতো দিনের পর দিন দীর্ঘ বাচনিক বক্তব্য শুনা হয় না। বর্তমানে প্রত্যেক পক্ষকে ত্রিশ মিনিট থেকে এক ঘণ্টা সময় পর্যন্ত তার বক্তব্য পেশ করার সুযোগ দেয়া হয়। প্রত্যেক পক্ষের বক্তব্য পেশের নির্ধারিত সময়ের ৫ মিনিট পূর্বে আইনজীবীদের সামনে রক্ষিত একটি ডেস্কে স্থাপিত বাতি থেকে সাদা আলো জ্বলে ওঠা মাত্র বক্তব্য অসম্পূর্ণ রেখেই আইনজীবীকে বসে পড়তে হয়। তবে আদালত আরও

www.pathagar.com

বক্তব্য শুনতে চাইলে সময় বাড়িয়ে দিতে পারেন। তখন আইনজীবীকে ওই বর্ধিত সময়ের মধ্যে তার বক্তব্য শেষ করে বসে পড়তে হয়। যে সকল মামলাতে উভয়পক্ষের যুক্তিতর্ক শুনা হয় ওই সকল মামলার ৭৫% থেকে ৮৫% মামলায় এ আদালত পরিপূর্ণ লিখিত রায় প্রকাশ করেন এবং বাকিগুলোতে সংক্ষিপ্ত রায় প্রকাশ করা হয়। পরিপূর্ণ রায়ে বিচারপতিরা একটি সর্বসম্মত বা একাধিক পৃথক পৃথক মতামত ব্যক্ত করেন। কিন্তু সংক্ষিপ্ত রায়ে কোন বিচারপতির নাম উল্লেখ থাকে না। সাধারণত প্রধান বিচারপতি বা তার পক্ষে ল' ক্লার্ক আদালতের সর্বসম্মত সংক্ষিপ্ত রায় লিখে থাকেন। তালিকাভুক্ত বাকি মামলাগুলোতে কোন প্রকার রায় লেখা হয় না। এ সকল মামলার নথিতে নিম্ন আদালতের রায় 'বহাল' বা 'বাতিল' বলে উল্লেখ করে নিষ্পত্তি করা হয়ে থাকে। এ আদালত যে সকল দরখাস্ত বিবেচনার জন্য গ্রহণ না করে বাতিল করেন সংক্ষুব্ধ পক্ষ তা পুনর্বিবেচনার জন্যে এ আদালতে দরখাস্ত পেশ করতে পারেন। সাধারণত এ সকল দরখাস্তের বেশিরভাগই বাতিল করে দেয়া হয। তবে চারজন বিচারপতি ওই রূপ কোন দরখাস্ত বিবেচনার যোগ্য বলে মত দিলেই ওই মামলা আদালতের এবং সময় শেষ হওয়া মাত্র ওই বাতি থেকে লাল আলো জ্বলে ওঠা পুনর্বিবেচনার জন্যে গ্রহণ করে তালিকাভুক্ত করা হয়। এ আদালতে তালিকাভুক্ত মামলায় রায় বা অদেশ প্রকাশিত হওয়ার ২৫ দিনের মধ্যে পরাজিত পক্ষ ওই মামলাটি পুনঃশুনানির জন্য আবেদন করতে পারে। এ জাতীয় আবেদন সাধারণ অগ্রাহ্য করে দেয়া হয়। ১৯৫০ থেকে ১৯৭৫ সালে মাত্র ছয়টি মামলায় পুনঃ শুনানির আবেদন মঞ্জুর করা হয়েছিল। আর ওই ছয়টি মামলার মধ্যে মাত্র তিনটিতে এ আদালত পূর্বের রায় বাতিল করে দিয়েছিলেন। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের সুপ্রিমকোর্টে ফেডারেল সরকারের পক্ষে মামলার দায়িত্বে থাকেন সলিসিটর জেনারেল। ফেডারেল সরকারের বিচার মন্ত্রণালয়ের প্রধান এটর্নি জেনারেল ও ডেপুটি এটর্নি জেনারেলের পরেই সলিসিটর জেনারেলের স্থান। এ আদালতে অর্ধেকের কিছু বেশি মামলা সরকার পক্ষ থেকে দায়ের করা হয়ে থাকে। সলিসিটর জেনারেলের মতামত নিয়েই এ সকল মামলা দায়ের করা হয়ে থাকে এবং তার অফিসের কর্মচারীরা এ সকল মামলায় প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিয়ে থাকেন। তিনি এবং তার সহকারী আইনজীবীরা এ আদালতে সরকার পক্ষে মামলা শুনানিতে যুক্তিতর্ক পেশ করেন। যদি নিম্ন আদালতে সরকার পক্ষ অন্যায়ভাবে কোন মামলায় জয়লাভ করেছে বলে তিনি দেখতে পান তবে তিনি ওই অন্যায় রায় বাতিল করে দেয়ার জন্য এ আদালতে ভুল স্বীকৃতির দরখাস্ত দাখিল করে ওই রায় বাতিল করার জন্য প্রার্থনা করেন : এ আদালতের প্রত্যেক বিচারপতি তাকে তার কাজে সাহায্য করার জন্য এক বা একাধিক ল' ক্লার্ক নিযুক্ত করে থাকেন। সদ্য পাস করা খুব মেধাবী আইনের স্নাতকদের মধ্য থেকে ল' ক্লার্কদের এক বা দু বছরের জন্য নিযুক্ত করা হয়। বর্তমানে ফেডারেল সরকারের তহবিল থেকে তাদের বেতন দেয়া হয়। তা ছাড়া প্রধান বিচারপতি একজন প্রশাসনিক সহকারীও সরকারি

www.pathagar.com

বেতনে তাকে প্রশাসনিক দায়িত্ব পালনে সাহায্য করার জন্য নিযুক্ত করেন। সহযোগী বিচারপতিগণও তাদের প্রশাসনিক কাজে সাহায্য করার জন্য একজন প্রশাসনিক সহকারী নিয়োগ করতে পারেন। সাধারণত ল' ক্লার্ক সারশিওরাই দরখাস্ত ও প্রতিপক্ষের উত্তর পাঠ করে সংক্ষিপ্ত স্মারক লিখে বা টাইপ করে তিনি যে বিচারপতির অধীনে কাজ করেন তার নিকট পেশ করে থাকেন। বিচারপতি অনেক সময় তার ল' ক্লার্ককে আদালতের সাপ্তাহিক সভার জন্য কোনো কোনো মামলার স্মারক তৈরি করতে নির্দেশ দিয়ে থাকেন। তার প্রধান কাজ হচ্ছে বিচারপতিকে মামলার রায় লেখার জন্যে নজির ও অন্যান্য তথ্য খুঁজে বের করে দেয়া। তাছাড়া তার প্রধান কাজ হচ্ছে বিচারপতির সঙ্গে থেকে মামলার গুণাগুণ আলোচনা করা, তার মতামত ব্যক্ত করা এবং নানাভাবে বিচারপতিকে রায় লিখতে সাহায্য করা। তবে ল' ক্লার্কগণের মতামতের ভিত্তিতে বিচারপতিগণ কোনো মামলার রায় দেন না। তারা শুধু তাদের নিজস্ব মতামত সঠিক কিনা তা যাচাই করার জন্যে তাদের রায়ের মুসাবিদা সম্পর্কে ল' ক্লার্কদের সাথে আলোচনা করে তাদের মতামত জেনে থাকেন।

বিচারপতিদের নিয়োগ : আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের কোনো কোনো অঙ্গরাজ্যে বিচারপতিদের নির্বাচনের মাধ্যমে নিযুক্তি করা হলেও অনেক অঙ্গরাজ্যে এবং ফেডারেল সাংবিধানিক ও ফেডারেল আইন পরিষদীয় আদালতের বিচারপতিদের নির্বাহী কর্তৃপক্ষের আদেশবলে নিযুক্ত করা হয়। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট সাংবিধানিক ও আইন পরিষদীয় ফেডারেল আদালতের বিচারপতিদের সিনেটের অনুমোদনসাপেক্ষে নিযুক্ত করে থাকেন। ১৯৭৯ সালে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের ফেডারেল আদালতগুলোতে প্রেসিডেন্ট নিযুক্ত ৭১০ জন বিচারপতি ছিলেন। সিনেটের সভায় তাদের নিযুক্তি সাধারণ সংখ্যাগরিষ্ঠতায় অনুমোদিত হলেই এ সকল বিচারপতিগণ কাজে যোগদান করে থাকেন। ফেডারেল সাংবিধানিক আদালতের বিচারপতিগণ স্বেচ্ছায় অবসর গ্রহণ না করা পর্যন্ত চাকরিতে বহাল থাকেন। কেবল অসদাচরণের অভিযোগে তাদের চাকরিচ্যুত করা যায়। যা অতি দুর্লভ ঘটনা। অসদাচরণের অভিযোগ আনার পরও কোনো ফেডারেল বিচারপতি পদত্যাগ না করলে তাকে আইন সভায় অভিশংসনের মাধ্যমে অপসারিত করা যায়। তবে যুক্তরাষ্ট্রের সার্কিট জুডিশিয়াল কাউন্সিল অধস্তন ফেডারেল বিচারপতিদের অসদাচরণের অভিযোগে বাদ দিতে পারেন। আইন পরিষদীয় আদালতের বিচারপতিদের চাকরির মেয়াদকাল যে আইনের অধীনে ঐ সকল আদালত প্রতিষ্ঠিত ঐ আইনের বিধান অনুযায়ী নির্ধারিত হয়ে থাকে। সাধারণত তাদের চাকরির মেয়াদকাল ৪ থেকে ১৫ বছর এবং কোনো কোনো আইন পরিষদীয় আদালতের বিচারপতিদের চাকরির মেয়াদকাল সাংবিধানিক আদালতের বিচারপতিদের মতো। আদালতের বিচারপতিদের চাকরির মেয়াদকাল তাদের বেতন ভাতাদি বর্ধিত করা ছাড়া কমানো যায় না। উপরোক্ত বিচারপতিদের ছাড়াও প্রেসিডেন্ট সিনেটের অনুমোদন সাপেক্ষে ৯৫টি ফেডারেল জেলা

www.pathagar.com

আদালতে দেউলিয়া মামলা বিচার করার জন্যে দু শতাধিক দেউলিয়া আদালতের বিচারপতিদের ১৪ বছরের জন্যে নিযুক্ত করে থাকেন।

বিচারপতিদের অবসর গ্রহণ : ফেডারেল বিচারপতিদের অবসর গ্রহণ সংক্রান্ত ১৯৩৭ সালের আইনের বিধান মতে ফেডারেল সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি দশ বছর চাকরির পর ৭০ বছর বয়সে এবং অন্য বিচারপতিগণ পনের বছর চাকরি করার পর ৬৫ বছর বয়সে অবসর গ্রহণ করলে পুরো বেতন ভাতা পান এবং প্রধান বিচারপতি প্রয়োজনবোধে বিচার কর্মে অংশগ্রহণ করার জন্য সময় সময় তাদের ডাকতে পারেন। শারীরিক অসমর্থের কারণে কোনো ফেডারেল বিচারপতি অবসর গ্রহণ করলে তার চাকরিকালের ভিত্তিতে অবসরকালীন বেতন নির্ধারিত হয়।[৬৮]

তথ্যসূত্র

১. দৈনিক ইনকিলাব, নভেম্বর ১৯৮৬ থেকে জানুয়ারি ১৯৮৭ পর্যন্ত বিভিন্ন সংখ্যা, দৈনিক দেশ, ২৪ আগস্ট ১৯৯০, দৈনিক মিল্লাত ১৫ মে ১৯৯২, দৈনিক আজকের কাগজ ২৭ নভেম্বর ২০০৫ অবলম্বনে।

২. দৈনিক আজকের কাগজ: ২৯ নভেম্বর ২০০৫।

৩. ডুরান্ট উইল: দিএইজ অব ফেইথ পৃ. ১৫৫।

৪. আবদুর রহিম: মোহামেডান জুরিসপ্রুডেন্স- পৃ. ৪।

৫. মন্টোগোমারি ওয়াট ডব্লু: মুহাম্মদ এট মদিনা, পৃ. ১২১-১২৫।

৬. কাদরি আনোয়ার আহমদ: জাস্টিস ইন হিস্ট্রিক্যাল ইসলাম, পৃ. ১০-১৩।

৭. দৈনিক জনকণ্ঠ: ২ ডিসেম্বর ২০০৫।

৮. সূরা আল মায়িদাহ, আয়াত-৩৮।

৯. তথ্যঃ হিদায়া, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ৫১৭।

১০. আব্দুল মান্নান তালিব: ইসলামী আইন ও বিচার, পৃষ্ঠা-৩৫, ৩৭ ও ৩৯।

১১. মাওলানা মুহিউদ্দিন খান অনূদিত ও সম্পাদিত, পবিত্র কোরআনুল করিম, পৃ: ২৫৭, ২৮৭, ৩১৩, ৩২৯, ৩৩৯।

১২. ওয়াহেদ হোসেন ঃ দি এডমিনিস্ট্রেশন অব জাস্টিস ডিউরিং দি মুসলিম রুল ইন ইন্ডিয়া, পৃ: ৭।

১৩. পিএম জৈনঃ আউট লাইন্স অব ইন্ডিয়ান লিগ্যাল হিস্ট্রি- পৃ: ৪০৮।

১৪. প্রাগুক্ত: দি এডমিনিস্ট্রেশন... পৃ: ১৪, ১৫।

১৫. হেমিল্টন: হেদায়া- পৃ: ৩৩৬-৩৮।

১৬. ডুরান্ট উইল: আওয়ার ওরিয়েন্টাল হেরিটেজ- পৃষ্ঠা ২৭-২৯।

www.pathagar.com

১৭. উলি: দি সুমেরিয়ানস- পৃষ্ঠা: ৯৩।
১৮. প্রাগুক্ত: ডুরান্ট- পৃ. ১৬১-৬৩।
১৯. প্রাগুক্ত: ডুরান্ট পৃ: ৩৩০-৩৮।
২০. প্রাগুক্ত: ডুরান্ট, পৃ: ৩৬০-৬২।
২১. দৈনিক মুক্তকণ্ঠ সাময়িকী প্রবাহ, ২৩ এপ্রিল ১৯৯৮,পৃ: ২৭।
২২. প্রাগুক্ত: ডুরান্ট পৃ: ১৬-১৭।
২৩. ডুরান্ট উইল: দি লাইফ অব গ্রীস, পৃষ্ঠা- ১০৯-১১৬, ২৫৭-৫৮, ২৫৯-২৬১।
২৪. এফ টমাস এডামস: ইন্ট্রাডাকশন টু দি এডমিনিস্ট্রেশন অব জাস্টিস, পৃ: ১০০-১০১।
২৫. ভি জেড ডব্লু উইনডিয়ার : লেকচার অন লিগ্যাল হিস্ট্রি পৃ: ১-২।
২৬. প্রাগুক্ত, উইনডিয়ার: পৃ: ৯-১০।
২৭. হেরল্ড পোট্রার: এ শর্ট অডিট লাইন অব ইংলিশ লিগ্যাল হিস্ট্রি- পৃ: ১০৮-১০।
২৮. সরকার শাহাবুদ্দীন আহমদ: আত্মঘাতী রাজনীতির তিনকাল- প্রথম খণ্ড, পৃ: ৭১-৭৩।
২৯. প্রাগুক্ত: এডামস-পৃ: ১০২।
৩০. প্রাগুক্ত হেরাল্ড পোট্রার, পৃ: ৫০-৫৭।
৩১. প্রাগুক্ত-পোট্রার, পৃ: ৫০-৫২।
৩২. কেনেথ ও কেনান স্মিথ, ডেনিশ ইংলিশ 'ল পৃ: ২।
৩৩. প্রাগুক্ত: উইনডিয়ার, পৃ: ৯৬।
৩৪. প্রাগুক্ত: উইনডিয়ার, পৃ: ৯৬, ৯৭, ১৪৭, ১৪৮।
৩৫. প্রাগুক্ত- পোট্রার, পৃ. ৯৫, ৯৬।
৩৬. প্রাগুক্ত: পোট্রার, পৃ. ১০৪।
৩৭. স্মিথ এন্ড বেইলি: দি মডার্ন ইংলিশ লিগ্যাল সিস্টেম, পৃ: ৫০৮-১৫, ৬৭৫-৮০।
৩৮. দি ইকোনমিস্ট, ১৬-২২ সেপ্টেম্বর ১৯৯৫, পৃ: ৬৮, ৬৯।
৩৯. প্রাগুক্তঃ উইনডিয়ার, পৃ: ১৭৭-৮৫, ১৮৮-৮৯।
৪০. ওয়েড এন্ড ফিলিপস: কনস্টিটিউশনাল 'ল-পৃ: ৫০, ৫১ ও ৫৯।
৪১. এডিড: ইংলিশ লিগ্যাল সিস্টেম, পৃ: ২৪৩, ২৪৪।
৪২. আজকের কাগজ, ৩ ডিসেম্বর, ২০০৫।
৪৩. ডুরান্ট উইল: আওয়ার ওরিয়েন্টাল হেরিটেজ, পৃষ্ঠা: ২৭১-২৭২।
৪৪. দৈনিক প্রথম আলো: ২০ জানুয়ারি, ২০০৬।
৪৫. দৈনিক মুক্তকণ্ঠ, সাময়িকী, প্রবাহ ২৩ এপ্রিল ১৯৯৮, পৃ: ২৭।
৪৬. দৈনিক সংগ্রাম: ৯ আগস্ট, ২০০৩ এবং ৯ মে ২০০৪।
৪৭. জে হেনরী আব্রাহাম, দি জুডিশিয়াল প্রসেস, ৪র্থ সংস্করণ, পৃ: ২৭১।
৪৮. জে হেনরি আব্রাহাম, দি জুডিশিয়াল প্রসেস, ৪র্থ সংস্করণ, পৃ: ২৭২।
৪৯. জে রিচার্ডস কুমিন্স: দি জেনারেল প্রিন্সিপালস অব ল' সেপারেশন অব পাওয়ার্স এন্ড থিওরি অব জুডিশিয়াল ডিসিশনস ইন ফ্রান্স, কনস্টিটিউশনাল ল' ইন্টারন্যাশনাল ল' কোয়ার্টারলি ভল্যুম- ২৫, পৃ: ৬১৯।
৫০. প্রাগুক্ত: আব্রাহাম, পৃ: ১০২, ১০৭ ও ২৭৪।
৫১. প্রাগুক্ত: কুমিন্স, পৃ: ৬২০-২৫।

www.pathagar.com

৫২. দৈনিক মুক্তকণ্ঠ সাময়িকী প্রবাহ: ২৩ এপ্রিল ১৯৯৮, পৃ: ২৭।
৫৩. দৈনিক সংগ্রাম, ২৯ আগস্ট ২০০৪।
৫৪. টেরিবিলভ: দি সেভিট কোর্ট, পৃষ্ঠা-১৮, ৯৭।
৫৫. প্রাগুক্ত: টেরিবিলভ, পৃ: ১২০-১২৫।
৫৬. জে রিচার্ড কুমিন্স: দি জেনারেল প্রিন্সিপলস অব ল' সেপারেশন অব পাওয়ার্স এন্ড থিওরি অব জুডিশিয়াল ডিসিশনস ইন ফ্রান্স, কনস্টিটিউশনাল লি' ইন্টারন্যাশনাল ল' কোয়ার্টারলি ভল্যুম ২৫, পৃ: ৬২০-৬২৫।
৫৭. প্রাগুক্ত: টেরিবিলভ, পৃ: ১২০-১২৫।
৫৮. প্রাগুক্ত: টেরিবিলভ, পৃ: ১২৬-১৩৫।
৫৯. প্রাগুক্ত: টেরিবিলভ, পৃ: ১২০-১২৫।
৬০. দি ইকনমিস্ট: ২-৮ সেপ্টেম্বর সংখ্যা ১৯৯৫, পৃষ্ঠা, ৪৬-৪৮।
৬১. ডি ব্রাউন রচিত বুরি মি হার্ট এট উনডেডনি।
৬২. দৈনিক সংগ্রাম: পহেলা মার্চ, ২০০৪।
৬৩. দৈনিক মিল্লাত: ১৬ নভেম্বর ১৯৯৪।
৬৪. গোল্ডম্যান এন্ড সারটে: আমেরিকান কোর্ট সিস্টেম, পৃষ্ঠা ৯২-৯৫।
৬৫. প্রাগুক্ত: গোল্ডম্যান, পৃষ্ঠা ১১৯-১২১।
৬৬. জে হেনরি আব্রাহাম: দি জুডিশিয়াল প্রসেস, ৪র্থ সংস্করণ, পৃষ্ঠা- ১৪২-১৪৪।
৬৭. প্রাগুক্ত: আব্রাহাম, পৃ: ১৪৯-৫০।
৬৮. প্রাগুক্ত: আব্রাহাম, পৃষ্ঠা ২৪, ৩৫, ৩৬, ৪১-৪৪, ১৫০-১৫২, ১৫৪, ১৫৫, ১৫৯-৬২, ১৬৯, ১৭২-৭৫, ১৭৯-১৮৯, ১৬৭, ১৭৯-১৮৯, ১৯২, ২০৪, ২০৫-৬, ২৫৪-২৫৮ এবং ৬ষ্ঠ সংস্করণ, পৃ: ১৪৯, ১৬৫, ১৭০।

www.pathagar.com

অধ্যায় : দুই

প্রাচীন ভারতীয় সমাজে হিন্দু বিচার ব্যবস্থা

আর্যদের ভারতে রাজত্ব প্রতিষ্ঠার আগে অতিপ্রাচীনকালে সুসভ্য জাতি, নগর রাষ্ট্র ও গ্রাম সমাজে ঠিক কি ধরনের আইন ও বিচার ব্যবস্থা চালু ছিল তা আজো উদ্ধার করা যায়নি। কারণ খ্রিষ্টপূর্ব ১৫শ' সালের মধ্যে আর্যদের দ্বারা সেই প্রাচীন সভ্যতার সব কিছুই সমূলে ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল। তবে আর্যরা যে আইন ও বিচার ব্যবস্থা প্রবর্তন করে তাকেই প্রাচীন ভারতের হিন্দু বিচার ব্যবস্থা বলা হয়। বিভিন্ন গোত্রে বিভক্ত আর্যরা প্রথমে পাঞ্জাবের আম্বালায় এবং পরে সমগ্র ভারতে ছড়িয়ে পড়ে।

গ্রাম সমাজ গড়ে উঠেছিল তখন কুল বা গোত্র নিয়ে যারা উচ্চ বর্ণের বা উচ্চ শ্রেণীর ছিল এবং যারা তাদের সেবা করত তারা নিম্ন বর্ণ তথা নিম্নশ্রেণীর ছিল। উচ্চ শ্রেণীর লোকদের পেশা ছিল ধর্মচর্চা, যুদ্ধবিদ্যা ও রাজ্য শাসন। নিম্নশ্রেণীর লোকদের দায়িত্ব ছিল পশুপালন, কৃষিকাজ, বিভিন্ন প্রয়োজনীয় পণ্য উৎপাদন, চুলকাটা ইত্যাদি। নিম্ন বর্ণের অনেকে উচ্চ বর্ণের গৃহভৃত্যের কাজ করত। এভাবে উচ্চ-নিম্ন সমন্বয়ে গঠিত গ্রাম স্বশাসিত ও স্বনির্ভর ছিল। গ্রামের কূল তথা গোত্রপতি নিজেদের মধ্যে বিচার মিমাংসা করতেন নিজেদের তৈরি আইন দ্বারা। নিম্নবর্ণের মানুষ তাদের স্বশ্রেণীর সমিতি বা সংঘের মাধ্যমে আইন তৈরি করে নিজেদের বিবাদ মিমাংসা করতেন। উচ্চ বর্ণের লোকজন তাদের পুরুষানুক্রমে লালিত পবিত্র বিশ্বাস ও ঐতিহ্যের অধীন পরিচালিত এবং পবিত্র আইনসমূহের রক্ষক ছিলেন বিশেষভাবে শিক্ষিত লোকজন। এই শিক্ষিতরা ছিলেন সংঘ পরিষদ নামে পরিচিত। আদিকাল হতে ক্ষমতা পরিচালনাকারী এই পরিষদ ধর্ম সম্পর্কীয় বিতর্কিত বিষয়াবলী মিমাংসা করতেন। গ্রাম জনসমষ্টি প্রধান 'গ্রামীণ' নির্বাচিত না হলেও গ্রামবাসীদের সম্মতিক্রমেই তিনি ছিলেন গ্রামের নেতা। গ্রাম জনসমষ্টি নিয়ে এক একটি গোষ্ঠি গঠিত হতো এবং গোষ্ঠি প্রধান হতেন রাজা। পরবর্তীকালে গ্রামীণ নিযুক্ত হতেন রাজকর্মচারী হিসেবে। ধর্মের রক্ষাকর্তা হিসেবে রাজা প্রজাদেরকে ধর্মপালনে বাধ্য করতে প্রয়োজনে বল প্রয়োগ এবং বিবাদ বিসংবাদ মীমাংসা করতেন। মামলা-মোকদ্দমার সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকলে রাজার নিযুক্তীয় বিচারকরা বিচারাদালতে বিচার মিমাংসা করতেন। যাজ্ঞবল্ক্য, বৃহস্পতি ও নারদের ধর্মশাস্ত্র মতে বিচারকার্য পরিচালনা হতো। বিচারকরা ছিলেন গোত্রপ্রধান, সংঘ প্রধান ও গ্রাম প্রধান। এদের

www.pathagar.com

সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে উচ্চআদালতে আপিল এবং রাজার কাছে সর্বশেষ আপিল করা যেত।[১] কয়েকটি গ্রাম নিয়ে গোষ্ঠি এবং কয়েকটি গোষ্ঠির সমন্বয়ে গঠিত রাজ্যের রাজা শাসনকার্য পরিচালনা করতেন। শান্তিকালীন সময়ে আর্যগণ কৃষিকাজে আত্মনিয়োগ করে সেখানে ধর্মের প্রয়োগ শুরু করলে ধর্মের আনুষ্ঠানিকতা, গুরুত্ব ও জটিলতা বেড়ে যায়। এসময় ধর্মজ্ঞানে বিশেষজ্ঞ উচ্চবর্ণের ব্রাহ্মণের সংখ্যা, ক্ষমতা ও বিত্ত বেড়ে যায়। ব্রাহ্মণরা আর্য জাতির ইতিহাস, আইন ও সাহিত্য জ্ঞানের অধিকারী হিসেবে যুবকদেরকে তা শেখাতেন। এভাবে ব্রাহ্মণগণ জনসাধারণের শ্রদ্ধাভাজন পুরোহিত হিসেবে হিন্দু সমাজে সর্বোচ্চ মহত্তম আসনের অধিকারী হন। কালক্রমে তারা ক্ষত্রিয়দের ক্ষমতার প্রতিদ্বন্দ্বি হয়ে ওঠেন এবং ক্ষত্রিয়রা ব্রাহ্মণ অপেক্ষা নিকৃষ্ট বলে ঘোষণা করেন। তখন সমাজে সংখ্যালঘু আর্য শাসক শ্রেণীর নিচে অবস্থান ছিল বৈশ্য, ব্যবসায়ী সম্প্রদায় ও কিছু সংখ্যক স্বাধীন লোক ছাড়া শুদ্র নামে পরিচিত পরাভূত স্থানীয় বিপুল কর্মজীবী জনসাধারণ। সবার নিচে সামাজিক অবস্থান ছিল যারা যুদ্ধবন্দি হিসেবে শাস্তি স্বরূপ ক্রীতদাসে পরিণত হয়েছিল, যারা ধর্মান্তরিত হয়নি এবং যারা অস্পৃশ্য ও সমাজচ্যুত ছিল।[২]

তখন প্রজাদেরকে ধর্ম পালনে বাধ্য করতে দণ্ডই ছিল একমাত্র অস্ত্র। রাজা দণ্ড দিতেন ধর্মের প্রতিষ্ঠিত রীতিনীতি অনুযায়ী। আইন সম্পর্কে ঋষি বা জ্ঞানী ব্যক্তিদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হতেন রাজা। খ্রিষ্টপূর্ব ৭-৮ শ' অব্দে গৌতমের মতে বিচারকার্য পরিচালনায় রাজা তিনটি উৎস থেকে আইন নির্ধারণ করতেন। প্রথমত বেদ, বেদাংস্ত, ধর্মসূত্র ও পুরাণ, দ্বিতীয়ত ধর্মের পরিপন্থী নয় এরূপ প্রথা, কুল, সম্প্রদায় ও দেশের আচার, তৃতীয়ত কৃষক, বণিক, পশুপালক, কুসীদজীবী ও কারিগরদের নিজ নিজ সম্প্রদায়ের ওপর প্রযোজ্য প্রথা ও আইন। এসব আইন প্রয়োগে কোন সন্দেহ দেখা দিলে রাজা আইনে অভিজ্ঞ ঋষি বা জ্ঞানীদের থেকে পরামর্শ নিতেন। তখন ব্যভিচার, আঘাত ও চুরির মতো গুরুতর অপরাধ ছাড়া অন্য ক্ষেত্রে রাজা দণ্ড দিতেন না। প্রথম দিকে প্রদবিবক নামে রাজকর্মচারী সাক্ষ্য গ্রহণ করে রাজাকে বিচারকার্যে সহায়তা করতেন, পরবর্তীকালে প্রদবিবক স্থায়ী বিচারক পদে বিচার কাজ করতেন। বিষ্ণু ও যাজ্ঞবল্ক্যের মতে রাজসভার পারিষদবর্গ বিচার নিষ্পত্তিতে রাজাকে তাদের মতামত ও পরামর্শ দিয়ে সাহায্য করতেন। মনু'র মতে রাজা ব্রাহ্মণ সভাসদ নিযুক্ত করতেন। কিন্তু কাত্যায়নের মতে রাজসভায় সদবংশজাত বণিককেও সভাসদ করা উচিত। যাজ্ঞবল্ক্যের মতে রাজা অন্য কাজে ব্যস্ত থাকলে তার পক্ষে ব্রাহ্মণ বিচারক নিযুক্ত করে বিচারকার্য নিষ্পত্তি করতে দিতে পারতেন এবং ওই বিচারক রাজসভাসদদের পরামর্শ মেনে বিচার করতেন।[৩] বৃহস্পতি, নারদ ও মনু'র আইন গ্রন্থে রাজার আদালতে বিচার্য মামলার বিবরণে দেখা যায় যে, পারিবারিক বিরোধসহ ১৮ ধরনের মামলা-মোকদ্দমার বিচার হতো রাজার আদালতে।[৪] যাজ্ঞবল্ক্যের আমলে রাজা বিচার কাজ পরিচালনার জন্য স্থায়ী

www.pathagar.com

বিচারক নিয়োগ করতেন। এ বিচারকগণকে অধিষ্ঠাতা বা অধিক্রীতা বলা হতো। এই বিচারকগণের রায়ের বিরুদ্ধে রাজার কাছে আপিল করা যেত। বৃহস্পতির আমলে চার প্রকার আদালত ছিল। রাজা গ্রাম ও শহরে বিচার করার জন্য প্রতিষ্ঠাতা বা স্থায়ী আদালত স্থাপন করেছিলেন। তিনি অপ্রতিষ্ঠাতা ভ্রাম্যমাণ আদালতও প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। বণিক, সৈনিক ও বনবাসীদের বিবাদের বিচার করা ছিল অপ্রতিষ্ঠাতা আদালতের দায়িত্ব। রাজা প্রতিষ্ঠিত মুদ্রিতা আদালতের বিচারক ছিলেন প্রদবিবক যিনি রাজসভার অধ্যক্ষ হিসেবে রাজাকে বিচারকার্যে পরামর্শ দিতেন। সর্বোচ্চ আদালত ছিল সসিষ্ঠা। ওই আদালতের সভাপতিত্ব করতেন রাজা স্বয়ং।[৫] মনু'র বিধানে এক, দশ, কুড়ি, একশ এবং এক হাজার গ্রাম নিয়ে গঠিত প্রশাসনিক এককের কথা উল্লেখ রয়েছে। যাজ্ঞবল্ক্য ও পরবর্তী স্মৃতি শাস্ত্রকারগণ কুল, শ্রেণী ও পুগ নামে যে সকল বিচারআদালতের উল্লেখ করেছেন, তাতে সালিশী ব্যবস্থা ছিল না। তবে তা রাজার স্বীকৃত দেশীয় বিচার ব্যবস্থার অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ ছিল। একই পরিবার নিয়ে গঠিত কুল এবং সম্প্রদায়, গোত্র বা গোষ্ঠির লোকদের নিয়ে গঠিত হতো সভা বা পরিষদ। শ্রেণী বলতে বুঝাত কোন পেশায় নিয়োজিত কারিগরদের বা যে কোন ব্যবসায়ীদের সমিতি বা সংঘ। সভা, সমিতি বা সংগঠনকে বলা হতো পুগ। নারদের মতে কুল শ্রেণী, গণ ও রাজার নিযুক্ত বিচারক ও রাজা পর্যায়ক্রমে মামলার বিচার করার অধিকারী এবং পরবর্তীটি পূর্ববর্তীর উপরস্থ আদালত ছিল। বৃহস্পতির মতে কুল-এর রায়ের বিরুদ্ধে পর্যায়ক্রমে শ্রেণী, পুগ এবং রাজার নিযুক্ত বিচারকের কাছে আপিল করা যেত। রাজা ছিলেন সব বিচারকের উপরস্থ শেষ বিচারক।[৬] খ্রিষ্টপূর্ব ৭-৮ অব্দে গৌতমের আমলে বৈবাহিক অধিকার, বণ্টন, সম্পত্তির উত্তরাধিকার, দায়িত্ব ইত্যাদি পারিবারিক বিরোধের বিচার হতো না। প্রথম দিকে রাজার আদালতে শুধুমাত্র অপরাধী ও গুরুতর সামাজিক অনাচারের বিচার হতো। গৌতম যে অপরাধগুলোর বিচার রাজার আদালতে হতো বলে উল্লেখ করেছেন, তা হচ্ছে- নিম্নবর্ণের কেউ উচ্চ বর্ণের লোকদের প্রতি কটুক্তি, চুরি, অন্যের সম্পত্তির ক্ষতি সাধন, ঋণ আদায় ও সম্পত্তির দখল সংক্রান্ত মামলা।[৭] মনু'র বিধান মতে রাজা বা রাজকর্মচারী কোন মামলা দায়ের করতে পারতেন না। একমাত্র ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিই রাজার কাছে মামলা দায়ের করতে পারতেন। মনু ও নারদের মতে সাধারণ এই নিয়মের ব্যতিক্রম হিসেবে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তির পক্ষে তার প্রতিনিধি হিসেবে তার ভাই বা পিতা মামলা দায়ের করতে পারতেন। তবে কাত্যায়নের মতে গুরুতর মামলা দায়ের করতে হতো। তার পক্ষে কোন প্রতিনিধি মামলা দায়ের করার অধিকারী ছিল না। তবে কালক্রমে রাজা বা রাজকর্মচারী কতিপয় বিষয়ে মামলা দায়ের করার অধিকারী হন।[৮]

বিবাদিকে আদালতে হাজির করার দায়িত্ব ছিল বাদীর ওপর। পরবর্তীতে বিবাদিকে আদালতে হাজির করতে সমন দেয়ার বিধান করা হয়। কাত্যায়নের মতে বাদীর

www.pathagar.com

অভিযোগ আইনসম্মত মনে করলে রাজা বিবাদীকে হাজির হতে সংবাদ বাহক একজন রাজকর্মচারীকে পাঠাতেন। নারদ ও কাত্যায়নের মতে বিশিষ্ট কতিপয় ব্যক্তিকে আদালতে হাজির হতে সমন দেয়া যেত না।[৯] তখন বাদী বা বিবাদীর পক্ষে আদালতে মামলা পরিচালনা করার জন্য কোন আইনজীবী ছিল না। তবে ধর্মশাস্ত্রে পণ্ডিত এবং আইন ও আচার সম্পর্কে বিশেষ জ্ঞানের অধিকারী ব্রাহ্মণগণ প্রচলিত আইন সম্পর্কে পরামর্শ দিতেন। এখনকার আইনজীবীদের মতে তারা মক্কেলদের কাছ থেকে ফিস গ্রহণ না করলেও উপঢৌকন গ্রহণ করতেন।[১০] যাজ্ঞবল্ক্যের মতে চার ধরনের প্রমাণ আদালতে গ্রহণযোগ্য ছিল যথা- দৈব প্রমাণ, দখল প্রমাণ, মৌখিক সাক্ষ্য ও দালিলিক প্রমাণ। মৌখিক ও দালিলিক প্রমাণ প্রচলনের আগে দৈব প্রমাণ প্রচলিত ছিল। দৈব প্রমাণের মধ্যে ছিল বিষ, অগ্নি, তুলা, কোশা এবং জল বা অপ পরীক্ষা। আসামীকে তুলাদণ্ডে ওজন করে সে দোষী কিনা প্রমাণ করাকে তুলা প্রমাণ বলা হতো। আসামিকে আগুনে দিয়ে পরীক্ষা করে সে দোষী কিনা প্রমাণ করার নাম ছিল অগ্নি প্রমাণ। আসামিকে জলে ডুবিয়ে দোষী কিনা প্রমাণ করাকে অপ বা জল প্রমাণ বলা হতো। আসামিকে বিষাক্ত দ্রব্য খেতে বাধ্য করে সে দোষী কিনা প্রমাণ করাকে বলা হতো বিষ প্রমাণ। আর কোশা প্রমাণে আসামীকে দূর্গা, রুদ্র ও আদিত্য মূর্তি ধোয়া জল পান করানোর ১৪ দিনের মধ্যে আসামি বা তার নিকটাত্মীয়ের কোন অনিষ্ট না হলে সে নির্দোষ বলে প্রমাণিত হতো। কাত্যায়নের মতে মামলার একপক্ষ মানবিক প্রমাণ অর্থাৎ দালিলিক বা মৌখিক প্রমাণ দিতে চাইলেও অপর পক্ষ দৈব প্রমাণ দিতে দৈব প্রমাণের পরিবর্তে মানবিক প্রমাণ গৃহীত হতো। বৃহস্পতির মতে দালিলিক ও মৌখিক প্রমাণ সম্পর্কে সন্দেহ দেখা দিলে দৈব প্রমাণ গ্রহণ করা হতো। হারিতের মতে, চুক্তি, লেনদেন ইত্যাদি গোপনে বা অন্যের অনুপস্থিতিতে করা হতো কিংবা কোন দলিল জাল বলে অভিযোগ করা হতো তখন এসব বিরোধের বিচার করতে দৈব প্রমাণের সাহায্য নেয়া হতো। দৈব প্রমাণে উত্তীর্ণ হলে আসামী অভিযোগ থেকে অব্যাহতি পেত। কোন কোন ঘটনা বিচারক নিজেই জানতেন বা স্থানীয় গণ্যমান্য বক্তির কাছ থেকে জেনে নিতেন। অভিযোগের সত্যতা সম্পর্কে সন্দেহ দেখা দিলে আসামীকে দৈব প্রমাণ দ্বারা অব্যাহতি লাভ করার সুযোগ দেয়া হতো। কাত্যায়নের মতে মানহানিকর কটুক্তি বা জমি সম্পর্কিত বিরোধ মীমাংসায় দৈব প্রমাণ গ্রহণযোগ্য ছিল না। একপক্ষ মানবিক প্রমাণ ও অন্যপক্ষ দৈব প্রমাণের ওপর নির্ভর করলে মানবিক প্রমাণকে অগ্রাধিকার দেয়া হতো। গৌতমের মতে সাক্ষীকে হলফ নিয়ে সাক্ষ্য দিতে হতো এবং সাক্ষ্য দ্বারা মামলার সত্যতা প্রমাণ করতে হতো। অস্পষ্টম ও গৌতম দালিলিক প্রমাণের কথা উল্লেখ না করলেও বৈশিষ্ট্য দালিলিক প্রমাণ দ্বারা কোন কোন মামলা প্রমাণের বিষয় উল্লেখ করেছেন। তবে তার মতে মৌখিক সাক্ষ্যের পরই দালিলিক সাক্ষীর স্থান। পরবর্তী শাস্ত্রকারগণ দালিলিক সাক্ষ্যকে মৌখিক সাক্ষীর উপর স্থান দিয়েছেন।[১১] নারদের মতে অভিযোগ দু'প্রকার ছিল। বাদীর অভিযোগে অপরাধ বা ক্ষতির বর্ণনা থাকলে তাকে শংকাবিয়োগ এবং কেউ কোন ক্ষতি বা অপরাধের প্রস্তুতি

www.pathagar.com

নিলে বা আশংকা থাকলে তাকে তত্ত্ববিয়োগ হিসেবে ধরা হতো। অভিযোগ বা আর্জিকে বলা হতো পূর্ণপক্ষ। বৃহস্পতির মতে অভিযোগ রাজার কাছে গ্রহণযোগ্য বিবেচিত হলেই বিবাদির জবাব দিতে হতো। যাজ্ঞবল্ক্যের মতে নারী বা পশু সংক্রান্ত অপরাধের জবাব সঙ্গে সঙ্গে দিতে হতো। অন্য ধরনের অভিযোগের জন্য সময় নেয়ার বিধান ছিল। কাত্যায়নের মতে বিবাদিকে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যেই অভিযোগের জবাব প্রদান বাধ্যতামূলক ছিল। নারদের মতে জবাব অর্থহীন বা অপ্রাসঙ্গিক হতে পারতো না এবং বাদীর অভিযোগ সরাসরি খণ্ডন করে প্রমাণ সাপেক্ষে তা দাখিল করতে হতো। জবাবকে বলা হতো উত্তরপক্ষ। উত্তরপক্ষ চার ধরনের ছিল। যথা- সত্য, মিথ্যা, সত্যতা স্বীকার বা অস্বীকার এবং প্রাক নায়ক তথা পূর্ব সিদ্ধান্তের অজুহাত। বিবাদী জবাব দেয়ার পর উভয় পক্ষকে জামানত দাখিল করতে হতো। জামানত দাখিলের পর মামলা প্রমাণের প্রক্রিয়া শুরু হবার পর মানবিক তথা মৌখিক, দৈব এবং দালিলিক প্রমাণ গ্রহণ করা হতো। বিচারক নির্ধারণ করে দিতেন কোন পক্ষ প্রথম প্রমাণ দিতে শুরু করবে। সম্পত্তির দখল স্বত্বও প্রমাণ হিসেবে গৃহীত হতো। প্রথম দিকে দীর্ঘদিনের দখল স্বত্ব গ্রহণযোগ্য থাকলেও পরবর্তীকালে শুধু দখল দ্বারা স্বত্ব প্রমাণ হতো না।

মামলার শুনানিকে বলা হতো ক্রিয়া। মনু'র মতে সবাইর সাক্ষী গ্রহণযোগ্য নয়। তার মতে দোষী ব্যক্তি, ডাকাত, চোর, বন্ধু, আর্থিক স্বার্থবান, বিকৃতমনা বা বোধশক্তি রহিত, ক্ষুধার্ত, লোভী, অভাবগ্রস্ত, পিপাসার্ত, নির্ভরশীল, কারিগর, সুদখোর, সাধুব্যক্তির সাক্ষী গ্রহণযোগ্য নয়। তার মতে মহিলার পক্ষে মহিলা এবং কটুক্তিজনিত অপরাধে ব্রাহ্মণের পক্ষে যে কেউ সাক্ষ্য দিতে পারতো। পরস্পর বিরোধী বক্তব্য দিলে যে পক্ষে সাক্ষীর সংখ্যা বেশি অথবা উভয় পক্ষে সমান সংখ্যক সাক্ষী দিলে উৎকৃষ্ট গুণের অধিকারী সাক্ষীর বক্তব্য গ্রহণযোগ্য ছিল। উভয় পক্ষের সাক্ষী উৎকৃষ্ট গুণের অধিকারী হলে ব্রাহ্মণের সাক্ষী গ্রহণযোগ্য হতো।[১২] নিম্ন আদালতের রায়ের বিরুদ্ধে উর্ধ্বতন আদালতে আপিল এবং সর্বশেষ আপিল করা যেত রাজার আদালতে। যাজ্ঞবল্ক্যের মতে রাজার রায়ের বিরুদ্ধে পুনর্বিবেচনার আর্জি দেয়া হলে এবং পূর্বের রায় ভুল হয়েছে মনে করলে রাজা তা বাতিল করতেন। সেক্ষেত্রে যে পক্ষ আগে মামলায় জয়ী হয়েছিল এবং বিচারক মামলার রায় দিয়েছিলেন তাদের সবাইকে রাজা মামলার দাবির দ্বিগুণ অর্থদণ্ডে দণ্ডিত করতে পারতেন। তবে পূর্বের রায় সাক্ষী ও সভাসদদের দোষে ভুল হলে তা বাতিল করা হতো। মামলার রায় বা সিদ্ধান্তকে বলা হতো সিদ্ধি বা নির্ণয়। বৃহস্পতি, কাত্যায়ন ও নারদের মতে মামলায় জয়ী পক্ষকে লিখিতভাবে ডিক্রি তথা জয়পত্র দেয়া হতো। ডিক্রিতে বাদী-বিবাদীর দাবি, জবাব, বিচার্য বিষয়, সাক্ষ্যের বিবরণ, আদালতের সিদ্ধান্ত এবং উপস্থিত সভাসদদের নাম উল্লেখ থাকতো।[১৩]

বিচারকের কর্তব্য ছিল সাক্ষীকে হলফ করে সত্য সাক্ষ্য দেয়ার জন্য প্রভাবান্বিত করা। মনু'র মতে বিচারক ব্রাহ্মণকে সত্যবাদিতার, ক্ষত্রিয়কে অস্ত্র বা আরোহণের পশু বা রথ, বৈশ্যকে তার গবাদি পশু, স্বর্ণ ও শস্য এবং শুদ্রকে তার মস্তকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির

www.pathagar.com

অভিসম্পাতের শপথ নিতে হতো এবং সত্যবাদী সাক্ষী ইহকালে অনতিক্রম্য যশের অধিকারী ও পরকালে স্বর্গের উৎকৃষ্ট স্থানের সুখভোগ করবেন। প্রথম দিকে আইনজীবী গুরুত্বহীন হলেও কালক্রমে আইনজীবীগণ প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে ওঠে। তবে হত্যা, রাজদ্রোহিতা ও দস্যুতার মতো গুরুতর অপরাধের ক্ষেত্রে আসামির পক্ষে কেউ মামলা পরিচালনা করতে পারতো না। ফৌজদারী মামলায় দোষী ব্যক্তিকে কারাদণ্ড, বেত্রদণ্ড, অর্থদণ্ড, নির্বাসন, দৈহিক নির্যাতন, খনিতে শ্রমদাস দণ্ড বা মৃত্যুদণ্ড দেয়া হতো। দণ্ডিত অপরাধীর কাঁধে শূলদণ্ড চড়িয়ে চণ্ডালরা রাস্তায় রাস্তায় ঘুরাতো, পাশাপাশি ঢোল বাজিয়ে তার অপরাধ ও মৃত্যুদণ্ডের বিবরণ জনগণকে শুনিয়ে এ মর্মে ঘোষণা দিতো যে কেউ অনুরূপ অপরাধ করলে এমনিভাবেই দণ্ডিত হবে এবং সে ইহকাল ও পরকালে অভিসম্পাত লাভ করবে। এরপর শ্মশানে জল্লাদগণ দণ্ডিত অপরাধীকে নিয়ে গিয়ে তরবারি দিয়ে তার মস্তক বিচ্ছিন্ন করে ফেলতো। চোখ উপড়িয়ে, অঙ্গচ্ছেদ করে বা হাতির পায়ের নিচে পিষ্ট করেও মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হতো।[১৪] শারীরিক আঘাত, বল প্রয়োগ, অপরাধে উস্কানি, ব্যভিচার, অপরাধে সহায়তা, রাজা নির্ধারিত মূল্যের অধিক মূল্যে পণ্য বিক্রি ও অন্যের সম্পত্তি হরণ শাস্তিযোগ্য অপরাধ ছিল।

আত্মরক্ষার্থে যে কেউ আক্রমণকারীকে হত্যা করার অধিকারী ছিল। নারদের মতে ব্রাহ্মণ ব্যতীত অন্য বর্ণের বল প্রয়োগকারীকে অপরাধের গুরুত্ব অনুযায়ী অর্থ ও শারীরিক শাস্তি দেয়া যাবে। কিন্তু ব্রাহ্মণ অপরাধীকে কোন শারীরিক শাস্তি দেয়া যাবে না। এ ধরনের অপরাধে ব্রাহ্মণকে বড় জোর মাথা মুড়িয়ে, কপালে অপরাধের বিবরণ লিখে গাধায় চড়িয়ে রাস্তায় ঘুরিয়ে এলাকাছাড়া করা যাবে। সম্পত্তি সংক্রান্ত ব্যক্তিগত বিরোধসহ আর্থিক, দৈহিক, মানসিকভাবে কাউকে ক্ষতিগ্রস্ত করা যেমন দণ্ডনীয় অপরাধ ছিল তেমনি রাজার আদেশ-নির্দেশ অমান্য করা, রাজকার্যে বিঘ্ন ঘটানো, রাজদ্রোহ ইত্যাদিও দণ্ডনীয় অপরাধ ছিল। ভেজাল ও নকল স্বর্ণ বিক্রি, রাজা সম্পর্কে কটুক্তি, রাজার গোপনীয়তা প্রকাশ করা, রাজার বিরুদ্ধে মনিবের আদেশ মতো কাজ করা, আদালতের রায় অমান্য করা, বিচারকের সিদ্ধান্ত রাজার পুনর্বিবেচনায় মিথ্যা প্রমাণ হওয়া, ধৃত চোরকে ছেড়ে দেয়া, শুদ্র নিজেকে ব্রাহ্মণ বলে পরিচয় দেয়া, রাজ সনদে মিথ্যা বিবরণ লিখে রাজ অনুদান পরিবর্তন, অখাদ্য মাংস বিক্রি ইত্যাদি যাজ্ঞবল্ক্যের মতে শাস্তিযোগ্য অপরাধ ছিল। অপষ্টমের ধর্মসূত্র মতে নিম্ন বর্ণের শুদ্র উচ্চ বর্ণের মহিলার সঙ্গে ব্যভিচারের শাস্তি নিশ্চিত মৃত্যুদণ্ড। কিন্তু অপর তিনটি উচ্চ বর্ণের লোককে শুদ্র রমনীর সঙ্গে একই অপরাধে নির্বাসন দণ্ড দেয়া হতো। ব্যভিচারিনীকে অবশ্যই প্রায়শ্চিত্ত করতে হতো এবং শুদ্র ছাড়া অপর উচ্চ বর্ণের ব্যক্তি স্ববর্ণের নারীর সাথে ব্যভিচার করলে তাকেও প্রায়শ্চিত্ত করতে হতো। মনুর বিধান মতে পরস্ত্রীর সঙ্গে কথা বলা, ইয়ার্কি দেয়া, ওঠা-বসা করা, খেলাধুলা করা এবং এক সঙ্গে বসাও দণ্ডনীয় অপরাধ ছিল। তবে নারদের মতে কোন ব্যক্তি নিজ স্ত্রীকে বিনাদোষে ত্যাগ করলে ওই স্ত্রীলোকের সম্মতিক্রমে কেউ তার সঙ্গে ব্যভিচারে লিপ্ত হলে তার কোন শাস্তি হতো না। তবে কোন কুমারী মেয়ের সম্মতিক্রমে

www.pathagar.com

কেউ তার সঙ্গে ব্যভিচার করলে যদিও তার কোন শাস্তি হয় না তবে পুরুষ ব্যক্তিটিকে অলংকারাদি দিয়ে তাকে বিয়ে করতে হতো। দাসী বা পতিতার সঙ্গে ব্যভিচার শাস্তিযোগ্য না হলেও দাসী বা পতিতা কারুর রক্ষিতা হলে তার সঙ্গে অপর কারোর ব্যভিচার দণ্ডনীয় অপরাধ ছিল। বিবাহিত নারী ব্যভিচারিণী হলে তার চুল কেটে তাকে নিচু বিছানায় শয়ন, নিম্ন মানের খাদ্য ও বস্ত্র গ্রহণে বাধ্য করা ছাড়াও গৃহাদি ঝাড়ু দিতে হতো।[১৫] খ্রিষ্টপূর্ব ৭শ' অব্দে গৌতম, ৫শ' অব্দে অপষ্টম ও ৬৫০ অব্দে বুদ্ধায়নের ধর্মসূত্রে রাজার আদালতে বিচার্য বিষয়ের সামান্য সংখ্যা মাত্র উল্লেখিত আছে। তখন ঋণ ও আমানত ছাড়া রাজার কাছে বিচার্য বিষয় ছিল নিম্নবর্ণের ব্যক্তি কর্তৃক উচ্চ বর্ণের কাউকে কটুক্তি, আঘাত করা, বেদপাঠ-শ্রবণ ও আবৃত্তি করা, ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের সঙ্গে একাসনে বসা, উচ্চ বর্ণের নারীর সাথে ব্যভিচার করা, নরহত্যা, চুরি ও চোরাই মাল রাখা, অন্যের শস্য, গবাদিপশুর ক্ষতি বা হত্যা করা, চাকর ও রাখালের কর্মত্যাগ ইত্যাদি। খ্রিষ্টপূর্ব ৪ শ' অব্দে বৈশিষ্ঠের ধর্মসূত্রে রাস্তা, জমি, বাড়ি ও সীমানা সম্পর্কিত বিরোধ, পুত্রত্ব, উত্তরাধিকার ইত্যাদি রাজার আদালতে বিচার হতো। তখন শুদ্র ব্রাহ্মণকে গালি দিলে তার জিহ্বা ছিঁড়ে ফেলে তাকে শাস্তি দেয়া হতো। অথচ উচ্চ বর্ণের বৈশ্য বা ক্ষত্রিয় ব্রাহ্মণকে গালি দিলে তার জন্য শুধু অর্থদণ্ডের বিধান রয়েছে এবং ব্রাহ্মণ শুদ্রকে গালি দিলে তা কোন অপরাধ ছিল না। শুদ্র ব্রাহ্মণকে আঘাত করলে যে অঙ্গ দ্বারা আঘাত করেছে তা কেটে ফেলার দণ্ড দেয়া হতো। ব্রাহ্মণ কন্যার সঙ্গে শুদ্রের ব্যভিচারের দণ্ড ছিল লিঙ্গচ্ছেদ এবং ব্রাহ্মণ রক্ষিতার সঙ্গে ব্যভিচারের শাস্তি ছিল মৃত্যুদণ্ড।

শুদ্র বেদ শ্রবণ করলে তার কানে সিসা ঢেলে বধির করা হতো, বেদ আবৃত্তি করলে তার জিহ্বা কর্তন এবং বেদ স্মরণে রাখলে তাকে কেটে টুকরো টুকরো করে হত্যা করা হতো। উচ্চ বর্ণের মহিলা নিম্ন বর্ণের কারুর সাথে দৈহিক সম্পর্কে লিপ্ত হলে তাকে জনসমক্ষে কুকুর দিয়ে ভক্ষণ করানো হতো। নরহত্যার শাস্তি ছিল বর্ণভেদে বিভিন্ন প্রকার। শুদ্রের নর হত্যার শাস্তি মৃত্যুদণ্ড ছিল নিশ্চিত। আর উচ্চ বর্ণের কেউ নরহত্যা করলে সামান্য শাস্তি ভোগ করত। রাজার দায়িত্ব ছিল প্রত্যেক বর্ণের লোককে তার নিজ নিজ বর্ণের সীমার মধ্যে থাকতে বাধ্য করা এবং ওই সীমা অতিক্রমকারী এবং অন্যান্য অপরাধীকে শাস্ত্রমতে দণ্ড প্রদান করা।[১৬]

ভারতবর্ষে হিন্দু আইন ও বিচার পদ্ধতি মুসলমান শাসনামলে আংশিকভাবে এবং ইংরেজ শাসনামলে প্রায় সম্পূর্ণভাবে অকার্যকর হয়ে পড়ে। শুধুমাত্র, বিবাহ, নাবালকত্ব, দত্তক গ্রহণ, পুত্রত্ব, সম্পত্তির উত্তরাধিকার, ঋণ, বণ্টন, খোরপোষ দান, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানসহ পারিবারিক আইন সামান্য সংশোধিত আকারে চালু থাকে। ব্রিটিশ শাসনামলে প্রাচীন এসব নিয়মাবলী ধর্মীয় বিধান থেকে আলাদা করে নিয়ে মামলা বিচারের সময় প্রয়োগ করে হিন্দু শাস্ত্রীয় আইনগুলোকে কিছুটা হলেও ইহজাগতিক করেছিলেন।[১৭] ইংরেজ শাসন অবসানের পর স্বাধীন প্রজাতান্ত্রিক ভারতের সংবিধানে অস্পৃশ্যতা ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে প্রবেশাধিকারের ওপর বাধা বাতিল করা হয়েছে।

www.pathagar.com

১৯৫৫ সালে হিন্দু বিবাহ আইন ও ১৯৫৬ সালে হিন্দু উত্তরাধিকার আইন পাশ করে ভারতীয় প্রজাতন্ত্র হিন্দু সম্প্রদায়ের সম্পত্তির উত্তরাধিকার, দত্তক গ্রহণ, বিবাহ, খোরপোষ, অভিভাবকত্ব ইত্যাদি বিষয়ে আইনের আমূল পরিবর্তন করা হয়েছে। এক কথায় আইনের দৃষ্টিতে উল্লেখিত বিষয়ে বর্ণ নির্বিশেষে প্রত্যেক ভারতীয় হিন্দু নাগরিকের সমান অধিকার স্বীকৃত হয়েছে। তবে জৈন, বৌদ্ধ ও শিখ ধর্মাবলম্বীদেরকেও ওই পাশকৃত আইনে হিন্দু হিসেবে গণ্য করা হয়েছে।[১৮]

ভারতবর্ষে ইসলামী বিচার ব্যবস্থার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস

ইবনে কাসিম ছিলেন ভারতে মুসলিম অভিযানের প্রথম সেনানায়ক। এর আগেও মুসলমানরা ব্যবসা, ধর্ম প্রচার এবং পরবর্তীতে প্রজা শোষণের বিরুদ্ধে সশস্ত্র অভিযানে এদেশে এসেছে। ঐতিহাসিকদের মতে আরবীয়দের সঙ্গে ভারতীয়দের বাণিজ্য যেমন স্বাভাবিকভাবে চলেছিল; ৬৬৩ খৃস্টাব্দের পরেও অর্ধশতাব্দী ধরে তেমনিভাবে চলতে থাকে। বাণিজ্য সূত্রে সিন্ধু নদের মোহনা থেকে সিংহল পর্যন্ত অর্থাৎ আরব সাগরের ভারতীয় উপকূলবর্তী অঞ্চলে, প্রধানত বন্দরগুলোতে, ছোট ছোট মুসলিম বসতিও গড়ে উঠেছিল। শত্রুতার সূত্রপাত হলো ৭০৮ খৃস্টাব্দে। সে বছর সিংহল থেকে এক জাহাজ ভর্তি পণ্য সামগ্রীসহ মুসলিম রমণী ইরাক যাওয়ার পথে দেবলবন্দরের কাছে অপহৃত হয়।

সিন্ধুর ব্রাহ্মণ রাজা দাহিরের কাছে ইরাকের মুসলিম শাসক হাজ্জাজ অপহৃত রমণীদের প্রত্যার্পণের দাবি জানালে দাহির প্রত্যুত্তরে জানান যে, অপহরণকারীরা যেহেতু তার নিয়ন্ত্রণ বহির্ভূত জলদস্যু সেহেতু হাজ্জাজের দাবি পূরণে তিনি অক্ষম।[১৯] এরপর ক্রোধের বশবর্তী হয়ে হাজ্জাজ একদল সৈন্যসহ বিচক্ষণ সেনাপতি কাশিমকে পাঠিয়েছিলেন সিন্ধু অভিযানে। কিন্তু যুদ্ধে পরাস্ত সেনাপতি ও বিরাট মুসলিম সেনাদলকে দাহিরের সেনারা দেবল মন্দিরের ঠাকুরের সামনে টুকরো টুকরো করে হত্যা করে। এরপর হাজ্জাজ কাসিমের পুত্র মুহাম্মদকে দ্বিতীয় দফা অভিযানে পাঠান। ইনিই হলেন মুহাম্মদ বিন কাসিম। দ্বিতীয় দফা এই অভিযানের আরো একাধিক কারণের মধ্যে ছিল হাজ্জাজ ইরান তথা পারস্যের যুদ্ধে যখন প্রাণপণ লড়ছিলেন তখন রাজা দাহির হাজ্জাজের শত্রুকে সাহায্য করছিলেন। হাজ্জাজের শাসনকালে পারস্যের বিদ্রোহীদের রাজা দাহির আশ্রয় দিয়েছিলেন, পরাজিত বন্দি মুসলমানদের নির্মমভাবে হত্যা করা হয়েছিল এবং জাহাজ ভর্তি মুসলিম মহিলাদের ধর্ষণ ও প্রাণনাশের ঘটনায় জনসাধারণ ও পারিষদবর্গের পরামর্শে হাজ্জাজ ভারত আক্রমণের নির্দেশ দিয়েছিলেন। হাজ্জাজের প্রথম দফা আক্রমণের সিদ্ধান্তটিও আরব সভ্যতা, শিক্ষা ও হযরত মুহাম্মদ সা.-এর বাণী প্রচারের উদ্দেশ্যে বলা যাবে না; বরং ঐ অভিযানটি ছিল অবলা নারীর অবমাননায় ক্রোধনির্ভর। ৭১২ সালের জুন মাসে রাজা দাহির সাহসের সাথে যুদ্ধ করে নিহত হওয়ার এক বছরের মধ্যেই ভারত ভূমিতে দাহিরের গোটা সাম্রাজ্য মুহাম্মদ বিন কাসিমের নেতৃত্বে

www.pathagar.com

মুসলমানদের অধিকারে চলে যায়। সিন্ধু বিজয়ের পর অত্যন্ত ধার্মিক শাসক হাজ্জাজ এক চিঠিতে বিজেতাদের জন্য এক আচরণ বিধিমালা লিখে মুহাম্মদ বিন কাশিমকে পাঠিয়েছিলেন। তাতে তিনি লিখেছেন– 'যেহেতু বিজিতরা এখন আমাদের জিম্মি, অতএব তাদের জীবন ও সম্পত্তিতে আমাদের হস্তক্ষেপ করার কোন অধিকার নেই। সুতরাং তাদেরকে আপন আপন উপাস্যের মন্দির গড়তে দাও। স্বধর্ম পালনের জন্য কেউ যেন বাধা বা শাস্তি না পায়, স্বদেশে সুখে-স্বাচ্ছন্দ্যে বসবাসে তাদের যেন কেউ কোন বাধা না দেয়।'[২০] কিন্তু শ্রী বিনয় ঘোষ ভারতের সরকারি পাঠ্যপুস্তকে মুহাম্মদ বিন কাশিমের বিরুদ্ধে অভিযোগ করে লিখেছেন, বিধর্মীদের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করা এবং তাহাদের ছলে-বলে কৌশলে ধর্মান্তরিত করা ইসলামের প্রসার ও প্রতিষ্ঠার যুগে অন্যায় বলিয়া গণ্য হত না। সেই জন্য ইসলামের বিস্তারের পথ আরও সুগম হয়েছে তার জন্য দুর্ধর্ষ শক্তি সঞ্চয় ও প্রয়োগ করিতে কোন বাধার সৃষ্টি হয় নাই।[২১] কিন্তু অন্যান্য ঐতিহাসিকের চোখে, বিনয় ঘোষের লেখা এই ইতিহাস একপেশে এবং সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধি তাড়িত। মুসলমানদের সিন্ধু বিজয়ের পর রাজা দাহিরের পুত্র রাজা জয়সীমাহও ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন এবং বহু অনুগত প্রজা, বন্ধু ও আত্মীয়-স্বজনকে মুসলমান হতে উৎসাহ দেন। ইসলামের শান্তি সমতা, সাম্যবাদ ও বন্দিদের সাথে মানবিক আচরণই এর প্রধান কারণ। শ্রী সুরজিত দাশগুপ্ত লিখেছেন, বাস্তব সুবিধার জন্য দাহিরের পুত্র জয়সীমাহ সহ কয়েকজন হিন্দু রাজা খলিফা দ্বিতীয় উমরের প্রস্তাব অনুসারে ইসলাম গ্রহণ করেন এবং তাদের সঙ্গে জনসাধারণের একটি উল্লেখযোগ্য অংশও ধর্মান্তরিত হয়।[২২] ৭১২ সালে মুসলমানদের সিন্ধু বিজয়ের সময় থেকে ভারতবর্ষে ইসলাম ধর্মের প্রভাব পড়তে থাকলেও প্রকৃতপক্ষে তখন ইসলামী শাসন ও বিচার ব্যবস্থা চালু হয়নি। মুহাম্মদ বিন কাসিম সিন্ধুর পর মুলতান জয় করে সেখানে একজন প্রশাসক নিযুক্ত করে তার অধীনে কিছু মুসলিম সৈন্য রেখে যাওয়া ছাড়া ইসলামী আইন মতে দেশ শাসনের অবকাশ পাননি। তিনি দেশ শাসনের ভার রাজা দাহিরের আমলের হিন্দু ব্রাহ্মণ কর্মচারীদের ওপর ছেড়ে দিয়েছিলেন। তারা হিন্দু শাস্ত্রের বিধানমতে দেশ শাসন ও বিচারকার্য পরিচালনা করতেন, তবে তাদের কাজের তদারক করতেন মুসলমান প্রশাসক ও তার অধীনস্থ সেনাবাহিনী। তখন মুসলমান সৈন্যদের মধ্যে কোন বিরোধ উপস্থিত হলে তার বিচার করতেন কাজি ও মুফতি। কাজি ও মুফতির রায়ের বিরুদ্ধে মুসলিম প্রশাসকের কাছে আপিল করা যেত এবং তিনি কাজি ও মুফতির সাথে পরামর্শ করে রায় বাতিল বা পরিবর্তন করতে পারতেন। সিন্ধু বিজয়ের পর ৯৯১ সালে সবুক্তগীনের ভারত অভিযান পর্যন্ত ভারতে মুসলিম শাসন ও বিচার ব্যবস্থা চালু হওয়ার কোন সুযোগ ঘটেনি।

সবুক্তগীনের ভারত অভিযানের পর থেকে মুসলমানরা বহুবার ভারত অভিযান করেন। গজনীর সুলতান মাহমুদের বারবার ভারত আক্রমণের ফলে হিন্দু রাজাদের শক্তি দুর্বল হয়ে পড়ে। এরপর মোহাম্মদ ঘুরি ভারত জয় করে এদেশে স্থায়ী মুসলিম শাসনের ভিত্তি

www.pathagar.com

স্থাপন করেন। দাস বংশের সুলতানদের আমল থেকে ভারতে দীর্ঘস্থায়ী মুসলমান রাজত্বের সূচনা হয় এবং ভারতে ইসলামী আইনের বিধানমতে শাসন ও বিচারকার্য শুরু হয়। তখন থেকে ভারতে হিন্দু শাসন ও বিচার ব্যবস্থার অবসান ঘটে। তবে তখনো ভারতের সেসব স্থানে হিন্দু রাজাদের শাসন বহাল ছিল, যেখানে হিন্দু শাসন ও বিচার ব্যবস্থা চালু ছিল। ভারতে মুসলিম শাসন শুরু হলে বিভিন্ন দেশ থেকে মুসলিম জ্ঞানীগুণী ব্যক্তিরা এদেশে আসতে থাকেন। তাদের মধ্যে যারা ধর্মশাস্ত্র ও আইনশাস্ত্রে অভিজ্ঞ ছিলেন তাদেরকে মুসলমান সুলতানরা বিভিন্ন সরকারি পদে বিশেষ করে বিচারক পদে নিযুক্ত করতেন। বাগদাদে আব্বাসি খলিফাদের, স্পেনের উমাইয়া খলিফাদের এবং মিসরের ফাতেমি খলিফাদের শাসন ও বিচার ব্যবস্থার অনুকরণে ভারতের মুসলিম সুলতানগণ এদেশে ইসলামী শাসন ও বিচার ব্যবস্থা প্রবর্তন করেন। দাস সুলতান বা বাদশাহদের আমলে ভারতের বিভিন্ন স্থানে বিচারালয় তৈরি করা হয়েছিল এবং এসব আদালতে মামলা মোকদ্দমার জন্য বিচারকদের নিয়োগ দেয়া হয়েছিল। আদালতে ইসলামী আইনের বিধানমতে প্রদত্ত রায় ও ডিক্রী কার্যকর করা হতো। তখন নিম্ন আদালতের বিচারকার্য পর্যালোচনা করতে পৃথক মুরাফিয়াত আদালতও গঠন করা হয়েছিল। তাছাড়া মাদকদ্রব্য বিক্রি ও জুয়াখেলা বন্ধ, বেআইনী ব্যবসা ও নৈতিকতাবিরোধী কাজের তদারক ও নিয়ন্ত্রণের জন্য মুহতাসিবদেরও নিয়োগ করা হয়েছিল। অধস্তন আদালতের বিচারকদের বিচার কাজ তদারক করতে বাদশাহ কুতুবউদ্দীন আইবেক রাজধানী দিল্লীতে একজন প্রধান বিচারপতি বা কাজি উল কুজ্জাত নিযুক্ত করেছিলেন। সকল বিচারকের ওপর বাদশাহ ছিলেন সর্বোচ্চ বিচারক। আদি মামলার বিচার ছাড়াও বাদশাহ আপিল শুনানিতে নিজ আদালতের রায় বাতিল করে ন্যায়বিচারের স্বার্থে নতুন রায় দিতেন। বাদশাহ মোহাম্মদ বিন তুঘলক সরাসরি মামলার বিচার করা ছাড়াও অধস্তন বিচারকদের রায়ের বিরুদ্ধে আপিল শুনানি করতেন। বাদশাহ গিয়াসউদ্দিন বলবন দেশে ন্যায়বিচার সঠিকভাবে হচ্ছে কিনা তা জানতে গুপ্তচরদের প্রতিবেদনের ওপর নির্ভর করে প্রতিকারের ব্যবস্থা নিতেন। বাদশাহ সিকান্দার লোদী প্রধান বিচারকের পদ হিসেবে মীর আদিলের পদ সৃষ্টি করেন।[২৩] ইসলামী শাসন ও বিচার ব্যবস্থা চালুর পূর্বে ভারতে দীর্ঘকাল হিন্দু শাসন ও বিচারব্যবস্থা বহাল ছিল। আর্যগণ ভারত জয় করার পর তাদের ধর্ম ও শাসন ব্যবস্থা এদেশে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে জনগোষ্ঠীকে চারটি বর্ণ ও শ্রেণীতে বিভক্ত করেছিলেন। কার্যত ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় শ্রেণী একত্রে দেশ শাসন করতো। তারা ছিল উচ্চ বর্ণের আর ভারতবর্ষের বিজিত জনগোষ্ঠী যারা কৃষি, শিল্প ও বিভিন্ন পেশাজীবী ছিল তারা ছিল নিম্নবর্ণের শূদ্র। মধ্যবর্তী বর্ণের বৈশ্যশ্রেণী শুধু ব্যবসা বাণিজ্যে নিয়োজিত ছিল। হিন্দু আইনের প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল, আইনের চোখে সবাই সমান ছিল না। যে কাজ উচ্চ বণের জন্য ধর্ম ও আইনসম্মত সে কাজই নিম্নবর্ণের জন্য ছিল ধর্ম ও আইনবিরুদ্ধ এবং অপরাধ। একই অপরাধের জন্য উচ্চ বর্ণের লোকের শাস্তি ছিল অর্থদণ্ড, তিরস্কার বা লোকচোখে হেয় করার মত লঘুদণ্ড

www.pathagar.com

আর নিম্নবর্ণের জন্য একই অপরাধের শাস্তি ছিল অঙ্গহানি ও মৃত্যুদণ্ডের মত গুরুদণ্ড।[২৪] ইসলামি শাসন ও বিচার ব্যবস্থায় এরূপ বৈষম্য ছিল না। এর কারণ ছিল মুসলমানদের মধ্যে কোন প্রকার শ্রেণী বিভাগ ছিল না। মুসলমান শাসক ও বিচারক জাতি ধর্ম নির্বিশেষে সকলকে সমান চোখে দেখতেন এবং দোষী ব্যক্তিকে শাস্তি দেয়ার সময় তার ধর্মের কারণে কোন প্রকার তারতম্য করতেন না। ভারতে মুসলমান বাদশাহ ও সম্রাটগণ হিন্দু ও অন্য ধর্মাবলম্বীদের ব্যক্তি আইনের ওপর কোন প্রকার হস্তক্ষেপ করেননি এবং তাদের ধর্মচর্চায়ও কোন প্রকার বিধিনিষেধ আরোপ করেননি। ভারতের গ্রাম সমাজে আবহমানকাল থেকে প্রচলিত পঞ্চায়েত প্রথার ওপরেও তারা কোন হস্তক্ষেপ করেননি; বরং বিরোধ নিষ্পত্তিতে পঞ্চায়েত প্রথাকে উৎসাহিত করতেন তারা।[২৫] স্থানীয় অমুসলমানগণ পঞ্চায়েতের মাধ্যমে তাদের ধর্মীয় বা ব্যক্তি আইন সম্পর্কিত বিরোধ নিষ্পত্তি করতে না পারলে মুসলিম প্রশাসক বা কাজির নিকট বিচারপ্রার্থী হলে তখন তাদের ধর্মীয় ও আইনশাস্ত্রে পণ্ডিতদের পরামর্শ মতে মুসলিম প্রশাসক বা কাজি বিচার করতেন।[২৬] যদি কোন বিষয়ে মামলার একপক্ষ মুসলমান ও অপর পক্ষ অমুসলমান হতো তখন মুসলিম আইনমতে বিচার হতো। ফৌজদারী মামলা এবং ইহজাগতিক বিষয়ে দেওয়ানি মামলার উভয়পক্ষ অমুসলমান হলেও ইসলামী আইনের বিধানমতে বিচার হতো। তবে যেসব ধর্মীয় আইন ভঙ্গের জন্য মুসলমানদের বিরুদ্ধে ফৌজদারী বিচার হতো সে সকল অপরাধের জন্য অমুসলমানদের বিরুদ্ধে কোন ফৌজদারী মামলা হতো না। সাক্ষ্য-প্রমাণ ও আইনের বিধান মতে মামলা বিচার হতো। এক পক্ষ মুসলমান অপর পক্ষ অমুসলমান এজন্য বিচারে কোন বৈষম্য ছিল না। আইনত যার যা প্রাপ্য তাকে বিচারক তা ডিক্রী দিতেন বা আইনত আসামীর যে শাস্তি প্রাপ্য তাকে তাই দিতেন। ফলে ভারতের যেসব অঞ্চলে তখনো হিন্দু রাজাদের রাজত্ব বহাল ছিল সেখানেও হিন্দু বিচার ব্যবস্থার কঠোরতা হ্রাস পায় এবং হিন্দু বিচার ব্যবস্থা মুসলমান বিচার ব্যবস্থার সাম্যনীতি দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়ে পরিবর্তিত হতে থাকে।[২৭] ভারতে মুসলিম শাসনকালকে, সুলতানি আমল ও মোঘল আমলে ভাগ করা হয়ে থাকে। ১২০৬ সালে কুতুবউদ্দিন আইবেকের রাজত্বকাল থেকে ১৫২৬ সালে মোঘল বাদশাহ বাবর কর্তৃক ইব্রাহীম লোদিকে পানিপথের যুদ্ধে পরাস্ত করে দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করা পর্যন্ত সময়কে সুলতানি আমল বলা হয়।[২৮]

সুলতানি আমলে রাজধানী দিল্লিতে বাদশাহ নিজে দু'জন খ্যাতিমান আইন বিশেষজ্ঞ মুফতির সাহায্যে আদি ও আপিল মামলা বিচার করতেন। সর্বোচ্চ ফৌজদারি আপিল আদালত ছিল দেওয়ানি মাজালিম এবং সর্বোচ্চ দেওয়ানি আপিল আদালতের নাম ছিল দেওয়ান ই রিসালাত। বাদশাহ দেশের সকল আদালতের প্রধান হলেও তার অনুপস্থিতিতে প্রধান বিচারপতি তথা কাজি উল কুজ্জাত সর্বোচ্চ বিচারক ছিলেন। ১২৪৮ সালে সুলতান নাসিরউদ্দিন তদানীন্তন প্রধান বিচারপতির ওপর ক্ষুব্ধ হয়ে সদরই জাহান-এর পদ সৃষ্টি করে তাকে বিচার বিভাগের প্রধান করেন। তখন থেকে প্রধান বিচারপতির

www.pathagar.com

পরিবর্তে সদর ই জাহানের আদালতে ধর্মীয় মামলার বিচার হতো। পরে বাদশাহ আলাউদ্দিন এ দুটি পদ একত্রিত করেন। কিন্তু বাদশাহ ফিরোজ শাহ তুঘলক ওই দুটি পদকে আবার পৃথক করেন। ১৫৩১ সালে বাদশাহ মোহাম্মদ বিন তুঘলক বিদ্রোহীদের বিচারের জন্য রাজধানীতে দেওয়ানই সিয়াসত নামের আদালত প্রতিষ্ঠা করেন। ইসলামি আইন বিশেষজ্ঞ মুফতি, হিন্দু আইন বিশেষজ্ঞ পণ্ডিত, সরকার পক্ষে মামলা পরিচালনাকারী মুহতাসিব ও আদালতের প্রশাসনিক কর্মকর্তা দাদবাক এর সমন্বয়ে গঠিত প্রধান বিচারপতির আদালতে সব ধরনের আপিল মামলার বিচার করতেন প্রধান বিচারপতি তথা কাজি উল কুজ্জাত।[২৯] সুলতানি আমলে প্রাদেশিক প্রশাসক বা নাজিমের আদালতে নাজিম স্বয়ং বিচার কাজ পরিচালনা করতেন। এর নাম ছিল আদালত নাজিমই সুবা এবং প্রাদেশিক প্রধান কাজিকে নিয়ে এ আদালতে নিম্ন আদালতের রায়ের বিরুদ্ধে আপিল বিচার হতো। প্রাদেশিক রাজধানীতে প্রদেশের প্রধান কাজির আদালতে সব ধরনের দেওয়ানি ও ফৌজদারি মামলার বিচারও করা হতো। তাছাড়া প্রধান কাজি প্রদেশের অধস্তন কাজিদের বিচারকর্মও তদারক করতেন। প্রাদেশিক দেওয়ানের আদালতের ভূমিরাজস্ব সংক্রান্ত মামলার চূড়ান্ত বিচারও করা হতো।[৩০] প্রতি প্রদেশের জেলাগুলোতে জেলা সদরে ওই জেলার কাজি সব ধরনের দেওয়ানি ও ফৌজদারি মামলার বিচার করতেন। তাছাড়া এ আদালতে পরগণার কাজি, কোতোয়াল ও গ্রাম পঞ্চায়েতের রায়ের বিরুদ্ধে আপিল করা যেত। মুফতি, পণ্ডিত, মুহতাসিব ও দাদবাক তথা মীর আদিলের সহায়তা নিয়ে জেলা কাজি বিচারকার্য সম্পাদন করতেন। জেলা ফৌজদারের আদালতে ছোটখাট ফৌজদারি মামলা, সন্দেহভাজন অপরাধী ও জনসাধারণের নিরাপত্তা সংক্রান্ত মামলার বিচার হতো। তখন প্রতিটি জেলা গঠিত হতো অনেকগুলো পরগণা নিয়ে। প্রতিটি পরগণা সদরে ছিল অধস্তন কাজি ও কোতায়ালের আদালত। জেলা কাজি আদালতের মতো পরগণার কাজির আদালতে পরগণার দেওয়ানি, ফৌজদারি ও ধর্মীয় বিরোধ সংক্রান্ত মামলারও বিচার হতো। কোতওয়ালের কাছে ছোটখাট ফৌজদারি মামলা দায়ের করা যেতো এবং তিনি ছিলেন শহরের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা।

তখন প্রতিটি পরগণা গঠিত হতো অনেকগুলো গ্রাম নিয়ে। স্থানীয় বিরোধ মীমাংসায় প্রত্যেক গ্রামে ছিল গ্রাম সভা বা পঞ্চায়েত। গণ্যমান্য ৫ জন গ্রামবাসীকে নিয়ে গঠিত পঞ্চায়েত গ্রামের নির্বাহী ও বিচার বিভাগীয় দায়িত্ব পালন করতো। পঞ্চায়েত প্রধানকে নিযুক্ত করতেন নাজিম বা ফৌজদার। পঞ্চায়েত রাষ্ট্রীয় আইন মতে মামলার বিচার না করে স্থানীয় প্রথা ও পদ্ধতির ওপর নির্ভর করে গ্রামের দেওয়ানি ও ফৌজদারি বিরোধের নিষ্পত্তি করতেন। পঞ্চায়েতের বিচার কর্মে রাষ্ট্রীয় কোন হস্তক্ষেপ ছিলনা। সাধারণ পঞ্চায়েতের রায় মামলার পক্ষদের ওপর বাধ্যকর ছিল এবং এ রায়ের বিরুদ্ধে কোন আপিল গ্রহণ করা হতোনা। সুলতানি আমলে আইনে উচ্চশিক্ষিত ব্যক্তিদেরকে বাদশাহ নিরপেক্ষ বিচারক পদে নিয়োগ দিতেন। রাজ্যের বিশিষ্ট গুণান্বিত ব্যক্তিই কেবল প্রধান

www.pathagar.com

বিচারপতি পদে বাদশাহ দ্বারা নিয়োগ পেতেন। সর্বোচ্চ জ্ঞান ও দক্ষতার অধিকারী বিচারকগণ সমাজে অতীব সম্মানিত ব্যক্তি ছিলেন। সমাজে তাদের পরিচিতি ছিল 'আফজাল ই রাজগর' অর্থাৎ সর্বোচ্চ দক্ষতা ও জ্ঞানের অধিকারী সর্বাদিক সম্মানিত ব্যক্তি। সৎগুণাবলী ও নিরপেক্ষ বিচারের জন্য সে আমলের অনেক প্রধান বিচারপতি ইতিহাসে বিখ্যাত হয়ে আছেন। পর্যটক ইবনে বতুতার মতে কাজিরা তাদের দক্ষতা এবং নিরপেক্ষ রায় প্রদানের মাধ্যমে প্রায়শই আইনের শিক্ষক হয়ে উঠতেন। দুর্নীতিপরায়ণ এবং সন্দেহভাজন চরিত্রের অধিকারী বিচারবিভাগীয় কর্মকর্তার বিরুদ্ধে জনগণ উষ্মা প্রকাশ করলে তাকে তার কর্মস্থল থেকে অপসারণ করা হতো। অদক্ষতা এবং দুর্নীতির অভিযোগ পাওয়া গেলে এমন কি প্রধান বিচারপতিকেও বরখাস্ত কিংবা পদাবনতি ঘটিয়ে অধস্তন কাজির পদে নামিয়ে দিতেন বাদশাহ। অযোগ্য এবং দুর্নীতিপরায়ণ কাজিকে বরখাস্ত করা হতো এবং তিনি সমাজে ভয়ংকরভাবে নিন্দিত হতেন।[৩১]

ইসলামী আইনে আল্লাহপাক হচ্ছেন ন্যায়বিচারের উৎস। খলিফা বা রাজ্য শাসক বাদশাহ ন্যায়বিচারের উৎস নন। তা সত্ত্বেও ভারতের মুসলমান শাসকগণ বিশেষত মোঘল সম্রাটগণ নিজেদের ন্যায়বিচারের উৎস মনে করতেন। পাঠান ও মোঘল সম্রাটগণের অনেকেই রাজসভায় বসে মামলার বিচার করতেন।[৩২] পাঠান সম্রাটদের মধ্যে শেরশাহ দেশ শাসন ও বিচার ব্যবস্থায় অনেক সংস্কার প্রবর্তন করেছিলেন। তিনি সর্বপ্রথম ধার্য খাজনা দেয়ার অঙ্গীকার সম্বলিত কবুলিয়ত গ্রহণ করে রায়তদের বরাবরে পাট্টা দেয়ার ব্যবস্থা করেছিলেন। গ্রাম পঞ্চায়েত প্রথা অক্ষুণ্ন রেখে মুকদ্দম তথা গ্রাম প্রধান নিযুক্ত করে তার ওপর গ্রামে সংঘটিত অপরাধ ও অপরাধীদের ওপর নজর রাখতে এবং অপরাধীদেরকে বিচারআদালতে সোপর্দ করার ক্ষমতা দিয়েছিলেন।[৩৩] তিনি বলেছিলেন, সরকারের স্থিতিশীলতা ন্যায়বিচারের ওপর নির্ভর করে। দুর্বলকে নির্যাতন করলে এবং শক্তিমানকে আইন ভঙ্গ করার সুযোগ দিলে ন্যায়বিচার লংঘিত হয় এবং তা যেন কোনক্রমে না ঘটে সে সম্পর্কে নজর রাখতে হবে।[৩৪] তিনি দক্ষ লোকদের মধ্য থেকে বিচারক নিযুক্ত করে ধর্মীয় আলেমদের একাধিপত্য খর্ব করেছিলেন। মুসলমান শাসকদের মধ্যে তিনিই ভারতে সর্বপ্রথম বিচার প্রক্রিয়াকে ধর্মীয় আইনের কবল থেকে কিছুটা মুক্ত করে ইহজাগতিক আইনের অধীন করেছিলেন। তবে মুসলমান ও হিন্দুর ওপর বাধ্যকর ধর্মীয় আইনের ওপর তিনি কোন হস্তক্ষেপ করেননি। মোঘল বাদশাহদের মধ্যে পাঠান শেরশাহর আগে বাদশাহ বাবর ও হুমায়ুনের আমলে পাঠান বাদশাহদের প্রবর্তিত বিচার ব্যবস্থাই বলবৎ ছিল। মোঘল সম্রাট আকবর দেশে শাসন ও বিচার ব্যবস্থায় শেরশাহ প্রবর্তিত নিয়ম কানুন আরো সংস্কার করে দেশে সুশাসন প্রতিষ্ঠা করেন।[৩৫]

"শেরশাহ মাত্র পাঁচ বছর দিল্লির সিংহাসন-আসীন ছিলেন। এই অল্প সময়ে তিনি শাসনব্যবস্থার ব্যাপক সংস্কার করেন। তিনি তার সাম্রাজ্যকে ৪৭টি সরকারে এবং প্রতিটি সরকারকে কয়েকটি পরগণায় বিভক্ত করেন। এই প্রশাসনিক ব্যবস্থায় বাংলায় ১৯টি

www.pathagar.com

সরকার ছিল। প্রতিটি সরকারের শিকদার-ই-শিকদারান (মুখ্য শিকদার) এবং মুন্সেফ-ই-মুন্সেফান (মুখ্য মুন্সেফ) খেতাবধারী ২ জন উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা নিয়োগ করা হতো। তারা শিকদার, আমীন, মুন্সেফ, কারকুন, পাটোয়ারী, চৌধুরী ও মুকাদ্দাম প্রমুখ পরগণা কর্মকর্তাদের তদারকি করতেন। রাজকর্মচারীরা একই স্থানে দীর্ঘদিন চাকরি করে স্বীয় প্রভাব-প্রতিপত্তি যাতে বিস্তার করতে না পারে সে জন্য তিনি তিন বছর পরপর তাদের বদলির নিয়ম করেন। জমির রাজস্ব নির্ধারণের জন্য জমির জরিপ করে উৎপাদিত ফসলের এক-চতুর্থাংশ রাজস্ব ধার্য করা হতো। এই রাজস্ব নগদ অর্থে বা ফসলের অংশ দ্বারা পরিশোধ করা যেত। তিনিই সর্বপ্রথম পাট্টা (ভূমি স্বত্বের দলিল) ও কবুলিয়াত (চুক্তি দলিল) প্রথা চালু করে জমির ওপর প্রজাদের মালিকানা প্রতিষ্ঠিত করেন। কৃষিকার্যে উৎসাহের জন্য তিনি কৃষি ঋণের ব্যবস্থা করেছিলেন।

সাম্রাজ্যের প্রত্যন্ত এলাকার সঙ্গে রাজধানী আগ্রার চমৎকার সংযোগ সড়ক নির্মাণ করেন তিনি। তিন হাজার মাইলের দীর্ঘ সোনারগাঁ থেকে পাঞ্জাব পর্যন্ত গ্রান্ড ট্যাক রোড তার স্মৃতি বহন করছে। রাস্তার দুই পাশে তিনি বৃক্ষরোপণ ও সরাইখানা স্থাপন করেছিলেন। সংবাদ আদান-প্রদানে যাতে বেশি বিলম্ব না হয় সে জন্য দ্রুতগামী অশ্বের মাধ্যমে তিনি ডাক ব্যবস্থা দ্রুততর করার ব্যবস্থা নিয়েছিলেন। শেরশাহ পুলিশ বিভাগের সংস্কার করেছিলেন। গ্রাম প্রধানদের তিনি স্ব স্ব এলাকার শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষার দায়িত্ব দেন। তিনি একটি শক্তিশালী সেনাবাহিনী ও গোয়েন্দা বাহিনী থাকার ব্যাপারেও মত পোষণ করতেন।

শেরশাহ একজন সুদক্ষ শাসক ও বীর যোদ্ধা ছিলেন। ন্যায়বিচারের প্রতি তার প্রবল অনুরাগ ছিল। দেওয়ানি ও ফৌজদারি উভয় মামলার প্রধান বিচারক ছিলেন তিনি। শেরশাহ অত্যন্ত প্রজাবৎসল ছিলেন। তিনি ধার্মিক ছিলেন। কিন্তু তার শাসন ব্যবস্থায় ধর্মীয় গোঁড়ামির কোন স্থান ছিল না। বিহারের সাসারামে তার সমাধি রয়েছে।"[৩৬]

মোগল বাদশাহ আকবর নিজ ধর্মের ব্যাপারে নিস্পৃহ এবং অন্য ধর্মের ব্যাপারে ছিলেন উদারচেতা। ধর্ম ও সাহিত্যের ব্যাপারে তার প্রধান উপদেশদাতা ছিলেন ফৈজী ও আবুল ফজল। ফৈজী প্রাচীন সংস্কৃত কাব্য রামায়ন ও মহাভারত অনুবাদ করেন। পরে আকবর গোয়া থেকে একজন রোমান ক্যাথলিক পর্তুগীজ পাদ্রীকে আনার পর ফৈজী সুসমাচার অনুবাদ করেন। তিনি হিন্দুদের প্রশ্রয় দেন এবং সতীদাহ প্রথা তুলে দিতে জিদ ধরেন। মুসলিম সরকারকে প্রত্যেক হিন্দুর অবশ্য দেয় মাথাপিছু জিজিয়াকর তিনি তুলে দেন। আকবরের রাজস্বনীতির প্রবর্তক অর্থমন্ত্রী রাজা টেডরমল কৃষিজীবীদের কাছ থেকে কর সংগ্রহের জন্য পরিমাপের একই মানদণ্ড এবং পরে নিয়মিত জরিপ ব্যবস্থা চালু করেন। প্রতি বিঘার উৎপাদন এবং তদভিত্তিতে সরকারকে প্রদেয় ঠিক করার জন্য উর্বরতা অনুসারে জমিকে ৩ শ্রেণীতে ভাগ করা হয়। তারপর প্রতি শ্রেণীর গড়পড়তা উৎপাদন অনুসারে প্রতি বিঘার পরিমাণ ধার্য করা হয়, ভূমিজাত শস্যের এক-তৃতীয়াংশ রাজস্ব হিসেবে গৃহীত হতো। টাকায় এর তুল্য কর কতটা দিতে হবে ঠিক করার জন্য ১৯ বছরে

www.pathagar.com

সারাদেশে মূল্যের হেরফের বিচার করে তার গড়পড়তা হার মুদ্রায় দেয় বলে ধার্য হল। আকবর সমগ্র সাম্রাজ্যকে ১৫টি সুবায় বিভক্ত করে প্রতি সুবায় প্রধান রাজকর্মচারী হিসেবে সুবাদার নিযুক্ত করেন। ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠায় আইনের প্রতিভূ ছিল কাজীরা। শুনানির পর তারা তাদের বক্তব্য জানাতেন প্রধান বিচারক মিরই আদল-এর কাছে। সম্রাটের ক্ষমতার প্রতিভূ মিরই আদল সে বক্তব্য শুনে রায় দিতেন। অংশত মুসলিম প্রথা এবং অংশত মনুসংহিতার ওপর ভিত্তি করে দণ্ডবিধির সংস্কার করেন আকবর। দিল্লীকে তদানীন্তন পৃথিবীর সবচেয়ে বিরাট ও সবচেয়ে সুন্দর নগরীতে পরিণত করেন তিনি।[৩৭] আইন-ই আকবরীতে মামলা বিচারের সময় প্রত্যেক সাক্ষীর সাক্ষ্য পৃথকভাবে লিপিবদ্ধ করে মামলার বিষয় পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে গভীর মনোযোগ দিয়ে তা বিবেচনা করে রায় দিতে বলা হয়েছে। এতে আরো বলা হয়েছে কাজি মামলা তদন্ত করে রায় দেবেন আর ওই সিদ্ধান্ত কার্যকর করবেন মীর আদিল।[৩৮] সম্রাট আকবরের আমলে ফিকাহ্ শাস্ত্র মতে মামলার বিচার হতো। সুবেদার, ফৌজদারসহ সাধারণ বিচারকগণ শাহী ফরমানের বিধানমতে কাজি ও মুফতির পরামর্শ নিয়ে বিচার করতেন। রাজস্ব কর্মকর্তাগণ সরকার নির্ধারিত নিয়ম অনুসরণ করে বিরোধ নিষ্পত্তি করতেন। সম্রাট আকবর দেশের সর্বোচ্চ আপিল আদালত হলেও কোন মামলা দরবার কক্ষে বসে তিনি স্বয়ং উজির, মুফতি, কাজির সংগে আলোচনা না করে বিচার করতেন না। বাদশাহ মামলার রায় দিতেন মৌখিকভাবে। বিচার কাজে দরবার কক্ষে তিনি উজির, কাজি, আমীর ওমরাহ ও মুফতিদের নিয়ে বসতেন। তখন দারোগাই আদালত বা আদালতের কার্যাধ্যক্ষ, কেরানী, লিপিকর উপস্থিত থাকতেন। বাদশাহর মৌখিক রায় মীর আদিলের নির্দেশে মীর মুনশী লিখে তার অনুলিপিতে বাদশাহী সিলমোহর দিয়ে তা কার্যকর করতে সুবাদারের কাছে পাঠিয়ে দিতেন। বাদশাহ আকবর কোন কোন সময় হিন্দু প্রজাদের মামলা বিচারের সময় ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদের পরামর্শ মতে প্রাচীন ভারতীয় দৈব প্রমাণ পদ্ধতি অবলম্বন করতেন। সম্রাট আকবরের আমলে প্রবর্তিত বিচার ব্যবস্থা পরবর্তী মোঘল সম্রাটদের আমলেও বহাল থাকে। সম্রাট জাহাঙ্গীর ও শাহজাহান প্রতি বুধবার দেওয়ানই খাসে বসে কাজি, অদিল, মুফতি আদালতের কার্যাধ্যক্ষ ও কোতোয়ালের সাহায্যে মামলার বিচার করতেন। সম্রাট জাহাঙ্গীরের অনুমোদন ছাড়া মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা যেত না। প্রাচীন ভারতীয় বিচারে জীবন্ত অবস্থায় শরীরের চামড়া তোলা ও দোষী ব্যক্তির নাক ও কান কর্তনের শাস্তি নিষিদ্ধ করেছিলেন যথাক্রমে সম্রাট আকবর ও জাহাঙ্গীর। সম্রাট জাহাঙ্গীর সবধরনের আবওয়াব বা অবৈধ কর আদায় নিষিদ্ধ করেছিলেন। তখন সপ্তাহে ১০ থেকে ২০টি আপিল ও মূল মোকদ্দমা বাদশাহর দরবারে বিচারের জন্য দাখিল হতো।[৩৯] বাদশাহ আওরঙ্গজেব প্রায় প্রতিদিনই দরবারে বসে মামলার বিচার করতেন। তিনি দেওয়ান-ই মাজালিম নামে সর্বোচ্চ বিচারআদালত প্রতিষ্ঠা করে প্রশাসনিক ও বিচারবিভাগীয় কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগের শুনানিও নিষ্পত্তি করতেন। তিনিই সর্বপ্রথম বিচারকের দুর্নীতিকে অপরাধ হিসেবে গণ্য করেন এবং মামলা বিচারে অহেতুক

www.pathagar.com

বিলম্ব করলে বিচারক কর্তৃক ভুক্তভোগীকে ক্ষতিপূরণ দানের বিধান করেন। কোন মামলায় জটিল প্রশ্ন দেখা দিলে তিনি কয়েকজন বিচারকের মতামতের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত নিয়ে মামলার রায় দিতেন। তিনি প্রশাসক ও বিচারকের দায়িত্ব পালন তদারকির জন্য গোয়েন্দা রিপোর্টের ভিত্তিতে দোষী সাব্যস্ত হলে সাময়িক বরখাস্ত বা পদচ্যুত করতেন। তিনি নারী, শিশু, শয্যাশায়ী রোগী, পঙ্গু পক্ষাঘাতগ্রস্ত, উন্মাদ, বৃদ্ধ ও যুদ্ধবন্দিকে মৃত্যুদণ্ড নিষিদ্ধ করেন এবং দাস প্রথা ও যুদ্ধবন্দিকে শাস্তি দেয়া বন্ধ করে দেন। তিনি যে কোন নাগরিক সরকারের কাজে ক্ষতিগ্রস্ত হলে সরকারের বিরুদ্ধে ক্ষতিপূরণ আদায়ে মামলা করার অধিকার দেন। দ্রুত মামলার বিচার এবং অঙ্গচ্ছেদ ও প্রাণদণ্ড নিষিদ্ধ করে তিনি দোষী চোর-ডাকাতকে জেলদণ্ড দেয়ার বিধান করেছিলেন। মামলার তারিখ ধার্য না হলে অভিযুক্ত আসামীকে প্রতিদিন আদালতে হাজির করার নির্দেশও তিনি দিয়েছিলেন। তার এসকল ফরমানের ফলে দেশে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।[৪০]

মোঘল বিচার ব্যবস্থার বেশ কয়েকটি বৈশিষ্ট্য ছিল। চমৎকারিত্বের দিক থেকে এসব বৈশিষ্ট্যের মধ্যে অন্যতমগুলো ছিল, অপরাধীকে শাস্তি দেয়ার পরিবর্তে অপরাধ সংঘটন রোধ করার জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালানো। এজন্য তখন চুরি ডাকাতিতে কারো সম্পদ খোয়া গেলে কোতোয়াল বা ফৌজদার তার তদন্ত করে চোর-ডাকাত ধরতে ব্যর্থ হলে বা খোয়া যাওয়া জিনিস উদ্ধার করতে না পারলে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিকে ক্ষতিপূরণ দিতে সংশ্লিষ্ট কোতোয়াল বা ফৌজদারকে বাধ্য করা হতো। কারণ নগরে শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষার দায়িত্ব ছিল কোতোয়ালের ওপর এবং নগরের বাইরে শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষার দায়িত্ব ছিল ফৌজদারের ওপর। তবে ফৌজদার যেমন ছোটখাটো অপরাধের বিচার করতে পারতেন কোতোয়াল তা পারতেন না। কোতায়ালকে অভিযোগ তদন্ত করে বিচারে জন্য আসামীকে বিচারকের নিকট হাজির করতে হতো।[৪১] এ বিচার ব্যবস্থার আরেকটি বৈশিষ্ট্য হচ্ছে দ্রুত মামলার বিচার করা। এ সময় গ্রামবাসী ও পেশাজীবীদের পঞ্চায়েত কর্তৃক তাদের নিজস্ব বিরোধ নিষ্পত্তি করা অব্যাহত ছিল এবং এর ফলে বেশিরভাগ মামলা মোকদ্দমা পঞ্চায়েতে বিচার করা হতো। এ কারণে খুব কম সংখ্যক মামলাই বিচারকের নিকট আদালতে রুজু হতো। তাছাড়া তখন আদালতে বিচার পদ্ধতি ছিল সহজ সরল। দীর্ঘসূত্রতার কোন সুযোগই ছিল না তখন। বাদশাহ দেশের একচ্ছত্র অধিপতি হওয়া সত্ত্বেও কোন মামলা বিচারের সময় তিনি সঠিক সিদ্ধান্তে পৌঁছতে না পারলে বিষয়টি কয়েকজন বিচারক ও মুফতির নিকট মতামতের জন্য পাঠাতেন। তারা একমত হয়ে যে সিদ্ধান্ত দিতেন, বাদশাহ সে সিদ্ধান্ত অনুযায়ী মামলার রায় দিতেন। আর তারা একমত হতে না পারলে যে মত বাদশাহর কাছে যুক্তিসঙ্গত মনে হতো সে মতেই তিনি মামলার রায় দিতেন। এ বিচার ব্যবস্থার অপর বৈশিষ্ট্য ছিল রাজদ্রোহ ব্যতীত অন্য সকল প্রকার অপরাধের জন্য আসামীকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করা বন্ধ করে দেয়া। ইসলামী বিচার ব্যবস্থায় ধর্মীয় বিধান ভঙ্গ করার অপরাধের জন্য অপরাধী বিচারে দোষী সাব্যস্ত হলে তাকে নির্দিষ্ট শাস্তি দিতে বাধ্য ছিলেন বিচারক। কাজি বা বাদশাহ এসব অপরাধ

www.pathagar.com

মাফ করতে বা কম শাস্তি দিতে পারতেন না। অপরদিকে হত্যার জন্য অপরাধীকে মৃত্যুদণ্ড না দিয়ে মৃত ব্যক্তির ওয়ারিশ সম্মত হলে বিচারক তাকে ক্ষতিপূরণের রায় দিতে পারতেন। মানুষের বিরুদ্ধে অপরাধের ক্ষেত্রে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি বা মৃত ব্যক্তির ওয়ারিশ অপরাধীকে ক্ষমা না করলে বা অপরাধীর কাছ থেকে ক্ষতিপূরণ নিতে রাজি না হলে এবং আইন নির্দিষ্ট শাস্তি দাবি করলে বিচারক তদ্রূপ শাস্তি দিতে বাধ্য ছিলেন। তাছাড়া রাষ্ট্রদ্রোহিতা, সরকারি অর্থ আত্মসাৎ করা, ডাকাতি ইত্যাদি রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে অপরাধ হিসেবে গণ্য করা হতো। রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে অপরাধে অপরাধীকে বাদশাহ ইচ্ছা করলে ক্ষমা করতে পারতেন। ইসলামী আইনে অপরাধের শাস্তির বিধান থাকা সত্ত্বেও মোঘল বাদশাহগণ রাষ্ট্রদ্রোহিতা ভিন্ন অপর সকল অপরাধের জন্য মৃত্যুদণ্ড বা অঙ্গহানির পরিবর্তে আসামীকে জেলে আবদ্ধ করে শাস্তি দেয়ার নিয়ম চালু করে শাস্তির কঠোরতা হ্রাস করেছিলেন।[৪২]

ভারতবর্ষে মুসলিম শাসকদের ন্যায়পরায়ণতার অসংখ্য দৃষ্টান্ত রয়েছে। ১৫২৬ থেকে ১৭৫৭ সাল পর্যন্ত মোঘল শাসনামলের এই সুদীর্ঘ সময়ে রাজনৈতিক ও যুদ্ধাবস্থা ব্যতীত সাধারণ বিচারের মাধ্যমে মাত্র ২৫টি মৃত্যুদণ্ড কার্যকর হয়। তন্মধ্যে সম্রাট আকবরের আমলে ১৩, জাহাঙ্গীরের আমলে ১১ এবং শাহজাহানের আমলে মাত্র ১টি প্রাণদণ্ডের আদেশ কার্যকর করা হয়েছে। সম্রাট আওরঙ্গজেবের আমলে প্রাণদণ্ড নিষিদ্ধ ছিল। যে সব অপরাধে এসব প্রাণদণ্ড দেয়া হয়েছিল তা হচ্ছে, ছাগলের গোশত বলে কুকুরের গোশত বিক্রির অপরাধে ১ জন, বিবাহিত ব্যক্তির ব্যভিচারের অপরাধে ১ জন, শিকদার দ্বারা রায়তগণকে অত্যাচার উৎপীড়নের অপরাধে ১ জন, রাজ শিকারে এক জিলাওদার কর্তৃক প্রতিবন্ধক সৃষ্টির অপরাধে ১ জন, হুকুম ছাড়া সেনা কর্তৃক শত্রু ছাউনি লুণ্ঠনের অপরাধে ১ জন, রাজপথে ডাকাতির অপরাধে একজন, রাজকোষাগার থেকে চুরির অপরাধে ১ জন, প্রকাশ্য বিদ্রোহের অপরাধে ৭ জন এবং নরহত্যার অপরাধে ১১ জনকে মৃত্যুদণ্ড দেয়া হয়। মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত এ ২৫ জনের মধ্যে ৫ জনকে হাতির পায়ে পিষে, একজনকে গলাটিপে শ্বাসরোধ করে এবং বাকি ১৯ জনকে শিরচ্ছেদ বা ফাঁসি দিয়ে হত্যা করা হয়।[৪৩]

স্যার ডব্লু ফোস্টার অনূদিত অক্সফোর্ড ১৯২১ পৃ: ২২৮ এবং একেএম আবদুল আলীম: ভারতে মুসলিম শাসন ব্যবস্থার ইতিহাস, পৃ: ১৯৮) উপরোক্ত তথ্যে একথাই সুস্পষ্টভাবে প্রমাণীত হয় ভারতে মুসলিম শাসনামলে আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি কতটা উন্নত ছিল।

প্রাচীন বাংলার সমাজ ও বিচার ব্যবস্থা

আদি যুগ বলতে অনুমান সাড়ে ৬শ' সাল থেকে ১২শ' সাল, মধ্যযুগ বলতে ১২০১ থেকে ১৮শ' সাল এবং আধুনিক যুগ বলতে ১৮শ' থেকে বর্তমান কাল পর্যন্ত ধরা হয়ে থাকে। কিন্তু খ্রিস্টপূর্ব বহু শতাব্দী যাবত বাংলাদেশে কি অবস্থা বিরাজ করছিল তার নির্ভরযোগ্য প্রামাণ্য ইতিহাস পাওয়া যায় না; যেমনটি পাওয়া গেছে প্রাচীন মিসরীয়, গ্রীক ও রোমান

www.pathagar.com

সভ্যতা সম্পর্কে। খৃষ্টপূর্ব ও খৃষ্ট পরবর্তী শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে দ্রাবিড়, আর্য, অনার্য, বৌদ্ধ, মৌর্য, সেন, গুপ্ত, পাল সামন্তরাজই শুধু নয় আরো অনেক জাতির শাসন চলেছে বাংলায়। তবে ঐতিহাসিকগণ অনুমান করেন, বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতো অতি প্রাচীনকালে ভারতীয় উপমহাদেশের অংশ হিসেবে বাংলাদেশেও আইনের ক্ষেত্রে মাৎস্যন্যায় বিরাজ করছিল। খ্রিস্টপূর্ব ৩ হাজার বছর আগে থেকে বাংলায় যে সুসভ্য দ্রাবিড় সভ্যতা বিরাজমান ছিল তা খ্রিস্ট জন্মের কয়েক শ' বছর আগে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় আর্য হিন্দুদের আক্রমণে। হিন্দু সভ্যতা প্রতিষ্ঠা হওয়ার পর যদিও সমাজে নিয়ম-শৃঙ্খলার ভিত্তি স্থাপন হয়েছিল কিন্তু তা কার্যত বন্দি হয়ে পড়েছিল উচ্চবর্ণের আর্য ব্রাহ্মণদের খেয়াল-খুশির মধ্যে। বাংলায় হিন্দু পর্বের বিচার ব্যবস্থা সম্পর্কে নির্ভরযোগ্য দলিলের সংখ্যা সীমিত। সংগৃহীত তথ্যে জানা যায়, তখনকার সমাজ ব্যবস্থা ছিল সম্পূর্ণ পিতৃতান্ত্রিক। পারিবারিক কলহ বিবাদ নিষ্পত্তি করতেন গোত্র প্রধান। দুই গোত্রে বিরোধ বাধলে তা মীমাংসা করতো পঞ্চায়েত যা এ যুগে সালিসী বৈঠক হিসেবে পরিচিত। রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা হবার পর রাজা নিজেই বিচার করতেন। বিচারের ব্যাপারে তাকে সাহায্য করতেন একদল ব্রাহ্মণ উপদেষ্টা। ক্রমে এলাকা বিস্তৃতির সঙ্গে সঙ্গে সেসব এলাকায় একজন করে বিচারক নিযুক্ত হন। রাজা শুধু আপিল নিষ্পত্তি করতেন। বিচার হতো শাস্ত্রমতো ধর্মীয় বিধান ও প্রথার অনুশাসনে। অভিযুক্ত আসামীর দোষ প্রমাণে সে আমলে কিছু উদ্ভট নিয়ম-কানুন প্রবর্তন করা হয়েছিল। দোষী প্রমাণে পরীক্ষার অন্যতম ৯টি পদ্ধতির নাম তৌল, অগ্নি, জল, বিষ, কোষ, তণ্ডুল, উত্তপ্ত তৈল, উত্তপ্ত লৌহ এবং মূর্তি পরীক্ষা।

তৌল পরীক্ষা: আসামী ও ব্রাহ্মণ বা বিচারকের একত্রে পূর্ণদিন উপবাসের পরদিন আসামীকে গঙ্গাজল দিয়ে স্নান করিয়ে পুরোহিত হোমাদিসহ দেবদেবীর পূজা করতেন। পূজা ও যাগযজ্ঞ সমাপ্তির পর আসামী দাঁড়িপাল্লাকে উদ্দেশ্য করে বলত, হে তুলাদণ্ড তুমি সত্যের আধার, প্রাচীনকালে দেবতাগণ তোমাকে সৃষ্টি করেছেন। অতএব তুমি সিদ্ধিদাতা, তুমি সত্য প্রকাশে আমাদের মনের সন্দেহ দূর করো। তুমি মাতৃসম পূজনীয়। আমি অপরাধী হলে নিচে নিয়ে যাও আর নিরপরাধ হলে আমাকে উপরে তোল। এরপর পুরোহিত নানা মন্ত্র জপে আসামীকে দাঁড়িপাল্লায় তুলে দিত। দাঁড়িপাল্লা তাকেসহ নিম্নগামী হলে দোষী আর উর্ধ্বগামী হলে সে নির্দোষ সাব্যস্ত হতো। আর পাল্লা ছিঁড়ে পড়ে গেলে মহাঅপরাধী গণ্য হতো আসামী।

অগ্নিপরীক্ষা: দীর্ঘ ৯ হাত প্রস্থ ও আধাহাত গভীর গর্তে পিপুল কাঠের শুকনো ডালে আগুন ধরিয়ে দেয়া হতো। আসামী হাতজোড় করে আগুনকে বলতো, হে অগ্নি তুমি সর্বভূতে বিদ্যমান, ধর্ম অধর্মের সাক্ষী ও সর্বশুচি। অতএব তুমি সত্যের প্রকাশ ঘটাও। প্রার্থনা শেষে আসামী খালি পায়ে আগুনের ওপর দিয়ে হেঁটে যেত। আগুনে তার পা না পুড়লে নির্দোষ এবং পা দগ্ধ হলে সে দোষী সাব্যস্ত হতো।

www.pathagar.com

জলপরীক্ষা: অভিযুক্ত আসামীকে জলাশয়ে নাভি পর্যন্ত ডুবিয়ে দাঁড়িয়ে বলতে হতো, হে বরুণ দেব, তুমি সত্য প্রকাশে আমাকে রক্ষা করো। এই শপথ উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে লাঠিহাতে একজন ব্রাহ্মণও পানিতে নামতো। এরপর অপর এক ব্যক্তি জলাশয়ের কিনারে দাঁড়িয়ে ধনুক দিয়ে পরপর ৩টি তীর নিক্ষেপ করতো। সবচেয়ে দূরে নিক্ষিপ্ত তীরটি আনতে এক ব্যক্তিকে নির্দেশ দেয়ার সঙ্গে সঙ্গে আসামীকে পানিতে ডুব দিতে হতো। তীর নিয়ে পূর্বস্থানে ফিরে আসার আগে আসামী নিঃশ্বাস নিতে পানির ওপরে মাথা তুললে দোষী আর তীর আনার পর মাথা তুললে সে অভিযোগ থেকে রেহাই পেত।

কোষ পরীক্ষা: যে কোন দেবদেবীর মূর্তি ধোয়া তিন কোষ পরিমাণ পানি অভিযুক্তকে পান করতে হতো। এরপর ১৪ দিন কঠোর প্রহরায় থাকাবস্থায় অভিযুক্ত যদি কোন প্রকার অসুস্থ হতো তাহলে দোষী আর সুস্থ থাকলে তাকে নির্দোষ গণ্য করা হতো।

বিষ পরীক্ষা: এ পরীক্ষার ক্ষেত্রে ৩ ধরনের যে কোন একটি প্রয়োগ করতেন বিচারক। প্রথমত, অভিযুক্ত ব্যক্তি বিষের পাত্রকে প্রণাম করে বলতো, হে হলাহল তুমি ব্রহ্মার পুত্র, তুমি ধর্ম ও সত্যপরায়ণ। যদি আমি নির্দোষ হই তাহলে তুমি অমৃতের মতো হও এবং আমাকে রক্ষা কর। এরপর তাকে ওই বিষ পান করতে নির্দেশ দেয়া হতো। বিষ পানের পর মৃত্যু হলে সে অপরাধী ছিল এবং বেঁচে গেলে সে নির্দোষ সাব্যস্ত হতো।

দ্বিতীয়ত, অভিযুক্ত ব্যক্তিকে স্নান করিয়ে পরে পুরোহিত নানা যাগযজ্ঞের আনুষ্ঠানিকতা শেষে ৫৪ রতি পরিমাণ খাঁটি গাওয়া ঘৃতের সাথে মেশানো বিষাক্ত গাছের শেকড় তাকে খেতে বাধ্য করা হতো। সে নির্দোষ হলে তার ওপর বিষক্রিয়া হতো না আর মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়লে সাব্যস্ত হতো যে সে তার পাওনা শাস্তিটাই পেয়েছে।

তৃতীয়ত, মাটির হাঁড়িতে একটি ধাতব মুদ্রার সাথে গোখরা কিংবা কেউটে সাপ রেখে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে হাত দিয়ে মুদ্রাটি তুলতে বলা হতো। মুদ্রা তুলতে গিয়ে সাপের ছোবল না খেলে নির্দোষ এবং ছোবল খেয়ে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়লে সাব্যস্ত হতো সে দোষী ছিল।

উত্তপ্ত তৈল পরীক্ষা: কড়াইতে অগ্নিতাপে টগবগ করে ফুটন্ত তেলে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে হাত ডোবানোর নির্দেশ দেয়া হতো। ডোবানোর পর হাত দগ্ধ হলে সে দোষী এবং দগ্ধ না হলে সে নির্দোষ সাব্যস্ত হতো।

উত্তপ্ত লৌহ পরীক্ষা: আগুনে পোড়ানো লাল টকটকে লৌহদণ্ড অভিযুক্ত ব্যক্তির হাতে দেয়া হতো। হাত পুড়লে দোষী আর না পুড়লে সে নির্দোষ সাব্যস্ত হতো।

মূর্তি পরীক্ষা: একটি পাত্রে লোহার তৈরি ও রূপার তৈরি দু'টি মূর্তি রেখে অভিযুক্ত ব্যক্তির চোখ বেঁধে একটি মূর্তি তোলার নির্দেশ দেয়া হতো। সে রূপার মূর্তি হাতে নিলে নির্দোষ আর লোহার মূর্তি তুললে দোষী সাব্যস্ত হতো। এসব পরীক্ষা দিতে গিয়ে অভিযুক্ত ব্যক্তিদের অধিকাংশই মারা যেত। দৈবাৎ কেউ বেঁচে গিয়ে দোষী সাব্যস্ত হলে তাকে পরবর্তী শাস্ত্রীয় বিধান মতে শাস্তি ভোগ করতে হতো। তবে এসব বিচারের ক্ষেত্রে আবার কিছু নিয়ম-কানুন প্রচলিত ছিল। যেমন- বৃদ্ধ, অন্ধ, রোগগ্রস্ত, ব্রাহ্মণ, স্ত্রীলোক বা

www.pathagar.com

অল্প বয়স্ক বালক-বালিকা কোন অপরাধে অভিযুক্ত হলে শুধু তুলাদণ্ড অর্থাৎ দাঁড়িপাল্লায় উঠিয়ে তাদের বিচারপর্ব সম্পন্ন হতো। নিম্নবর্ণের শুদ্র অভিযুক্ত হলে অগ্নি, জল অথবা বিষ দিয়ে পরীক্ষা করে তার বিচারকাজ সমাধা করা হতো।

মামলার সাক্ষী হিসেবে হিন্দু শাস্ত্রে উচ্চবর্ণকেই অগ্রাধিকার দেয়া হয়েছে। বৃহস্পতির বিধানে বলা হয় বিচারকার্যের সাক্ষীদের অবশ্যই অভিজাত বর্ণ বা গোত্র থেকে আসতে হবে, এমনকি তাদের হতে হবে শুদ্ধাচারি ও বেদস্মৃতিশাস্ত্রে ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান নিয়মিত পালনকারী। এ ব্যাপারে কাত্যায়নের বিধান হলো, নিম্নবর্ণের কোন অভিযোগকারী উচ্চবর্ণের কোন সাক্ষী দিয়ে অভিযোগ প্রতিষ্ঠা করতে পারবে না। এ ব্যাপারে নারদ কিন্তু অনেক নমনীয়। তার মতে যে কোন বর্ণের মামলায় বর্ণ নির্বিশেষে যে কোন ব্যক্তি সাক্ষী হতে পারবেন। নারদ আবার মিথ্যা সাক্ষ্য যারা দিতে পারে তাদের তালিকা দিয়ে বলেছেন, ঐন্দ্রজালিক, নট, মাহুত, চর্মকার, চণ্ডাল, শুদ্র ও তার সন্তান, পণ্ডিত এবং কৃষক মিথ্যা সাক্ষ্য দিতে পারে। যাজ্ঞবল্ক্য বলেন, শুদ্রের জন্যও তুলাদণ্ড ব্যবহার করা উচিত। অপর তিনজন ধর্ম শাস্ত্রের প্রণেতা বলেন, ব্রাহ্মণকে তুলাদণ্ড, ক্ষত্রিয়কে আগুন, বৈষ্যকে জল ও শুদ্রকে বিষ দ্বারাই যাচাই করা উচিত। মনুসংহিতায় দণ্ডকে দেখা হয়েছে শাসনের মূল হাতিয়ার ও ধর্ম রূপায়ণের সঠিক ব্যবস্থা হিসেবে। সারা পৃথিবী অধীনতা মেনে নেয় দণ্ডের মাধ্যমে এবং উচ্চ নিচে মেলামেশা রদ করে দণ্ড। দণ্ড মহাতেজা, দণ্ড রাজা, সে পুরুষ, সে শাস্তিদাতা, দণ্ডই সমস্ত লোককে চালায়। দণ্ডই রক্ষা করে, সবাই যখন ঘুমায় দণ্ড তখন জেগে থাকে।[৪৪] কালক্রমে এই দণ্ডনীতির বিবর্তন হয়ে দৈব প্রমাণপদ্ধতি গুরুত্ব হারাতে থাকে। দৈব প্রমাণের পরিবর্তে দালিলিক ও মানবিক প্রমাণাদি আদালতে অগ্রাধিকার পেতে থাকে।

ঐতিহাসিক চার্লস স্টুয়ার্ট লিখেছেন 'প্রাচীন বাংলাদেশকে প্রাচীন ভারত থেকে একটি পৃথক রাজ্য হিসেবে দেখার মতো যথেষ্ট প্রমাণ নেই।' ভারতীয় সভ্যতা কত প্রাচীন তা নিয়ে মতভেদ থাকলেও এবং আর্যদের ভারতে আগমনের পূর্বে ভারতে কোন সভ্যতা গড়ে ওঠেনি বলে যে ধারণা বহুকাল যাবত প্রচলিত ছিল ১৯২৪ সালে মহেনজোদারো ও হরপ্পাতে প্রত্নতাত্ত্বিক খনন কাজের ফলে যে প্রাচীন সভ্যতা আবিষ্কৃত হয়েছে তাতে প্রমাণিত হয়েছে যে খুব উন্নত ধরনের নগর সভ্যতা আর্যদের আগমনের পূর্বেই ভারতে গড়ে উঠেছিল। এই প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতা সমসাময়িক বেবিলনীয় ও মিসরীয় সভ্যতা থেকে উন্নত ছিল। উল্লেখিত দু'টি সভ্যতার ঘর-বাড়িও মহেঞ্জোদারোর দালান কোঠার সমান উন্নত ছিল না।[৪৫] সিন্ধুর লারকানা জেলার কৃত্রিম পাহাড়ের উপর ২য় শতাব্দীর বৌদ্ধ মন্দিরের তলদেশে আবিষ্কৃত হয়েছে মহেঞ্জোদারো নামে পরিচিত বিশাল প্রত্নতাত্ত্বিক ধ্বংসাবশেষ। মহেঞ্জোদারো শব্দের অর্থ মৃতের পাহাড়। অনুমান করা হয়, যিশু খ্রিস্টের জন্মের দু'হাজার বছর বা তারও পূর্বে সিন্ধু নদীর উপত্যকায় মহেঞ্জোদারোতে গড়ে উঠেছিল একটি সমৃদ্ধ নগর-সভ্যতা। মহোঞ্জোদারোর নগর পরিকল্পনা ছিল অত্যন্ত উন্নত ধরনের। নগরীর আবাসগৃহ, রাস্তাঘাট, নর্দমা, পয়:নিষ্কাশন ব্যবস্থা ছিল সুপরিকল্পিত। এই প্রাচীন নগরীতে শস্য সংরক্ষণের জন্য ছিল বিশাল

www.pathagar.com

শস্যভাণ্ডার, জনগণের ব্যবহারের জন্য ছিল গণ-স্নানাগার, বিদ্যালয় এবং সভাকক্ষ। নগরপ্রাচীর, সুপ্রশস্ত রাস্তাঘাট ও অন্যান্য নির্মাণকাজে পোড়ামাটির ইট ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়েছে। বন্যা এবং বহি:শত্রুর আক্রমণ থেকে রক্ষার জন্য মূল দুর্গটি নিজের নগর এলাকা থেকে অনেক উঁচুতে নির্মিত। মহেঞ্জোদারোর ধ্বংসাবশেষ থেকে উদ্ধারকৃত দ্রব্যাদির মধ্যে রয়েছে ব্রোঞ্জ ও তামার তৈরি বর্শাফলক, ছুরি ও কুড়াল। এ ছাড়া তামা ও ব্রোঞ্জের তৈরি বিভিন্ন আকারের পাত্র, স্বর্ণালংকারসহ বিভিন্ন ধরনের অলংকার, পোড়ামাটির তৈরি ফলক, সীলমোহর, প্রস্তর ও ব্রোঞ্জ নির্মিত মূর্তি সিন্ধু সভ্যতার শিল্পরীতির পরিচয় বহন করে। এদের ব্যবহৃত লিপির অর্থ উদ্ধার করা যায়নি বলে এই সভ্যতার ইতিহাস অনেকাংশে রহস্যাবৃত্ত।[৪৬]

খ্রিস্টপূর্ব তিন শতাব্দী আগ পর্যন্ত প্রায় তিন হাজার বছরের উর্ধ্বকাল পর্যন্ত এ সভ্যতা টিকে ছিল।[৪৭] আর্যদের ভারতে আগমনের আগে দক্ষিণ ভারতে সুসভ্য দ্রাবিড় জাতি বাস করত। তাদের দুঃসাহসিক বণিকগণ ব্যবসা করার জন্য সমুদ্র পাড়ি দিয়ে সুমেরিয়া ও বেবিলনে যেত এবং তাদের নগরবাসীগণ নানা প্রকার বিলাসব্যসন ও সুসংস্কৃতিতে অভ্যস্ত ছিল।[৪৮]

নব্য-প্রস্তর যুগে বাংলাদেশে জনবসতির যে নির্দশন পাওয়া গেছে তাতে মনে হয় আদি অধিবাসীগণ বন্য অবস্থা বা শিকার জীবন ছেড়ে কৃষি জীবন শুরু করে। কৃষি জীবনের আগে এদেশের আদি অধিবাসী ছিল নিগ্রো প্রতিম নামে এক জাতি এবং তারা অস্ট্রিকদের সাথে বিলীন হয়ে গেছে। নৃতত্ত্ববিদদের মতে নিগ্রোদের পর বাংলার প্রাচীনতম অধিবাসী ছিলো অস্ট্রো-এশিয়াটিক জাতি বা অস্ট্রিকগণ। তারা অস্ট্রেলিয়া ও ইন্দোনেশিয়ার মানুষ। প্রাগৈতিহাসিক কালে তারা ইন্দোচীন হয়ে বাংলাদেশে প্রবেশ করে। নিষাদ জাতি তাদের একটি শাখা। কোল, ভীল, সাঁওতাল, ভেড্ডিক প্রভৃতি অস্ট্রিকদের বংশের। তারা অস্ট্রিক ভাষায় কথা বলত। অস্ট্রিকরা কৃষি কাজ জানতো। তারাই এদেশে কৃষি কাজের প্রচলন করে। অস্ট্রিকগণ প্রাগৈতিহাসিক যুগে এদেশে আগমন করে। তাদের পর মোঙ্গলীয় ও দ্রাবিড়গণ বাংলাদেশে আসে। মোঙ্গলীয়গণ ভাগ্যের সন্ধানে ৫ হাজার বছর আগে তিব্বত ও ইন্দোচীন থেকে বাংলাদেশে আগমন করে। অস্ট্রিক ও মোঙ্গলীয়দের পর বাংলাদেশে আলপাইন জনগোষ্ঠী পামীর মালভূমি অঞ্চল থেকে এখানে আগমন করে। তাদের সাথে অস্ট্রিক মোঙ্গলীয়দের রক্তের সংমিশ্রণ ঘটে। আর্যদের কাছে পরাজিত হয়ে দ্রাবিড় জাতির একটি অংশ বঙ্গে আশ্রয় নেয়। প্রাচীন কাল থেকে সপ্তম শতক পর্যন্ত বাংলাদেশ পুন্ড্র, গৌড়, রাঢ়, সুহ্ম, তাম্রলিপ্ত, সমতট, চন্দ্রদ্বীপ প্রভৃতি জনপদে বিভক্ত ছিল। এ জনপদগুলোর প্রত্যেকটি স্বতন্ত্র ও পৃথক ছিল। বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর বিভিন্ন ভাষা ছিল। তাদের মধ্যে সামাজিক বন্ধন শিথিল ছিল। এক জনপদের সাথে অন্য জনপদের যোগাযোগ ও সাংস্কৃতিক আদান-প্রদানের পথে ছিল ভাষার অন্তরায়। যেহেতু তাদের কোন একক ভাষা ছিল না। ভাষা হল সামাজিক বন্ধন। ঐতিহাসিক কারণে বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর মধ্যে ভাবের বিনিময় চলতে থাকে এবং সপ্তম শতকে বাংলা ভাষার সৃষ্টি হয়।

www.pathagar.com

বাংলা ভাষা সৃষ্টিতে বাঙালি জাতি উদ্যোগ গ্রহণ করে এবং মনে হয় তাদের ভাষার সাথে অন্য জনগোষ্ঠীর ভাষা মিলে যায়। এ মিশ্রিত ভাষায় বাঙালদের ভাষার প্রাধান্য ছিল। তাই ভাষার নাম বাংলা ভাষা।

গুপ্ত যুগের আগে বাংলার ধারাবাহিক ইতিহাস সম্পর্কে সঠিক কিছু জানা যায় না। মহাভারতে বাংলাদেশে কয়েকটি রাজ্যের উল্লেখ আছে। পশ্চিম বঙ্গের বর্ধমান জেলার অজয় নদীর দক্ষিণে পাণ্ডু রাজার ঢিবিতে খৃষ্টপূর্ব ১৫০০ বছর আগে এক উন্নত সভ্যতার নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে। রাজার ঢিবিতে প্রাপ্ত নিদর্শনসমূহ থেকে অনুমান করা হয় যে, সাড়ে তিন হাজার বছর আগে বাংলাদেশে সুসভ্য জাতি বাস করতো। খৃস্ট পূর্ব ৩২৭ অব্দে আলেকজান্ডারের ভারত আক্রমণের সময়কার ইতিহাসে বাংলাদেশে গঙ্গারিডি রাজ্যের উল্লেখ আছে। আলেকজান্ডারের ভারত আক্রমণের পর চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য উত্তর ভারতে রাজত্ব করেন। এ সময় বাংলাদেশ মৌর্য সাম্রাজ্যভুক্ত হয়ে পড়ে। সম্রাট অশোকের অধীনে বঙ্গ একটি প্রদেশ ছিল। চতুর্থ শতকে চন্দ্রবর্মা বাংলাদেশে স্বাধীনভাবে রাজত্ব করে। মৌর্যদের পরে বাংলাদেশ গুপ্ত রাজাদের অধীনে ছিল। মনে হয় সমুদ্রগুপ্তের পিতা চন্দ্রগুপ্ত বঙ্গ জয় করেন। গুপ্ত রাজাদের পরে ষষ্ঠ শতকে দক্ষিণ-পূর্ব বাংলার একটি স্বাধীন রাজ্য গড়ে উঠে। সপ্তম শতকে রাজা শশাঙ্ক বঙ্গ, পুন্ড্র, গৌড় ও রাঢ় অঞ্চল নিয়ে প্রথমবার স্বাধীন গৌড়রাজ্য গড়ে তোলেন। এ রাজে বৌদ্ধ ধর্মের প্রভাব ছিল। অষ্টম শতকের প্রথম ভাগে বাংলাদেশ অরাজকতায় পূর্ণ ছিল। ৭৫০ সনে জনগণ জনৈক গোপালকে রাজা নির্বাচিত করেন। পাল রাজারা ৭৫০ হতে ১১২৪ সন পর্যন্ত রাজত্ব করেন। পাল বংশের চারশ' বছরের শাসন বাংলার ইতিহাসে বিশেষ অবদান রেখেছে। বর্তমান বাংলাদেশ বাঙালি জাতি ও বাংলাভাষার গোড়াপত্তন পাল আমলে হয়েছে। এ যুগে প্রথম বৃহত্তর সামাজিক সমীকরণ ও সমন্বয় ঘটেছে। পাল রাজাদের রাজধানী ছিল গৌড় এবং উত্তরে ভারত নিয়ে তাদের ব্যস্ত থাকতে হতো। দক্ষিণ-পূর্ব বঙ্গের দিকে তারা দৃষ্টি দিতে পারেননি। পাল বংশের পরে সেন বংশ ১০৯৮ সন থেকে ১২০৩ সন পর্যন্ত বাংলাদেশে রাজত্ব করেন।[৪৯] প্রাচীন বাংলার জনবসতির শুরু হয়েছিল কবে থেকে এ নিয়ে বিশেষ বিতর্ক রয়েছে পণ্ডিতজনদের মধ্যে। তবে প্রাচীন বাঙালির সভ্যতার যেসব আদি নিদর্শন এখন পর্যন্ত প্রত্নতত্ত্ববিদদের নজরে তার বেশিরভাগটাই হলো সামরিক যন্ত্রপাতি। বাংলার পশ্চিমাঞ্চলে প্যালিওলিথিক ও মাইক্রোলিথিক বিভিন্ন অস্ত্রশস্ত্র পাওয়া গেছে এবং গবেষকরা অনুমান করেছেন, কম করে হলেও দশ হাজার বছর পূর্বের পুরনো লড়াকু বাঙালির নিদর্শন এসব প্রত্ন দলিল।[৫০] মনে করা হয় খৃস্টপূর্ব ২০০ সালের কাছাকাছি সময় থেকে আর্যরা তাদের মূল বাসভূমি দক্ষিণ রাশিয়া থেকে মধ্য রাশিয়া পর্যন্ত বিস্তৃত ভূভাগ ছেড়ে ভারত, ইরান, গ্রীস এবং ইউরোপের বিভিন্ন এলাকায় ছড়িয়ে পড়তে থাকে। এর মধ্যে ভারতীয় উপমহাদেশে তাদের আগমন সব অঞ্চলেই সুখকর হয়নি, বিশেষ করে তৎকালীন বাংলা অঞ্চলের মানুষজনের সামরিক শক্তির সঙ্গে আর্যরা সহজে পেরে উঠতে পারেনি। এর প্রমাণ পাওয়া যায় বিভিন্নভাবে। আর্যদের যে সব

www.pathagar.com

সাহিত্য ও প্রামাণ্য গ্রন্থ পাওয়া যায় তাতে দেখা যায়, বাংলা অঞ্চলের মানুষদের বিরুদ্ধেই তাদের রাগটা একটু বেশি : তারা বাঙালিদের পূর্ব পুরুষদের কাছ থেকে যথাযথ সমীহ আদায় করতে পারেনি বলেই বাংলা অঞ্চলকে তারা 'অপবিত্র' বলে ঘোষণা করেছিল। তারা ফতোয়া দিয়েছিল যে, বাংলা অঞ্চল এলাকায় যদি কোনো আর্য ভুলক্রমেও যায় তাহলেও তাকে 'পুনোস্টিম; নামে একটি পূজো করতে হবে এবং এই পূজোর পরেই সে আবার পবিত্র হয়ে উঠবে।[৫১] ঠিক কোন সময় থেকে বাংলাদেশে রাষ্ট্র ব্যবস্থার সাথে সামরিক ও প্রশাসনিক কার্যক্রমের আনুষ্ঠানিক সূচনা হয়েছিল এখনো তা একরকম অজ্ঞাতই রয়ে গেছে বলা চলে। এ পর্যন্ত যে সব তথ্য আবিষ্কৃত হয়েছে, প্রাচীন গ্রন্থাদি ও অন্যান্য সূত্র থেকে যতটুকু সাক্ষ্য-প্রমাণ পাওয়া গেছে, তার থেকে বিষয়টির বিস্তারিত উদঘাটন একরকম অসম্ভব বলেই মনে হয়। কিন্তু সারা দুনিয়ার সমাজ ও সভ্যতার বিকাশের যে ধারা তা বিশ্লেষণ করলে এ কথা অনুমান করতে একটুও কষ্ট হয় না যে, বাংলাদেশ অঞ্চলও এক সমৃদ্ধ সভ্যতার (তা অবশ্যই নগর সভ্যতার ধারাবাহী) অধিকারী ছিল। পাহাড়পুর ও ময়নামতির মৃৎফলকগুলোতে প্রাচীন বাংলার লোকায়ত ও নগর জীবনের যে চিত্র দেখতে পাওয়া যায়, তা স্পষ্টতই তৎকালীন সমাজ ও রাষ্ট্র ব্যবস্থার একটি শক্তিশালী অবয়বকে আমাদের সামনে তুলে ধরে। এ ছাড়া, চীনা ভ্রমণকারী ও পরিব্রাজকদের বিবরণী, শীলভদ্রের জীবন কাহিনী, তিব্বতি ঐতিহ্য ও ভারতীয় ন্যায়শাস্ত্রের ইতিহাসগ্রন্থ, এমনকি বৈদিক সাহিত্যের বেশকিছু সূত্রেও প্রাচীন বাংলাকে চিহ্নিত করা যায় এবং তৎকালীন সমাজ কাঠামো, রাষ্ট্রচিন্তা ও প্রশাসনিক অবস্থার একটা স্বরূপ উদঘাটন করা সম্ভব হয়। বাংলার গোড়ার দিককার ইতিহাসে অর্থাৎ মৌর্য যুগে 'গণ ও সংঘ' নামে ক্ষত্রিয় প্রভাবিত যুক্তরাষ্ট্রীয় ধাঁচের যেসব রাজ্য গড়ে উঠেছিল, সেখানে কিয়ৎ পরিমাণ হলেও গণতান্ত্রিকতা ছিল। এ সত্ত্বেও প্রজাতন্ত্রগুলো ছিল তীব্র শ্রেণী, মালিকানা ও সামরিক বিরোধে পূর্ণ। ভারতীয় আকরসূত্রে সে সব যুক্তরাষ্ট্রীয়কে গণ বা সংঘ বলে অভিহিত করা হয়েছে। এই ধাঁচের রাষ্ট্রের রাজা ছিল না, রাষ্ট্রনেতারা সেখানে নির্বাচিত হতেন। এসব রাষ্ট্রে (মগধ ও মৌর্যযুগে) রাজবংশ শাসিত রাজ্যগুলোর বিরুদ্ধে প্রাণপণ সামরিক সংগ্রাম করেছেন।[৫২] আর্যগণ ভারতে আগমনের পর অনার্যদের পরাজিত করে ধীরে ধীরে উত্তর ভারত থেকে দক্ষিণ ভারত পর্যন্ত সমগ্র ভারতবর্ষ তাদের নিয়ন্ত্রণে এনেছিল।[৫৩] যুদ্ধ শেষে আর্যগণ কৃষিকাজে আত্মনিয়োগ করেছিল। পরাজিত অনার্যদের মধ্যে যারা আর্যদের বশ্যতা স্বীকার করেছিল তাদেরকে কৃষিকাজ ও পশুপালনে সাহায্য করার জন্য দাস হিসেবে নিযুক্ত করা হয়। অনার্যদের মধ্যে যারা বশ্যতা স্বীকার করেনি তারা জনপদ থেকে পালিয়ে গিয়ে বনে-জঙ্গলে আশ্রয় নিয়েছিল। পলাতকরা মাঝেমধ্যে জনপদে হামলা করে আর্যদের গৃহপালিত গরু ও নারী হরণ করে নিয়ে যেত। এজন্য আর্যরা এসব অনার্যদেরকে দস্যু বলত এবং তাদের হত্যা বা বন্দি করে দাসে পরিণত করত। আর্যগণ বিভিন্ন গোত্রে বিভক্ত ছিল এবং ভারতবর্ষে আগমনের পর তারা প্রথমে পাঞ্জাবে প্রবেশ করে এবং ধীরে ধীরে উত্তর ভারতে ছড়িয়ে পড়ার বহু

www.pathagar.com

পরে তারা দক্ষিণ ভারতেও বিস্তার লাভ করেছিল। আর্যদের ভারতে আগমনের আগে এদেশে কি ধরনের বিচার ব্যবস্থা ছিল তা এখনো জানা যায়নি। তবে আর্যদের আগমনের পর থেকে যে বিচার ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল তাকেই প্রাচীন ভারতীয় বিচার ব্যবস্থা হিসেবে গণ্য করা হয়। এই বিচার ব্যবস্থাকে হিন্দু বিচার ব্যবস্থাও বলা হয়।[৫৪]

মুসলিম শাসক সুলতান মাহমুদের সাথে গজনীতে এসেছিলেন বিশিষ্ট মনীষী ও পর্যটক আল বেরুনী। ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা ছাড়াও তৎকালীন ভারতীয় জনগণ ও পণ্ডিতদের সাথে কথা বলে তিনি ১০৩১ সালে ভারততত্ত্ব (আল হিন্দ) নামের একটি বিখ্যাত গ্রন্থ লিখেন, ওই গ্রন্থে তিনি তৎকালীন সমাজ ব্যবস্থা, দণ্ডবিধি ও বিচার প্রণালী সম্পর্কে লিখেন, হত্যাকারী যদি ব্রাহ্মণ হয় ও নিহত ব্যক্তি যদি অন্য বর্ণের হয় তাহলে উপবাস, পূজার্চনা ও দানের অধিক প্রায়শ্চিত্ত করতে সে বাধ্য নয়। আর যদি হত ব্যক্তি ব্রাহ্মণ হয়, তাহলে অপরাধের দণ্ড পরজন্মে হবে। কারণ ব্রাহ্মণের প্রায়শ্চিত্তের বিধান নেই। প্রায়শ্চিত্ত পাপ হরণ করে; কিন্তু ব্রাহ্মণের মহাপাতক কিছুতেই মোচন হয় না। আর সর্বাপেক্ষা বড় পাপ হচ্ছে ব্রাহ্মণ হত্যা। তারপর আসে গোহত্যা, ব্যভিচার বিশেষ করে নিজ পিতার স্ত্রী ও গুরুপত্নীর সঙ্গে। অবশ্য এজন্য রাজা এরূপ অপরাধের জন্য ব্রাহ্মণ বা ক্ষত্রিয়কে বধ করে না, শুধু ধনসম্পদ বাজেয়াপ্ত করে তাদেরকে রাজ্য থেকে নির্বাসন দেয়। পরস্বাপহরণের শাস্তি অপহৃত বস্তুর সমান। সেজন্য অপরাধীকে কখনো কঠোর কখনো লঘু শাস্তি দেয়া হয়। কখনো সংশোধনী অবরোধ ও অর্থদণ্ডেও দণ্ডিত করা হয়। আর কখনো লোক লাঞ্ছনা ও উপহাসই তার যোগ্য শাস্তি। ভ্রষ্টা (ব্যভিচারিনী) স্ত্রীর শাস্তি হলো স্বামীগৃহ হতে বহিষ্কার ও নির্বাসন। বিচার প্রক্রিয়া সম্পর্কে ওই গ্রন্থে আল বেরুনী লিখেছেন, বিচারক বাদীর কাছ থেকে একটা দরখাস্ত দাবি করে যাতে প্রতিবাদীর বিরুদ্ধে অভিযোগের সুস্পষ্ট বিবরণ ও প্রমাণ লিপিবদ্ধ থাকে। লিখিত অভিযোগ না থাকলে কেবল সাক্ষ্য দ্বারাই মামলা নিষ্পত্তি করা হয়। সাক্ষীর সংখ্যা অন্তত চার হতে হবে। বেশিও হতে পারে। তবে কোন একজন সাক্ষীর ন্যায়পরায়ণতা যদি সুপ্রমাণিত থাকে তাহলে বিচারক সেই একজনের সাক্ষ্যেই অভিযোগের বিচার করতে পারেন। বাদী তার অভিযোগ প্রমাণ করতে না পারলে প্রতিবাদীকে শপথ করে তা অস্বীকার করতে হবে। কিংবা সে বাদীকে শপথ করাতে পারে এই বলে যে, শপথ করে বল তোমার দাবি সত্য, তাহলে আমি তোমার দাবি পূরণ করে দেব। দাবির পরিমাণ ও মূল্য অনুযায়ী শপথ অনেক প্রকারের আছে। বস্তুত যদি অল্প মূল্যের হয় এবং প্রতিবাদী শপথ গ্রহণে সম্মত থাকে তাহলে পঞ্চব্রাহ্মণের সম্মুখে প্রতিবাদী এ বলে শপথ করবে, আমি যদি মিথ্যা বলি তাহলে আমার পুণ্যফল থেকে বিরুদ্ধপক্ষ তার দাবির ৮ গুণ বেশি পরিমাণ পুণ্য ক্ষতিপূরণস্বরূপ পাবে। এরূপ শপথের পর নানা রূপ পরীক্ষাও আছে। যেমন– বিষ পান করতে দেয়া। পরীক্ষার মধ্যে একটি জঘন্যতম। তবে সত্যবাদী হলে বিষপানে শপথ গ্রহণকারীর কোন ক্ষতি হবে না বলে প্রচলিত বিশ্বাস। আরো কঠোর পরীক্ষা হচ্ছে, কোন

www.pathagar.com

গভীর খরস্রোতা নদীর তীরে কিংবা জলপূর্ণ গভীর কূপের ধারে শপথ গ্রহণকারীকে নিয়ে যাওয়া হয়।

সেখানে সে জলকে এই বলে সম্বোধন করবে, তুমি দেবগণের কলুষ নাশ কর, গোপন ও প্রকাশ্য সমস্ত কিছুই তুমি জান, আমি যদি মিথ্যা বলি তাহলে আমাকে বধ কর। আর সত্য বললে আমাকে ক্ষমা কর। তারপর পাঁচজন লোক তাকে ধরে জলে নিক্ষেপ করবে। সত্যবাদী হলে সে জলে ডুবে মরবে না। সে আমলের সামাজিক জীবনধারা সম্পর্কে আলবেরুনী আরো লিখেন, ওদের রীতির মধ্যে একটি হচ্ছে যে ওরা শরীরের কোন কেশ ছেদন করে না। অত্যধিক গরমকালে ওরা এককালে উলঙ্গ থাকত, তখন কেশ দিয়ে সূর্যের তাপ থেকে তারা মস্তক রক্ষা করত। গুম্ফের শোভাবর্ধনের জন্য ওরা তাতে তাও দেয়। ওরা নখ বড় রাখে আর তার অব্যবহারে গর্ববোধ করে। নখ দিয়ে ওরা কোন কাজ করে না, কেবল আলস্যভরে মস্তক কুন্ডায়ন করে আর কেশের উকুন বাছে। ওরা প্রত্যেকে গোমায় লিপ্ত স্থানে বসে ভোজন করে, উচ্ছিষ্টের সদ্ব্যবহার করে না এবং ভোজন পাত্রগুলো মাটির হলে সেগুলোকে আহারের পর ফেলে দেয়। ভোজনের পর পান ও চুনের সঙ্গে গুর্বাক চর্বণ করে বলে ওদের দাঁত লাল। আহারের পূর্বে ওরা সূরাপান করে। হিন্দুরা গোমূত্র পান করে কিন্তু গোমাংস খায় না। ওরা কাঠি দিয়ে করতাল বাজায়। পাগড়ির বস্ত্রকে ওরা পাজামার মতো ব্যবহার করে। যারা অল্প পরিচ্ছদে সন্তুষ্ট তারা দু'আঙ্গুল পরিমাণ বস্ত্র দিয়ে শুধু তাদের লজ্জাস্থান আবৃত করে। আর যারা অধিক বস্ত্রের পক্ষপাতী তারা পাজামার জন্য এত বস্ত্র ব্যবহার করে যে তা দিয়ে অনেকগুলো ঘোড়ার জিনের অন্তর্বাস তৈরি করা চলে। পায়ের সঙ্গে আঁটসাঁট করে ওরা পাদুকা পরে এবং পাদুকার অগ্রভাগ ঈষৎ উল্টানো থাকে। স্নান করার সময় ওরা প্রথমে পা ধোয়, পরে মুখ। প্রসাধন, কর্ণকুণ্ডল, হাতে ও পায়ে স্বর্ণাঙ্গুরীয় প্রভৃতি স্ত্রীলোকদের ব্যবহার্য অলংকারাদি দিয়ে পুরুষরা অঙ্গসজ্জা করে। নপুংসক ও স্ত্রী সংগমে অপরাগ লোকদেরকে ওরা কৃপা করে। মলত্যাগের সময় হিন্দুরা কোন দেয়াল বা প্রাচীরের দিকে মুখ করে বসে এবং পশ্চাদ্দেশ পথচারীদের দিকে খুলে রাখে। জিন ছাড়াই ওরা ঘোড়ায় চড়ে। জিন দেয়া থাকলে ঘোড়ার ডান দিক থেকে তার পিঠে চড়ে। যাত্রাকালে ওদের পেছনে কোন অশ্বারোহী থাকা ওরা পছন্দ করে। কুঠার নামক এক প্রকার ছোরা ওরা কোমরের ডান দিকে ঝুলিয়ে রাখে। বাম কাঁধ কটিদেশের দক্ষিণ দিয়ে ঘোরানো যজ্ঞ (যজ্ঞোপবীত) নামক একরকম সুতো ওরা পরিধান করে। সমস্ত কর্মে ও সিদ্ধান্তে ওরা স্ত্রীদের পরামর্শ নেয়। শিশুর জন্মকালে ওরা প্রসূতির চেয়ে শিশুর পিতার বেশি যত্ন নেয়। ভারতের পূর্বাঞ্চলের সর্বকনিষ্ঠ সন্তানকে বেশি আদর করা হয়। কারণ ওদের বিশ্বাস যে প্রথম সন্তান প্রবল কামোত্তেজনার অনিচ্ছাকৃত ফল, কিন্তু কনিষ্ঠের জন্ম ঐকান্তিক অভিপ্রায় ও স্থির সংকল্পের ফল। করমর্দন করতে ওরা করতল না ধরে করপৃষ্ঠ ধরে। গৃহে প্রবেশ করতে ওরা অনুমতি নেয় না, কিন্তু গৃহত্যাগ করার সময় ওরা অনুমতি নেয়। ওরা পা মুড়ে চতুষ্কোণ হয়ে বসে। গুরুজনদের উপস্থিতি অগ্রাহ্য করে ওরা থু থু ফেলে, নাক

www.pathagar.com

ঝাড়ে এবং সর্বসমক্ষে উকুন মারে। বায়ুত্যাগ করাকে ওরা সুলক্ষণ আর হাঁচিকে কুলক্ষণ মনে করে। তাঁতিকে ওরা অস্পৃশ্য বলে কিন্তু ক্ষৌরকার অথবা যে পারিশ্রমিক নিয়ে মুমূর্ষু পশুকে জলে ডুবিয়ে বা আগুনে পুড়িয়ে হত্যা করে তাদেরকে ওরা স্পৃশ্য মনে করে। পাঠশালায় শিশুরা লেখার জন্য কালো রং-এর এক প্রকার ফলক ব্যবহার করে এবং প্রস্থের দিক না নিয়ে তার দৈর্ঘের দিকে এক প্রকার সাদা জিনিস দিয়ে বাম থেকে দক্ষিণে লেখে।[৫৫] আর্যদের সম্বন্ধে বেবিলনীয় ও এশিয়া মাইনরের প্রাচীন ভাষায় লেখা যেসব বিবরণ পাওয়া গেছে তাই এ বিষয়ে সর্বাপেক্ষা প্রাচীন উল্লেখ। এ থেকে অনুমান হয় যে উত্তর হতে ককেকাস পর্বত পার হয়ে অথবা উত্তর গ্রীসে মেসিডন ও থ্রেস প্রদেশ পার হয়ে কৃষ্ণসাগরের দক্ষিণে উত্তর এশিয়া মাইনরের পথ ধরে মেসোপটেমিয়া ও এশিয়া মাইনর অঞ্চলে আর্যদের আগমন ঘটে।[৫৬] ঐতিহাসিকদের মতে যাযাবর আর্যদের আগেই ভারতে সুসভ্য দ্রাবিড় তথা বাঙালিদের বসবাস ছিল। প্রথমে সিন্ধু ও পরে বাঙালি সভ্যতাই ভারতের প্রাচীন সভ্যতা। ভারতের দুই প্রান্তের এ দুই সভ্যতা ক্রমে ধ্বংসপ্রাপ্ত ও লাঞ্ছিত হয় আর্যদের হাতে। ঐতিহাসিক রমেশচন্দ্র মজুমদার লিখেছেন, খ্রীস্টজন্মের প্রায় দেড় হাজার বছর আগে সিন্ধুনদের উপত্যকায় এবং মধ্য ভারতে ও রাজস্থানের অনেক জায়গায় যেমন তাম্রপ্রস্তর যুগের সভ্যতা ছিল, বাংলাদেশের এই অঞ্চলেও সেরূপ সভ্যতাসম্পন্ন মনুষ্যগোষ্ঠী বাস করত। অন্তত তিন হাজার বছর অথবা তারও আগে বাংলাদেশের এই অঞ্চলে সুসভ্য জাতি ছিল। মোটের ওপর আর্য জাতির সংস্পর্শে আসার আগেই বর্তমান বাঙালি জাতির উদ্ভব হয়েছিল এবং তারা একটি উচ্চাঙ্গ ও বিশিষ্ট সভ্যতার অধিকারী ছিল।[৫৭] সম্রাট অশোক প্রাচীন ভারতের অনন্য রাষ্ট্রনায়ক ছিলেন। আর্য বিজয়ের পর তার আমলেই প্রথম আর্য ভাষা ও সংস্কৃতির বিজয় অভিযান চলে সমগ্র বঙ্গ দেশে। মূলত মগধ রাজ্যের সাথে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগের কারণে প্রাচীন বাংলায় এ সময় নানা জাতি ও ধর্মবেত্তাদের আগমন ঘটে।

জৈন, বৌদ্ধ এবং পৌরাণিক ব্রাহ্মণ্য ধর্মের উত্থান এ সময় থেকেই ধাপে ধাপে অগ্রসর হয়। তবে খ্রীস্ট জন্মের ৩শ' বছর পর অর্থাৎ বাংলায় মৌর্যদের ক্ষমতা দখলের ৫শ' বছর পর প্রাচীন বাংলায় ধীরে ধীরে রাজনৈতিক চেতনা গড়ে উঠতে থাকে। এ সময় কৌম সমাজ ভেঙ্গে বাংলায় অসংখ্য ছোট ছোট রাষ্ট্রের জন্ম হয়। ৫০৭-৫০৮ সালে সামন্ত রাজা বৈন্যগুপ্ত প্রাচীন বাংলার বিভিন্ন অঞ্চল নিজের রাজ্যভুক্ত করে রাজ্যের স্বাতন্ত্র্য ঘোষণা করেছিলেন। সপ্তম শতাব্দীতে মহারাজা শশাংক প্রাচীন বাংলার গৌড় রাষ্ট্রকে সমগ্র উপমহাদেশে বিশিষ্ট করে তোলেন। তবে শশাংক পরবর্তী বাংলার ইতিহাস ছিল খুবই মর্মান্তিক ও দুঃখজনক। সপ্তম শতাব্দীর শেষ দিক থেকে শুরু হয়ে প্রায় একশো বছর পর্যন্ত প্রাচীন বাংলায় চলে সীমাহীন নৈরাজ্য বিশৃংখলা। দেশের এ অবস্থাকে অভিহিত করা হয়েছে মাৎস্যন্যায় বলে। দীর্ঘদিন অরাজকতার ফলে অতিষ্ঠ বাংলার মানুষ অষ্টম শতাব্দীর মাঝামাঝি সময় তৎকালের জনপ্রিয় নেতা উত্তর বাংলার অধিবাসী গোপালকে সিংহাসনে বসায়। তিনিই পালরাজ বংশের আদিপুরুষ। পাল বংশের

www.pathagar.com

শ্রেষ্ঠতম রাজাদের নাম ধর্মপাল ও দেবপাল। একাদশ শতাব্দী পর্যন্ত প্রায় চারশো বছরকাল তাদের রাজত্ব বিস্তৃত ছিল। তবে পালরাজা দ্বিতীয় মহীপালের (১০৭০-৭৭ সাল) আমলে বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসে সংঘটিত হয় এক অনন্য সাধারণ ঘটনা। বাংলার কৃষক, কৈবর্ত এবং রাজ কর্মচারীদের ঐক্যবদ্ধ শক্তি একযোগে বিদ্রোহ করে ক্ষমতা দখল করে নেয়। বাংলার ইতিহাসে এ ঘটনা বিদ্রোহের ক্ষেত্রে প্রথম মাইলফলক। বিদ্রোহীরা তাদের নেতা দিব্যোক এর নেতৃত্বে বরন্দ্রে অঞ্চলে স্বাধীন রাজ্য প্রতিষ্ঠা করে। রাজা মহীপাল এ বিদ্রোহে নিহত হন। এরপর দিব্যোক তার ভাই রুদ্রোক ও তদীয় পুত্র ভীম দীর্ঘদিন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ছিলেন। প্রভূত বিশৃঙ্খলার ভেতরে ভীমের শাসনামলে রাজ্য জুড়ে কিছুটা শান্তি ও শৃঙ্খলা ফিরে এলেও দেশবাসী ছিল করভারে জর্জরিত। এদিকে রাষ্ট্রমুকুট মথন (বা মহন) এক মগধরাজ ভীমযশ্যা প্রমুখ ১৪ জন প্রধান সামন্ত রাজের সহায়তায় ভীমের বিরুদ্ধে সংগ্রামের জন্য রামপাল প্রস্তুত হন। রামপলের সৈন্যদল বরেন্দ্র ভূমি আক্রমণ করলে যুদ্ধ বেঁধে যায়। যুদ্ধ ক্ষেত্রে ভীম হাতির পিঠ থেকে পড়ে যান এবং বন্দি হন। তার সৈন্যরাও এই যুদ্ধে পরাজিত হয়, পরে ভীমকেও হত্যা করা হয়। কোনও কোনও ঐতিহাসিকের মতে, সন্ধ্যাকরনন্দী কৈবর্ত বিদ্রোহকে 'উপবিপ্লব' ও 'অনকি ধর্মবিপ্লব' বলে যে বর্ণনা দিয়েছেন, তা পক্ষপাতদোষে দুষ্ট এবং একে গণতান্ত্রিক ও স্বাধীনতা যুদ্ধের শামিল কোনও ঘটনা বলে বর্ণনা করাও যুক্তিহীন।

বাংলা সাহিত্যে এ বিদ্রোহকে কেন্দ্র করে লিখিত প্রথম উপন্যাস সত্যেন সেনের 'বিদ্রোহী কৈবর্ত'।[৫৮] ১১২৫ সালের শেষ নাগাদ পালরাজা মদন পালের মৃত্যুর সাথে সাথে বাংলায় শুরু হয় সেন যুগের। পালেরা ছিলেন বৌদ্ধ এবং সেনরা ছিলেন হিন্দু। সেন বংশের রাজাদের মধ্যে বল্লাল সেন প্রসিদ্ধ। তিনি হিন্দুদের মধ্যে কৌলিন্য প্রথার প্রবর্তন করেন। সেন রাজারা এসেছিলেন কর্ণাটক থেকে। সেন রাজত্ব প্রতিষ্ঠার পর হিন্দু বিচার ব্যবস্থা পুনঃপ্রবর্তনের ফলে বাংলার সামাজিক অবস্থা আবার নিপতিত হয় বর্ণাশ্রমের নির্মম যাঁতাকলে। তবে হেমন্ত সেনের মাধ্যমে বাংলায় যে ব্রাহ্মণ্যতন্ত্রের সেন রাজত্বের শুরু হয়েছিল তা মাত্র দেড়শো বছরের ব্যবধানে ভেঙ্গে পড়ে। ৩৬টি জাতপাতে বিভক্ত জাতি এ সময়কার বর্ণপীড়নে অতিষ্ঠ হয়ে মেনে নেয় মুসলিম শক্তির আধিপত্য।

১২০৪ সালে ইখতিয়ার উদ্দিন মুহম্মদ বখতিয়ার খলজি রাজা লক্ষণ সেনকে পরাজিত করে নদীয়া অধিকার করলে বাংলাদেশে প্রথম তুর্কি শাসনের সূত্রপাত ঘটে। এই তুর্কিরা ছিলেন ধর্মীয় বিশ্বাসে মুসলমান। তুর্কি শাসনে বাংলায় চালু করা হয় ইসলামী আইন ও বিচার ব্যবস্থা। ইসলামী আইন ও বিচারে উচ্চ নিচ বা জাতিভেদ প্রথা রহিত হয়ে সাম্যবাদ প্রতিষ্ঠা হওয়ায় দীর্ঘকালের অত্যাচারিত নিপীড়িত মানুষ দলে দলে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে। এ প্রসঙ্গে ঐতিহাসিক সুরজিত দাসগুপ্ত লিখেছেন, যে কারণেই হোক ভারতীয়দের মনে একটা ভুল ধারণা আছে, একহাতে কোরআন আর অন্য হাতে কৃপাণ

www.pathagar.com

নিয়ে এদেশে ইসলামের প্রচার করা হয়েছে। কিন্তু লক্ষণীয় মুসলিম কৃপাণ যেখানে সব চাইতে প্রচণ্ড ছিল সেই দিল্লী আগ্রা অঞ্চলের চেয়ে ভারতের সীমান্তবর্তী অঞ্চলগুলোতে যেমন সিন্ধু, পাঞ্জাব, কাশ্মীর, কেরালা, বাংলা প্রভৃতিতে ইসলাম প্রতিষ্ঠা পেয়েছে বেশি।[৫৯] স্যার রমেশ চন্দ্র মজুমদার 'বাংলাদেশের ইতিহাস' গ্রন্থে লিখেছেন, 'ব্রাহ্মণ্যবাদ এতই চরমসীমায় পৌঁছেছিল যে যেটাই ঘোষিত হতো সেটাই ঈশ্বর বাক্য বলে মেনে নিতে হতো। ব্রাহ্মণ্য বর্ণাশ্রমবাদীদের খড়গাঘাতে যখন নিষ্ঠুরভাবে বৌদ্ধ নিধন চলছিল, দেশজুড়ে অরাজকতা, বিশৃংখলা বিরাজ করছিল ঠিক সেই সময় উদ্ধার কর্তা হিসেবে বখতিয়ার এসেছিল।' ড. দীনেশ চন্দ্র সেন তার 'বৃহৎ বঙ্গ' পুস্তকে লিখেছেন, 'বৌদ্ধ ও নিম্ন বর্ণের হিন্দুরা ব্রাহ্মণ্যবাদীদের আধিপত্য ও নির্মূল অভিযানের হাত থেকে মুক্তি পাওয়ার লক্ষ্যে বাংলায় মুসলিম বিজয়কে দু'বাহু বাড়িয়ে অভিনন্দন জানিয়েছিল।' ড. এম এ রহীম তার 'বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস' বইতে লিখেছেন, মুসলিম বিজয় ছিল বাংলার প্রতি বিরাট আশীর্বাদ স্বরূপ, যা বাংলা ভাষাভাষী লোকদেরকে একটা রাজনৈতিক ও সামাজিক ঐক্যমঞ্চে সংঘবদ্ধ করে বাংলা ও বাঙ্গালির ইতিহাসের ভিত্তি স্থাপন করে দেয়।

যদি বাংলায় মুসলিম বিজয় ত্বরান্বিত না হতো এবং এদেশে কয়েক শতাব্দী যাবৎ হিন্দু শাসন অব্যাহত থাকত তাহলে বাংলাভাষা বিলুপ্ত হয়ে যেত এবং অবহেলিত বিস্মৃত হয়ে অতীতের গর্ভে নিমজ্জিত হতো। ড. নীহার রঞ্জন রায় তার 'বাঙ্গালীর ইতিহাস' বইতে লিখেছেন, 'যে বঙ্গ সভ্যতা ছিল আর্য সভ্যতা ও সংস্কৃতির দিক দিয়ে ঘৃণিত ও অবজ্ঞার, যা ছিল পাল ও সেনদের আমলে কম গৌরবের, সেই বঙ্গ নামেই শেষ পর্যন্ত মুসলিম আমলে বাংলার সমস্ত জনপদ ঐক্যবদ্ধ হল। অতএব বখতিয়ারের বঙ্গ বিজয় বাংলার নিপীড়িত অব্রাহ্মণ্যদের মুক্তির দিগন্ত উন্মোচিত করেছিল এবং জনগণ নরপূজা, নরবলি পূজা, লিঙ্গ পূজা, প্রতীক পূজা, পৌত্তলিকতা, অবতারবাদের সীমাহীন ক্লেদ, গ্লানি এবং পঙ্গুত্ব থেকে মুক্তি পেয়েছিল।'

বঙ্গে ইসলামী বিচার ব্যবস্থা

প্রাচীনকালে বঙ্গ বা বাঙ্গাল নামে যা পরিচিত ছিল তা ছিল আজকের বাংলার (বাংলাদেশ ও পশ্চিম বাংলার) একটি অংশমাত্র। সে সময় বাংলাদেশ বিভক্ত ছিল নানা জনপদে। প্রত্যেকটি কওমের নামে জনপদের নামকরণ করা হয়েছিল। যেমন বঙ্গ, গৌড়, পুণ্ড্র ও রাঢ় ইত্যাদি, এদের ছিল আলাদা আলাদা রাষ্ট্র। কেশব সেন ও বিশ্বরূপ সেনের আমলে বঙ্গের দু'টো বিভাগ ছিল। একটি বিক্রমপুর অন্যটি নাব্যমন্ডল। (বাকেরগঞ্জ জেলা থেকে পূর্ব দিকে সমুদ্র পর্যন্ত।) হারিকেল নামের বাংলার আরেকটি জনপদের সীমা ছিল বাকেরগঞ্জ জেলা থেকে সিলেট পর্যন্ত বিস্তৃত। এর আরেকটি নাম ছিল চন্দ্র দ্বীপ। সমতট নামে বাংলার আরেকটি জনপদের নাম পাওয়া যায় যার সীমা ছিল ত্রিপুরা থেকে চব্বিশ

www.pathagar.com

পরগণা পর্যন্ত প্রসারিত। আবার পূর্ব বাংলাকেই সমতট বলা হয়েছে। বাঙ্গাল নামে আরেকটি জনপদ ছিল পূর্ববঙ্গ ও দক্ষিণ বঙ্গের সমুদ্র এলাকাজুড়ে সমগ্র ভূখণ্ডই ছিল এর অন্তর্গত। পুণ্ড্রবর্ধন এর রাজধানী ছিল বগুড়ার মহাস্থানগড়। এর অন্তর্ভুক্ত ছিল দিনাজপুর ও রাজশাহী জেলা। আবার বগুড়া, রাজশাহী, পাবনা এবং দিনাজপুর মিলে ছিল বরেন্দ্র জনপদ। রাঢ় জনপদের রাজধানী ছিল কোটিবর্ষ। বর্ধমান, হুগলী ও হাওড়া জেলা দক্ষিণ রাঢ় হিসেবে চিহ্নিত। মুর্শিদাবাদ, বীরভূম, কটোয়া প্রভৃতি অঞ্চল নিয়ে ছিল প্রাচীন ব্রজভূমি। মুর্শিদাবাদ ও বীরভূম গৌড়ের আদিকেন্দ্র হলেও এক সময় সমগ্র বাংলাদেশকেই গৌড় বলা হতো। ১২০৪ সালে বখতিয়ার খলজির বাংলা বিজয়ের পর খলজির বংশের সুলতান গিয়াসউদ্দিন (১২১৩-২৭) দিল্লীর অধীনতা থেকে মুক্ত হয়ে স্বাধীন নরপতি হিসেবে ১২ বছর বাংলা শাসন করেন।

'১৩৩৮ থেকে ১৫৩৮ সাল পর্যন্ত একটানা দুশ' বছর বাংলাদেশ পরিপূর্ণ স্বাধীনতা ভোগ করে। দিল্লীর বাদশাহগণ মাঝে মধ্যে বাংলার প্রতি লোলুপ দৃষ্টি দিলেও এই স্বাধীনতা অক্ষুণ্ন থাকে। বাংলার তৎকালীন সুলতানদের জারিকৃত মুদ্রার মাধ্যমে প্রমাণিত হয় যে সুলতানরা স্বাধীন ও সার্বভৌম ছিলেন। ইসলামী শাস্ত্র ও ইসলামী আইনকে তাঁরা সম্মান করতেন এবং দেশে ওই আইনের মর্যাদা ছিল। ইসলামী আইন ছাড়া অন্য কিছুই সুলতানদের ক্ষমতা ক্ষুণ্ন করতে পারতো না। আইন প্রনয়ণকারী ও বিচার বিভাগীয় কর্তা হিসেবে তিনি ছিলেন রাষ্ট্রের সকল সর্বোচ্চ ক্ষমতার অধিকারী। তবে সুলতানগণ ইসলামী আইনের বিধিবহির্ভূত কোন আইন প্রণয়ন করতেন না। ভূমি রাজস্ব নির্ধারিত ছিল এক পঞ্চমাংশ। চট্টগ্রাম বন্দরের শুল্ক আদায় করা হতো এবং দেশে বাণিজ্য শুল্ক প্রচলিত ছিল। সুলতানরা জ্ঞানী ও ন্যায়বিচারক ছিলেন এবং তারা বাংলায় ইসলামী শরীয়তি আইন প্রয়োগ করতেন। সুলতান শামস উদ্দিন ইলিয়াস ইউসুফ মাঝে মাঝে বিচারকদের ডেকে ন্যায়বিচার সম্পর্কে সদুপদেশ দিতেন এবং ন্যায়বিচার না করলে শাস্তির ভয় দেখাতেন। কাজিরা যেসব বিষয়ে ন্যায়বিচার করতে অসমর্থ হতেন সেসব বিষয়ে সুলতান নিজেই বিচার করতেন। এছাড়া রাজদ্রোহ এবং ধর্মদ্রোহের বিচার সুলতান নিজেই করতেন। সুলতান আলাউদ্দিন হোসেন শাহ ধর্মদ্রোহিতার অপরাধে চৈতন্য সাহিত্যের যবন হরিদাসকে বাইশ' বাজারে প্রহার করার শাস্তি দিয়েছিলেন এবং সুলতান রুকনউদ্দিন বারবাক শাহ রাজাদ্রোহের অপরাধে ইসমাইল গাজীকে মৃত্যুদণ্ড দিয়েছিলেন। সুলতানি আমলে দৈনন্দিন বিচারের ভার শহর ও গ্রামের কাজির ওপর ন্যস্ত ছিল। আলেম বা জ্ঞানীরা কাজিকে বিচারকাজে সহায়তা করতেন। খোদ সুলতানকে সাজা দেয়ার জন্য কাজি সিরাজউদ্দিন ইতিহাসে বিখ্যাত হয়ে আছেন। বাংলায় তখন দু'ধরনের শাস্তি প্রচালিত ছিল যথা প্রহার ও নির্বাসন। রাজদ্রোহ ছাড়া অন্যান্য ক্ষেত্রে নির্বাসনই ছিল সর্বোচ্চ শাস্তি। অপরাধীকে কখনো কারারুদ্ধও করা হতো। সুলতানি আমলে দেশরক্ষা ও রাজস্ব আদায় ব্যতীত অন্যান্য বিষয়ে গ্রামগুলো ছিল পুরোপুরি স্বায়ত্তশাসিত। গ্রামের শান্তিরক্ষা এবং সামাজিক ক্রিয়াকলাপের দায়িত্ব নিত গ্রাম

www.pathagar.com

পঞ্চায়েত। গ্রামে সামাজিক প্রথা ও আইন ছাড়াও হিন্দু সম্প্রদায়ের সামাজিক ব্যাপারে হিন্দু আইন প্রচলিত ছিল। বাংলায় তখন জিজিয়া কর চালু ছিলনা এবং অমুসলমানগণও উচ্চ পদে রাজকার্যে নিযুক্ত হতেন।'[৬০]

বাংলার স্বাধীন সুলতানি আমলের প্রায় দু'শো বছরের ঐক্যবদ্ধ বাঙ্গালি জাতি বাংলাদেশ গঠনের ইতিহাসে একটা বড় ধরনের মাইলফলক তৈরি করেছিল। এ সুলতানি আমলেই (১৩৪২-১৫৩৮) প্রথম গৌড় ও বঙ্গমিলে একটি রাষ্ট্রে পরিণত হয়। এর অধিবাসীরা ছিল বাঙ্গালি এবং তাদের রাষ্ট্র ছিল বাংলাদেশ নামে পরিচিত। ১৩৪২ সালে বাংলার সিংহাসনে আরোহণ করেন সামসুদ্দিন ইলিয়াস শাহ। তিনি বঙ্গশাহী উপাধি নিয়ে বাংলার রাজনৈতিক ইতিহাসে নতুন অধ্যায়ের সৃষ্টি করেন। প্রকৃতপক্ষে তার আমলেই ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে ঐক্যবদ্ধ বাঙ্গালি জাতির প্রথম বিকাশ ঘটে। ১৪১৪ সালে রাজা গণেশ বাংলার শাসন ক্ষমতায় আসেন এবং তার ছেলে জালালউদ্দিন ১৪৪১ সাল পর্যন্ত বাংলা শাসন করেন। এর মাধ্যমে সুলতানদের কাছ থেকে আবার বাঙ্গালিরা বাংলার মসনদে ক্ষমতাসীন হয়। ইলিয়াস শাহী বংশের অধীনে ১৪৪২ থেকে ১৪৮৭ সাল পর্যন্ত বাংলা আবার শাসিত হয়। হাবশি খোজারা ১৪৮৭ থেকে ১৪৯৩ সাল পর্যন্ত বাংলা শাসন করেন। ১৪৯৩ সালে আলাউদ্দিন হুসেন শাহের নেতৃত্বে হুসেন শাহী বংশের শাসন শুরু হয়। ১৫৩৮ সালে পাঠান সেনাপতি শেরশাহের বাংলা দখলের আগে পর্যন্ত হুসেন শাহী বংশের শাসন চলেছে বাংলায়। হুসেন শাহীর আমলেই বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাসে স্বর্ণ যুগের সূচনা হয়। এরপর ১৫৬৫ সালে কাররানী বংশ এবং ১৫৭৬ সাল থেকে ১৭৫৭ সাল পর্যন্ত প্রায় দু'শো বছর বাংলা মুঘল শাসনের আওতায় থাকে। তৈমুর লং ও চেঙ্গিস খানের বংশধর সম্রাট বাবর (জাতিতে এরা ছিলেন উজবেক, সম্প্রতি বিভক্ত সোভিয়েত রাশিয়ার অংশ বিশেষ), সমরখন্দ থেকে বিতাড়িত হয়ে ভাগ্যের সন্ধানে ভারতে এসে ১৫২৬ সালে দিল্লীর সিংহাসন দখল করেন এবং মুঘল সাম্রাজ্যের গোড়া পত্তন করেন। মুঘলদের আমলে বাংলার রাজনৈতিক ইতিহাস নতুন মোড় নেয়।

১৫৩৮ থেকে ১৫৭৬ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশে পাঠান শেরশাহের নেতৃত্বে যে আফগান রাজত্বের শাসন চলছিল তার অবসান ঘটে বাবর বংশের মুঘল সম্রাট আকবরের হাতে। বাংলাদেশে এ সময় ঈসা খান, কেদার রায় ও প্রতাপাদিত্য প্রমুখ বারো ভূঁইয়ার রাজত্ব চলছিল। 'খ্রীস্টপূর্ব ৩০২ অব্দে প্রখ্যাত ভ্রমণকারী মেগস্থিনিসের ভারতে ভ্রমণের অনন্য দলিল 'ইন্ডিকা' গ্রন্থের মানচিত্র থেকে জানা যায়, আজকের বাংলাদেশের কিশোরগঞ্জসহ বৃহত্তর ময়মনসিংহ অঞ্চল ছিল কামরূপ রাজ্যের অন্তর্গত। চতুর্থ শতকে কামরূপ রাজ্য গুপ্ত সাম্রাজ্যের করদ রাজ্যে পরিণত হয়।

সপ্তম শতকে কামরূপ গুপ্ত শাসনমুক্ত হয়। দশম শতকের মাঝামাঝি পর্যন্ত ভাস্কর বর্মার বংশধরগণ ময়মনসিংহ অঞ্চল শাসন করেন। পরবর্তী সময় এ অঞ্চল চন্দ্র বংশের অধীন হয়। একাদশ শতাব্দীতে ময়মনসিংহ পাল রাজাদের অধীনে আসে। পরবর্তী ইতিহাস

www.pathagar.com

সেন রাজ বংশের। কিন্তু ব্রহ্মপুত্রের পশ্চিম তীর সেন রাজত্বের অধীন হলেও পূর্বতীর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যে পরিণত হয়। এ সব রাজ্যের নেতৃত্বে ছিল কোচ, হাজং, গারো, রাজবংশ ইত্যাদি আদিবাসী সম্প্রদায়। ১৫৮০ সালে কোচ অধ্যুষিত জঙ্গলবাড়িসহ কিশোরগঞ্জ অঞ্চল বাংলার বারো ভূঁইয়া খ্যাত ঈসা খাঁর অধীনে আসে। ঈসা খাঁর কাছে কোচ সরদারের পরাজয় ঘটে। ঢাকার অদূরে সোনারগাঁও ছিল ঈসা খার রাজ্যের প্রথম রাজধানী। কোচ সরদারের পরাজয়ের পর ঈসা খাঁ কিশোরগঞ্জের জঙ্গলবাড়িতে তার দ্বিতীয় রাজধানী স্থাপন করেন এবং এগারো সিন্ধুতে নির্মাণ করেন দুর্ভেদ্য দুর্গ। রাজপুত্র নেতা কালিদাস গজদানী ছিলেন ঈসা খাঁর পিতা।

তিনি পরে স্বধর্ম ত্যাগ করে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন এবং বাংলাদেশের ঢাকা অঞ্চলে স্বাধীন রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। পিতার মৃত্যুর পর অনেক সংগ্রাম সাধনার পর ঈসা খাঁ পিতৃরাজ্য পুনরুদ্ধার করেন। তিনি ছিলেন বর্ণাঢ্য বিচিত্র জীবনের অধিকারী। তিনি বহু দু:সাহসিক অভিযান পরিচালনা করেন। জঙ্গলবাড়ি রাজধানী স্থাপন করে তিনি রাজধানীর চতুর্দিকে পরিখা খনন করেন। তার দুর্ধর্ষ সেনা ও নৌ বাহিনীর কথা সুবিদিত। তিনি ছিলেন স্বাধীনচেতা বারোভূঁইয়া। মোঘল সম্রাট আকবরের সেনাপতি মানসিংহকে তিনি এই বাংলার মাটিতে যুদ্ধ করে পরাজিত করেন। মানসিংহকে যুদ্ধে পরাস্ত করে তিনি সম্রাট আকবরের দিল্লির দরবারে যান। দেশপ্রেমিক ঈসা খাঁর বীরত্বে অভিভূত হয়ে সম্রাট আকবর তাকে 'মসনদে আলা' উপাধিতে ভূষিত করে বাংলার সিপাহসালার নিযুক্ত করেন এবং জঙ্গলবাড়ীর আশপাশের ২৪টি পরগণা দান করেন। তার আমলে বাংলাদেশ যথেষ্ট সমৃদ্ধি লাভ করেছিল। ঈসা খাঁর আমলে ইংল্যান্ডের রাণী এলিজাবেথের দূত রালফ ফিস এদেশে এসেছিলেন। রালফ ফিস তার ভ্রমণ বিবরণীতে লিখেছেন, এসব দেশের প্রধান রাজার নাম ঈসা খাঁ। তিনি এ অঞ্চলের সব রাজার রাজা।

ব্রহ্মপুত্র নদের পূর্ব তীরে সমৃদ্ধ জনপদ কিশোরগঞ্জ জেলা শহর থেকে মাত্র ৪ মাইল দূরে নরসুন্দা নদের তীরে জঙ্গলবাড়ী একটি অতি প্রাচীন স্থান। পাঠান, মোঘল, হিন্দু, মুসলমান এই জঙ্গলবাড়ী নগরীটি কেন্দ্র করে বহুবার সংঘর্ষে লিপ্ত হয়েছে। মোঘল সম্রাট আকবরের অর্থ সচিব টোডর মল্ল বাংলাদেশকে ১৫৮২ সালে ১৯টি সরকার ও ৬৮২টি মহালে বিভক্ত করেন। এর মধ্যে একটি সরকারের নাম ছিল 'সরকার বাজুহা' সুলতান হোসেন শাহের আমলে যে অঞ্চলটি 'নছরত শাহী' প্রদেশ নামে পরিচিত ছিল টোডর মল্লের বন্দোবস্তে তারই নাম দেয়া হয় 'সরকার বাজুহা।' আজকের কিশোরগঞ্জের জঙ্গলবাড়ী তখনই সরকার বাজুহার' অন্তর্ভুক্ত ছিল। ব্রিটিশ আমলে সরকার বাজুহাকে ১৭৮৭ সালে ময়মনসিংহ জেলা এবং ১৮৬০ সালে কিশোরগঞ্জকে মহকুমা হিসেবে ঘোষণা করা হয়। বাংলাদেশ আমলে ১৯৮৪ সালের পহেলা ফেব্রুয়ারি কিশোরগঞ্জকে জেলা হিসেবে ঘোষণা করা হয়। ঈসা খাঁর স্মৃতি বিজড়িত জঙ্গলবাড়ী এখন বাংলাদেশের দু'দশটা গ্রামের মতোই একটা গ্রাম। তবে সাড়ে ৪শ' বছর আগের অনেক স্মৃতি সেখানে

www.pathagar.com

আজো বিদ্যমান। ঈশা খাঁর দুর্গের ভগ্নাবশেষ প্রাচীর ও পরিখার বিধ্বস্ত ইট সুরকির ফাঁকে ফাঁকে সোনালী অতীত এখনো উঁকি মারে। ঈসাখাঁর বাসভবনের স্মৃতি চিহ্ন এবং দরবার হলটি এখনো আস্ত আছে। বাসভবনের পাশেই বিশাল দীঘির সামনে সুরম্য মসজিদ। মসজিদের পাশেই রয়েছে ঈসা খাঁর বংশধরদের কিছু বাঁধানো সমাধি। সোনালী অতীতের এসব সুতচিহ্ন ধারণ করে আজো টিকে আছে বীর ঈসা খাঁর জঙ্গলবাড়ী।'[৬১] মুঘল সম্রাট জাহাঙ্গীরের সুবাদার ইসলাম খান ১৬১৩ সালে বাংলাকে মুঘল সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করলেও সমগ্র পূর্ববাংলা মুঘলদের সুবা বাংলার অন্তর্ভুক্ত হয় শায়েস্তা খাঁর আমলে ১৭ শতকের শেষ দিকে। মুঘল শাসনে বাংলাদেশের নামকরণ করা হয় সুবাবাংলা আর ঢাকা হয় এর রাজধানী। এর মাধ্যমে ঢাকা প্রথম বাংলার রাজধানী হবার সৌভাগ্য অর্জন করে। মুসলিম শাসনামলে যারা বাংলার মসনদে সমাসীন ছিলেন তাদের মধ্যে কিছু সংখ্যক ছিলেন যারা আপন বাহুবলে বাংলার সিংহাসনে আরোহণ করে দিল্লীর সম্রাটের অনুমোদন লাভ করেন। কিছুসংখ্যক শাসক ছিলেন সম্পূর্ণ স্বাধীন। আর অবশিষ্টাংশ দিল্লীর দরবার থেকে নিয়োগপত্র লাভ করে গভর্নর অথবা নাজিম হিসেবে বাংলা শাসন করেন। ১২০৪ সালে তুর্কি বিজয়ের পর ১৭৫৭ সালে ইংরেজ শক্তির অভ্যুদয় পর্যন্ত একটানা সাড়ে ৫শ বছর পর্যন্ত বাংলাদেশ শাসিত হয় বিভিন্ন পরাক্রমশালী মুসলিম শাসকের হাতে। এ সময়ে ইসলামী আইন ও বিচার ব্যবস্থা বলবৎ থাকায় দেশে অর্থনৈতিক উন্নতি ও আইন-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। নাগরিক জীবনে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় কৃষি উৎপাদন ও ব্যবসা বাণিজ্যের প্রভূত উন্নতি ঘটেছিল। দেশ ও দেশের জনগণ ছিল প্রকৃত অর্থেই সুখী সমৃদ্ধ এবং বিভিন্ন ধর্মাবলম্বীরা নিজ নিজ ধর্ম পালনের ক্ষেত্রে স্বাধীন ছিলেন। ইতিহাসে এটাই ছিল বাংলার স্বর্ণযুগ এবং বিদেশীদের কাছে পরিচিত ছিল সোনার বাংলা হিসেবে। তৎকালীন মুসলিম শাসনামলে বাংলাদেশে হিন্দুদের পঞ্চায়েত প্রথাও প্রচলিত ছিল। তারা তাদের কলহ বিবাদ এখানে আপোষ নিষ্পত্তির মাধ্যমে মিটিয়ে ফেলতে পারতেন। আর সর্বসাধারণের জন্য ছিল নিযামত আদালত। সেখানে বিচার করতেন কাজি-এ পরগনা। তার ওপরে ছিলেন জেলার কাজী। শহরে নিযুক্ত হতো কোতোয়াল। মূলত পুলিশ হলেও কোতোয়াল ছোট খাট ফৌজদারি বিচার করতেন। তাদের রায়ের বিরুদ্ধে জেলা আসলগুজার আপিল শুনতেন। রাজস্ব সম্পর্কিত মামলার বিচার করতেন আমিন। তাদের রায়ের বিরুদ্ধে আপিল শুনানির নিষ্পত্তি করতেন কাজি- এ সুবা। সকলের উপরে ছিলেন নবাব স্বয়ং। তার দরবারে সকল প্রকার দেওয়ানী ও ফৌজদারী মামলার রায়ের বিরুদ্ধে আপিলের চূড়ান্ত নিষ্পত্তি হতো। '১৭৫৭ সালে ব্রিটিশদের অধীনে যাওয়ার পর ১৭৬৫ সালে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর দেওয়ানি লাভকালে বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার রাজধানী মুর্শিদাবাদের নিম্ন বর্ণিত আদালতগুলো চালু ও কর্মকর্তাগণ কার্যরত ছিলেন- (১) নাজিমের আদালতে মৃত্যুদণ্ডযোগ্য অপরাধীর বিচার হতো। (২) দেওয়ানের আদালতে ভূসম্পত্তি সংক্রান্ত

www.pathagar.com

দেওয়ানি মামলার বিচার হতো। (৩) দারোগা আদালত আল আলিয়া বা নায়েব নাজিমের আদালতে দাঙ্গা হাঙ্গামা, আঘাত, ঝগড়া বিবাদ, ভূসম্পত্তি ব্যতীত অন্য সম্পত্তি সংক্রান্ত মামলার বিচার হতো। (৪) দারোগা আদালতই-দেওয়ানি বা নায়েব দেওয়ানের আদালতে যে কোন প্রকার দেওয়ানি মামলার বিচার হতো। (৫) ফৌজদারের আদালতে মৃত্যুদণ্ডযোগ্য ব্যতীত অন্য সকল প্রকার ফৌজদারি মামলার বিচার হতো। (৬) কাজির আদালতে উত্তরাধিকার সংক্রান্ত মামলার বিচার হতো। (৭) মুহতাসিবের আদালতে মাদকদ্রব্য সেবনকারী বা বিক্রেতার এবং ওজনে কারচুপির বিচার হতো। (৮) কানুনগোর আদালতে জমি সংক্রান্ত বিরোধ নিষ্পত্তির জন্য আনিত মামলার বিচার হতো মাঝেমধ্যে। (৯) তাছাড়া ফৌজদারের অধীনে কোতওয়াল শহরে শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষার দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন। তিনি অপরাধীকে বিচারাদালতে সোপর্দ করতেন। (১০) আর মুফতী মামলা বিচারের সময় কাজিকে জটিল আইনের প্রশ্নে পরামর্শ দিয়ে বিচারকার্যে সহায়তা করতেন। কাজি মুফতির পরামর্শ বা ফতোয়ার সঙ্গে একমত পোষণ করলে তা গ্রহণ করে মামলার রায় দিতেন। কাজি মুফতির সঙ্গে একমত পোষণ না করলে বিষয়টি নাজিমের নিকট পাঠাতেন। নাজিম তখন কাজি, মুফতি, মুহতাসিব, দারোগা আদালত আল আলিয়া, মৌলভী প্রভৃতি আইনজ্ঞদের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী মামলা নিষ্পত্তি করতেন।[৬২]

বাংলায় ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির বিচার ব্যবস্থার গোড়াপত্তন

মুসলিম শাসনামলে বাংলাসহ ভারতবর্ষের প্রাচুর্য ও সমৃদ্ধির কাহিনী ইউরোপীয় দেশগুলো ছাড়াও সারাবিশ্বে ছড়িয়ে পড়েছিল। ইংরেজ ছাড়াও তখন ডাচ, পর্তুগীজ, ফরাসী, আরব ও ইউরোপসহ বিশ্বের অন্যান্য দেশ ও জাতির আমদানি-রফতানি বাণিজ্যের অন্যতম আকর্ষণ ছিল বাংলা। বাংলায় ১৫১৪ সালে চীনা রাজকীয় প্রতিনিধির সাথে আগত পর্যটক মাহুয়ান লিখেছেন, এই বিশাল বিস্তীর্ণ দেশে বিপুল সম্পদ ও অঢেল ঐশ্বর্য রয়েছে। প্রতিনিধি দলের এক সদস্য বর্ণনা করেছেন দেশটি সুসভ্য ও সম্পদশালী। তারা আমাদের রাজদূতকে সোনার থালা ও গামলা এবং সহকারী দূতকে রূপার থালা ও গামলা উপহার দিয়েছিলেন। সঙ্গে আগত অন্যদেরকে সোনার ঘণ্টা, কোমরে সাদা রশির সজ্জিত ও রেশমের কারুকাজ করা দীর্ঘ গাউন দেয়া হয়েছিল।[৬৩] সমগ্র মুসলিম আমলে শিল্প বাণিজ্যের অভাবিত উন্নতির ফলে স্বর্ণ-রৌপ্য মুদ্রার ব্যাপক চাহিদা সৃষ্টি হওয়ায় দেশের বিভিন্ন স্থানে ২৬টির বেশি টাকশাল প্রতিষ্ঠিত হয়। সুলতান গিয়াস উদ্দিন আজম শাহ (১৩৯০-১৪১০) ও সুলতান জালাল উদ্দিন মুহাম্মদ শাহ (১৪১৪-১৪৩১) কর্তৃক পবিত্র মক্কা ও মদিনা নগরীতে প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত মাদ্রাসা ও এতিমখানার জন্য বাংলা থেকে নিয়মিত স্বর্ণমুদ্রা পাঠানো হতো।[৬৪] বঙ্গদেশে তখন জীবন ধারণের প্রয়োজনীয় সব দ্রব্যাদি ও বিলাসপণ্য বিপুলভাবে উৎপাদিত হতো। অভ্যন্তরীণ চাহিদা মিটিয়ে সব পণ্য বিদেশে রফতানি হতো। মোঘল সম্রাট বাবর তার আত্মজীবনী

www.pathagar.com

বাবরনামায় লিখেছেন, বাংলামুল্লুক অঢেল প্রাচুর্যের দেশ। বাংলার অধিবাসীদের প্রিয় শখ হচ্ছে স্বর্ণ-রূপা সঞ্চয় করা আর মৃত্যুকালে সন্তানদের জন্য তা রেখে যাওয়া।[৬৫] পর্যটক আলেকজান্ডার ডাউ লিখেছেন, বাংলা এমন একটি ডোবা যেখানে সারা বিশ্বের রাশি রাশি স্বর্ণ এসে হারিয়ে যায়, তা আর কোনদিন ফিরে পাওয়া যায় না।[৬৬] উচ্চ শিক্ষিত ফরাসী চিকিৎসক, বণিক ও পর্যটক বার্নিয়ার ১৬৬৬ সালে এ দেশ সফর করে লিখেন, বাংলামূলক ভারতের সর্বাপেক্ষা সম্পদশালী অঞ্চল এবং পৃথিবীর সবচেয়ে সমৃদ্ধ দেশ। মিসরকে বিশ্বের সবচেয়ে সমৃদ্ধ ও সুন্দর দেশ বলা হয়, কিন্তু আমার দু'বার বাংলামূলক সফরে অভিজ্ঞতা হলো। মিসরকে যে প্রাধান্য দেয়া হয় তা বাংলারই প্রাপ্য।[৬৭] প্রধান রফতানি পণ্য বিশ্ববিখ্যাত মসলিন ও সুতী বস্ত্রের দ্বিতীয় স্থানই ছিল রেশমী কাপড়ের। আফিম ও বারুদ তৈরির উৎপাদন সল্ট পিটার, কাঠ পলিশের উপাদান লাক্ষাও রফতানি হতো প্রচুর পরিমাণে। প্রধান রফতানি পণ্যের পাশাপাশি ভোজ্য তেল, শুকনো মাছ, ডাল, পান, সুপারী, পেঁয়াজ, রসুন, কর্পুর, চন্দন ও আগর কাঠ, পাট, ছাগল, হরিণ, ভেড়া, কবুতর ইত্যাদি মোঘল শাসনের বহু পূর্ব থেকেই বাংলা থেকে বিদেশে রফতানি হতো।[৬৮] ১৩শ' শতাব্দীতে তুরস্কের সুলতান বাংলাদেশ থেকে ১৩টি পালতোলা জাহাজ আমদানি করেন। ১৪শ' শতাব্দীতে বিশ্বখ্যাত পর্যটক ইবনে বতুতা উপমহাদেশে এসে জাংক নামের একটি কাঠের জাহাজে করে ফিরে যান। ওই জাহাজ নির্মাণ করেছিলেন ঢাকার অদূরবর্তী সোনারগাঁয়ের নির্মাতারা। সেগুন, জারুল ও শিশুকাঠের সহজলভ্যতার কারণে চট্টগ্রাম অঞ্চলে কাঠের জাহাজ নির্মাণের গোড়াপত্তন হয়েছিল। সেকালে এ ধরনের নৌস্থপতি ছিলেন ইমাম চন্দ্র, ইমাম আলী এবং বালমিপাড়া ও ষোলশহরের কিছু মানুষ। শুধু নিজস্ব বুদ্ধি-বিবেচনায় নিরক্ষর লোকজন বংশপরম্পরায় রপ্ত করেছিল পালতোলা জাহাজ নির্মাণের কৌশল। ইতিহাসে, 'পোর্ট গ্রান্ড' নামে খ্যাত চট্টগ্রাম সমুদ্র বন্দরটি মূলত দু'হাজার বছরের প্রাচীন।[৬৯] পর্তুগীজ পর্যটক বার্থেমা লিখেছেন, বেংগালা বন্দর থেকে কাপড়, চিনি, আদা, মরিচ ইত্যাদি পণ্য বোঝাই অনেকগুলো জাহাজ নিয়মিত মালয় দ্বীপপুঞ্জ, বার্মা, সিংহল, আরব, পারস্য, আবিসিনিয়ার পথে পাড়ি দিত।[৭০] মরক্কোর বিশ্ব পর্যটক ইবনে বতুতা ১৩৪০ সালেই পূর্ব বাংলা সফর করে এদেশকে পৃথিবীর সবচেয়ে সম্পদশালী ও সস্তা জীবনোপকরণের দেশ বলে উল্লেখ করেন।[৭১] মোঘল সম্রাট আকবরের শাসনামলে বাংলায় ছিল মোঘলদের কাগজী সাম্রাজ্য। বাংলার বারো ভূঁইয়া শাসিত এ দেশের দক্ষিণাঞ্চল খুলনার প্রতাপাদিত্য ও বরিশালের বাকালা (চন্দ্রদ্বীপ) রামচন্দ্রের রাজ্যভুক্ত ছিল।[৭২]

আগেই উল্লেখ করা হয়েছে, মুসলিম শাসনামলে বাংলাসহ ভারতবর্ষের প্রাচুর্য ও সমৃদ্ধির কাহিনী ইউরোপীয় দেশগুলোতেও ছড়িয়ে পড়েছিল। তখন গোলমরিচ পাওয়া যেত ভারতবর্ষ ও দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ায়। মধ্যযুগে ভারত ও দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার সাথে গোলমরিচের একচেটিয়া ব্যবসা করে ইটালির বাণিজ্য বন্দর ভেনিস সমৃদ্ধি লাভ করেছিল। কিন্তু ১৭৪০ সাল থেকে মধ্যপ্রাচ্যের স্থলপথে তুর্কিদের একচ্ছত্র আধিপত্য

www.pathagar.com

প্রতিষ্ঠিত হলে ভারতবর্ষ ও দক্ষিণ এশিয়ার সাথে ইউরোপীয়ান বণিকদের যোগসূত্র ছিন্ন হয়ে যায়। ফলে ইটালিয়ান, স্পেনিশ ও পর্তুগীজ নাবিকরা পশ্চিম ও দক্ষিণ দিকে সমুদ্র পথে প্রাচ্য আবিষ্কারের সন্ধানে বেরিয়ে পড়ে। এর আগে ১৪৯২ সালে নাবিক কলম্বাস এক স্পেনীয় নৌবহর নিয়ে আটলান্টিক মহাসাগর পাড়ি দিয়ে ভিন্ন পথে ভারত পৌছার উদ্দেশে যাত্রা করেন। কিন্তু দু'মাস পর ভারতে পৌছতে না পেরে ভুলক্রমে তিনি আবিষ্কার করেন আমেরিকা। আর ১৪৯৮ সালে দক্ষিণ দিক থেকে যাত্রা শুরু করে শেষ পর্যন্ত আফ্রিকার উত্তমাশা ঘুরে ঠিকই ভারতবর্ষের সাথে জলপথ আবিষ্কার করেন পর্তুগীজ নাবিক ভাস্কো-ডা-গামা। ফলে কলম্বাস ও ভাস্কো-ডা-গামার আবিষ্কৃত সমুদ্র পথ অনুসরণ করে পর্তুগীজ, ফরাসী, স্পেনিশ, ওলন্দাজ, ইটালিয়ান ও বৃটিশ ভাগ্যান্বেষী জাহাজী ও বণিকরা।

এর আগে ভারতের সাথে ওলন্দাজসহ অন্যান্য ইউরোপীয় বণিকদের বাণিজ্যের প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে ১৫৯৯ সালের ২৪ সেপ্টেম্বর সিটি অব লন্ডনের ২৪ জন নাবিক লেডেন হল স্ট্রিটের একটি ভগ্নপ্রায় দালানে সমবেত হয়ে ৭২ হাজার পাউন্ড মূলধন দিয়ে 'ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি' নামে ব্যবসা প্রতিষ্ঠান গঠন করেন। তখন তাদের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল আমদানি-রফতানি বাণিজ্য। ভারতের সাথে বাণিজ্যের উদ্দেশ্য সে বছর ৩১ ডিসেম্বর ইল্যান্ডের রাণী প্রথম এলিজাবেথের নিকট থেকে কোম্পানী ১৫ বছরের জন্য বাণিজ্যিক সনদ লাভ করে। এর আট মাস পর ১৬শ' সালের ২৪ আগস্ট ভারতের পশ্চিম উপকূলের সুরাট বন্দরে ৫শ টন ওজনের হেক্টর (Hector) নামের একটি পালতোলা বৃটিশ জাহাজ নোঙ্গর করে। জাহাজের ক্যাপ্টেন উইলিয়াম হওকিন্স আগ্রায় যেয়ে তৎকালীন মোঘল সম্রাট জাহাঙ্গীরের দরবারে উপস্থিত হন। তিনি রাণী এলিজাবেথের সনদ পেশ করে সম্রাটের কাছে ভারতবর্ষের সাথে ব্যবসা করার জন্য করজোড়ে প্রার্থনা করেন। সম্রাট জাহাঙ্গীর ছিলেন তদানীন্তন পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা শক্তিমান ও ঐশ্বর্যশালী সম্রাট। বৃটিশ রাণী এলিজাবেথ ছিলেন তার সামনে একজন ক্ষুদ্র গ্রাম্য শাসকের সমান। সম্রাট জাহাঙ্গীর ক্যাপ্টেন হওকিন্সের প্রার্থনা মঞ্জুর করেন। ফলে ইংরেজরা ব্যবসা শুরু করে ভারতের সাথে। পরবর্তী ১৬১২ সালে সম্রাটের অনুমতি নিয়ে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি সুরাট বন্দরে তাদের প্রথম বাণিজ্যিক কুঠি স্থাপন করে। তৎকালীন ভারতের বহির্বাণিজ্যের সর্ব প্রধান বন্দরে ইংরেজ কোম্পানির আবির্ভাবকে কেউ গুরুত্ব দেয়নি। বরং তাদের দারিদ্র্য দেখে অনেকেই বিদ্রুপের হাসি হেসেছিল এ জন্য যে, সুরাটে তখন এমন বহু মুসলমান ও হিন্দু ব্যবসায়ী ছিলেন যাদের প্রত্যেকের মূলধন বিদেশী এ কোম্পানীর সম্মিলিত মূলধনের চেয়ে বেশি ছিল। লন্ডন থেকে এরপর পাঠানো হয় টমাস রো'কে। তিনি ছিলেন একজন ঝানু রাজনীতিবিদ। ইংল্যান্ডের রাজা জেমসের দূত হিসেবে ১৬২৬ সালে তিনি নানা উপঢৌকন নিয়ে উপস্থিত হন সম্রাট জাহাঙ্গীরের দরবারে। সেদিন টমাস আনুগত্য, ভক্তি, প্রীতি আর অনুনয়ের যে অভিনয় করেছিলেন তাতে সফল হয়েছিলেন তিনি। সম্রাটের পক্ষ থেকে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির ইচ্ছাধীন

www.pathagar.com

শর্তে ভারতের বিভিন্ন স্থানে বিশেষ করে অবিভক্ত বাংলায় বাণিজ্য করার অধিকার ইংরেজরা পেয়ে গিয়েছিল অনায়াসে। টমাস রোয়ের এই সাফল্যে ইংল্যান্ড থেকে দেয়া হয় তাকে স্যার উপাধি। মোঘল সম্রাট শাহজাহানের কন্যা জাহানারা দুর্ঘটনাবশত কাপড়ে আগুন লেগে অগ্নিদগ্ধ হলে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির ডাক্তার সার্জেন গ্যাবরিয়াল বাউটনের চিকিৎসায় আরোগ্য লাভ করেন। এ জন্য সম্রাট বাউটনকে পুরস্কৃত করতে চাইলে বাউটন ধন-সম্পদ কিছু না চেয়ে সম্রাটের কাছে একখণ্ড জমি প্রার্থনা করেন যাতে কোম্পানি এদেশে নিজস্ব মালিকানায় কারখানা স্থাপন করে ব্যবসা-বাণিজ্য করতে পারে। তার প্রার্থনা মঞ্জুর হয়। ১৬৫৫ সালের পর কোম্পানির কাসিম বাজার কুঠির অধ্যক্ষ নিযুক্ত হন ইংরেজ জব চার্নক। তিনি চব্বিশ পরগণার জমিদার সাবর্ণ চৌধুরীর কাছ থেকে কালিকোঠা বা কালিঘাট, গোবিন্দপুর ও সুতানুটি গ্রাম তিনটি কিনে কোলকাতা নগরীর পত্তন করেন। পরবর্তীতে এই কোলকাতা হয় বৃটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির প্রধান ঘাঁটি।[৭৩]

১৬৬১ সালে ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি বাংলায় তাদের প্রথম কারখানা প্রতিষ্ঠা করে হুগলী বন্দরে।[৭৪] ইংল্যান্ডের রাজা প্রথম জেমস ১৬২২ সালের সনদ দ্বারা কোম্পানিকে পূর্ব ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে বসবাসকারী ইংরেজদের অপকর্মের জন্য বিচার করে শাস্তি দেয়ার ক্ষমতা দিয়েছিলেন। ১৬৬১ সালের ৩ এপ্রিলের সনদ দ্বারা রাজা দ্বিতীয় চার্লস কোম্পানির গভর্নর ও কাউন্সিলকে (অর্থাৎ শাসনকর্তা ও তার পরামর্শদাতাদের) কোম্পানির অধিনস্ত সকল স্থানের কর্মচারী ও অধিবাসীদের ইংল্যান্ডের আইনানুযায়ী দেওয়ানি ও ফৌজদারি মামলা বিচার করার ও বিচারের রায় এবং ডিক্রি কার্যকর করার ক্ষমতা দিয়েছিল। ১৬৮৩ সালের ৯ আগস্টের সনদ দ্বারা রাজা দ্বিতীয় চার্লস কোম্পানির গভর্নর ও কাউন্সিলকে একজন আইনজ্ঞ ও দু'জন বণিককে নিয়ে বাণিজ্যিক আদালত গঠন করে বণিকদের মধ্যে প্রচলিত প্রথা, ন্যায়নীতি, সুবিবেচক অনুসারে মামলা বিচার করার ক্ষমতাও দিয়েছিলেন।[৭৫] ১৬৯০ সালের ২৪ আগস্ট কোম্পানির কর্মচারী জব চার্নক ভগীরথী নদীর পূর্ব পাড়ে সুতানটি গ্রামে প্রথম বাণিজ্য কুঠি স্থাপন করে কলকাতা নগরীর গোড়া পত্তন করেন। ১৬৯৮ সালে কোম্পানি সম্রাট আওরঙ্গজেবের পৌত্র বাংলার সুবাদার আজিম উস সানের নিকট থেকে সুতানটি, গোবিন্দপুর ও কলকাতা গ্রামের জমিদারী লাভ করেন।[৭৬] -এর ফলে কোম্পানি নব স্থাপিত কলকাতা নগরীতে স্থায়ীভাবে থাকার অধিকার লাভ করে। ওই তিনটি গ্রাম নিয়েই ১৬৯৯ সালের ডিসেম্বরে কলকাতা প্রেসিডেন্সী শহর প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এবং ঐ এলাকা শাসনের জন্য কোম্পানি একজন প্রেসিডেন্ট (গভর্নর) ও কাউন্সিল বা পরামর্শ পরিষদ নিযুক্ত করেছিল।[৭৭] ১৭০০ সাল থেকে কোম্পানির গভর্নর কাউন্সিলের একজন সদস্য কলকাতা নগরীতে কালেক্টর বা রাজস্ব কর্মকর্তা হিসেবে কাজ করতেন। এই কালেক্টর কলকাতার জমিদার হিসেবে নগরীতে বসবাসকারী এদেশী লোকদের দেওয়ানি, ফৌজদারী ও রাজস্ব মামলার বিচার করতেন। অপরাধীকে তখন চাবুকাঘাত, জরিমানা, কারাদণ্ড, শৃংখলাবদ্ধ করে রাস্তায়

www.pathagar.com

কাজ করানো, নগর থেকে বহিষ্কার ও মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করা হতো। গুরুতর অপরাধে কালেক্টর মৃত্যুদণ্ড দিলে তা কার্যকর করতে গভর্নর ও কাউন্সিলের অনুমোদন নিতে হতো। মামলার রায়ের বিরুদ্ধে গভর্নর ও কাউন্সিলের নিকট আপিল করা যেত। কালেক্টর ইংরেজ অপরাধীদের বিচার করে শাস্তি দিতেন। ইংরেজদের গুরুতর অপরাধের বিচার করতেন গভর্নর ও কাউন্সিল ১৬৬১ সালের সনদের ক্ষমতা বলে।[৭৮] ইংল্যান্ডের রাজা প্রথম জর্জ ১৭২৬ সালে কোম্পানিকে কলকাতা, মাদ্রাজ ও বোম্বাই নগরীতে একজন করে মেয়র এবং ৯ জন অল্ডারম্যান নিয়ে গঠিত একটি করে মেয়র কোর্ট স্থাপনের অনুমতি দিয়েছিলেন। এ আদালতে সব ধরনের দেওয়ানী মামলার বিচার হতো। মেয়র কোর্টের রায়ের বিরুদ্ধে গভর্নর ও তার কাউন্সিলের নিকট প্রথম আপিল এবং প্রিভিকাউন্সিলে দ্বিতীয় আপিল করা যেত। ১৭২৬ সালের সনদে গভর্নর ও কাউন্সিলের সদস্যদের রাজদ্রোহ ব্যতীত কলিকাতা, বোম্বাই ও মাদ্রাজে কোম্পানির ফ্যাক্টরি ও তার ১০ মাইলের মধ্যে সংঘটিত সব ধরনের ফৌজদারী মামলা অয়ার ও টার্মিনার এবং জেল ডেলিভারি আদালত হিসেবে বিচার করার ক্ষমতা দেয়া হয়েছিল। এ আদালতগুলোতে বিচার হতো জুরির সাহায্যে। গভর্নর ও কাউন্সিলের সদস্যদের জাস্টিস অব দি পিস এর মর্যাদা দিয়ে তাদেরকে ফৌজদারি মামলা বিচারের ক্ষমতাও দেয়া হয়েছিল।[৭৯] অষ্টাদশ শতকের প্রথমার্ধে ইউরোপের প্রত্যেকটি দেশের বাণিজ্য এখানে বহুগুণ বৃদ্ধি পায়। ১৭০৮ থেকে ১৭১১ সালের মধ্যে ইংলিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির বছরে গড়ে ১১টি ৩শ টনি জাহাজ এদেশে বাণিজ্য করে। ১৭৩৫ সালে তাদের জাহাজের সংখ্যা একুশে উন্নীত হয়।[৮০] বাংলাদেশে আমদানির চেয়ে পণ্য রফতানি করতো বেশি। এ বাণিজ্যিক আনুকূল্যের ফলে বাংলাদেশে প্রতি বছর কোটি কোটি টাকার সোনা রূপ ও মূল্যবান পাথর লাভ করেছে। পরিসংখ্যানে দেখা যায় যে, ১৭০৯ থেকে ১৭২৭ সাল পর্যন্ত ইংলিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ও ডাচ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কাছ থেকেই শুধু বাংলদেশ প্রতিবছর গড়ে প্রায় তিন কোটি টাকা লাভ করেছে।[৮১] ১৭০৭ সালের পর থেকেই মোঘল সাম্রাজ্যের পতনের সূচনাকাল মনে করা হয়। এ বছর সম্রাট আওরঙ্গজেবের মৃত্যুর পর থেকে ধীরে ধীরে মোঘল বাদশাহদের প্রভাব প্রতিপত্তি কমতে থাকে। ভোগ বিলাস, সিংহাসন নিয়ে নিজেদের মধ্যে আত্মকলহ, ভ্রাতৃঘাতি সংঘর্ষ ও অভ্যন্তরীন যুদ্ধবিগ্রহ মোঘল শক্তিকে দুর্বল করে ফেলে। বাদশাহের উদারতায় উচ্চ বর্ণের হিন্দুরাও সাম্রাজ্যের বিভিন্ন উচ্চপদে সমাসীন ছিলেন। তাদের অনেকের অন্তরে ছিল হিন্দু পুনর্জাগরণের অভিলাষ। তারা বহিরাগত মুসলিম শাসকদের মনে প্রাণে গ্রহণ করতে পারেননি, ঐতিহাসিকভাবে যদিও বর্ণ হিন্দুরাও ছিলেন এদেশে মুসলমানদের মতোই বহিরাগত। মোঘল সাম্রাজ্যের পতনের যুগে প্রাদেশিক শাসকগণ সে সুযোগে প্রভাবশালী ও স্বাধীন হয়ে যায়। কার্ল মার্কস তার ভারতীয় ইতিহাসের কালপঞ্জি গ্রন্থে (পৃ: ৭৫) লিখেছেন, '১৭৪০ সালে সুবাদার সুজাউদ্দিনের মৃত্যুর পর বিহারের শাসনকর্তা আলিবর্দী খাঁ বঙ্গ, বিহার, উড়িষ্যা প্রদেশ তিনটিকে পুনরায় একীভূত করেন। বিশেষভাবে উল্লেখ্য

www.pathagar.com

যে, ১৪৯২ সালে কলম্বাসের আমেরিকা আবিষ্কার এবং ১৪৯৮ সালে ভাস্কো-ডা-গামার ভারতের জলপথ আবিষ্কারের সাড়ে ৪০০ বছর ধরে ইউরোপীয়দের লুণ্ঠন আর আধিপত্যের ফলে সমগ্র বিশ্বের রাজনৈতিক মানচিত্র ওলটপালট হয়ে যায়। ইউরোপীয়রা নতুন নতুন দেশ আবিষ্কারের সাথে সাথে সে সব দেশে ছলে বলে কৌশলে উপনিবেশও স্থাপন করতে থাকে। সমগ্র আমেরিকা, অস্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যান্ডসহ এশিয়া ও আফ্রিকার অধিকাংশ অঞ্চল করতলগত হলো ইউরোপীয়ান উপনিবেশবাদীদের। ওলন্দাজ, নাবিক টাসম্যান আবিষ্কার করেছিলেন অস্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যান্ড। কিন্তু ব্রিটিশ নাবিক ক্যাপ্টেন জেমস কুক এর নেতৃত্বে ওলন্দাজদের টেক্কা মেরে এ দেশ দুটি দখল করে নেয় ব্রিটিশরা। ওলন্দাজরা দখল করে গোটা ইন্দোনেশিয়া। আফ্রিকা মহাদেশের সম্পদশালী দেশগুলো দখল করে পশ্চিম ইউরোপীয়রা। ফরাসীরা নিল সমগ্র ইন্দোচীন ও পন্ডিচেরী আর পর্তুগীজরা নিল ফিলিপাইন। এছাড়া ছোট ছোট জায়গা যেমন গোয়া, দমন, দিউ দখল করে পর্তুগীজরা। হংকং ক্যান্টন ও এডেন বন্দরও চলে যায় ব্রিটিশদের দখলে। সারা বিশ্বে ঔপনিবেশিক আধিপত্য বিস্তারকে কেন্দ্র করে ১৭৫৬ সাল থেকে ১৭৬৩ সাল পর্যন্ত ইউরোপীয় দেশগুলো সাত বছরব্যাপী যুদ্ধ বিগ্রহে জড়িয়ে পড়েছিল। উপনিবেশ গ্রাসের কাড়াকাড়িতে ফ্রান্স, অস্ট্রিয়া, সুইডেন, স্পেন, ব্রিটেন, প্রুশিয়াসহ বিভিন্ন দেশ এ যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে। ১৭৬৩ সালে প্যারিসে ব্রিটেন ও ফ্রান্সের মধ্যে সন্ধি স্থাপনের মাধ্যমে এ যুদ্ধ সমাপ্ত হয়। এ যুদ্ধের পর ইউরোপের সেরা ঔপনিবেশিক শক্তি রূপে মাথা তুলে দাঁড়ায় ব্রিটেন আর ফ্রান্স সর্বস্বান্ত হয়ে যায়। এদিকে ভারতে মোঘল সাম্রাজ্যের পতনের যুগে শাসক শ্রেণী আত্মকলহ ও নিজেদের নিয়ে ব্যস্ত থাকায় বিশ্বব্যাপী ইউরোপীয় আগ্রাসন সম্পর্কে তারা ছিলেন উদাসীন।

ক্ষয়িষ্ণু মোঘল সাম্রাজ্যের দুর্বলতার সুযোগে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির বাণিজ্যিক আওতাভুক্ত বাংলাসহ ভারতের বিভিন্ন স্থানে বেশ আগে থেকেই তারা দস্তুরমতো স্বাধীন প্রশাসন ও নিজেদের বিচার ব্যবস্থা চালু করে। কলকাতার কাশিম বাজার কুঠিতে মোতায়েন করে নিজস্ব সেনাবাহিনী। ১৭৫৩ সালে ইংল্যান্ডের রাজা দ্বিতীয় জর্জ কর্তৃক প্রদত্ত নতুন সনদের আওতায় কলকাতাসহ প্রত্যেক প্রেসিডেন্সি শহরে সর্বনিম্ন দেওয়ানী আদালত কোর্ট অব রিকোয়েস্ট, তার ওপর মেয়র কোর্ট ও দেওয়ানি আপিল নিষ্পত্তির জন্য গভর্নর ও কাউন্সিল কোর্ট গঠন করা হয়। ফৌজদারি বিষয়ে গভর্নর জেনারেল ও কাউন্সিলের সদস্য জাস্টিস অব দি পিস, কমিশনার অব অয়ার এন্ড টার্মিনার, জেল ডেলিভারি ও কোয়ার্টার সেশন আদালত হিসেবে অপরাধে অভিযুক্তদের বিচার করতেন। গুরুতর অপরাধের মামলার শুনানি হতো জুরির সাহায্যে। এ সব রায়ের বিরুদ্ধেও প্রিভি কাউন্সিলে আপিল করা যেত।[৮২] অক্ষয় কুমার মৈত্রেয় তার সিরাজউদ্দৌলা গ্রন্থে লিখেছেন, বাল্যকাল হতেই সিরাজউদ্দৌলা ইংরেজদিগকে দু'চোক্ষে দেখতে পারিতেন না। ইংরেজের হাতে সোনার বাঙ্গালা রাজ্য যে ক্রীড়ার পুতুলের মত বিক্রীত হইবে, তাহা যেন সূচনাতেই সিরাজউদ্দৌলা বুঝিতে পারিয়াছিলেন। সেই জন্য ইংরেজদের বাণিজ্য

www.pathagar.com

বিস্তৃতি এবং পদোন্নতি হইতে দেখিয়া তিনি ঈর্ষাকষায়িত লোচনে তীব্র প্রতিবাদ করিতেন। ইংরেজদের লাভের পথ যতই বিস্তৃত হইতে লাগিল সিরাজউদ্দৌলা বিদেশী বণিকদের প্রতি ততই অসন্তুষ্ট হইতে লাগিলেন। ফরাসী, দিনেমার, ওলন্দাজ প্রভৃতি ইউরোপীয় বণিকদিগের বিনাশুল্কে বাণিজ্য করিবার অধিকার ছিল না। কিন্তু ইংরেজগণ বিনাশুল্কে জলে স্থলে বাণিজ্য করিবার আদেশে বাদশাহর ফরমান পাইয়া দেশীয় বণিকদের লাভের পথে কাঁটা দিয়াছে বলিয়া ইংরেজদের উপরই তাহার বিদ্বেষ বদ্ধমূল হইয়াছিল। সেই জন্যই বালক সিরাজউদ্দৌলা ইংরেজদিগকে তাড়াইয়া দিবার সুযোগ খুঁজিতেন। সেনাপতি মুস্তফা খাঁ সিরাজের প্রস্তাব সমর্থন করিতেন, কিন্তু আলীবর্দীর ভয়ে তিনিও ইংরেজ তাড়াইবার আয়োজন করিতে পারিতেন না। প্রস্তাব উঠিলেই আলীবর্দী বলিতেন, মুস্তফা যুদ্ধ ব্যবসায়ী, যুদ্ধ বাঁধিলেই তাহার লাভ, তোমরা তাহার কথায় কর্ণপাত করিওনা। আলীবর্দী ইংরেজদিগের সহিত কলহ করিতে নিষেধ করিলে সিরাজউদ্দৌলা তাহার প্রকৃত কারণ বুঝিতে না পারিয়া বৃদ্ধ মাতামহকে (নানাকে) ভীরু কাপুরুষ বলিয়া তিরস্কৃত করিতে ভীত হইতেন না।[৮৩] ১৭৫৬ সালের ৮ এপ্রিল আলীবর্দী খাঁর মৃত্যুর পর তার পৌত্র নবাব সিরাজউদ্দৌলা সঙ্গে সঙ্গে কলকাতার গভর্নর মিঃ ড্রেককে জানালেন যে, সমস্ত ব্রিটিশ সশস্ত্র ঘাঁটি ভেঙ্গে ফেলতে হবে। ড্রেক রাজি না হওয়ায় নবাব সসৈন্যে আক্রমণ করে ইংরেজদের ফোর্ট উইলিয়াম দুর্গ দখল শেষে ফিরে যান মুর্শিদাবাদে। বঙ্গ এবার অনাহুত ইংরেজ থেকে সম্পূর্ণভাবে এবং কার্যত মুক্ত হয়। ১৭৫৭ সালের ২ জানুয়ারি মাদ্রাজ থেকে প্রেরিত এডমিরাল ওয়াটসনের অধীনে নৌবহরের সঙ্গে এসে ক্লাইভ ফোর্ট উইলিয়াম দুর্গ পুনর্দখল করে। ৩ জানুয়ারি সিরাজউদ্দৌলা কোম্পানিকে তাদের পুরানো বিশেষাধিকার ফিরিয়ে দিয়ে সন্ধি করতে বাধ্য হন। চন্দননগরে ফরাসী বসতি ক্লাইভ ধ্বংস করার পর নবাব সেনাশিবির গড়লেন কলকাতার হুগলী নদীর তীরে পলাশীতে। সিরাজউদ্দৌলার প্রধান সেনাপতি মীরজাফর চিঠি পাঠালেন ক্লাইভের কাছে এই মর্মে যে তিনি চূড়ান্ত যুদ্ধের যে কোন দিন ইংরেজদের দলে যোগ দিবেন যদি সিরাজউদ্দৌলার জায়গায় তাকে বঙ্গ বিহার ও উড়িষ্যার নবাব করা হয়। ক্লাইভ প্রস্তাবটা গ্রহণ করলেন। ১৭৫৭ সালের ২৩ জুন ইংরেজদের সাথে যুদ্ধে প্রধান সেনাপতির বিশ্বাসঘাতকতায় নবাব বাহিনী পরাজিত হয় এবং মীরজাফর যোগ দিলেন ক্লাইভের পক্ষে।

যুদ্ধের ক্ষতিপূরণ ও হুগলীতে কোম্পানির সম্পত্তি রক্ষা করার শর্তে পরবর্তী ২৯ জুন দেশদ্রোহী মীরজাফরকে ক্লাইভ বঙ্গ বিহার উড়িষ্যার নবাব বলে ঘোষণা করলেন। মীরজাফরের অর্থমন্ত্রী হলেন দুলাব রাম ও পাটনার শাসনকর্তা হলেন রাম নারায়ণ। ৩০ জুন ভিখারীর ছদ্মবেশে সিরাজউদ্দৌলা ধরা পড়লে মীরজাফরের একপুত্র তাকে হত্যা করে। পলাশী যুদ্ধ শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে ক্লাইভকে কলকাতার গভর্নর করা হয়; এভাবে তিনি বঙ্গে ব্রিটিশ সামরিক ও বেসামরিক অধিকর্তা হলেন।[৮৪] পলাশী বিপর্যয়ে বাংলার

www.pathagar.com

স্বাধীনতা অস্তমিত হওয়ার পর ধীরে ধীরে সমগ্র ভারতও চলে যায় ব্রিটিশদের দখলে। পলাশীর যুদ্ধ মূলত কোন অর্থেই যুদ্ধ ছিলনা। এটি ছিল মুসলিম শাসন অবসানে নবাব দরবারের হিন্দু আমর্ত্যবর্গের মরিয়া প্রচেষ্টা, হিতাহিত জ্ঞানশূন্য অতিলোভী প্রধান সেনাপতির বিশ্বাসঘাতকতা এবং এই পরিস্থিতি কাজে লাগিয়ে ইংরেজ শক্তির এদেশ গ্রাসের যুক্ত ফলাফল। বাংলার পরবর্তী অধ্যায় হচ্ছে- প্রতিরোধ যুদ্ধের এক ভিন্ন রক্তরঞ্জিত ইতিহাস।

তথ্যসূত্র

১. জন স্যার মার্শাল: দি প্রি হিস্টোরিক সিভিলাইজেশন অব ইন্টাজ- পৃ: ১।
২. ডুরান্ট উইল: আওয়ার ওরিয়েন্টাল হেরিটেজ, পৃ: ৩৯৬-৩৯৯।
৩. নরেশ চন্দ্র সেন গুপ্ত: এভুলেশন অব এনসিয়েন্ট ইন্ডিয়ান ল' পৃ: ৩৭-৪৩।
৪. দি লয়স অব মনু: ৮ম অধ্যায়, শ্লোক নং ৪-৭, পৃ: ১৫২।
৫. প্রাগুক্ত: সেনগুপ্ত, পৃ: ৪৪।
৬. মুল্লা: প্রিন্সিপলস অব হিন্দু ল' চতুর্দশ সংস্করণ, পৃ: ৪৪।
৭. প্রাগুক্ত: সেনগুপ্ত পৃ. ২২৯।
৮. প্রাগুক্ত: সেনগুপ্ত, পৃ: ৫৬।
৯. প্রাগুক্ত: সেনগুপ্ত, পৃ: ৫৩, ৫৪)।
১০. প্রাগুক্ত: সেনগুপ্ত, পৃ: ৭৭, ৭৮।
১১. প্রাগুক্ত: সেনগুপ্ত, পৃ: ৬১, ৬৬)
১২. প্রাগুক্ত: সেনগুপ্ত, পৃ: ৫৭, ৫৮, ৫৯।
১৩. প্রাগুক্ত, সেনগুপ্ত, পৃ: ৫৯, ৬০।
১৪. খোসলা: দি লয়স অব মনু, অষ্টম অধ্যায়, শ্লোক নং ৮৮ ও ১২৩, পৃষ্ঠা- ১৬০ থেকে ১৬৪।
১৫. প্রাগুক্ত: সেনগুপ্ত- পৃ: ৩০৭, ৩১৩ ও ৩২৪।
১৬. দি লয়স অব মনু, অষ্টম অধ্যায়, শ্লোক নং ২৬৭-৩৮৫, পৃষ্ঠ ১৮১-১৯৩।
১৭. গৌর হরি সিং: দি হিন্দু কোড, পৃ: ৫৩)
১৮. মুল্লা: প্রিন্সিপাল অব হিন্দু ল'- চতুর্দশ সংস্করণ, পৃষ্ঠা ৬৯।
১৯. সুরজিত দাশ গুপ্ত: ভারতবর্ষ ও ইসলাম; পৃ-২৫।
২০. প্রাগুক্ত : ভারতবর্ষ ও ইসলাম, পৃ: ২৬।
২১. বিনয় ঘোষ: ভারত জনের ইতিহাস, পৃ: ২৭৭।
২২. প্রাগুপ্ত: ভারতবর্ষ ও ইসলাম– পৃ: ২৬।
২৩. ওয়াহেদ হোসেন : এডমিনিস্ট্রেশন অব জাস্টিস ডিউরিং দি মুসলিম রুল ইন ইণ্ডিয়া- পৃ: ১০ থেকে ২৩।
২৪. ডিভি কুলশ্রেষ্ঠ: ল্যান্ড মার্কস ইন ইন্ডিয়ান লিগ্যাল এন্ড কনস্টিটিউশনাল হিস্ট্রি- পৃ: ১১-১২।
২৫. প্রাগুক্ত: মুসলিম রুল ইন ইন্ডিয়া, পৃ: ২৫।
২৬. বি নেইল বেইলি: ডাইজেস্ট অব মোহামেডান 'ল-পৃ: ৭৩৮-৩৯।
২৭. হুসাইনি এসএ কিউই: দি এডমিনিস্ট্রেশন আন্ডার দি মোঘলস-পৃ: ১৯৪।

www.pathagar.com

২৮. প্রাগুক্ত: মুসলিম রুল ইন ইন্ডিয়া, পৃ: ১৭২।
২৯. প্রাগুক্ত: ডিভি কুলশ্রেষ্ঠ, পৃ: ১৯।
৩০. প্রাগুক্ত: ডিভি কুলশ্রেষ্ঠ, পৃ: ২৪।
৩১. প্রাগুক্ত: ডিভি কুলশ্রেষ্ঠ, পৃ: ২৪।
৩২. প্রাগুক্ত : এডমিনিস্ট্রেশন অব জাস্টিস, পৃ:-৬।
৩৩. প্রাগুক্ত : এডমিনিস্ট্রেশন অব জাস্টিস, পৃ: ২৪-২৬।
৩৪. প্রাগুক্ত : ল্যান্ড মার্কন ইন ইন্ডিয়ান... পৃ: ২৫।
৩৫. প্রাগুক্ত : এডমিনিস্ট্রেশন আন্ডার দি মোঘলস, পৃ: ২১।
৩৬. আজকের কাগজ: ২০ এপ্রিল, ২০০৪।
৩৭. কার্ল মার্কস, ভারতীয় ইতিহাসের কালপঞ্জী, পৃ: ৪৩, ৪৪।
৩৮. আবুল ফজল: আইন-ই অকবরী- পৃ: ৪২, ৪৩।
৩৯. প্রাগুক্ত: এডমিনিস্ট্রেশন অব জাস্টিস... পৃ. ৩৩-৪৩।
৪০. প্রাগুক্ত: এডমিনিস্ট্রেশন অব জাস্টিস... পৃ. ৫০-৫৯।
৪১. হুসাইন এসএ কিউই: দি এডমিনস্ট্রেশন আন্ডার দি মোঘল- পৃ. ২১৫।
৪২. ওয়াহেদ হোসেন: এডমিনিস্ট্রেশন অব জাস্টিস ডিউরিং দি মুসলিম রুল ইন ইণ্ডিয়া, পৃ. ৪১, ৪৭, ৫২, ৫৩, ৫৬।
৪৩. ইবনে হাসান: সেন্ট্রাল স্ট্রাকচার, পৃ: ৩৩১-৩২, মনসারেট: কমেনটারী, পৃ. ৮৭, ৮৮ এবং এডওয়ার্ড টেরী আর্লি: ট্রাভেলস ইন ইন্ডিয়া ১৬১৫-১৬২৮।
৪৪. তথ্যসূত্র: টাঙ্গাইল আইন মহাবিদ্যালয়ের সাবেক অধ্যাপক ও আইনজীবী প্রয়াত কামাক্ষানাথ সেন-এর লেখা প্রবন্ধ 'প্রাচীন ভারতবর্ষে বিচার ব্যবস্থা' অবলম্বনে।
৪৫. জন স্যার মার্শাল : দি প্রি-হিস্টোরিক সিভিলাইজেশন অব ইন্টাজ, পৃষ্ঠা-১।
৪৬. আজকের কাগজ, ১৬ ডিসেম্বর ২০০৫।
৪৭. ডুরান্ট উইল : আওয়ার ওরিয়েন্টাল হেরিটেজ-পৃ: ৩৯৫।
৪৮. স্মিথ : অক্সফোর্ড হিস্টোরি-পৃ: ১৪।
৪৯. দৈনিক সংগ্রাম : ১ মার্চ ২০০৬।
৫০. ড: মোহাম্মদ হান্নান : বাঙালির ইতিহাস, পৃ: ১৮, ১৯।
৫১. অতুল সুর: বাঙলার সামাজিক ইতিহাস, পৃ: ৩১।
৫২. গ্রি বোনদার্গ লেভিন, কো অন্তোনভা এবং গ্রি কতোভস্কি: ভারতবর্ষের ইতিহাস, পৃ: ১৩২-৩৪।
৫৩. প্রাগুক্ত ডুরান্ট-পৃ: ৩৯৭।
৫৪. নরেশ চন্দ্র সেনগুপ্ত : এভ্যুলেশন অব এনিশিয়েন্ট ইন্ডিয়ান'ল-পৃ: ৭।
৫৫. দৈনিক প্রথম আলো সাময়ীকি-'ছুটির দিনে', পৃ: ৫ ৬, ৮/২৫ ডিসেম্বর ১৯৯৯।
৫৬. বিনয় ঘোষ : ভারতজনের ইতিহাস, পৃ: ৭০।
৫৭. রমেশচন্দ্র মজুমদার : বাংলাদেশের ইতিহাস, নতুন সংস্করণ, ১ম খণ্ড– পৃ:-১৩।
৫৮. আজকের কাগজ-১১ ডিসেম্বর, ২০০৫।
৫৮. আজকের কাগজ-১১ ডিসেম্বর ২০০৫।
৫৯. সুরজিত দাসগুপ্ত: ভারতবর্ষ ও ইসলাম, পৃ: ৩৭।

www.pathagar.com

৬০. আবদুল করিম: বাংলার ইতিহাস সুলতানি আমল, পৃ: ১৪২, ৩৯১, ৪০৫।
৬১. দৈনিক ইত্তেফাক: ৩০ ডিসেম্বর ২০০৫।
৬২. ওয়াহেদ হোসেন: এডমিনিস্ট্রেশন অব জাস্টিস ডিউরিং দি মুসলিম রুল ইন ইন্ডিয়া, ১ম সংস্করণ, পৃ: ৯৪-৯৫।
৬৩. মোহর আলী: হিস্টোরি অব দি মুসলিম অব বেঙ্গল, ভলিউম ১/খ, পৃ: ১১৭ ও ১২৭।
৬৪. প্রাগুক্ত: মোহর আলী, পৃ: ১৪০ এবং ৯২৮, সৌদী আরবের ইসলামী ইউনিভার্সিটি কর্তৃক প্রকাশিত।
৬৫. আবদুর রহীম: সোস্যাল এন্ড কালচারাল হিস্ট্রি অব বেঙ্গল, পৃ: ৫১৭।
৬৬. আলেকজান্ডার ডাউ: ইন্দোস্তান, পৃ: ১১২।
৬৭. বার্নিয়ার: পৃ. ১৬৯, ৪৩৭।
৬৮. আবদুর রহীম: সোস্যাল এন্ড কালচারাল হিস্ট্রি অব বেঙ্গল, ১ম খণ্ড পৃ: ৪০০।
৬৯. দৈনিক ইত্তেফাক: ১০ এপ্রিল ২০০৬।
৭০. হাকলুইয়াত সোসাইটি ১১ পৃ: ১৩৬ ও ৩৭।
৭১. ইবনে বতুতার সফরনামা পৃ: ১৩০-৩২।
৭২. পূর্বোক্ত হিস্ট্রি অব বেঙ্গল, পৃ: ৩৬৪।
৭৩. প্রাগুক্ত: সরকার শাহাবুদ্দিন আহমদ, পৃ: ২৮ থেকে ৩২।
৭৪. যাদুনাথ সরকার: হিস্ট্রি অব বেঙ্গল পৃ: ৩৮৩।
৭৫. এইচ উইলিয়াম মরলি: দি এডমিনিস্ট্রেশন জাস্টিস ইন বৃটিশ-ইন্ডিয়া, পৃ: ৫,৬।
৭৬. সিরাজুল ইসলাম: হিস্টোরি অব বাংলাদেশ, ভলিয়ম-১, পৃ: ৬৯।
৭৭. পিএম জৈন: আউট লাইন্স অব ইন্ডিয়ান লিগ্যাল হিস্টোরি, ৩য় সংস্করণ, পৃ: ৩৮।
৭৮. প্রাগুক্ত: জৈন, পৃ: ৪১,৪২।
৭৯. প্রাগুক্ত: মরলি, পৃ: ৬, ৭।
৮০. চার্লস হার্ডি: রেজিস্টার অব শিপস এমপ্লয়েড ইন দি সার্ভিস অব দি ইউনাইটেড ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ১৭৯৯।
৮১. ওম প্রকাশ: বেলুন ফর গুডস, ইন্টারন্যাশনাল ট্রেড এন্ড দি ইনকনমিকস অব আর্লি এইটিনথ সেঞ্চুরি বেঙ্গল, দি ইন্ডিয়ান জার্নাল অব সোস্যাল এন্ড ইকনোমিক হিস্টোরি রিভিউ, ভলিয়ম- ৮, নং-২, ১৯৭৬।
৮২. কে জে মিত্তাল: ইন্ডিয়ান লিগ্যাল হিস্টোরি, পৃ: ৩০।
৮৩. উদ্ধৃতি: দৈনিক সংগ্রাম, ১০ ডিসেম্বর ২০০৫।
৮৪. প্রাগুক্ত: কার্ল মার্কস, পৃ: ৮৪, ৮৫, ৮৬।

www.pathagar.com

অধ্যায় : তিন

ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক বিচার ব্যবস্থা: ভূলুণ্ঠিত মানবাধিকার

১৭৫৭ সালে ইংরেজ বণিক সংগঠন ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি পলাশী যুদ্ধে বাংলা বিহার উড়িষ্যা দখলের পরবর্তী ১৭৭২ সাল পর্যন্ত সময়কাল ছিল দারুণ অরাজকতাপূর্ণ। তখন দেশে অরাজকতার সুযোগে সরকারি কর্মকর্তারা ক্ষমতাশালী হয়ে কাজী (বিচারক) 'কে উপেক্ষা করে নিজেরাই বিচারকার্য করতে থাকেন এবং কাজীর ক্ষমতা মুর্শিদাবাদে উত্তরাধিকার সংক্রান্ত মামলার বিচার করা, দলিল তালিকাভুক্ত করা ও বিয়ে পড়ানোর মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ে। আর মফস্বলে কাজী ও নায়েব কাজী থাকলেও তাদের মামলা বিচার করার ক্ষমতা স্থানীয় জমিদার, রাজস্ব কর্মকর্তা ও ভূস্বামীদের প্রভাবে খর্ব হয়ে পড়ে। জমিদার, রাজস্ব কর্মকর্তা ও ভূস্বামীরা নিজেদের স্বার্থ হাসিলের জন্য যেসব বিষয়ে দেশে প্রচলিত আইনের বিধান ছিল না–সেসব বিষয়ও ক্ষমতা পরিচালনা করতে থাকেন। এককথায় পলাশী যুদ্ধের পর পর গোলযোগের ফলে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির দেওয়ানি লাভ তথা ভূমি রাজস্ব আদায়ের ক্ষমতা লাভ করা পর্যন্ত দেশে শাসন ও বিচার ব্যবস্থা ভেঙ্গে পড়েছিল। যার ফলে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ১৭৭২ সালে এদেশে দেওয়ানি ও ফৌজদারি আদালত স্থাপন করে।[১] ১৭৬৭ সালে অসুস্থতার দরুণ লর্ড ক্লাইভ পদত্যাগ করেন। ইংল্যান্ডে প্রত্যাবর্তনের পর ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির ডিরেক্টররা তাকে নির্মমভাবে নির্যাতন করে। ১৭৭৪ সালের নভেম্বরে ক্লাইভ আত্মহত্যা করেন। এর আগে ১৭৬৭ থেকে '৬৯ সাল পর্যন্ত কলকাতা কাউন্সিলের সভাপতি ভেরলেস্ট ছিলেন বঙ্গের গভর্নর। ১৭৭১ সালে ইংল্যান্ডের পার্লামেন্টের হস্তক্ষেপে কলকাতায় গিয়ে কোম্পানির সমস্ত কর্মদ্ধতি তদন্ত করে সংস্কারের জন্য তিন সদস্যের একটি কমিটি নিয়োগ করা হলো। কিন্তু কমিটির তিন সদস্য ভান্সিটার্ট, স্ক্রাফটন এবং কর্নেল ফোর্ড উত্তমাশা অন্তরীপের কাছে জাহাজডুবিতে মারা গেলেন।[২] এরপর বঙ্গের গভর্নর নিযুক্ত হন লর্ড ওয়ারেন হেস্টিংস। ১৭৭৩ সালে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি পুনর্গঠন আইনে তাকে গভর্নর জোনারেল পদ দেয়া হয় এবং তিনিই এদেশে ১৭৭২ সালে আনুষ্ঠানিকভাবে ঔপনিবেশিক দেওয়ানি, ফৌজদারী ও রাজস্ব আদালতের গোড়া পত্তন করে ন্যায় বিচারের প্রতীক হিসেবে দাঁড়িপাল্লাকে পুনর্নির্ধারণ করেন।

www.pathagar.com

কে এই ওয়ারেন হেস্টিংস?

আজকের স্বাধীন ভারত, পাকিস্তান ও বাংলাদেশের বিচার ব্যবস্থার আদি জনক 'লর্ড ওয়ারেন হেস্টিংস-এর জন্ম ১৭৩২ সালে। বেঙ্গল সিভিলিয়ান হিসেবে ১৭৫০ সালে কলকাতায় তিনি চাকরি করতেন ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির একজন নগণ্য কেরানী পদে। ১৭৬০ সালে তিনি কলকাতা কাউন্সিলের সদস্য হন। ১৭৭২ সালে ১৩ এপ্রিল বঙ্গের গভর্নর নিযুক্ত হয়ে হেস্টিংস প্রধান রাজস্ব বিভাগের অফিস মুর্শিদাবাদ থেকে কলকাতায় স্থানান্তর করেন। ১৭৭৩ সালে রিকনস্ট্রাকশন এ্যাক্ট এর অধীনে তিনি হলেন বাংলার প্রথম গভর্নর জেনারেল। এ বছরই ইংল্যান্ডের তৃতীয় জর্জের শাসন পর্বের ত্রয়োদশ বছরের ৬৩ নং রয়েল চার্টারের বিধিবলে হেস্টিংস কলকাতা সুপ্রিমকোর্ট প্রতিষ্ঠা করেন। প্রধান বিচারপতি পদে নিযুক্ত করলেন স্যার এলিজা ইম্পেকে। হেস্টিংস রাজস্ব বিষয়টি নাগরিক প্রশাসন থেকে আলাদা করেন। প্রথমটির 'সাময়িক আদালত' এবং শেষেরটির নাম দিলেন 'জেলা আদালত'। এই দুই আদালতের উপরে তিনি আপিল কোর্ট হিসেবে প্রতিষ্ঠা করেন 'সদর দেওয়ানই আদালত'।[৩] ইংল্যান্ডে পাঠানো এক 'ডেসপ্যাচে' লর্ড ওয়ারেন হেস্টিংস এদেশী ডাকাতদেরকে 'আউট ল' বলে উল্লেখ করেন। তিনি লিখেন, এই শ্রেণীর ডাকাতরা পুরুষানুক্রমে দস্যু সম্প্রদায়। এদের চিরাচরিত স্বভাব মতো এরা সরকার নবাব প্রভৃতি প্রত্যেকের সঙ্গে সর্বদাই যুদ্ধরত। ডাকাতির সঙ্গে হত্যা যুক্ত না হলে মুসলিম কাজী বা ব্রাহ্মণ বিচারকগণ এদেরকে প্রাণদণ্ড দিতেন না। জমিদার শাসকদের প্রশ্রয় ও সাহায্যপুষ্ট এই ডাকাতদের নবাবরাও সমীহ করে চলতেন। তাই ব্রিটিশদের স্বার্থে ওদের দমন করতেই হবে।[৪] তবে ডাকাত কে? এর এক মজার কিন্তু মর্মান্তিক উদাহরণ দেখুন। লর্ড ওয়ারেন হেস্টিংস যখন ব্রিটিশ ফৌজের সহায়তায় নাটোর এবং বর্ধমানের রাজপ্রাসাদ লুট করেন তাকে ডাকাতি বলা হয়নি। অথবা যখন তিনি খাজনা দিতে অক্ষম পরিবারগুলোর গৃহবধূদের বাইরে টেনে এনে দু'খণ্ড কাঠের সাহায্যে তাদের বক্ষ নিপীড়ন করে রাজকর আদায় করেছেন তখন সেটাকে ডাকাতি বলা হয়নি। অযোধ্যার বেগমকে নির্যাতন করে তার কাছ থেকে অর্থ ও সম্পদ আদায়ও ডাকাতি বলে গণ্য করা হয়নি। এখন প্রশ্ন হচ্ছে ওয়ারেন হেস্টিংস যদি ডাকাত না হয় তবে ডাকাত কে?[৫] এটা খুবই বিস্ময়কর ঘটনা যে, আজকের আদালতে ব্যবহৃত ন্যায়বিচারের প্রতীক দাঁড়িপাল্লা ওয়ারেন হেস্টিংস এরই অবদান, আর হেস্টিংস নিজেই দাঁড়িপাল্লার ব্যবহার করেছেন অনৈতিক কাজে। তিনি পরস্ত্রীকে দাঁড়িপাল্লায় বসিয়ে স্বর্ণের দামে খরিদ করেছিলেন। ১৭৭২ থেকে ১৭৮৫ সাল পর্যন্ত ক্ষমতায় থাকাকালে তার অধস্তন কর্মচারীর পরম সুন্দরী স্ত্রী কয়েক সন্তানের জননী ব্যারোনেস আন্নামারিয়া ইমহোফ এর সাথে আট বছর পরকীয়া সম্পর্ক থাকার পর তিনি তাকে বিয়ে করে তার পূর্ব স্বামীকে স্বর্ণ দিয়ে বিদায় করেন। দাঁড়িপাল্লার একদিকে মারিয়া ইমহোফকে বসিয়ে আর অন্য পাল্লায় সমওজনের স্বর্ণ রেখে এই মূল্য নির্ধারণ করা হয়েছিল। মারিয়া ইমহোফ-এর চিত্র শিল্পী জার্মান স্বামী তার প্রিয়তমা স্ত্রীকে ফেরত পাবার দুঃসাহস দেখাননি। কারণ

www.pathagar.com

ভারতের দোর্দণ্ড প্রতাপশালী গভর্নর জেনারেল বলে কথা।'[৬] ১৭৮০ সালের ২৯ জানুয়ারি ভারতীয় উপমহাদেশে 'বেঙ্গল গেজেট' নামে প্রথম ইংরেজি পত্রিকা প্রকাশিত হয়। পত্রিকাটি ছিল সরকারের অপকর্মের কঠোর সমালোচক। ওয়ারেন হেস্টিংসের ভুলনীতি ও তার পত্নীর বিরুদ্ধেও পত্রিকাটি সমালোচনার ঝড় তোলে। এছাড়া আদালতে কি ধরনের বেআইনি কাজকর্ম চলছে এবং ঘুষ না দিলে যে কিছুই হয় না তাও ছাপা হত বেঙ্গল গেজেটে। এতে গভর্নর জেনারেল হেস্টিংস ও সুপ্রিমকোর্টের প্রধান বিচারপতি স্যার এলিজা ইম্পে প্রচণ্ডভাবে ক্ষেপে যান পত্রিকার সম্পাদক জেমস অগাস্টাস হিকির ওপর। হিকিকে জেলে বন্দি করে হেস্টিংসের ইঙ্গিতে ১৭৮২ সালের মার্চ মাসে প্রধান বিচারপতি ইম্পে বাজেয়াপ্ত করলেন হিকির প্রেস, ছাপার কাগজ, যন্ত্রপাতি সবকিছু। মাত্র ৫ হাজার টাকা ক্ষতিপূরণ আদায় করতে হিকিকে তারা করে দিলেন একেবারে নিঃস্ব। আর এভাবেই অস্তমিত হয়ে গিয়েছিল ভারতীয় উপমহাদেশের প্রথম সংবাদপত্রের রক্তিম সূর্য।[৭]

সভ্যতাগর্বী ইংরেজরা ভারতীয় উপমহাদেশে সর্বপ্রথম ঘুষ বা উৎকোচ নেয়ার রীতি প্রচলন করে। ১৭৭৫ সালের ৬ মে ভারতবর্ষের ইংরেজ গভর্নর জেনারেল লর্ড ওয়ারেন হেস্টিংস মীরজাফর পত্নী মনি বেগমের কাছ থেকে সাড়ে তিন লাখ টাকা ঘুষ নেন। হেস্টিংস-এর এই উৎকোচ গ্রহণ তার ভারতীয় সেক্রেটারি কানাইলাল বাবুকে ঘুষ গ্রহণে উৎসাহ ও প্রেরণা যোগায়। বর্ধমানের রানীর কাছ থেকে কানাইলাল বাবু ১৫ হাজার টাকা ঘুষ নেন। এই টাকা থেকে ১০ হাজার টাকা হেস্টিংসকে দিয়ে বাকি ৫ হাজার টাকা কানাইলাল বাবু নিজে নেন। কানাইলাল বাবুই প্রথম ভারতীয় সিভিল সার্ভিস অফিসার হিসেবে ঘুষ গ্রহণ করে ইতিহাসে নাম লিখিয়েছেন। এ ঘুষ নেয়ার অপরাধে তৎকালীন ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী উইলিয়াম পিট ভারতের গভর্নর জেনারেল হেস্টিংসকে ইম্পিচ করেন। এই ইম্পিচের ফলে সাত বছর ধরে তদন্ত ও বিচার প্রক্রিয়ায় হেস্টিংস সর্বস্বান্ত হয়ে যান। তবুও এই ঘুষের ধারা রোধ না হয়ে ক্রামগত বেড়েই চলে। এই প্রচলন ভারতবর্ষে সিভিল এবং পুলিশ প্রশাসনের ভেতর ক্যান্সারের মতো সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে।[৮] আসামীর জামিন ক্ষেত্রে দেশীয় লোকদের সুপ্রীম কোর্টের এখতিয়ারের বাইরে রেখে হেস্টিংস এক আদেশ জারি করলে বিচারালয় অপমানের জন্য সুপ্রীম কোর্ট সমন জারি করে কাউন্সিল এবং গভর্নর জেনারেলকে। কিন্তু সুপ্রিম কোর্টকে বিন্দু মাত্র পরোয়া করলেন না হেস্টিংস। ১৭৮৫ সালে পদত্যাগ করে হেস্টিংস ইংল্যান্ড প্রত্যাবর্তনের পর অশেষ দুর্গতি ভোগ করেন। ১৮১৮ সালে ৮৬ বছর বয়সে তিনি মৃত্যুবরণ করেন।[৯] ভারতবর্ষে ঔপনিবেশিক আদালতের জনক হেস্টিংস এভাবেই আদালত অবমাননার ইতিহাসটিও সর্ব প্রথম স্থাপন করে গেছেন।

জেলা দেওয়ানি আদালত : ১৭৭২ সালে হেস্টিংস এর শাসন পরিকল্পনায় রাজস্ব আদায় ও বিচার বিভাগের কাজ দেশীয়দের বদলে কোম্পানির ইংরেজ কর্মচারীদের হাতে ন্যস্ত হয়। তখন প্রতি জেলায় রাজস্ব আদায়ে একজন চুক্তিবদ্ধ ইংরেজ কালেক্টার নিয়োগ দেয়া

www.pathagar.com

হয়। গভর্নর ও তার কাউন্সিলসহ স্থানীয় কর্মকর্তাদের নিয়ে কলকাতায় রাজস্ব আদায় তত্ত্বাবধানের জন্য গঠন করা হয় বোর্ড অব রেভিনিও তথা রাজস্ব বোর্ড। জেলার দেওয়ানি আদালতের বিচারকও ছিলেন কালেক্টর। এই আদালতে খাজনা ও টাকার দাবি, উত্তরাধিকার, বিয়ে, বর্ণ, চুক্তি, লেনদেন, স্থাবর ও অস্থাবর সংক্রান্ত সর্বোচ্চ ৫শ' টাকা দাবির মামলার বিচার হতো এবং এ আদালতের রায়ের বিরুদ্ধে কোন আপিল করা যেত না। তবে এ আদালতে জমিদারিতে উত্তরাধিকার সূত্রে মালিকানা দাবি সংক্রান্ত মামলার বিচার হতো না। এ বিচার করার ক্ষমতা ছিল গভর্নর ও তার কাউন্সিলের। নির্দিষ্ট ফি দিয়ে মামলা দায়ের করার বিধান এবং ১২ বছর আগের দাবি সংক্রান্ত মামলা গ্রহণ করা হতো না এই আদালতে। বাদীর আর্জি, বিবাদীর জবাব ও প্রয়োজনবোধে সাক্ষ্য নিয়ে রায় দেয়া হতো।[১০]

জেলা ফৌজদারী আদালত : কালেক্টরের তত্ত্বাবধানে দেওয়ানি আদালতের মতো প্রত্যেক জেলায় একটি করে ফৌজদারী আদালতও প্রতিষ্ঠা করা হয়। এ আদালতে প্রতারণা, চুরি, হত্যা, ডাকাতি, মারামারি, শারীরিক আঘাত, জালিয়াতি, সম্পত্তি থেকে বেদখল, মিথ্যা সাক্ষ্য দান ও সব ধরনের শান্তি ভঙ্গের বিচার হতো। দু'জন মৌলবির সাহায্যে কাজি ও মুফতি প্রচলিত ইসলামী আইনে সাক্ষ্য প্রমাণে দোষী সাব্যস্ত হলে আসামীকে কারাদণ্ড, শারীরিক শাস্তি বা জরিমানা করতেন। ১শ' টাকার অধিক জরিমানা হলে সদর নিজামত আদালতের অনুমোদন নিতে হতো। সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত বা মৃত্যুদণ্ড অনুমোদনে বিচারকের মতামতসহ সদর নিজামত আদালতে পাঠানোর পর নাজিমের অনুমোদন লাভ করলে মৃত্যুদণ্ড কার্যকর হতো। তবে সবকিছুই তদারক করতেন ইংরেজ কালেক্টর।[১১]

সদর দেওয়ানি আদালত : জেলা দেওয়ানি আদালতে ৫শ' টাকা পর্যন্ত দাবির মামলার রায় চূড়ান্ত ছিল। এর অধিক দাবির মামলার রায়ের বিরুদ্ধে কলকাতার সদর দেওয়ানি আদালতে আপিল করা যেত।[১২] সদর দেওয়ানি আদালতের বিচারক ছিলেন গভর্নর ও কাউন্সিলের দু'জন সদস্য। এ আদালতে এদেশী রাজস্ব দেওয়ান, প্রধান কানুনগো, মুফতি ও পণ্ডিত জেলা দেওয়ানি আদালতের রায়ের বিরুদ্ধে আপিল শুনানি শেষে রায় দিতেন সপরিষদ গভর্নর। আপিলের দরখাস্তের সাথে শতকরা ৫ টাকা ফি দিয়ে জেলা দেওয়ানি আদালতের ডিক্রীর দু'মাসের মধ্যে এ আদালতে আপিল দায়ের করতে হতো।[১৩]

সদর নিজামত আদালত : প্রধান কাজী, প্রধান মুফতি ও তিনজন খ্যাতিমান মৌলবিকে নিয়ে এই আদালত গঠন করা হয়েছিল এবং এর প্রধান ছিলেন দারোগা আদালত আল আলিয়া বা নায়েব নিজাম। এই আদালতের তত্ত্বাবধান করতেন সপরিষদ গভর্নর। জেলা ফৌজদারী আদালতে মৃত্যুদণ্ড বা ১শ' টাকার উর্ধ্বে জরিমানার রায়ের বিরুদ্ধে এ আদালতে আপিল করা যেত[১৪] পরবর্তী ১৭৯০ সালের রেগুলেশনে জেলা ফৌজদারী

www.pathagar.com

আদালত ও সদর নিজামত আদালত বিলুপ্ত করা হয়েছিল। মোঘল ও নবাবী আমলের কয়েকশ' বছরের বিচার ব্যবস্থা এদেশের সমাজজীবনে এতো গভীরভাবে প্রোথিত হয়েছিল যে বহুদিন পর্যন্ত ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি সে বিচার ব্যবস্থা তড়িঘড়ি আমূল পরিবর্তনের সাহস করেনি। ওয়ারেন হেস্টিংস এর ১৭৭২ সালের শাসন পরিকল্পনায় বিচার ব্যবস্থায় মুসলমানদের বেলায় ইসলামী আইন ও হিন্দুদের ক্ষেত্রে হিন্দু আইন প্রয়োগ সাব্যস্ত করা হয়। ১৭৮০ সালে সপরিষদ গভর্নর জেনারেল নব অধিকৃত এলাকাগুলোতে বিধিবিধান জারি করার ক্ষমতা পান পার্লামেন্ট থেকে; সে সময় সর্ব সম্মতিক্রমে হেস্টিংস-এর ২৩ ধারা আইনে পরিণত হয় এবং ২৭ অনুচ্ছেদে ঠিক করে দেয়া হয় যে, মুসলমানদের বেলায় আইনের মানদণ্ড হবে কোরআন ও হিন্দুদের বেলায় বেদ বা ধর্মশাস্ত্র। ওয়ারেন হেস্টিংসের ২৩ ধারা অনুসারে ইসলামী আইনের ব্যাখ্যাকার মৌলবি এবং হিন্দু আইনের ভাষ্যকার পণ্ডিতদের নিযুক্ত করে নিয়মিতভাবে প্রতি আদালতে রাখা হয়।'[১৫] ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ১৭৬৫ সালে যখন দেওয়ানি লাভ করে তখন এদেশের দেওয়ানি ও ফৌজদারি আদালতগুলোতে ইসলামী আইনের বিধান ও বাদশাহী ফরমান অনুযায়ী মামলার বিচার করা হতো। এসব আদালত বাতিল করে দিয়ে রাতারাতি এদেশে ইংরেজদের বিচার পদ্ধতি চালু করা কোম্পানির পক্ষে ব্যয়সাধ্য ও কঠিন ছিল। তাই আপাতত কোম্পানি মধ্যপন্থা অবলম্বন করেছিল। প্রচলিত ইসলামী আইনের স্থলে দেওয়ানি মামলার পক্ষগণ হিন্দু হলে নির্দিষ্ট বিষয়ে তাদের ক্ষেত্রে হিন্দু আইনের বিধানমতে বিচার করার সুবিধার্থে পণ্ডিত নিযুক্ত করে তাদের লিখিত মতামতের ভিত্তিতে ইংরেজ বিচারক মামলার রায় দিতেন। একইভাবে দেওয়ানি মামলার পক্ষগণ মুসলমান হলে নির্দিষ্ট বিষয়ে তাদের বেলায় ইসলামী আইনের বিধানে বিচার করতে মৌলবি নিযুক্ত করে তাদের লিখিত মতামতের ভিত্তিতে ইংরেজ বিচারক রায় দিতেন। রায়ে হিন্দু পণ্ডিত বা মৌলবিকে সম্মতিসূচক স্বাক্ষর করতে হতো। জেলা, প্রাদেশিক ও সদর ও দেওয়ানি আদালতে আপিল বিচারের সময়ও তাদের লিখিত মতামতের ওপর ভিত্তি করে ইংরেজ বিচারকরা আপিল নিষ্পত্তি করতেন। বিভিন্ন আইন ও রেগুলেশনে ইংরেজ বিচারকদের ওপর ফৌজদারী মামলার বিচারের ভার ন্যস্ত হলে তখনও কাজী ও মুফতি ইসলামী আইন সম্পর্কে বিচারকদেরকে মতামত দিয়ে সাহায্য করতেন। প্রথম দিকে গভর্নর জেনারেল ও তার কাউন্সিল তাদের রেগুলেশন ও পরে আইন করার ক্ষমতাপ্রাপ্ত হলে তাদের প্রণীত আইন দ্বারা ইসলামী বিচার পদ্ধতি সংশোধন করতে থাকলে হিন্দু মুসলমান নির্বিশেষে সকল ধর্মাবলম্বীদের ওপর একই আইন প্রয়োগ করা শুরু হয়। বিশেষ করে ১৮৬২ সালের ১৭ নং আইন দ্বারা পূর্বের প্রচলিত বিচার ব্যবস্থা বাতিল করে দেওয়া হলে কাজী, মুফতি, মৌলবি, পণ্ডিতদের কাছ থেকে ইংরেজ বিচারকদের পরামর্শ গ্রহণ করা অপ্রয়োজনীয় হয়ে পড়ে। পরবর্তী ১৮৬৪ সালের ১১নং আইনে আদালতে পণ্ডিত, কাজী, মুফতি ও মৌলবি নিয়োগ করে মামলা বিচার করার পদ্ধতি বাতিল করে দেয়া হয়।[১৬] ১৮৬৪ সালের ১১নং আইনে কাজি উল কুজ্জাত নগর ও পরগণা কাজির পদ বিলুপ্ত করে ১৮৮০ সালের ১২ নং আইনে মুসলমানদের বিবাহ

www.pathagar.com

ও ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদি পরিচালনার জন্য প্রাদেশিক সরকারকে এই দায়িত্বে নতুন কাজি নিয়োগ করার ক্ষমতা দেয়া হয়। এভাবে বিচারক পদের কাজিদের বিবাহ রেজিস্ট্রার পদে অবনমিত করা হয় যা আজো বিদ্যমান। তখন মুন্সেফ, সদর আমিন ও প্রধান সদর আমিন তথা সাবজজ পদ ছাড়া বিচারকের অন্য পদে এদেশীয়দের নিয়োগ করা হতো না। ১৮৭০ সাল থেকে জেলা বিচারক ও অতিরিক্ত বিচারক পদে কোটাভিত্তিক অল্পসংখ্যক এদেশীয়দের নিয়োগ শুরু করা হলে পরবর্তীতে এসব পদে এদেশীয়দের সংখ্যা বাড়তে থাকে।

বিভাগীয় দেওয়ানি আদালত : ১৭৮০ সালের রেগুলেশনে বিভাগের প্রাদেশিক কাউন্সিলের দেওয়ানি আপিল শুনানির ক্ষমতা বিলুপ্ত করে শুধু রাজস্ব বিষয়ক মামলা বিচার করার ক্ষমতা দেয়া হয় এবং ৬টি বিভাগে একটি করে দেওয়ানি আদালত প্রতিষ্ঠা করা হয়। দেওয়ানি আদালতের প্রধান বা তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত করা হয় একজন চুক্তিবদ্ধ ইংরেজ কর্মচারীকে। এই আদালতে জমিদারী ও তালুকদারীর উত্তরাধিকার, স্থাবর ও ব্যক্তিগত সম্পত্তি ছাড়াও উত্তরাধিকারসহ ব্যবসা বাণিজ্য সংক্রান্ত মামলার বিচার হতো। এ আদালতে এক হাজার টাকা দাবির মামলার রায় চূড়ান্ত বলে গণ্য করা হতো। এর উর্ধ্ব দাবির মামলা বিচারের জন্য তত্ত্বাবধায়ক স্থানীয় জমিদার, সরকারি উর্ধ্বতন কর্মচারী বা সালিশের নিকট পাঠাতে পারতেন অথবা এর বিরুদ্ধে আপিল করলে সদর দেওয়ানি আদালতের দ্বারস্থ হতে হতো।[১৭]

সদর দেওয়ানি আদালত : গভর্নর জেনারেল ও কাউন্সিলের সদস্যগণের পরিবর্তে তখন সুপ্রীম কোর্টের একজন বিচারককে সদর দেওয়ানি আদালতের প্রধান নিযুক্ত করার সিদ্ধান্ত হয়। সিদ্ধান্ত মতে ১৭৮১ সালের ২৪ অক্টোবর সুপ্রীম কোর্টের প্রধান বিচারপতি স্যার এলিজা ইম্পে সর্বপ্রথম এ আদালতের প্রধান নিযুক্ত হন। কিন্তু এক বছর দায়িত্ব পালনের পর ১৭৮২ সালের ১৫ নভেম্বর তিনি ওই পদ থেকে পদত্যাগ করেন।[১৮] পদত্যাগের আগে এলিজা ইম্পে মফস্বল ও সদর দেওয়ানি আদালতের কার্যক্রম পরিকল্পনার জন্য যে দেওয়ানি কার্যবিধি সংকলন করেন সেটাই ভারতবর্ষে ব্রিটিশদের প্রথম দেওয়ানি কার্যবিধি। ১৭৮১ সালের ৬নং রেগুলেশনে এই কার্যবিধি গৃহীত ও প্রচারিত হয়েছিল।[১৯]

প্রিভি কাউন্সিল : ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির ডিরেক্টরদের নির্দেশে ১৭৮২ সালে গভর্নর জেনারেল ও তার কাউন্সিল পুনরায় সদর দেওয়ানি আদালতের কার্যভার গ্রহণ করে। ৫ হাজার পাউন্ড দাবির মামলার রায় এ আদালতের চূড়ান্ত রায় বলে গণ্য হতো। তবে এর বিরুদ্ধে ইংল্যান্ডের প্রিভি কাউন্সিলে আপিল করার বিধান করা হয়েছিল।[২০]

কালেক্টরের ফৌজদারী বিচারক্ষমতা : ১৭৯০ সালের রেগুলেশনের মুর্শিদাবাদ থেকে সদর নিজামত আদালত কলকাতায় স্থানান্তর করে সপরিষদ গভর্নর জেনারেল, প্রধান কাজী ও দু'জন অভিজ্ঞ মুফতি নিয়ে আদালতটি পুনর্গঠন করা হয়। এই আদালত

www.pathagar.com

ফৌজদারী আপিল ছাড়াও প্রাদেশিক পুলিশের নিয়ন্ত্রণ ভার গ্রহণ করে। এ রেগুলেশনে ম্যাজিস্ট্রেটের ক্ষমতাপ্রাপ্ত কালেক্টররা আসামীদের গ্রেফতার করে বিচারের জন্য স্থানীয় ভ্রাম্যমাণ দায়রা আদালতে সোপর্দ করার ক্ষমতাপ্রাপ্ত হয়েছিল। তবে কালেক্টর আসামিকে সর্বোচ্চ ২শ' টাকা জরিমানা, ১৫টি বেত্রদণ্ড এবং ১৫ দিন পর্যন্ত কারাদণ্ডও দিতে পারতেন। কালেক্টর ম্যাজিস্ট্রেট হিসেবে ব্রিটিশ প্রজাদের অপরাধের জন্য শাস্তি দিতে পারতেন না। পরে ১৭৮৭ সালের রেগুলেশনে কালেক্টার প্রাথমিক তদন্ত শেষে অভিযুক্ত ব্রিটিশ প্রজাকে গ্রেফতার করে বিচারের জন্য কলকাতা সুপ্রীম কোর্টে সোপর্দ করতে পারতেন। তাছাড়া তখন ব্রিটিশ প্রজা ছাড়া অন্য ইউরোপীয়দের বিচার করার ক্ষমতা মফস্বলের ফৌজদারী আদালতের এখতিয়ারে ছিল।[২১]

ভ্রাম্যমাণ দায়রা আদালত : কালেক্টর তথা ম্যাজিস্ট্রেট যেসব আসামিকে প্রাথমিক তদন্তের পর বিচারের জন্য ভ্রাম্যমাণ দায়রা আদালত বা সার্কিট কোর্টে পাঠাতেন তাদের বিচার করার জন্য ঢাকা, মুর্শিদাবাদ, পাটনা ও কলকাতায় ৪টি ভ্রাম্যমাণ আদালত প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল। এ আদালতে ইংরেজ বিচারকগণ কাজী ও মুফতির আইন সম্পর্কে মতামত নিয়ে বিচার করতেন। প্রত্যেক এলাকায় ৬ মাস অন্তর এসব ভ্রাম্যমাণ দায়রা আদালত একবার গিয়ে বিচারের জন্য ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক জেলে আবদ্ধ আসামীদের বিচার করতেন। যাবজ্জীবন কারাদণ্ড বা মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত আসামীর দণ্ড অনুমোদনের জন্য এই আদালতের রায়ের নথি সদর নিজামত আদালতে পাঠানো হতো। এ রেগুলেশনে নিহতের আত্মীয়-স্বজন কর্তৃক আসামীকে ক্ষমা করার ইসলামী বিধান বাতিল করা হয় এবং নরহত্যার বিচারে ইমাম আবু হানিফার ফতোয়ার স্থলে ইমাম আবু ইউসুফ ও ইমাম মোহাম্মদের মতকে প্রাধান্য দিয়ে আসামীর নরহত্যার অভিপ্রায় প্রমাণ করার বিধান করা হয়।[২২]

আসামির অঙ্গহানি ও ক্ষতিপূরণ দান বাতিল : ১৭৯১ সালের রেগুলেশনে ভ্রাম্যমাণ দায়রা আদালত ম্যাজিস্ট্রেটের বিচার কার্যক্রম বা ইসলামি ফতোয়ার সাথে দ্বিমত পোষণ করলে সিদ্ধান্তের জন্য মামলার নথি সদর নিজামত আদালতে পাঠাবার ক্ষমতাপ্রাপ্ত হন। ওই রেগুলেশনে অঙ্গহানির পরিবর্তে আসামীর সশ্রম কারাদণ্ড দেওয়ার বিধান এবং হত্যা মামলায় নিহতের আত্মীয়-স্বজনকে ক্ষতিপূরণ দিয়ে আসামীকে মুক্ত করার নিয়ম বাতিল করে সদর নিজামত আদালতকে মৃত্যুদণ্ডদানের ক্ষমতা দেয়া হয়।[২৩]

ম্যাজিস্ট্রেট ও পুলিশী ক্ষমতা : ১৭৯২ সালের রেগুলেশনে নিহতের আত্মীয়স্বজন দ্বারা অভিযোগ না দিলে আসামীর বিচার না করার নিয়ম বাতিল করে পুলিশের ব্যবস্থাপনার ভার জমিদার ও তালুকদারদের হাত থেকে নিয়ে জেলা ম্যাজিস্ট্রেটদের হাতে ন্যস্ত করা হয়। এলাকার চুরি ডাকাতির খবরদারি থেকে জমিদার ও তালুকদারদের অব্যাহতি দিয়ে জেলা ম্যাজিস্ট্রেটগণ স্ব স্ব জেলার ২০ বর্গমাইল এলাকায় একজন দারোগার অধীনে কয়েকজন পুলিশ কর্মচারী নিয়োগ করে সরকারি তহবিল থেকে তাদের বেতন-ভাতা দিয়ে পুলিশ প্রশাসন নিয়ন্ত্রণ করতেন।[২৪]

www.pathagar.com

লর্ড কর্নওয়ালিসের সংস্কার : ১৭৯৩ সালের রেগুলেশনে গভর্নর জেনারেল লর্ড কর্নওয়ালিস চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রচলন করে শুধু এদেশে স্থায়ী জমিদার শ্রেণীই সৃষ্টি করেননি, তিনি বিচার ব্যবস্থারও পরিবর্তন করেন। রাজস্ব আদালত বাতিল করে দিয়ে তিনি বোর্ড অব রেভিনিউর আপিল শুনানির ক্ষমতা বিলুপ্ত করে রাজস্ব কর্মকর্তাদের বিচারাধীন মামলাগুলোকে প্রত্যেক প্রাদেশিক বিভাগে প্রতিষ্ঠিত দেওয়ানি আদালতে বিচারের জন্য পাঠাবার ব্যবস্থা করেন। প্রাদেশিক দেওয়ানি আদালতের প্রধান হিসাবে একজন চুক্তিবদ্ধ ইংরেজ কর্মচারীকে নিযুক্ত করে তাকে বিচারক, ম্যাজিস্ট্রেট ও তার বিভাগের পুলিশী ব্যবস্থাপনারও দায়িত্ব দেওয়া হয়। এ রেলগুলেশনে বিয়ে, ধর্মীয় প্রথা, বর্ণ, উত্তরাধিকার ও প্রাতিষ্ঠানিক দাবি সংক্রান্ত দেওয়ানি মামলা বিচারের সময় মুসলমানদের জন্য ইসলামী আইন ও হিন্দুদের জন্য হিন্দু আইনমতে বিচার করার বিধান করা হয়েছিল।[২৫]

প্রাদেশিক আদালত : জেলা আদালতের ওপরে চতুর্থ স্তরে ছিল ৪টি প্রাদেশিক আদালত। প্রতি আদালতে ৩ জন চুক্তিবদ্ধ ইংরেজ কর্মকর্তাকে বিচারক নিযুক্ত করে মুর্শিদাবাদ, ঢাকা কলকাতা ও পাটনায় একটি করে প্রাদেশিক আদালত প্রতিষ্ঠা করা হয়। এ আদালতগুলো প্রাদেশিক আপিল আদালত হিসেবেও পরিচিত ছিল। জেলা ও নগর আদালতের রায়ের বিরুদ্ধে প্রাদেশিক আদালতে তিন মাসের মধ্যে আপিল দায়ের করা যেত। এ আদালতে এক হাজার টাকা পর্যন্ত দাবির মামলার রায় চূড়ান্ত ছিল। এর অধিক দাবির মামলার রায়ের বিরুদ্ধে সদর দেওয়ানি আদালতে আপিল করা যেত।[২৬]

মুন্সেফের আদালত : লর্ড কর্নওয়ালিস প্রত্যেক এলাকায় তিন ধরনের অবৈতনিক স্থানীয় বিচারক নিযুক্ত করেন। এ বিচারকদের পদ ছিল মুন্সেফ, সালিশান ও আমিন। তারা ৫০ টাকা পর্যন্ত দাবির দেওয়ানি মামলার বিচার করতেন। তাদের রায়ের বিরুদ্ধে জেলা আদালতে আপিল করা যেত। ছোট দাবির মামলাগুলো বিচারের জন্য জেলা আদালত থেকে আমিনের কাছে পাঠানো হতো আর মুন্সেফের আদালতে সরাসরি মামলা দায়ের করা যেত। বাদী বিবাদী আপোষের জন্য সম্মত হয়ে চুক্তি করলে সালিশান বিচার করতেন।

রেজিস্ট্রারের আদালত : ১৭৯৪ সালের রেগুলেশনে রেজিস্ট্রার ২৫ টাকা পর্যন্ত দাবির মামলা বিচার করতেন এবং তার রায় চূড়ান্ত ছিল। এর অতিরিক্ত দাবির মামলার রায়ের বিরুদ্ধে প্রাদেশিক আদালতে আপিল করা যেত। ১৭৯৫ সালের রেগুলেশনে স্থানীয় বিচারক ও রেজিস্ট্রারের রায়ের বিরুদ্ধে জেলা ও নগর আদালতকে চূড়ান্তভাবে আপিল নিষ্পত্তির ক্ষমতা দেয়া হয়। এ রেগুলেশনে মুন্সেফ ও রেজিস্ট্রারকে মামলার ফিস থেকে আদায়কৃত অর্থ বেতনের পরিবর্তে পারিশ্রমিক হিসেবে কমিশন দেয়া হত।[২৭]

পুলিশ প্রশাসন : ১৭৯২ সালের রেগুলেশনে পুলিশী ব্যবস্থাপনার যে নিয়ম করা হয়েছিল ১৭৯৩ সালের রেগুলেশনের তাই সামান্য সংশোধিত আকারে অব্যাহত থাকে। সরকার নিযুক্ত কর্মকর্তাদের অধীনে পুলিশ প্রশাসন ন্যস্ত হয়। স্ব স্ব এলাকার অপরাধী ও

www.pathagar.com

ভবঘুরেদের গ্রেফতার করে বিচারের জন্য ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে পাঠাতে এবং প্রয়োজনীয় পুলিশ নিয়োগ করে এলাকার শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষার দায়িত্ব দেয়া হয় দারোগাকে। প্রত্যেক নগরীকে কয়েকটি ওয়ার্ডে ভাগ করে দারোগাকে নগর কোতওয়ালের অধীনে নগর প্রহরার দায়িত্ব দেয়া হয়েছিল এবং জমিদার ও ভূস্বামীদের নিজস্ব পুলিশ বাহিনী নিষিদ্ধ করা হয়েছিল। ১৮১৬ সালের রেগুলেশনে পুলিশ সুপারদের দায়িত্ব নির্দিষ্ট করে দিয়ে জেলা পুলিশ প্রশাসনের কার্যভার ন্যস্ত করা হয়। ১৮১৭ সালের রেগুলেশনে পুলিশ সুপারদের অধিনস্ত পুলিশ কর্মকর্তাদের কর্তব্য সুনির্দিষ্ট করে এলাকার শান্তি-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা, অপরাধ প্রতিরোধ, আসামী গ্রেফতার এবং এসব কার্যক্রম স্থানীয় ম্যাজিস্ট্রেটকে গোচরীভূত করার দায়িত্ব দেয়া হয়। সন্দেহজনক মৃত্যুর ঘটনায় লাশের সুরতহাল রিপোর্ট তৈরি, পরোয়ানা জারিতে বাধাদানকারিকে গ্রেফতার, সিঁদকাটা. চুরি, ডাকাতি ও সতীদাহ প্রতিরোধ ও নিবারণ করতে থানার দারোগাকে ক্ষমতা দেয়া হয়। গ্রামের যে কোন অপরাধ প্রতিরোধ ও আসামীকে গ্রেফতারের ক্ষমতা দেয়া হয় চৌকিদারকে।[২৮]

ঔপনিবেশিক বিচার বিভাগীয় তাণ্ডব

আপাত দৃষ্টিতে মনে হতে পারে ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি এদেশে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার জন্যই এতো প্রকার আদালত ও পুলিশ প্রশাসন প্রতিষ্ঠা করেছে। প্রকৃত ঘটনা কিন্তু তা ছিল না। আদালতে বিচার করার জন্য তারা এমন সব উদ্ভট আইন জারি করে যা ছিল চরম দমন ও নির্যাতনমূলক। এ প্রসঙ্গে ১৭৯৯ সালের ৭নং রেগুলেশন তথা হাফতম আইনের উল্লেখ করা যায়। এ আইনের ১৫ ধারার ১, ৬, ৭ ও ৮ উপধারায় বলা হয়েছে, সরকারি অনুমতি ছাড়াই জমিদার প্রজাকে বন্দি করতে পারবে, এমনকি খাজনা বাকি ফেলে পালিয়ে যাবে সন্দেহ থাকলেও প্রজাকে বন্দি করা যাবে। জমিদার প্রজার সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করলে তার বিরুদ্ধে আদালতে কোন মামলা চলবে না। বকেয়া খাজনা আদায়ে জমিদার যে কোন ব্যবস্থা এমনকি প্রজাকে তার বাস্তুভিটা থেকে উচ্ছেদ করতে পারবে। জমিদার দৈহিক নির্যাতন করলেও প্রজা তার বিরুদ্ধে কোন ফৌজদারী মামলা করতে পারবে না ইত্যাদি।

এ আইনের বিভীষিকা সম্পর্কে খোদ ইংরেজ কালেক্টর লিখেন, 'এ জেলার কৃষকরা জমিদার ও তাদের আমলাদের অত্যাচারে জর্জরিত হচ্ছে। কৃষক এখন সম্পূর্ণ অসহায়। জমিদার আমলারা তাদের বিরুদ্ধে মিথ্যা মোকদ্দমা রুজু করে হয়রানি করছে, নানাভাবে অমানবিক অত্যাচার চালিয়ে কৃষক জীবনকে দুর্বিষহ করে তুলেছে। কিন্তু কৃষকরা অসহায়। এ সবই হাফতম আইনের কুফল'[২৯] রেভিনিও বোর্ডের প্রেসিডেন্ট জর্জ ডডওয়েল লিখেন, 'হাফতম রেগুলেশন আক্ষরিক অর্থেই একটি ঘন কালো আইন।'[৩০]

এ সকল কালো আইন দিয়েই চলতো কোম্পানির রকমারী আদালত। এ সব আদালতে হিন্দু ব্রাহ্মণ পণ্ডিত এবং মুসলমান মুফতি মৌলবি উপস্থিত রেখে ধূর্ত ব্রিটিশরা দেশবাসীর মনে এ ধারণা দেয়ার চেষ্টাই করেছে যে দেশীয় ধর্মীয় ব্যক্তিদের মতামতও অনুমোদনেই

www.pathagar.com

দেশে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা চলছে। অথচ হাফতমের মতো জঘন্য কালাকানুন হিন্দু কিংবা ইসলামী আইনে কোনভাবেই অনুমোদন যোগ্য ছিল না। হিন্দু মুসলমান ধর্ম গুরুদের আদালতে শিখণ্ডি হিসেবে ব্যবহার করে মামলার রায় প্রদান করতেন কোম্পানির ইংরেজ বিচারকগণ। বস্তুত আইন আদালত ব্যবহৃত হয়েছে ঔপনিবেশিক শক্তির শোষণ ও পীড়ন যন্ত্র হিসেবে। বিচারে বৈষম্য ছাড়াও ব্রিটিশ বিচারকগণ আদালতকে শোষণের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করেছেন এবং অন্যায় উৎপীড়নকে কিভাবে বৈধতা দিয়ে নির্লজ্জভাবে সমর্থন করেছেন তার কিছু খণ্ডচিত্র পাওয়া যাবে নিচে বর্ণিত ঘটনাবলী থেকে–

এদেশে জমিদারদের অত্যাচারের কাহিনীতে বিরূপ ইংল্যান্ডের জনমতের চাপে কোম্পানির ডাইরেক্টররা এদেশের প্রজা স্বার্থরক্ষার চিন্তাভাবনা শুরু করেন। ১৮২২ সালের পহেলা আগস্ট গভর্নর জেনারেল এক চিঠিতে লন্ডনের কোর্ট অব ডাইরেক্টরসকে জানান, 'চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের প্রভাব সমাজের বিভিন্ন স্তর ও শ্রেণীতে বিভিন্নভাবে অনুভূত হচ্ছে। মোট কথা এর ধ্বংসাত্মক প্রক্রিয়া থেকে কেউ মুক্ত নয়। জবাবে ১৮২৪ সালের ১০ নভেম্বর এক চিঠিতে কোর্ট গভর্নর জেনারেলকে উপদেশ দেন 'প্রজার অধিকার পুনরুদ্ধার করে জমিদারদের অত্যাচার থেকে প্রজাকে রক্ষা করার জন্য যেন উপায় উদ্ভাবন করা হয়। ফলে ১৮২৬ সালে হার্বাট হেরিংটন নামে একজন রাজস্ব বিশেষজ্ঞকে নিয়োগ করা হয় এমন একটি আইন রচনা করার জন্য যাতে রায়ত তথা প্রজার অধিকার স্বীকৃতি পায়। পর বছরই এ মর্মে একটি খসড়া আইন তৈরি করা হয়। হেরিংটন তার খসড়া আইনে রায়ত শ্রেণীর অধিকারের পটভূমি আলোচনা করে তাদের ঐতিহাসিক সামাজিক স্থান ও অধিকার যেন সংরক্ষিত হয় তার ব্যবস্থা গ্রহণের সুপারিশ করেছিলেন। মতামতের জন্য হেরিংটনের খসড়া আইনটি সদর দেওয়ানি আদালতে প্রেরণ করলে প্রধান বিচারক লিসেস্টার এর তীব্র প্রতিবাদ করে অভিমত ব্যক্ত করেন এই বলে যে, 'দেশের অনেক জায়গায় আবাসিক রায়ত তথা ভিটেবাড়িতে বসবাসকারী প্রজারা জমিদারদের ক্রীতদাসের মতো। এই প্রজাদেরকে জমিদার অন্যান্য সম্পত্তির ন্যায় বন্ধক রাখতে পারে, বিক্রি করতে পারে, ভাড়া দিতে পারে, সবকিছু করতে পারে। এসব রায়তদের অধিকার দেয়ার মানে ক্রীতদাসকে প্রভু আর প্রভুকে ক্রীতদাস বানানো। হেরিংটন তাই করতে চান। এদেশের দুটি পরস্পর বিরোধী বৈশিষ্ট্য হচ্ছে তারা প্রতারণা করতে পাকা, আবার প্রতারিত হতে প্রস্তুত, শোষণ করতে বদ্ধপরিকর, আবার, শোষিত হতেও প্রস্তুত। তাদের কাছে সততা ও অসদাচরণের একই মূল্য।'[৩১]

হেরিংটনের খসড়া আইনের বিরোধিতা করে দেওয়ানি আদালতের পঞ্চম বিচারপতি রস মন্তব্য দেন এই বলে যে 'ভূমিতে রায়তের আদৌ কোন অধিকার নেই। রায়ত জমিদারের শ্রমিক মাত্র। জমিতে যা কিছু আয় হয় তা প্রাপ্য জমিদারের, প্রজার প্রাপ্য শুধু বেঁচে থাকার মতো খোরাকি। প্রজা যা কিছু উৎপন্ন করে তার খোরাকি বাদে সবই যাওয়া উচিত

www.pathagar.com

জমিদারের গোলাঘরে।'[৩২] দেওয়ানি আদালতের বিচারকদের এই বিরোধিতার দরুন হেরিংটনের খসড়া আইনটি বাতিল হয়ে যায় আর অব্যাহত থাকে জমিদারী শোষণ। কারণ ব্রিটিশদের হাকিম নড়ে তো হুকুম নড়ে না বলে কথা। এদেশে ইংরেজদের বৈষম্য ও বিশেষ অধিকারসূচক আইনসমূহের মধ্যে একটি ছিল কেবলমাত্র শ্বেতাঙ্গ বিচারক দ্বারা গঠিত আদালতে শ্বেতাঙ্গ অপরাধীদের বিচার ব্যবস্থা। এ আইনানুসারে ইংরেজ অপরাধীদের অপরাধ যতই গুরুতর হোক না কেন তাদের বিচারের ক্ষমতা কোন দেশীয় বিচারকের ছিল না। ১৮৩৩ সালে তৎকালীন বড় লাট লর্ড রিপনের আইন সচিব স্যার সিপি ইলবার্ট এ বৈষম্য দূর করার উদ্দেশ্যে একটি আইনের খসড়া তৈরি করেন। তার নামানুসারে তৈরি 'ইলবার্ট বিল' আইনটির খসড়া প্রকাশ হওয়ার সাথে সাথে শ্বেতাঙ্গ মহলের তীব্র বিরোধিতায় তা আর কার্যকর হতে পারেনি।[৩৩]

১৮৭৬ সালে আগ্রা জেলায় মিঃ ফুলার নামের এক ইংরেজ তার ঘোড়া গাড়ির সহিস কাতাবারুকে বেদম প্রহার করেন। একটু দেরিতে আসার অপরাধে ফুলার তার নাকে ও ঘাড়ে ঘুষি মারতে থাকেন। রক্তাক্ত সহিসের অবস্থা দেখেও ফুলারের ক্রোধ উপশম না হওয়ায় ফুলার তার তলপেটে এলোপাতাড়ি লাথি মারাতে সহিসের মৃত্যু হয়। আগ্রার জয়েন্ট ম্যাজিস্ট্রেট মিঃ লীডস ভারতীয় দন্ডবিধি আইনের ৩২৩ ধারামতে ফুলারকে অভিযুক্ত করে বিচার করেন। আগ্রার যে ইংরেজ মেডিকেল অফিসার সহিস কাতাবারুর লাশের ময়না তদন্ত করেছিলেন, আদালতে সাক্ষ্য দানকালে তিনি বলেন, কাতাবারুর প্লীহা ফেটে যাওয়ায় তার মৃত্যু ঘটে। তার মতে প্লীহাটি এত বড় হয়ে গিয়েছিল যে সামান্য ধ্বস্তাধ্বস্তিতে মাটিতে পড়ে যাওয়ার দরুন তা ফেটে যায়। মিঃ লীডস গুরুতর আঘাতের অপরাধ আমলে না নিয়ে এবং সাক্ষ্য প্রমাণ অগ্রাহ্য করে এ মর্মে রায় দেন, 'যেহেতু অন্য কোন রকমের আঘাতের প্রমাণ পাওয়া যায় না। এ জন্য লঘু অপরাধের জন্য দোষী সাব্যস্ত করে মিঃ ফুলারকে ৩০ টাকা জরিমানা অনাদায়ে ১৫ দিন বিনাশ্রম কারাদণ্ড দেয়া হল। মিঃ ফুলার জরিমানার টাকা দিতে সম্মত হলে ওই টাকা কাতাবারুর বিধবা স্ত্রী পাবে।'

সে আমলে ইংরেজদের হাতে এদেশীয়দের অপমৃত্যু বিরল ছিল না কিংবা বড় কথাও ছিল না। এ ধরনের মৃত্যু ও আদালতের অবিচার ভারতীয়রা বিধাতার অভিশাপ রূপেই ভাবতে অভ্যস্ত হয়ে উঠেছিল। কিন্তু ১৮৭৬ সালে কলকাতার পত্রপত্রিকায় মিঃ ফুলারের মামলার বিবরণ ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হতে থাকলে মিঃ ফুলার, মিঃ লীডস এবং হতভাগা কাতাবারুর নাম সমগ্র ভারতে ছড়িয়ে পড়ে।[৩৪] ভারতের গভর্নর জেনারেল মিঃ ফুলারের আচরণের প্রতি নিন্দা প্রকাশ করেই কর্তব্য সম্পাদন করেন।[৩৫] ১৭৭৫ সালে কলকাতার সুপ্রীম কোর্টের অভূতপূর্ব কাণ্ডে জালিয়াতির অপরাধে ব্রাহ্মণ নন্দ কুমারকে প্রাণদণ্ড দেয়া হয়। সুপ্রীম কোর্টের অর্বাচীন অজ্ঞতায় তারা ইংরেজি আইন প্রয়োগ করে। এর ফলে হিন্দু আইনে যেটা অনতিগুরু অপরাধ সেটা প্রাণদণ্ডযোগ্য অপরাধে পরিণত

www.pathagar.com

হয়।[৩৬] উল্লেখ্য, এই নন্দকুমার ছিলেন নবাব সিরাজউদ্দৌলা প্রশাসনের হুগলির ফৌজদার পদে। সিরাজ পতনের ষড়যন্ত্রের অন্যতম অংশীদার ছিলেন এই নন্দকুমার। অথচ ইংরেজদের চক্রান্তের এই সহযোগীকেই ইংরেজরা সুপ্রীম কোর্টের রায়ের মাধ্যমে ফাঁসি দেয় যা জুডিশিয়াল মার্ডার বা বিচার বিভাগীয় হত্যাকাণ্ড হিসেবে ইতিহাসে স্থান করে নিয়েছে। ইংরেজ বিচারকদের নানা অবিচারে অতিষ্ঠ দেশবাসীও সুযোগ পেলে বিচারককে খুন করতে দ্বিধা করেনি। ১৯৩৩ সালের ২ সেপ্টেম্বর ভারতের মেদিনীপুরের ইংরেজ জেলা ম্যাজিস্ট্রেট ভারতীয় অনাথ বন্ধু পাঞ্জা এবং মৃগেন্দ্রনাথ দত্ত নামক দুই আততায়ীর গুলিতে নিহত হন। '১৮৬৭ সালের ২ এপ্রিল পেশোয়ারের ইংরেজ কমিশনার কর্নেল পোলক আসামী শের আলীকে যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ড দিয়ে আন্দামান দ্বীপপুঞ্জে পাঠিয়ে দেন। পাঠান শের আলী ইংরেজদের পক্ষপাতমূলক বিচার পদ্ধতিতে সন্তুষ্ট হতে পারেননি। এই আক্রোশে শের আলী ১৮৭২ সালের ১২ ফেব্রুয়ারি আন্দামান দ্বীপপুঞ্জে ভ্রমণরত ভারতের গভর্নর জেনারেল লর্ড আল মেয়ো (১৮২২-১৮৭২)কে ছুরিকাঘাতে হত্যা করেন। এদেশে ইংরেজদের ১৯০ বছরকাল রাজত্বে লর্ড আর মেয়োই ছিলেন একমাত্র বড়লাট যিনি ভারতীয় লোকের হাতে নিহত হয়েছেন। ১৮৭১ সালের ২০ সেপ্টেম্বর প্রকাশ্যে দিবালোকে আব্দুল্লাহ নামক জনৈক মুসলমানের হাতে কলকাতা হাইকোর্টের অস্থায়ী প্রধান বিচারপতি মিঃ নর্মান নিহত হন। এছাড়াও বিভিন্ন স্থানে সরকারি আমলাদের নির্যাতন ও জমিদার নীলকরদের অমানুষিক অত্যাচারের বিবরণসহ ইংরেজ বিচারকদের অবিচারের অসংখ্য দৃষ্টান্ত পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত হতে থাকে। তাই ঔপনিবেশিক ইংরেজরা দেশীয় ভাষায় প্রকাশিত সংবাদপত্রগুলোর কণ্ঠরোধের জন্য ১৮৭৮ সালে 'ভার্নাকুলার প্রেস এ্যাক্ট' নামে একটি দমনমূলক আইন পাস করে সংবাদ প্রকাশের ওপর বহু বিধিনিষেধ আরোপ করে। সংবাদপত্রের কণ্ঠরোধে ব্রিটিশ আমলে এটাই ছিল প্রথম কালাকানুন।'[৩৭]

ম্যাজিস্ট্রেটদের ক্ষমতা পুনর্বিন্যাস: ১৮০৭ সালের রেগুলেশনে ম্যাজিস্ট্রেটদের অপরাধীকে এক বছর ও সহকারী ম্যাজিস্ট্রেটকে একমাস পর্যন্ত কারাদণ্ড ও বেত্রদণ্ড দেয়ার ক্ষমতা দেয়া হয়। ১৮১০ সালের রেগুলেশনে সর্বপ্রথম জেলা ও নগর আদালতের বিচারক ভিন্ন কোম্পানির অন্য কর্মকর্তাদের সহযোগী ও সহকারী ম্যাজিস্ট্রেট পদে নিযুক্ত করে ফৌজদারী মামলা বিচার করার ক্ষমতা দেয়া হয়েছিল। ১৮১৭ সালের রেগুলেশনে সিঁদকাটা, চুরি ও ডাকাতির সময় কাউকে হত্যা বা হত্যা প্রচেষ্টা বা শারীরিক আঘাত করলে সার্কিট কোর্ট অপরাধীর বিচার করে শাস্তি অনুমোদনের জন্য সদর নিজামত আদালতে পাঠাবার বিধান করা হয়েছিল। ১৮১৮ সালের রেগুলেশনে ম্যাজিস্ট্রেট ও সহযোগী ম্যাজিস্ট্রেটদের ক্ষমতাবৃদ্ধি করে অপরাধীদের দু'বছর সশ্রম কারাদণ্ড ও ৩০টি পর্যন্ত বেত্রদণ্ড দেয়ার ক্ষমতা দেয়া হয়েছিল। ১৮১৯ সালের রেগুলেশনে ম্যাজিস্ট্রেট ও সহযোগী ম্যাজিস্ট্রেটদের প্রদত্ত দণ্ডাদেশ ভ্রাম্যমাণ আদালতের নিয়ন্ত্রণাধীন করা

www.pathagar.com

হয়েছিল। ১৮৩৪ সালের আইনে শারীরিক শাস্তি সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করে তার বদলে সদর নিজামত আদালত, সার্কিট বা দায়রা বিচারককে দু'বছর, ম্যাজিস্ট্রেট ও সহযোগী ম্যাজিস্ট্রেটকে এক বছর এবং সহকারী ম্যাজিস্ট্রেট, প্রধান সদর আমিন ও সদর আমিনকে এক মাসের কারাদণ্ড দেয়ার ক্ষমতা দেয়া হয়। ১৮৪৫ সালের আইনে ম্যাজিস্ট্রেট প্রেরিত মামলাগুলো বিশেষ ক্ষমতাপ্রাপ্ত সহকারী ম্যাজিস্ট্রেটদের বিচার করার ক্ষমতা দেয়া হয়েছিল। ১৮৫৪ সালের আইনে সহকারী ও ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটদের স্বয়ং মামলা বিচার করার ক্ষমতা দেয়া হয়েছিল। ম্যাজিস্ট্রেটগণ কর্তৃক বিচারের জন্য সহকারী ও ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটদের নিকট মামলা পাঠানোর আগের নিয়মও বিলুপ্ত করা হয়েছিল।[৩৮]

রায়ের নজির বা ল'রিপোর্ট : ১৮০৪ সালে সদর দেওয়ানি ও নিজামত আদালতগুলোর গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে বা প্রচলিত আইনে যেসব রায় দিতো তা এতোদিন ধরে প্রচলিত ফার্সি ভাষা থেকে ইংরেজিতে অনুবাদ করে প্রকাশ করার ক্ষমতা দেয়া হয়। এসব ল' রিপোর্টে আইন সাময়িকীতে প্রকাশের ফলে উচ্চ আদালতের নজির সম্পর্কে নিম্ন আদালতকে অবহিত করা হতো। প্রাদেশিক সরকার নিয়মিতভাবে প্রতিমাসে নিম্ন আদালত ও সর্বসাধারণের জানার জন্য এসব ল'রিপোর্ট প্রকাশ করত।[৩৯]

ফার্সি ভাষা বাতিল: ১৮৩৭ সালের আইনে গভর্নর জেনারেলকে আদালতে ফার্সি ভাষার স্থলে অন্য ভাষা ব্যবহারের জন্য আদেশ জারি করার ক্ষমতা দেয়া হয়েছিল। এর ফলে বাংলা প্রদেশের জেলা আদালতগুলোতে ফার্সির বদলে বাংলাভাষা ও সদর আদালতে প্রথম দিকে উর্দু ও পরে ইংরেজি ভাষা চালু করা হয়।[৪০] ভারতীয় পেনাল কোডের রচয়িতা টমাস ব্যারিংটন মেকলে ভারতবর্ষের মধ্যশ্রেণীকে ব্রিটিশ শাসনের একনিষ্ঠ সমর্থক রূপে তৈরি করার উদ্দেশ্যে সর্বপ্রথম এদেশে ইংরেজি শিক্ষা প্রবর্তনের উদ্যোগ নেন।[৪১] আজ পর্যন্ত বিশ্ব ইতিহাসে একটি দৃষ্টান্ত পাওয়া যাবেনা যেখানে দেশী ভাষায় বিদ্যা প্রচার ছাড়া দেশে কারখানা শিল্পের বিপ্লব ঘটেছে। ১৮৩৫-১৮৩৮ সালে ইংরেজ পাদ্রী উইলিয়াম এ্যাডাম বঙ্গদেশের শিক্ষা বিষয়ে প্রদত্ত রিপোর্টে স্বদেশী ভাষাকেই অগ্রাধিকার দিয়ে সুপারিশমালা পেশ করেছিলেন। কিন্তু ভারতীয় আইন ব্যবস্থার প্রণেতা টমাস ব্যারিংটন মেকলে তা উপেক্ষা করে ১৮৩৮ সালেই সমগ্র ভারতের রাষ্ট্রভাষা হিসেবে ইংরেজি প্রবর্তন করেন। ভারতে ইংরেজি ভাষার প্রসার ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শক্তিকে গ্রহণীয় ও সহনীয় করে তোলার লড়াই ছিল। ব্রিটিশ যুগের সেই ভাষানীতি এখনো বহাল আছে। দেশের অফিসে আদালতে রায় ও সিদ্ধান্ত লেখার ক্ষেত্রে আজো বাংলার চেয়ে ইংরেজি ভাষাকেই প্রাধান্য দেয়া হচ্ছে। '৫২ সালের ভাষা আন্দোলন, ভাষা শহীদদের আত্মদান দেশে ও জাতিসংঘের সেই ভাষা দিবসের স্বীকৃতি সবই বৃথা।[৪২]

দেশীয় বিচারক নিয়োগ: ১৮৪৩ সালের ১৫ নং আইন মতে স্থানীয় ব্যক্তিদের মধ্য থেকে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট নিয়োগের ব্যবস্থা করা হয়। তারা ফৌজদারী বিচার ও রাজস্ব বিভাগের কাজ করতেন। এই প্রথমবারের মতো দেশীয় বিচারকরা নিম্ন আদালতে বিচার

www.pathagar.com

করার একক কর্তৃত্ব লাভ করেন।[৪৩]

আইন কমিশন: ১৮৩৪ সালে ইস্ট ইন্ডিয়া সরকার প্রথম আইন কমিশন প্রতিষ্ঠা করে। কমিশনের ৪ জন সদস্য লর্ড টমাস ব্যারিংটন মেকলে, এন্ডর্সন, মিলেট এবং ম্যাকলিওড ভারতীয় দণ্ডবিধি আইনের খসড়া প্রণয়ন করেন। তাদের সুপারিশে 'কাস্ট ডিসবিলিটি রিমুভাল এ্যাক্ট' পাস করা হয়। ১৮৫৩ সালে দ্বিতীয় আইন কমিশনের ৭ জন সদস্য ছিলেন রোমিলি, রাইয়ান, শেরব্রুক, ক্যামরোন, ম্যাকলিওড এবং এলিস। তাদের সুপারিশে ১৮৫৯ সালে দেওয়ানি কার্যবিধি ও তামাদি আইন গৃহীত হয়। তাছাড়া ১৮৬০ সালে দণ্ডবিধি ও ১৮৬১ সালে এবং সংশোধিত আকারে ১৮৯৮ সালে ফৌজদারি কার্যবিধি গৃহীত হয়। ১৮৬১ সালে তৃতীয় আইন কমিশনের ৬ জন সদস্য ছিলেন রোমিলি, আর্ল, রাইয়ান, শেরব্রুক, উইলেস এবং ম্যাকলিওড। তাদের প্রণীত ১৮৫০ সালের উত্তরাধিকার আইন গৃহীত হয়। তাদের প্রণীত বহু খসড়াকে আইনে রূপ দেয়ার বিলম্বের কারণে সবাই পদত্যাগ করেন। তবে তাদের প্রণীত খসড়ার ভিত্তিতে চুক্তি আইন ও ১৮৭২ সালে সাক্ষ্য আইন পাস হয়। ১৮৮৯ সালে গঠিত চতুর্থ আইন কমিশনের তিন সদস্য ছিলেন স্টোকস, আরনল্ড এবং ওয়েস্ট। তাদের সুপারিশে সম্পত্তি হস্তান্তর আইন, ট্রাস্ট আইন, নেগোসিয়েবল ইনস্ট্রুমেন্ট আইন এবং ইজমেন্ট আইন পাস হয়। ১৯২৩ সালে গঠিত 'সিভিল জাস্টিস কমিশন'-এর প্রধান ছিলেন র‍্যাংকিন। মামলা মোকদ্দমা নিষ্পত্তিতে অস্বাভাবিক বিলম্ব নিরসনে এ কমিশনকে সুপারিশ দিতে বলা হয়েছিল। দীর্ঘদিন পরিশ্রম করে কমিশন যে সুপারিশমালা প্রণয়ন করেছিল তা কখনো বাস্তবায়িত হয়নি।[৪৪]

হাইকোর্ট প্রতিষ্ঠা: ১৮৬২ সালে কলকাতা হাইকোর্ট প্রতিষ্ঠা করা হয়। প্রধান সদর আমিন পরবর্তীতে সাব জজের নির্দিষ্ট মামলার রায়ের বিরুদ্ধে এবং জেলা বিচারক ও অতিরিক্ত বিচারকদের যে কোন মামলা রায়ের বিরুদ্ধে সদর দেওয়ানি আদালতের পরিবর্তে হাইকোর্টে আপিল করার বিধান করা হয়। কলকাতা সুপ্রীম কোর্টের আদি দেওয়ানি মামলাগুলোও হাইকোর্টে স্থানান্তর করা হয়। কলকাতা প্রেসিডেন্সি শহর এলাকার যে সব দেওয়ানি মামলা নিম্ন আদালতে দায়ের করা যেতনা যেসব মামলা এবং অধস্তন দেওয়ানি আদালতের আদেশের বিরুদ্ধে হাইকোর্টে রিভিশন বা পর্যালোচনার আবেদন করার নিয়ম করা হয়। হাইকোর্ট দেওয়ানি মামলা বিচারকালে ১৮৫৯ সালের ৮ নং আইনের কার্যবিধি ও পরে নিজস্ব নিয়মের অধীনে সংশোধিত কার্যবিধি ১৮৬৫ সাল পর্যন্ত অনুসরণ করত।[৪৫]

বিচারক পদে এদেশীয়দের নিয়োগ: এতোদিন জেলা বিচারক ও অতিরিক্ত বিচারক পদে শুধু ইংরেজদেরকে নিয়োগ দেয়া হত। ১৮৭০ সালে মহারানী ভিক্টোরিয়ার ঘোষণা পত্রের দ্বারা এসব পদে দেশীয়দের নিয়োগের জন্য ১৮৭৩ সালে প্রথম নিয়মাবলী প্রণীত হয়। গভর্নর জেনারেল নর্থ ব্রুক ১৮৭৫ সালে নির্দিষ্টসংখ্যক ভারতীয়দের এসব পদে

www.pathagar.com

নিয়োগে নিয়মাবলী এবং লর্ড লিট্রনের সরকার এসব পদে এক পঞ্চমাংশ ভারতীয়দের নিয়োগের বিধান করেন।[৪৬]

ফৌজদারী কার্যবিধির বিবর্তন: ১৮৬০ সালের দণ্ডবিধি ও ১৮৬১ সালের ২৫ নং আইনের ফৌজদারী কার্যবিধি বলবৎ হওয়ার আগ পর্যন্ত বিভিন্ন রেগুলেশন দ্বারা সংশোধিত ইসলামী আইন দিয়ে ফৌজদারী মামলার বিচার হতো। ১৮৬২ সালের ১৭ নং আইনে পূর্বের সকল ফৌজদারী আইন বাতিল করে ১৮৬০ সালের দণ্ডবিধি, ১৮৬১ সালের ফৌজদারী কার্যবিধি, সাক্ষ্যদান সংক্রান্ত ১৮৫৩ সালের ১৯ নং আইন এবং ১৮৫৫ সালের ২ নং আইনানুযায়ী ফৌজদারী মামলার বিচার অব্যাহত থাকে।[৪৭] আগের ফৌজদারী আদালতগুলো এই ফৌজদারী কার্যবিধি দ্বারা পুনর্গঠিত হয়। পরে সব ফৌজদারী কার্যবিধি বাতিল করে ১৮৮২ সালের ১০ নং আইনে নতুন ফৌজদারী কার্যবিধি বলবৎ করা হয়। সর্বশেষ ১৮৮২ সালের ফৌজদারী কার্যবিধি বাতিল করে ১৮৯৮ সালের ৫ নং আইনে নতুন ফৌজদারী কার্যবিধি বলবৎ করা হয়।[৪৮] যৎকিঞ্চিত সংশোধিত আকারে এই ১৮৯৮ সালের ফৌজদারী কার্যবিধি আইনটি বর্তমান স্বাধীন ভারত, পাকিস্তান ও বাংলাদেশে বলবৎ রয়েছে।

দেওয়ানি কার্যবিধির বিবর্তন: ১৮৫৯ সালের ৮ নং আইনে গৃহীত দেওয়ানি কার্যবিধির স্থলে ১৮৭৭ সালের দেওয়ানি কার্যবিধি প্রণীত হয়। পরে ১৮৮২ সালের ১৪ নং আইনে আবার নতুন দেওয়ানি কার্যবিধি বলবৎ করা হয়। এই দেওয়ানি কার্যবিধিটি ১৮৮৮ সালের ৭ নং আইন, ১৮৯১ সালের ১৩২ নং আইন, ১৮৯৪ সালের ৫ নং আইন ও ১৮৯৫ সালের ১৩ নং আইনগুলো দ্বারা চার দফা সংশোধিত হয়। সর্বশেষে এসব দেওয়ানি কার্যবিধি বাতিল করে ১৯০৮ সালের ৫ নং আইনে দেওয়ানি কার্যবিধি বলবৎ করা হয়।[৪৯]

বিভিন্ন আইনের সংস্কার ও বিবর্তন: ব্রিটিশ দখলাধীন সমগ্র ভারতে একই ধরনের আইন প্রচলনের জন্য ১৮৩৩ সালের চার্টার এ্যাক্টে সপরিষদ গভর্নর জেনারেলের কাউন্সিলকে ক্ষমতা দেয়া হয়। এ লক্ষ্যে ১৮৩৫, ১৮৫৩, ১৮৬১ ও ১৮৭৯ সালে চারটি আইন সংস্কার কমিশন গঠন করা হয়েছিল। এসব কমিশনের সুপারিশের ভিত্তিতে সাক্ষ্যদান সংক্রান্ত ১৮৫৩ সালের ২ নং আইন ও পরে ১৮৫৫ সালের ১৯ নং আইন, ১৮৫৯ সালের দেওয়ানি কার্যবিধি ও ১৮৬১ সালে ফৌজদারি কার্যবিধি প্রণীত হয়। ১৮৬২ সালের আইনে পূর্বের প্রচলিত বিচার ব্যবস্থা বাতিল করে দিয়ে উল্লেখিত আইনের বিধান মতে দেওয়ানি ও ফৌজদারি মামলা বিচার করার নিয়ম করা হয়। অর্থাৎ এতোদিন ধরে চলা সংশোধিত ইসলামী বিচার ব্যবস্থা বিলুপ্ত করে ইংরেজদের বিচার ব্যবস্থা পুরোপুরিভাবে চালু করা হয়। ১৮৬৫ সালে উত্তরাধিকার আইন, ১৮৬৯ সালে বিবাহ বিচ্ছেদ আইন, ১৮৭০ সালে কোর্ট ফি আইন, ১৮৭১ সালে দেওয়ানি আদালত আইন ও তামাদি আইন, ১৮৭২ সালে সাক্ষ্য আইন ও চুক্তি আইন, ১৮৭৫ সালে সাবালকত্ব

www.pathagar.com

আইন, ১৮৭৭ সালে সুনির্দিষ্ট প্রতিকার আইন, ১৮৭৯ সালে আইনজীবী আইন, ১৮৮১ সালে বিনিময়যোগ্য দলিল আইন, ১৮৮২ সালে সম্পত্তি হস্তান্তর আইন, অছি আইন ও স্বত্ব আইন, ১৮৮৫ সালে বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব আইন, ১৮৮৭ সালে মামলার তায়দাদ আইন, দেওয়ানি আদালত ও ছোট আদালত আইনসহ পরবর্তীতে ১৮৯৮ সালের ফৌজদারী কার্যবিধি, ১৯০৮ সালের দেওয়ানি কার্যবিধি ও তামাদি আইন এবং ১৯২৫ সালে উত্তরাধিকার আইনসহ আরো অসংখ্য আইন প্রণয়ন ও বিচার ব্যবস্থা পূর্ণভাবে প্রতিষ্ঠা করে গেছে।[৫০]

কোর্ট ফি ও উকিলের সনদ: ভারতে হিন্দু ও মুসলমান শাসনামলে উকিলের সনদ এবং বাদী বিবাদীর কাছ থেকে অগ্রীম ফি গ্রহণের কোন বিধান ছিলনা। মামলার পক্ষদের কাছ থেকে কোর্ট ফি আদায় ও আইনজীবীদের সনদ দেয়ার নিয়ম এদেশে বিচার ব্যবস্থায় ইংরেজদের নতুন উদ্ভাবন বলা যায়। মুসলমান আমলের বিচার ব্যবস্থায় ডিক্রিকৃত সম্পত্তি উদ্ধারের পর সম্পত্তির মূল্যের এক চতুর্থাংশ আদায় করে বিচারকের পারিশ্রমিক হিসেবে গ্রহণ করার যে বিধান ছিল তা ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি বাতিল করে। তার পরিবর্তে মামলা দায়েরের সময় ফরিয়াদি বা আপিলকারীর নিকট থেকে বিচারকের জন্য কোর্ট ফি নেয়ার বিধান করেছিল কোম্পানি। ১৭৯৩ সালে লর্ড কর্নওয়ালিশ কোর্ট ফি প্রথা নিষিদ্ধ করে সরকারি তহবিল থেকে বিচারকদের বেতন দেয়ার ব্যবস্থা করেছিলেন। কিন্তু ১৭৯৪ সালের ৭ নং রেগুলেশনে তিনি কোর্ট ফি প্রথা পুনঃপ্রবর্তন, সদর দেওয়ানি আদালত থেকে আইনজীবীদের সনদ দেয়ার বিধান এবং মক্কেলদের কাছ থেকে আইনজীবীদের ফি গ্রহণের নিয়ম চালু করেন।[৫১] বাদশাহী আমলের বিচার ব্যবস্থায় পক্ষদের কাছ থেকে কোর্ট ফি আদায় কিংবা আইনজীবীদের সনদ দেয়ার নিয়ম ছিলনা। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী বিচারাদালতে এ দুটি নিয়ম প্রবর্তন করে। ১৮১৪ সালে মামলায় কোর্ট ফি প্রদান বাধ্যতামূলক করে ১৮৭০ সালে কোর্ট ফি আইন পুনঃপ্রণয়ন করা হয়। ১৮১৪ সালের ২৭ নং রেগুলেশনে জেল ও নগর আদালতকে আইনজীবীদের মামলা পরিচালনা করার সনদপত্র প্রদান বা বাতিলের ক্ষমতা দেয়া হয়। ১৮৩৩ সালের ১২ নং রেগুলেশনে আদালতের এই ক্ষমতা পুনর্বিন্যাস করা হয়। ১৮৫০ সালে নির্ধারিত পরীক্ষা উত্তীর্ণ প্রার্থীদের ওকালতি করার জন্য সনদ দেয়ার বিধান করা হয়েছিল।[৫২] ১৮৭৯ সালের আইনজীবী আইনে অধস্তন আদালতের উকিল, মোক্তার ও রাজস্ব প্রতিনিধিদের সনদ প্রদানে নিয়মাবলী প্রণয়নের বিধান করা হয়েছিল। আইনের স্নাতকদের তখন অধস্তন আদালতে ওকালতির সনদ লাভে পরীক্ষা দেয়ার প্রয়োজন হতো না। কালক্রমে আইনের স্নাতকদের সংখ্যা বেড়ে গেলে উপযুক্ত প্রার্থীদের মধ্য থেকে পরীক্ষা গ্রহণের মাধ্যমে ওকালতি সনদ দেয়ার ব্যবস্থা বাতিল করা হয়েছিল। তবে আইনের স্নাতকদের এক বছর শিক্ষানবীশ থাকার পর হাইকোর্ট থেকে অধস্তন আদালতে ওকালতি করার জন্য সনদ দেয়া হতো। হাইকোর্ট তখন হাইকোর্টে মামলা পরিচালনার জন্য ব্যারিস্টার, সলিসিটর,

www.pathagar.com

অভিজ্ঞ উকিল ও আইনের স্নাতকদের এডভোকেট, উকিল ও এটর্নির সনদ দিত। তখন ব্যারিস্টার ভিন্ন কলকাতা হাইকোর্টের উকিলগণ ওই আদালতের আদি বিভাগে ওকালতি করতে পারত না। শুধু এটর্নিদের দ্বারা নিযুক্ত হলে ব্যারিস্টারগণ উক্ত আদালতের আদি বিভাগে মামলা পরিচালনা করতে পারতেন। ১৯২৬ সালে বার কাউন্সিল আইনে ব্যারিস্টার ও উকিলদের মধ্যে বিভেদ দূর করে সকলকে একই শ্রেণীর এডভোকেট হিসেবে তালিকাভুক্ত করার বিধান করা হয়।[৫৩] ১৭৬৫ সালে দেওয়ানি লাভের পর ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ১৭৭২ সালে প্রেসিডেন্সী শহর ছাড়া এদেশের অন্য সব এলাকায় দেওয়ানি ও ফৌজদারী আদালত প্রতিষ্ঠা করে সে আমলে এদেশে প্রচলিত ইসলামী বিচার ব্যবস্থা তাদের নিজেদের মতো সংশোধন করে চালু রাখে। কোম্পানির আমলে প্রেসিডেন্সী শহরগুলোতে এক প্রকার বিচার ব্যবস্থা ও মফস্বল শহরগুলোতে অন্য ধরনের বিচার ব্যবস্থা চালু ছিল।

১৮৫৭ সালের সিপাহী বিপ্লবের পর ১৮৫৮ সালে ভারত শাসন আইনের ক্ষমতাবলে শাসনভার গ্রহণ করার পূর্ব পর্যন্ত ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির বিচার ব্যবস্থা অটুট ছিল। স্বতন্ত্র সুপ্রীম কোর্ট, সদর দেওয়ানি ও নিজামত আদালত বাতিল করে ১৮৬২ সালে কলকাতা হাইকোর্ট প্রতিষ্ঠিত হলেও কলকাতা প্রেসিডেন্সী শহরে কোম্পানি আমলের স্বতন্ত্র বিচার ব্যবস্থা কিংবা তাদের প্রবর্তিত সবগুলো আইন বাতিল করা হয়নি।

নির্লজ্জ অনুশীলন: ১৯৪৭ সালের ১৪ আগস্ট পাকিস্তান ও ১৫ আগস্ট ভারত এবং ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর বাংলাদেশ স্বাধীন হলেও ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক সেই আইন ও বিচার ব্যবস্থা সামান্য সংশোধন করে এ তিনটি স্বাধীন দেশে বলবৎ রয়েছে। ব্রিটিশ প্রবর্তিত আইনগুলোর প্রারম্ভে শুধু নিজ নিজ দেশের নাম লিখে এই তিন দেশের পরিশ্রম বিমুখ শাসকগোষ্ঠী তাদের দায়িত্ব শেষ করেছে। যেমন- ব্রিটিশ প্রবর্তিত ১৮৬০ সালের দণ্ডবিধির নাম ভারতে 'ইন্ডিয়ান পেনালকোড' (আইপিসি), পাকিস্তানে 'পাকিস্তান পেনাল কোড' (পিপিসি), এবং বাংলাদেশে 'শুধু পেনাল কোড' (পিসি) হিসেবে পরিচিত। আরো মজার ব্যাপার দণ্ডবিধি আইনের ৫১১টি ধারা এদেশে আজ পর্যন্ত বাড়েওনি কিংবা কমেওনি। কোন কোন ধারা বাতিল করে ক্রমিক নম্বরটি অক্ষত রেখে সেখানে শুধু 'বাতিল' শব্দটি প্রতিস্থাপনে করা হয়েছে। আবার কোন কোন ধারায় বর্ধিত ব্যাখ্যা দিয়ে (ক) কিংবা (খ) অক্ষর ওই ধারার সাথে সংযুক্ত করা হয়েছে। অর্থাৎ ৫১১টি ধারা অপরিবর্তনীয় রাখার প্রাণান্ত প্রচেষ্টা অব্যাহত আছে অথচ ১৮৬০ সালের পর পৃথিবীতে কতো পরিবর্তন হয়েছে, আমাদের প্রেক্ষাপট, আকাংখা রুচি ও চাহিদা বদলেছে, মানচিত্র ও স্বাধীনতা পেয়েছি দু'বার কিন্তু পরিবর্তন হয়নি মান্ধাতা ও পরাধীন আমলে প্রণীত দণ্ডবিধি আইনের ৫১১টি ধারা। অপরবর্তনীয় থাকায় দণ্ডবিধি ৫১০টি কিংবা ৫১২টিও হয়নি। এটা একটা দৃষ্টান্ত মাত্র। দেশে প্রচলিত ব্রিটিশ আমলের সবগুলো মৌলিক আইন সামান্য ঘষামাজা করে আজো অক্ষত থাকায় আমাদের স্বাধীন দেশে ঔপনিবেশিক যুগের

www.pathagar.com

আবহ বিরাজ করছে। কোন দেশের উন্নতি অবনতি বা শাসন ও বিচার পদ্ধতির ভাল মন্দ মূল্যায়ন করার সহজ নিয়ম হচ্ছে তার ঐতিহাসিক পশ্চাৎপট জানা এবং সেটাকে প্রাধান্য দেয়া। সে দৃষ্টিভঙ্গী দিয়ে মূল্যায়ন করলে বিশ্বের উন্নত দেশগুলোর কাতারে আমাদের বর্তমান স্বাধীন বাংলাদেশের অবস্থা সহজেই নির্ণয় করা যাবে।

জমিদার: ঔপনিবেশিক বিচার ও ভূমি ব্যবস্থার স্থানীয় খুঁটি

ব্রিটিশদের ভূমি ব্যবস্থার সাথে বিচার ব্যবস্থা ছিল অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। এসব ব্যবস্থা টিকিয়ে রাখতে তারা সৃষ্টি করে অনুগত দেশীয় তাঁবেদার শ্রেণী। এই রাজানুগত তাঁবেদাররাই হলো ইতিহাসের কুখ্যাত জমিদার। ব্রিটিশদের রাজত্ব টিকিয়ে রাখতে ভূমি রাজস্ব লুণ্ঠনের বিনিময়ে মধ্যস্বত্বভোগী এই জমিদাররা আইন আদালতে পেত বিশেষ সুবিধা। আর্য হিন্দু ও পরে মুসলমানরা এদেশ জয় করে এদেশেই স্থায়ীভাবে থেকে গেছে। এদেশের ধন সম্পদ বিদেশে পাচার করেনি। কিন্তু ব্রিটিশরা এদেশ দখল রেখে এদেশের ধন সম্পদ যতোটা সম্ভব লুট করে নিয়ে গেছে তাদের দেশ ইংল্যান্ডকে সমৃদ্ধ করার জন্য। আর্য ও মুসলমানের মতো তারা এদেশে স্থায়ীভাবে বসবাসের জন্য কিংবা দেশকে আপন করে নেয়ার জন্য আসেনি। যে কারণে ১৭৫৭ সালে পলাশী বিপর্যয়ে এদেশ দখল পরবর্তী সময় তারা এদেশের ওপর কর্তৃত্ব ও নিয়ন্ত্রণ সুদৃঢ় করার পদক্ষেপ নেয়। কিন্তু উদ্দেশ্য সাধনের জন্য প্রয়োজনীয় লোকবল তাদের ছিল না। তাছাড়া এদেশের ভূমি পরিমাপ, প্রচলিত রাজস্ব ব্যবস্থা ও দায় অধিকারের পার্থক্য, আরবী, ফরাসী সংস্কৃত পরিভাষা, বিভিন্ন পরগনায় ওজন প্রথাভিত্তিক আইন কানুনের পার্থক্য সম্পর্কে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কোন অভিজ্ঞতা ছিলনা। জমিদারদের থেকে কোম্পানী নির্ধারিত রাজস্ব আদায়ের বিনিময়ে তাদেরকে দেয়া হয় প্রজার সম্পদ ও শ্রম শোষণের অপরিমেয় ক্ষমতা। জনগণের প্রতিপক্ষ হিসেবে শক্তিশালী জমিদার শ্রেণী কর্তৃক কোম্পানির দুঃশাসন টিকিয়ে রাখা এবং একই সাথে নির্বিঘ্নে রাজস্ব আদায়ের ব্যবস্থা করে কোম্পানি এক ঢিলে দুই পাখি মারে। দেশীয় দিয়ে দেশীয়দের উৎপীড়নে কাঁটা দিয়ে কাঁটা তোলার পথটিও কোম্পানি প্রশস্ত করে জমিদারি প্রথা সৃষ্টি করে। আজকের প্রজন্ম জানেনা আমাদের পূর্বপুরুষরা জমিদারদের কি নির্মম অত্যাচারে পিষ্ট হয়েছে যুগের পর যুগ ধরে। রবার্ট ক্লাইভ ১৭৬৫ সালের ১২ আগস্ট নামে মাত্র দিল্লির সম্রাট শাহ আলমের কাছ থেকে বাংলা, বিহার, উড়িষ্যার দেওয়ানী অর্থাৎ রাজস্ব শাসন সনদ আদায় করেন। এই শর্তে যে এই তিন প্রদেশের রাজস্ব সংগ্রহ থেকে সম্রাটকে বার্ষিক ২৬ লাখ টাকা ও মুর্শিদাবাদের নবাবকে ৫৩ লাখ টাকা দেয়া হবে। লক্ষ করার বিষয় হলো দিল্লির তদানীন্তন সম্রাট ইংরেজ দখলদারদের উচ্ছেদে পদক্ষেপ না নিয়ে বরং তাদেরকে দেওয়ানি সনদ দিয়ে এদেশের ভূমি রাজস্ব লুণ্ঠনের সুযোগ দেয় যা ইতিহাসের আরেক কলংকময় অধ্যায় হিসেবে চিহ্নিত। মোঘল আমলে ভূমি বন্দোবস্ত ও রাজস্ব সংগ্রহের নিয়ম ছিল, যে কোন ভূস্বামী যদি প্রাকৃতিক কারণে রাজস্ব দিতে ব্যর্থ হতো তাহলে

www.pathagar.com

সরকার অনুসন্ধান করে পরিস্থিতি বুঝে বকেয়া মওকুফ করে দিত অথবা অনুকূল শস্য বছরের অপেক্ষায় তা বাকি রাখা হতো। প্রতিকূল বছরের অর্থনৈতিক বিরূপ প্রতিক্রিয়া মোকাবেলা করতে সরকার থাকতো সদা প্রস্তুত। কিন্তু ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ছিল একটি ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান। তাই বাংলার শেষ স্বাধীন নবাব সিরাজউদ্দৌলাকে সফল চক্রান্তের মাধ্যমে হত্যা করে এদেশ দখলের পর তারা নবাবের কোষাগার লুণ্ঠন শেষে মনোযোগ দেয় এদেশের ভূমি রাজস্ব লুণ্ঠনের প্রতি। বাংলার কৃষিভিত্তিক সমাজে ভূমির মালিকানা প্রশ্নটি বরাবরই ছিল অধিক গুরুত্বপূর্ণ। এদেশের সমাজে সমস্ত সম্পদের উৎস ভূমি এবং সে সূত্রে বংশ পরম্পরায় ভূমির প্রকৃত মালিক ভূমি থেকে উৎপন্ন সম্পদের প্রধান ভোগকারী। মোঘল আমলে ভূমির সার্বভৌম মালিক ছিল সরকার কিন্তু এর চিরস্থায়ী ভোগদখলদার ছিলেন ভূমি মালিক তথা রায়ত শ্রেণী। মোঘল শাসনতন্ত্রে জমিদার ছিল রাষ্ট্র নিযুক্ত ভূমি রাজস্ব সংগ্রহকারী ও প্রশাসন ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের স্থানীয় প্রতিনিধি। 'তখন ভূমিতে রায়তের সুনির্দিষ্ট অধিকার ছিল। জমিদার কর্তৃক রায়তকে অত্যাচার করার কোন উপায় ছিলনা। বরং তার ওপর সরকারি নির্দেশ ছিল রায়তকে আপন সন্তানবৎ মনে করার জন্য এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগে ও অন্যান্য প্রয়োজনে রায়তকে তাকাভী ঋণ দিয়ে খাজনা মওকুফ করে সাহায্য করার জন্য।'[৫৪] আলীবর্দী খাঁর সময়কাল পর্যন্ত দেশে লোক বসতি ছিল প্রচুর, ধন-সম্পদ ছিল কল্পনাতীত, জনগণ ছিল সুখী ও বিশ্বস্ত। তারা দরজা খোলা রেখে রাতে ঘুমাতে পারতো, কেননা কারো তখন অভাব ছিলনা, কারও ধনের প্রতি অন্য কারও লোলুপ দৃষ্টিও পড়তো না। জীবন ছিল সরল সুন্দর উদ্বেগশূন্য।[৫৫] কিন্তু এ অবস্থার পরিবর্তন ঘটে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির দেওয়ানি লাভের পর। বিজেতা হিসেবে কোম্পানী বিজিতের শাসন ব্যবস্থা অনুকরণ করা সমীচীন মনে করেনি। তাছাড়া রাজনৈতিক কারণেও প্রচলিত ব্যবস্থা কাঠামোয় আমূল পরিবর্তন অনিবার্য হয়ে ওঠে। ঔপনিবেশিক প্রয়োজনে শুরু হয় রাজস্ব ব্যবস্থায় ধ্বংসাত্মক পরীক্ষা-নিরীক্ষা। কোম্পানী রায়তদের ভূমি মালিকানা কেড়ে নিয়ে মধ্যস্বত্বভোগী নতুন জমিদার শ্রেণী সৃষ্টি করে তাদেরকে নির্দিষ্ট হারে রাজস্ব প্রদানের বিনিময়ে বিভিন্ন মেয়াদে ভূমির মালিকানা দিয়ে দেয়। এসব পরীক্ষা-নিরীক্ষার মধ্যে ১৭৬৫ থেকে ৭১ সাল পর্যন্ত ছিল দেশীয় ও কোম্পানীর ইংরেজদের দ্বৈত ব্যবস্থা। এতে রায়তের অবস্থা শোচনীয় হয়ে ওঠে। এর পরিবর্তে ১৭৭২ থেকে ৭৭ সাল পর্যন্ত চালু করা হয় ৫ বছরের জন্য জমি নিলামী ব্যবস্থা। এর ফল ছিল আরো মারাত্মক। তারপর চালু করা হয় এক থেকে তিন বছর মেয়াদী জমিদারী বন্দোবস্ত (১৭৭৮-৮৯)। সবশেষে ১৭৯০ সালে যে দশসালা বন্দোবস্ত দেয়া হয় সেটাই ১৭৯৪ সালে স্থায়ী অবয়ব পরিগ্রহ করে এবং এটাই আমাদের ইতিহাসে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত হিসেবে কুখ্যাতি অর্জন করে।

এর ফলে দেশে প্রতিষ্ঠিত হয় এক নির্মম সামন্তবাদ; যদিও এর পাঁচ বছর আগে ১৭৮৯ সালের ফরাসি বিপ্লবে সামন্তবাদকে ইউরোপে কবর দেয়া হয়েছিল। দেশে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর প্রতিষ্ঠিত এই সামন্তবাদে পূর্বের জমির প্রকৃত মালিক ও জমি থেকে

www.pathagar.com

প্রত্যক্ষভাবে যারা ফসল ফলাচ্ছে তাদের কোন অধিকার জমির ওপর রইল না। সামন্ত প্রভু বা জমিদার শ্রেণী চাষীদের নিকট থেকে খেয়ালখুশি মতো কর আদায় শুরু করে। এই করের পরিমাণ অনেক সময় এতো বেশি হতো যে, কৃষক যা উৎপন্ন করত তার প্রায় সবটুকু কর পরিশোধে চলে যেত। এভাবে ক্রমশ জমির পুরনো মালিক ও কৃষক পরিণত হয় ভূমিদাসে; যাদের জমির চৌহদ্দির বাইরে পর্যন্ত যাওয়ার অধিকার ছিল না। সরকারি প্রশাসন যন্ত্র ছিল জমিদারদের পক্ষে এবং এদের লুণ্ঠন অত্যাচারে দুর্বিষহ হয়ে উঠেছিল কৃষক শ্রেণীর জীবন। আবার জমিদারদের সীমানার মধ্যে যে সব প্রজা বাস করতো তাদের ভিটেবাড়ির জন্য তাদেরকে নানা ধরনের খাজনা পরিশোধ করতে হতো জমিদারকে। অন্যথা হলে দৈহিক নির্যাতন এবং খাজনা পরিশোধ না করা পর্যন্ত জমিদারের কাছারিতে তাকে বন্দি রাখা হতো। এ অবস্থা প্রবর্তনের ফলে হিংসা হানাহানি ছড়িয়ে পড়ে, অস্থিতিশীল হয়ে ওঠে বাংলার সমাজ। নির্যাতীত মানুষ এ থেকে পরিত্রাণের আশায় আদালতের বারান্দায় মাথা কুটে মরেছে; সেখানে আরেক দফা লুণ্ঠিত হয়ে মানুষ ফরিয়াদ জানিয়েছে স্রষ্টার কাছে আর আত্মসমর্পণ করেছে ভাগ্যের কাছে যা পুষ্ট করেছে ধর্মীয় পারলৌকিকতা এবং অদৃষ্টবাদকে। এরকম পঙ্গু ও অস্থিতিশীল সমাজই কাম্য ছিল ঔপনিবেশিক শাসকদের। কারণ অস্থিতিশীল সমাজেই শোষণ লুণ্ঠন চালানো যায় সুবিধাজনকভাবে। এছাড়া কোম্পানির আরো উদ্দেশ্য ছিল একটা শক্তিশালী জমিদার শ্রেণীর প্রশ্নাতীত আনুগত্যের মাধ্যমে কোম্পানির শোষণ শাসন টিকিয়ে রাখা এবং একই সাথে জমিদারদের মাধ্যমে নির্বিঘ্নে ভূমি রাজস্ব লুণ্ঠন। আর কোম্পানির ছত্রছায়ায় নতুন শক্তিশালী স্বতন্ত্র ধনাঢ্য জমিদার শ্রেণী লাভ করে লাগামহীন অর্থ উপার্জনের অলিখিত রাজক্ষমতা। তারা অচিরেই একটি প্রবল প্রভাবশালী রাজভক্ত শাসকগোষ্ঠী হিসেবে গ্রাম সমাজে পরিচিতি লাভ করে। ঐতিহাসিক লোকেশ্বর বসু লিখেছেন, জমিদার বলতে মোঘল যুগে বোঝাতো ক্ষুদ্র অঞ্চলের শাসক এবং তারা অধিকাংশই মুসলমান। কিন্তু ইংরেজ যুগে হিন্দুরা আবার জমিদার হলেন। এই জমিদারী প্রথার বয়স মাত্র দেড়শো বছর। পলাশীর যুদ্ধের সময়ও কোন বিশিষ্ট বাঙ্গালী হিন্দুর দেখা মেলে না। পরে বাঙ্গালিরা কলকাতায় ছুটে এলেন, তাদের মধ্যে যেমন ব্রাহ্মণ কায়স্থ ছিল, তেমনি ছিল অন্যান্য জাতি। এই সময় ইংরেজদের সাথে ব্যবসা করে ও সহযোগিতা করে এবং নানাভাবে তাদের উপকার করে, দোভাষী হয়েও জাহাজ ঘাটায় মাল নামানোর কুলি সংগ্রহ করে দিয়ে অনেকেই কপাল ফেরালেন। এদের মধ্যে ধনীরা জমিদারী কিনলেন ইংরেজদের কাছ থেকে। কিন্তু সে জমিদারী আসলে খাজনা আদায়ের ঠিকাদারী। তবু দু'তিন পুরুষেই তারা বনেদী বনে গেলেন।[৫৬] বৃহৎ নব্য জমিদারদের মধ্যে সবচেয়ে চমকপ্রদ জীবন হুগলী জেলার সিংগুরের দ্বারকানাথ বাবুর। তিনি ছিলেন প্রথম জীবনে সিংগুরের মল্লিক পরিবারের পারিবারিক চাকর।[৫৭] তিনি সুগঠিত এক ডাকাতদলে যোগদান করে অগাধ ধন লুণ্ঠন করেন এবং সূর্যাস্ত আইনের সুযোগে সে ধন তিনি

www.pathagar.com

জমিদারী ক্রয়ে বিনিয়োগ করেন। তার জমিদারীর বার্ষিক সরকারি রাজস্ব ছিল পাঁচ লাখ টাকা।[৫৮] কলকাতা ভূকৈলাশের গোকুল ঘোষাল ছিলেন চট্টগ্রামের প্রধান রাজস্ব কর্মকর্তা হেনরী ভেরলস্টারের বানিয়া। গোকুল বাবু প্রভুকে এমনভাবে বশ করতে পেরেছিলেন যে ১৭৬৩ সালে তিনি চট্টগ্রাম জেলার সমস্ত অনাবাদী জমির মালিকানা সনদ লাভ করেন।[৫৯]

রানা ঘাটের পাল চৌধুরী পরিবারের প্রতিষ্ঠাতা দু'ভাই কৃষ্ণচন্দ্র পাল ও শ্যাম চন্দ্র পাল ছিলেন প্রথম জীবনে সাধারণ পান সুপারির ফেরিওয়ালা। পরে তারা লবণের ব্যবসা করে প্রভূত ধনার্জন করেন। দু'লাখ টাকায় তারা নদীয়া ও যশোর জমিদারির কয়েকটি পরগণা ক্রয় করেন।[৬০] কলকাতার ঠাকুর পরিবারের জয়রাম ঠাকুর ছিলেন ১৭৬০ সালে কোম্পানির একজন নিম্ন কর্মচারী। তার পুত্র দর্পনারায়ণ ঠাকুরও ছিলেন কোম্পানির মুৎসুদ্দী ও বানিয়া।[৬১] দর্প নারায়ণের দুই পুত্র গোপীমোহন ঠাকুর ও নীলমনি ঠাকুর যথাক্রমে প্রতিষ্ঠা করেন মহাঠাকুর পরিবারের বড় ও ছোট শাখা। ১৮৩০ সালে এ দুই শাখার জমিদারির সম্মিলিত সরকারি রাজস্বের পরিমাণ দাঁড়ায় সমগ্র বাংলার সরকারি রাজস্বের এক পঞ্চদশমাংশ।[৬২] পাটনার অধিবাসী লালা মানিক চাঁদ ছিলেন রংপুর-এর কালেক্টার গুডল্যান্ডের বানিয়া, পরে ছিলেন কালেক্টার ইলিয়াটের দেওয়ান। ১৭৭৫ সালে তিনি সম্পূর্ণ রংপুর জেলার ইজারা লাভ করেন। ১৭৯২ সালে দিনাজপুর রাজ্যের দেওয়ান নিযুক্ত হওয়ার পরে দিনাজপুর জমিদারির বৃহদংশই তিনি ক্রয় করেন।[৬৩] মুর্শিদাবাদের দানেশমন্দে নিত্যানন্দ ছিলেন প্রথম জীবনে তাঁতী। পরে বাণিজ্যিক দালাল হিসেবে লাখ লাখ টাকা উপার্জন করেন। সেই টাকায় তিনি দিনাজপুর, রাজশাহী ও ইদ্রিকপুর জমিদারির বহু লাভজনক পরগনা ক্রয় করেন।[৬৪] মুর্শিদাবাদের কান্দী পরিবারের প্রতিষ্ঠাতা গঙ্গা গোবিন্দ সিংহ ছিলেন গভর্নর জেনারেল ওয়ারেন হেস্টিংস-এর প্রধান মুৎসদ্দী। প্রভুর কৃপায় তিনি কলকাতা রেভিনিও কমিটির দেওয়ান নিযুক্ত হন। তিনি এবং তার পুত্র প্রাণকৃষ্ণ সিংহ চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পর যে জমিদারী প্রতিষ্ঠা করেন তার বার্ষিক সরকারি রাজস্ব ছিল পাঁচ লাখ টাকা।[৬৫] হুগলী জেলার তেলিনী পাড়া পরিবারের প্রতিষ্ঠাতা বৈদ্যনাথ ব্যানার্জী ও তার ভাই রামলোচন ব্যানার্জী ছিলেন যথাক্রমে বর্ধমান ও নদীয়া মহারাজার কর্মচারী। সাত লাখ টাকায় তারা পরে নদীয়া জমিদারির ১১টি পরগনা খরিদ করেন।[৬৬] যশোরের নড়াইল জমিদারির প্রতিষ্ঠাতা কালিশংকর রায় ছিলেন রাজশাহী জমিদারির একজন গোমস্তা। তিনি ছিলেন পেশাদার লাঠিয়াল। আট লাখ টাকা পুঁজি বিনিয়োগে প্রতিষ্ঠিত তার জমিদারির বার্ষিক সরকারি রাজস্ব ছিল দু'লাখ টাকা।[৬৭] দিনাজপুরের মানিক পরিবারের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন রংপুর কালেক্টারের দেওয়ান, পরে দিনাজপুর মহারাজার দেওয়ান। কয়েক বছরের মধ্যেই তিনি তার প্রভুর মহাজমিদারী ধ্বংস করতে সমর্থন হন। কালেক্টারের কর্মচারীদের সাথে যোগসাজশে তিনি ইচ্ছাকৃতভাবে সরকারি রাজস্ব বকেয়া রেখে জমিদারী নিলামে উঠিয়ে

www.pathagar.com

নিজে নামমাত্র মূল্যে লাভজনক পরগণাগুলো খরিদ করেন। তার সহযোগী কালেক্টারের কর্মচারিদের মধ্যে যারা দিনাজপুর জমিদারীর বিভিন্ন পরগণা এভাবে ষড়যন্ত্র করে নামমাত্র মূল্যে কিনে নেন, তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে– ওয়ালী মোহাম্মদ, বৈদ্যনাথ চৌধুরী, রাধাকান্ত, করান্দেজ, রাগুবাবু, গঙ্গনারায়ণ সেন প্রমুখ।[৬৮] বানিয়াদের মধ্যে সবচেয়ে বড় জমিদারী কাশিমবাজারের রাজপরিবারের প্রতিষ্ঠাতা কৃষ্ণ কান্তনন্দী। কাশিম বাজারে ওয়ারেন হেস্টিংস-এর সাথে তার পরিচয় সূত্রে তিনি হেস্টিংস-এর বানিয়া নিযুক্ত হন। এ পদে থেকে তিনি অবৈধভাবে লাখ লাখ টাকা উপার্জন করেন। প্রভু হেস্টিংস-এর কৃপায় তিনি রংপুরের বিশাল এলাকা বাহারবন্দ পরগনা জায়গীর হিসেবে লাভ করেন।[৬৯] বানিয়ারা ছিল দোভাষী, প্রধান হিসাবরক্ষক, প্রধান সেক্রেটারি, প্রধান দালাল, তহবিল রক্ষক, পুঁজি প্রদানকারী ও সর্বতোভাবে গোপনীয়তা রক্ষক[৭০] ফরাসী পর্যটক লাগ্রান্দপ্রে লিখেছেন, নগণ্য কেরানী হিসেবে একজন ইংরেজ যুবক যখন প্রথম লন্ডন থেকে এদেশে আসে তখন তার পকেট থাকে শূন্য। কিন্তু এ শূন্যতা ক্ষণিকের। জাহাজ থেকে নামার ২৪ ঘন্টার মধ্যেই দেখতে পায় সে এক মহা ঐশ্বর্যের মধ্যে সাঁতার কাটছে। কেমন করে? জাহাজ থেকে মাটিতে পা ফেলার সাথে সাথে বানিয়াদের মধ্যে কাড়াকাড়ি পড়ে যায় কে কার আগে এই কপর্দকহীন ছোট সাহেবকে সাহায্য করবে। টাকার থলেটা করজোড়ে দেয় সাহেবের হাতে। সাহেবও তা গ্রহণ করতে দ্বিধাবোধ করে না। সাহেব দেখতে পায় সুখ সম্ভোগের সবকিছুই পলকের মধ্যে তৈরি। যেমন- পালকি, টাট্টু ঘোড়া, টমটম, চাকর নোকর, বাঁন্দী-বাবুর্চি, সুসজ্জিত প্রাসাদ ইত্যাদি। ঝানু ব্রাহ্মণ বানিয়া জানে যে অচিরেই এই আগন্তুক সরকারের কোন একটি লোভনীয় পদে উন্নীত হবে এবং তার জন্য সব সুবিধার দ্বার উন্মুক্ত করে দেবে। সুতরাং টাকার থলেটা বাড়িয়ে বানিয়া বলে খরচ করো দেদার। ব্রাহ্মণ জানে যে সাহেবকে কাবু করার বড় উপায় হলো তার মাথায় মস্ত ঋণের বোঝা চাপিয়ে দেয়া। কারণ সাহেবের প্রথম নিয়োগই হবে কোন জেলার কালেক্টার হিসাবে। তখন সে সাহেবের সাথে ওই জেলায় যাবে এবং দেশীয়দের জন্য খোলা সর্বোচ্চ দেওয়ানীর পদ আদায় করে সরকারি ক্ষমতার অপব্যবহার ক্রমে অচিরেই নিজেও ঐশ্বর্যের পাহাড় গড়ে তুলবে।[৭১] পলাশী যুদ্ধের পর রাতারাতি ধনী হওয়ার জন্য ইংল্যান্ডের অভিজাত শ্রেণীর লোকজন স্রোতের মতো এ দেশে আসতে থাকে। অর্থের জন্য 'বাংলায় চলো' হিড়িকে মন্ত্রীবর্গের আত্মীয়-স্বজন এমন কি রাজপরিবারের সদস্যরা পর্যন্ত যোগদান করে।[৭২] বানিয়ারা যেমন নবাগত সাহেব খুঁজে বেড়াতো, সাহেবরাও তেমন ধনী বিশ্বস্ত বানিয়ার খোঁজ করতো। তখন ইংরেজ যুবকদের এদেশে আসার প্রধান উদ্দেশ্য থাকতো রাজকীয় জীবন যাপন করা আর অল্প সময়ে বিস্তর অর্থোপার্জন করে দেশে গিয়ে সুপ্রতিষ্ঠিত হওয়া। কিন্তু কোম্পানির রাইটার হিসেবে তারা এদেশে এসে প্রথম ৩-৪ বছর কাজ করতো অতি অল্প বেতনে। রাইটারদের মাসিক বেতন ছিল মাত্র দু'শো টাকা।[৭৩]

www.pathagar.com

কোম্পানির কালেক্টার তথা রাজস্ব সংগ্রাহক, বানিয়া ও জমিদারদের শোষণে বিবর্ণ হয়ে ওঠে বাংলার সবুজ প্রান্তর। সমাজ বিন্যাসে নতুনভাবে আবির্ভূত হয় বহুস্তর বিশিষ্ট মধ্যস্বত্বভোগী শ্রেণী। তারা আবার সৃষ্টি করে অজস্র উপমধ্য স্বত্বাধিকারী নবাব, মহারাজা, রাজা, জমিদার, লাঠিয়াল, তহশিলদার, পাইক পেয়াদা, নায়েব, বরকন্দাজ, মহাজন, পায়কার, বানিয়া, গোমস্তা, মুৎসুদ্দী, বণিক, লটদার, আমিলদার, রাজনক, মান্তলিক, মহামহত্তর, মোকররা, সেজোয়াল, ওসত তালুকদার, তালুকদার, পত্তনীদার, পায়কাশত, মিয়াসদার, ইজারাদার, হাওলাদার, খোদকাশত, নিম ওসত তালুকদার, দায় পত্তনীদার, পাট্টাদার সহ প্রায় ৩০টির অধিক মধ্যস্বত্বভোগী স্তর সমাজকে নিংড়ে খাওয়া শুরু করে। জমিদারী শোষণ লুণ্ঠন সম্পর্কে সাহিত্যিক বংকিম চন্দ্র উক্তি করেছিলেন, 'জীবের শত্রু জীব, মনুষ্যের শত্রু মনুষ্য, বাঙ্গালি কৃষকের শত্রু বাঙ্গালি ভূস্বামী। ব্যাঘ্রাদি বৃহজ্জন্তু ছাগাদি ক্ষুদ্র পশুগণকে ভক্ষণ করে। জমিদার নামক বড় মানুষ কৃষক নামক ছোট মানুষকে ভক্ষণ করে। জমিদার প্রকৃতপক্ষে কৃষকদিগকে ধরিয়া উদরস্থ করেন না বটে, কিন্তু যাহা করেন তাহা অপেক্ষা হৃদয় শোণিত পান করা দয়ার কাজ।' স্বাধীন ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত জহরলাল নেহেরু লিখেছেন, 'ভারতের অন্যান্য সমস্ত প্রদেশের চেয়ে বাংলাদেশেই মুসলমানদের সংখ্যাটা বেশি। এরা ছিল গরীব প্রজা বা অতিক্ষুদ্র ভূস্বামী। জমিদার সাধারণত হতো হিন্দু, গ্রামের বানিয়ারাও তাই। এই বানিয়াই হচ্ছে– টাকা ধার দেয়ার মহাজন আর গ্রামের মুদি। কাজেই জমিদার এবং বানিয়া প্রজার ঘাড়ে চেপে বসে তার রক্ত শুষে নেবার সুযোগ পেত। সুযোগের যথাসাধ্য সদ্ব্যবহার করে নিতে তারা ছাড়তো না। এই কথাটা মনে রাখা দরকার। কেননা হিন্দু আর মুসলমানদের মধ্যে যে বিবাদ তার মূল রয়েছে এইখানে'।[৭৪] জমিদারী শ্রেণীর শোষণ উৎপীড়নের কাহিনী সমকালীন পত্রপত্রিকা ও সাহিত্যে একটি বড় স্থান দখল করে আছে। ব্রিটিশ পত্রপত্রিকাতেও এ নিয়ে অনেক তোলপাড় হয়েছে। দেশে কৃষক বিদ্রোহ সংঘটিত হয়েছে অসংখ্যবার। এর মধ্যে বাকেরগঞ্জ প্রজা বিদ্রোহ (১৮৭১-৭৪), ময়মনসিংহ কৃষক বিদ্রোহ (১৮৭৪-৭৮, ১৮৮৪), পাবনা কৃষক বিদ্রোহ (১৮৭৩) মেহেদীগঞ্জ কৃষক বিদ্রোহ (১৮৮০) উল্লেখযোগ্য। এসব সংবাদে ইংল্যান্ডে এদেশের প্রজাদের পক্ষে জনমত সৃষ্টি হলে ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী সরকার বাধ্য হয়ে জমিদারিতে হস্তক্ষেপের সিদ্ধান্ত নিয়ে কখনো কখনো প্রজাকে জমির স্বত্ব ফিরিয়ে দিতে মনস্থ করে, উদ্যোগও নেয়। কিন্তু জমিদার সমাজের সংঘবদ্ধ আন্দোলন ও প্রতিরোধের ফলে সব উদ্যোগ ভন্ডুল হয়ে যায়। ১৮৮৫ সালের বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব আইন পাসের আগে পর্যন্ত এ অবস্থা অপরিবর্তিত থাকে এবং দেশে অত্যাচার উৎপীড়নের এক রামরাজত্ব কায়েম হয়। ঔপনিবেশিক সরকারের প্রতিভূ লর্ড ওয়েলেসলি'র আমলে ১৭৯৯ সালের ৭নং রেগুলেশন আইনটি ছিল জমিদারী নিপীড়নের সবচেয়ে বড় হাতিয়ার, যা বাংলায় ব্রিটিশ শোষণকে সুদৃঢ় ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত করে। সে আমলে হাফতম নামের কুখ্যাত কালো আইনটির কয়েকটি উল্লেখযোগ্য ধারা হচ্ছে।

www.pathagar.com

১৫নং ধারার উপধারা-১ : জমিদার প্রজাকে সরকারের অনুমোদন ছাড়াই বন্দি করতে পারবে। কোন প্রজা যদি খাজনা বকেয়া ফেলে পালিয়ে যাবার আয়োজন করছে বলে সন্দেহ হয়, তাকেও জমিদার বন্দি করতে পারবে।

উপধারা-৬ : খাজনা বাকি পড়লে জমিদার প্রজার সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করতে পারবে– সে বাজেয়াপ্ত স্থগিত রাখার জন্য প্রজার মোকদ্দমা করার অধিকার থাকবে না।

উপধারা-৭ : প্রয়োজন হলে প্রজাকে তার বাস্তুভিটা থেকে উৎখাত করতে পারবে। খাজনা বাকি পড়লে জমিদার যে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করে বকেয়া খাজনা সংগ্রহ করতে পারবে।

উপধারা-৮ : জমিদার প্রজাকে কাছারিতে ডেকে আনতে বাধ্য করতে পারবে। সে জন্য দৈহিক নির্যাতনের নামে প্রজা কোন ফৌজদারী মোকদ্দমা করতে পারবে না।

এরপরেই বাঙ্গালি কৃষক জীবনে নেমে আসে এ হাফতম আইনের বিভীষিকা। জমিদারগণ যথেচ্ছভাবে প্রজার ওপর কর বৃদ্ধি করেই ক্ষান্ত হয়নি, তারা এ আইনের ওপর নির্ভর করে নিজেরাও উদ্ভট কতগুলো নিয়ম কানুন চালু করে। এসব চাপিয়ে দেয়া নিয়মের মধ্যে ছিল জাজিপুরের উৎসবে যেতে জমিদারদের বারুনী খরচা, সরকারি স্কুলে অনুদান বাবদ স্কুল খরচা, টেলিগ্রাফ খরচা, ম্যাজিস্ট্রেটের কাছারিতে জামিদারের উপঢৌকন পাঠাতে রসদ খরচা, জগন্নাথের প্রসাদ তৈরি ও প্রজাদের মধ্যে বিতরণের জন্য বড় মহাপ্রসাদ খরচা ইত্যাদির জন্য আলাদা কর ধার্য করা ছিল। জমিদারের অনুমতি ছাড়া প্রজার পক্ষে জমি হস্তান্তর, পাকাবাড়ি নির্মাণ, পুকুর খনন, গাছ কাটা, এমনকি শাল, চিকন ধুতি, শাড়ি, ছাতা, জুতা পর্যন্ত কেনা নিষেধ ছিল। এগুলো কিনতে হলে প্রজাকে জমিদারী সেরেস্তায় গিয়ে নায়েব গোমস্তাকে সেলামি তথা চাঁদা দিয়ে পাশাপাশি জমিদারকে নজরানা দিয়ে শর্ত সাপেক্ষে কিনতে হতো। আবার কেনার পর জুতা, শাল, ধুতি পরে বা ছাতা মাথায় দিয়ে কোন প্রজা জমিদার বাড়ির সামনে দিয়ে যেতে পারতো না। এসব নিয়মের অন্যথা হলে কিংবা খাজনা বাকি পড়লে প্রজাকে কাছারিতে ধরে নিয়ে গিয়ে কশাঘাত, হাত পা বেঁধে অন্ধ কুঠুরিতে ফেলে রাখা, খাজনা অনাদায়ে বিষয় সম্পত্তি ক্রোক করা, স্ত্রী কন্যাকে বন্ধক হিসেবে আটক রাখা ও ভিটেমাটি থেকে উচ্ছেদ করা ছিল সে আমলে নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা। উনবিংশ শতাব্দির অনেক জরিপ নথিপত্রে দেখা যায় যে বহু জমিদারীতে প্রজার ছেলেদের লেখাপড়া করা ছিল নিষিদ্ধ। ঢাকা জেলার শ্রীনগর থানায় অনেক জমিদারী এলাকায় রায়তের ছেলেদের লেখাপড়া ছিল নিষিদ্ধ।[৭৫] প্রজার ওপর জমিদারী জুলুমের ধরন ছিল, (১) দণ্ডাঘাত বেত্রাঘাত (২) চর্ম পাদুকা প্রহার (৩) বংশকাষ্ঠাদি দ্বারা বক্ষস্থল দলন (৪) খাপড়া দিয়ে কর্ণনাসিকা দলন (৫) ভূমিতে নাসিকা ঘর্ষণ (৬) পিঠে দুইহাত মোড়া দিয়ে বেঁধে বংশ দণ্ড দিয়ে মোড় দেয়া (৭) গায়ে বিছুটি দেয়া (৮) হাত পা শিকল দিয়ে বেঁধে রাখা (৯) কান ধরে দৌড় করানো (১০) কাঁটা দিয়ে হাত দলন করা (১১) দু'খানি কাঠের বাখরির মধ্যে হাত রেখে মর্দন করা (১২)

www.pathagar.com

গ্রীষ্মকালে প্রচণ্ড রোদে ইটের ওপর পা ফাঁক করে দু'হাতে ইট দিয়ে দাঁড় করিয়ে রাখা (১৩) প্রবল শীতের সময় জলে চোবানো (১৪) গোনীবদ্ধ করে জলমগ্ন করা (১৫) গাছে বা অন্যত্র বেঁধে টান দেওয়া (১৬) ভাদ্র ও আশ্বিন মাসে ধানের গোলায় পুরে রাখা (১৭) চুনের ঘরে বন্ধ করে রাখা (১৮) বদ্ধ কুঠুরিতে বন্দি করে উপবাস রাখা (১৯) ঘরের মধ্যে বন্দি রেখে লংকা মরিচের ধোঁয়া দেয়া ইত্যাদি।[৭৬] হাফতম আইন জারির পর জবরদস্তি খেয়াল খুশিমতো খাজনা আদায় ছাড়াও জমিদাররা যে কত রকম শোষণ করতো তার কিছু বিবরণ দিয়ে উনিশ শতের 'সুলভ সমাচার' পত্রিকায় বলা হয়, 'প্রজারা যখন বাজারে তরিতরকারি বিক্রয় করতে আসবে তখন 'তোলা' দিবে। আপনার গাছ তোয়ারি করিবে, তাহার 'চৌথ' জমিদার পাইবে। আক হইতে গুড় করিবে, 'ইক্ষুগাছ কর' জমিদারকে সন্তুষ্ট করিতে হইবে। ঘাটে নৌকা লাগাইবে, জমিদার 'খোটাগাড়ি' লাইবেন। নৌকায় মাল তুলিবে কি তাহা হইতে মাল নামাইবে 'করালী খাতায়; কিছু জমা করিয়া দিতে হইবে। গরুর গাড়ি করিয়া বাজারে মাল পাঠাইতে হইলে 'ধুলট' দিতে হইবে। ভাগাড়ে মরা গরু ফেলিবে 'ভাগাড় জমা' দিবে। প্রত্যেক জেলেকে 'জেলে জমা' দিতে হইবে। জমিদারের জমিদারীতে তোষদান লইয়া উপস্থিত সকলের নজর দিয়া সেলাম করিতে হইবে। কিছুদিন জমিদারের জমিদারী এলাকায় বেড়াইতে আসিলে 'আগমনী' দিতে হইবে, জমিদার কোন কুকার্য করিয়া কয়েদ হইলে 'গারদ সেলামি' দিয়া তাহাকে বাটি ফিরাইয়া আনিতে হইবে।[৭৭] মোঘল আমলে রাজস্ব শাসনে মুসলমানদের একচেটিয়া অধিকার ছিল। পুরানো রাজস্ব ব্যবস্থার পরিবর্তন ও চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রচলন করে বৃটিশ গভর্নর বাংলার মুসলমানদের আর্থিক জীবনে তীব্র আঘাত হানে। ৭৫ বছরের মধ্যে বাংলার মুসলমান পরিবারগুলোর অস্তিত্ব হয় পৃথিবীর বুক থেকে মুছে গেছে নয়তো ইংরেজদের সৃষ্ট নব্য ধনী সমাজের নিচে এ সময় ঢাকা পড়ে রয়েছে।[৭৮] হিন্দু জমিদাররা কালিপূজা, চড়ক পূজা, দুর্গা পূজায় মুসলমান প্রজাদের কাছ থেকে শুধু জবরদস্তি চাঁদা আদায় করেই ক্ষান্ত হয়নি; তৎকালীন জমিদার কৃষ্ণ চন্দ্র রায় তার মুসলমান প্রজাদের ওপর হুকুম জারি করেছিলেন, পাকা মসজিদ নির্মাণে এক হাজার টাকা, কাঁচা মসজিদ বানাতে ৫শ' টাকা, ফি দাড়ির জন্য আড়াই টাকা ও গোঁফের পাঁচশিকা তার জমিদারী সেরেস্তায় জমা দিতে হবে এবং গো জবাই করলে ডান হাত কেটে দেয়া হবে।[৭৯] জমিদার বাড়িতে প্রজার কোন সম্মানের আসন ছিল না। মোড়ল গোছের দু'চারজন প্রজা জমিদারী বাড়িতে গেলে বসবার জন্য কাঠের টুল কিংবা মোড়া পেত, বাকি সবাইকে বসতে হত পাটি কিংবা চাটাইয়ে। কাছারির নিতান্ত পাতি কর্মচারীও প্রজাকে 'তুমি' ছাড়া বলত না। জমিদার অনেক স্থলে সমাজের কর্তা ছিল। অপরাধ পেলে জরিমানা হতে শুরু করে কানমলা, জুতা মারা সবই চলত।[৮০] এই জমিদারী প্রথা সমাজ কাঠামোতে সৃষ্টি করে অভূতপূর্ব অস্থিরতা ও সংকট। যারা ছিল একদা প্রবল প্রতাপান্বিত নাগরিক তারা হলো নিঃস্ব আর যারা ছিল অবহেলিত তারা হলো

www.pathagar.com

জমিদার। বড় ছোট হলো আর ছোট হলো বড়। এরকম সামাজিক ওলট পালট সমকালীনদের জন্য ছিল অত্যন্ত বেদনাদায়ক।

ভোগবিলাসে মত্ত অর্থ পিচাশ ও অলস জমিদার শ্রেণীর এসব অত্যাচার সম্পর্কে ঔপনিবেশিক সরকার যে জানতেন না তা নয়। কিন্তু শক্তিশালী জমিদার শ্রেণী ছিল জনগণের যে কোন প্রতিরোধ আন্দোলন দমনে ঔপনিবেশিক শক্তির স্থানীয় খুঁটি। তাছাড়া বিপুল পরিমাণ রাজস্ব আদায়ের নিশ্চয়তাসহ সুবিধাভোগী জমিদার শ্রেণীর ওপর গ্রামের নিয়ন্ত্রণ ছেড়ে দিয়ে কোম্পানি সরকারের খরচ ও দায়িত্ব কমানোসহ প্রশাসন নির্ঝঞ্ঝাট রাখাও উদ্দেশ্য ছিল। কারণ প্রশাসনে খরচ বৃদ্ধি মানে কোম্পানির শেয়ার হোল্ডারদের মুনাফা কমে যাওয়া, যা কাম্য ছিল না ব্রিটিশদের। জমিদারী জুলুম সম্পর্কে নিখিল রায় লিখেছেন, স্ত্রীলোকদিগের উপর যে রূপ অত্যাচার চলিত, তাহা স্মরণ করিতে গেলেও হৃদয় কাঁপে। যে দেশের কুমারীগণকে বিশ্বজননী ভগবতী বলা হয়, সেই সমস্ত কুমারীদিগকে তাহাদের পবিত্র নিকেতন হইতে বলপূর্বক প্রকাশ্য বিচারালয়ে আনয়ন করিয়া তাহাদের পবিত্রতা নষ্ট করা হইত। স্বামীর অংক হইতে পত্নীকে কাড়িয়া আনা হইত। এই সময়ে কত স্ত্রীলোকের যে সতীত্ব নষ্ট হইয়াছে কে জানে? সেই সমস্ত স্ত্রী লোকদিগকে সাধারণের সমক্ষে উলঙ্গ করিয়া বেত্রাঘাত করা হইত। তাহার পর সূচাগ্র বংশখণ্ড বক্রভাবে আনত করিয়া যুবতীগণের স্তনবৃন্তে বাঁধিয়া দিত। স্থিতিস্থাপক বংশ খণ্ডগুলো স্ত্রীলোকদিগের স্তন ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন করিয়া ঋজু ভাব অবলম্বন করত। পরে তাহাদের ক্ষতস্থান গুল ও মশালের আগুনে দগ্ধ করিয়া যন্ত্রণার সীমা বৃদ্ধি করা হইত। স্ত্রীলোকগণ যখন ঐরূপ অত্যাচার সহ্য করিয়া গৃহে প্রতিনিবৃত্ত হইত তখন আত্মীয়স্বজন তাহাদিগকে গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করিত না।[৮১] অর্থলোভী জমিদারদের স্বেচ্ছাচারিতার চিত্র তুলে ধরে ভবানীচরণ বন্দোপাধ্যায় ১৮২৩ সালে প্রমথ নাথ শর্মা ছদ্মনামে লিখেন, "ধন্য ধন্য ধর্মাবতার ধর্ম প্রবর্তক দুষ্ট নিবারক সৎপ্রজাপালক সদ্বিবেচক ইংরাজ কোম্পানি বাহাদুর অধিক ধনী হওনের অনেকপন্থা করিয়াছেন। আধুনিক কাল্পনিক বাবুদিগের পিতা কিংবা জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা শহরে আসিয়া বর্ণকার কর্ণকার, কর্মকার চর্মকার চটকার পটকার মটকার বেতন ভোগ হইয়া কিংবা রাজের সাজের কাঠের খাটের ঘাটের মঠের ইটের ঠিকাদারী চৌকিদারী জুয়াচুরি পোদ্দারী করিয়া অর্থসঙ্গতি করিয়া কোম্পানির কাগজ কিম্বা জমিদারী ক্রয়াধীন বহুতর দিব্যাবসানে অধিকতর ধনাঢ্য হইয়াছেন, ইহারা অখণ্ড দোর্দান্ত প্রতাপান্বিত হিন্দু মুসলমান গনিকা সাধারণ তাবতেই নির্মলান্তকরণে একাসনে বিবিধ মদ্য মাংস প্রভৃতি নানা দ্রব্য ভোজন করিলেন, তৎপর নানাবিধ মসলা সম্বলিত তাম্বুল ভোজন অন্তর নানা প্রকার তামাকের আয়োজন। কড়া দোক্তা ভেলস অম্বুরী গাঁজা খায় কেহ চরস খায় কেহ বলে হায় হায় কেহ নৃত্য করে কেহ তাড় মারে কেহ কান্দিছে কেহ খেলিছে কেহ দুলিছে কেহ পড়িছে কেহ বলে বড় মজা ওহে তুমি এয়ারের রাজা, কেহ বলে মেদরা বুঝি অল্প আসিয়াছিল। হিঙ্গল বিবি বসাক বাবু এই দুইজনে সকলই খাইল, কেহ ঘরে

www.pathagar.com

ঢুকিল, কার্ক খুলিয়া সরাপ সয়লাপ করিল, কেহ মৎস্য ধরে কেহ গুপ্ত ঘরে, কেহ মজিয়াছে কালোয়াতের গানে, কেহ গনিকা চুম্বনে কেহ আলিঙ্গনে, কেহ বলে তয়াফওয়াল কি মজা দিলি, এইরূপ খুসিতে স্বদেশী সকলেই নববাবুর মনোবিলাস পূর্ণ করিলেন, এই প্রকার রাগ রঙ্গে দিবারাত্রি গত হইল প্রভাতে তাবতে স্বস্থান প্রস্থান করিল।"[৮২]

নব্যবাবু তথা নতুন জমিদারদের কটাক্ষ করে এ লেখাটি যে মোটেই অতিরঞ্জন ছিল না তার প্রমাণ পাওয়া যায় নদীয়ার রাজার দেওয়ান কার্ত্তিকেয় চন্দ্র রায়ের অভিজ্ঞতা থেকে। তিনি বলেন, 'তৎকালে বিদেশে পরিবার লইয়া যাইবার প্রথা অপ্রচলিত থাকাতে প্রায় সকল আমলা, উকিল বা মোক্তারের এক একটি উপপত্নী আবশ্যক হইত। সুতরাং তাহাদের বাসস্থানের সন্নিহিত স্থানে স্থানে গণিকালয় সংস্থাপিত হইতে লাগিল।

পূর্বে গ্রীস দেশে যেমন পণ্ডিত সকল বেশ্যালয়ে একত্রিত হইয়া সদালাপ করিতেন সেই রূপ প্রথা এখানেও প্রচলিত হইয়া উঠিল। যাহারা ইন্দ্রিয়াসক্ত নহেন, তাহারাও আমোদের ও পরস্পর সাক্ষাতের নিমিত্ত এই সকল গণিকালয়ে যাইতেন। সন্ধ্যার পর রাত্রি দেড় প্রহর পর্যন্ত বেশ্যালয় লোকে পরিপূর্ণ থাকিত। বিশেষত পর্বোপলক্ষে তথায় লোকের স্থান হইয়া উঠিত না। লোকে পূজার রাত্রিতে যেমন প্রতিমা দর্শন করিয়া বেড়াইতেন, বিজয়ার রাত্রিতে তেমনি বেশ্যা দেখিয়া বেড়াইতেন।'[৮৩] শিবনাথ শাস্ত্রী নব্যবাবু জমিদারদের জীবনযাত্রা সম্পর্কে লিখেছেন, এই সময় শহরের মধ্যবিত্ত ভদ্র গৃহস্থদিগের গৃহে 'বাবু' নামের এক শ্রেণীর মানুষ দেখা দিয়াছিল। তাহারা পারসী ও স্বল্প ইংরেজী শিক্ষার প্রভাবে প্রাচীন ধর্মে আস্থাহীন হইয়া ভোগ সুখেই দিন কাটাইত। ভ্রূমুখের পার্শ্বে ও নেত্রকোণে নৈশ অত্যাচারের চিহ্নস্বরূপ কালিমা রেখা, শিরে তরঙ্গায়িত বাবরী চুল, দাঁতে মিশি, পরিধানে ফিনফিনে কালো পেড়ে ধুতি, অঙ্গ উৎকৃষ্ট মসলিন বা কেমরিকের বেনিয়ান, গলদেশে উত্তমরূপে চুনট করা উড়নি ও পায়ে পুরু বগলেস সম্বলিত চিনে বাড়ির জুতা। এই বাবুরা দিনে ঘুমাইয়া, ঘুড়ি উড়াইয়া, বুলবুলির লড়াই দেখিয়া, সেতার, এসরাজ, বীন প্রভৃতি বাজাইয়া কবি-পাঁচালী প্রভৃতি শুনিয়া রাত্রে বারাঙ্গনাদের আলয়ে গীতবাদ্য ও আমোদ করিয়া কাটাইত।[৮৪] সমসাময়িককালে রাজা রামমোহন রায়ের এক যবনী (মুসলমান) রক্ষিতা ছিল। উমানন্দ ঠাকুরের এক প্রশ্নের উত্তরে রাজা রামমোহন রায় বলেছিলেন যে ওরূপ যবনী রক্ষিতা রাখা শাস্ত্র মতে দোষণীয় নয়।[৮৫]

এভাবে মুঘল আভিজাত্যের ধ্বংস স্তূপের ওপর কোম্পানির সরকার প্রতিষ্ঠা করে হাজার হাজার অকর্মণ্য, ইন্দ্রিয়াসক্ত, অজ্ঞ, উন্নয়ন বিমুখ, নারীলিপ্সু, অলস, আমোদপ্রিয়, প্রজাপীড়ক ধনী জমিদার শ্রেণী। জমিদাররা যে সবাই হিন্দু সম্প্রদায়ের ছিলেন তা নয়। নগণ্য সংখ্যক মুসলমান জমিদারও ছিল যাদের শ্রেণী স্বার্থ ও চরিত্র ছিল অভিন্ন। এ ব্যাপারে বীরভূমের মহারাজা জমান খানের পতন সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট কালেক্টার মন্তব্য করেন– রাজা ছিল অজ্ঞ, নির্বোধ নারী প্রিয়। সে সুযোগ গ্রহণ করেছে আমলারা। তাছাড়া রাজবাড়িতে প্রত্যহ গরু জবাই হতো। রাজার হিন্দু আমলারা তা কোন দিন পছন্দ

www.pathagar.com

করেনি। সূর্যাস্ত আইনের সুযোগে তারা দু'কাজই সম্পন্ন করলো– রাজার পতন আর গো জবাইর অবসান।[৮৬] এখানে সূর্যাস্ত আইনের বিষয়টিও উল্লেখ করা দরকার।

লর্ড কর্ণওয়ালিস-এর আমলে ১৭৯৩ সালের ১নং রেগুলেশনে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ৭নং ধারায় বলা হয়েছিল, বন্যা, খরা, মহামারী প্রভৃতি প্রাকৃতিক দুর্যোগের অজুহাতে জমিদাররা কোন অবস্থাতেই রাজস্ব বাকি রাখতে পারবে না। কোন জমিদার রাজস্ব বাকি ফেললে বাকি পড়ার এক মাসের মধ্যেই তার জমি নিলামে বিক্রীর জন্য পত্র-পত্রিকায় ও হাটে বাজারে বিজ্ঞপ্তি দেয়া হবে এবং নির্দিষ্ট তারিখে সূর্যাস্তের আগে ওই জমি অন্যত্র নিলামে বিক্রি হবে। কোন অবস্থায় ওই নিলামের তারিখ পরিবর্তন করা যাবে না। জমিদারের আমলারা এ আইনের অপব্যবহার করে প্রভু জমিদারকে ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে কিভাবে কুপোকাত করেছে তার আরেকটি উদাহরণ নদীয়া জমিদারী। ১৮১৩ সালে নদীয়া জমিদারী সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়ে যায়। এর কারণ বর্ণনা করতে গিয়ে নদীয়ার রাজা গিরিশচন্দ্রের মাতা রানী বিশ্বময়ী ও রাজার স্ত্রী পিতাম্বরী সরকারকে জানান, জমিদারী ধ্বংস হয়েছে আমলাদের ষড়যন্ত্রের জন্য। রাজা গিরিশ ছিল বোকা ও আমোদ প্রমোদপ্রিয়। তার দুই দেওয়ান রামলোচন ব্যানার্জি ও তারিনী ব্যানার্জি রাজাকে আনন্দের মোহে রেখে জমিদারী বিক্রির ব্যবস্থা করে এবং নিজেরাই সে জমিদারী ক্রয় করে।[৮৭] সরকার নির্ধারিত রাজস্বের চেয়ে জমিদাররা প্রজাদের কাছ থেকে খাজনা আদায় করতো আরো বহুগুণ অধিকহারে। নির্ধারিত রাজস্ব আদায় সুনিশ্চিত করতে ঔপনিবেশিক সরকার জমিদারদেরকে বাধ্য করতে জারি করছিল সূর্যাস্ত আইন যা অকল্পনীয়ভাবে মামলা মোকদ্দমা বৃদ্ধি করে। নিলামে জমি কেনা সহজ হলেও এর দখল নেয়া ছিল কঠিন। আঞ্চলিক ক্ষমতা ও প্রভাব প্রয়োগ করে নিঃস্ব জমিদার নিলামে জয়ী নব্য জমিদারের সম্পত্তি দখলের চেষ্টা প্রতিহত করেছে। নিরুপায় প্রজারা এক্ষেত্রে পুরানো জমিদারকে সমর্থন করতে বাধ্য হয়েছে। কারণ নতুন জমিদার এসে দখল নেয়াই মানে খাজনা বৃদ্ধি, নতুন নায়েব গোমস্তার উৎপাত, আমিন পেয়াদার উৎকোচ দাবি, নতুন জমিদারকে সেলামি দিয়ে নতুন পাট্টা নিয়ে বশ্যতা স্বীকার করা ইত্যাদি। কারণ ১৭৯৩ সালের ৪৪ নং রেগুলেশনে বলা হয়েছে যে 'বকেয়া রাজস্ব আদায়ের জন্য কোন জমিদারী নিলামে বিক্রি হলে তৎক্ষণাৎ জমিদার ও রায়তের মধ্যে সব চুক্তি বাতিল হয়ে যাবে। নতুন জমিদারের সঙ্গে নতুনভাবে চুক্তি করতে হবে। যে কোন শর্তে চুক্তি সম্পাদন করার অধিকার জমিদারের থাকবে।' এছাড়া ১৭৯৯ সালের সপ্তম আইনেও বলা হয়েছে– 'নিলামে জমিদারী বিক্রি হওয়ার পর নতুন জমিদারের স্বাধীনতা থাকবে যে কোন রায়তকে কোন কারণ না দর্শিয়ে জমি থেকে উৎখাত করার।' ভীত সন্ত্রস্ত প্রজারা বাধ্য হয়ে পুরানো জমিদারের পক্ষাবলম্বন করেছে। জমিদার নিজে অথবা অনুগত প্রজাকে দিয়ে সত্য মিথ্যা মামলা করেছে নব্য জমিদারের বিরুদ্ধ। লাঠিয়াল দিয়ে নতুন জমিদারদের আমলাদেরকে এলাকা থেকে তাড়িয়ে দেয়ার চেষ্টা করেছে। নতুন জমিদার

www.pathagar.com

ও ভাড়াটে লাঠিয়াল দিয়ে দখল নেয়ার চেষ্টা করেছে। ফলে হয়েছে অজস্র খুনোখুনি আর মামলা মোকদ্দমা। কোর্ট-কাচারী লোকারণ্য করে তুলেছে বিচারপ্রার্থীরা। এর সঙ্গে বৃদ্ধি পেয়েছে উকিল, মোক্তার, টাউট, গোয়েন্দা ও পেশাদার সাক্ষীর গুরুত্ব। সমাজবিন্যাসে এসেছে নতুন মুখ-আইনজীবী। মামলা মোকদ্দমা অস্বাভাবিকহারে বৃদ্ধির পাশাপাশি বৃদ্ধি পায় আইনজীবীর আয়। ফলে আইন পেশার আকর্ষণের সাথে বিকশিত হয় আইনজীবী শ্রেণীর বিকাশ।

ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ছিল একটি ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান। শোষণ নির্যাতনমূলক আইনের অধীনে রাজস্ব লুণ্ঠনে জমিদারী প্রথা চালু করলে বাংলার সমাজে হিংসা হানাহানি নিয়ন্ত্রণে কোম্পানির নীতি নির্ধারকরা তাই শুরু থেকেই এদেশে শাসন ও বিচার ব্যবস্থা চালু করে একটি লাভজনক ব্যবসা হিসেবে। কোম্পানির শাসন ও বিচার ব্যবস্থার সফলতার মাপকাঠি ছিল লাভক্ষতির হিসেবের মধ্যে সীমাবদ্ধ; শান্তি-শৃঙ্খলার উন্নয়ন বা ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা নয়। বলা বাহুল্য, বাংলায় এই জমিদারী শোষণ লুণ্ঠনের জন্য বৃটিশ ঔপনিবেশিক অপশক্তি যেসব নিয়ম বেঁধে দিয়েছিল তার সবটাই করা হয়েছিল আইনের শাসনের নামে আর ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার নামে।

ব্রিটিশ বিচার ব্যবস্থা : দরিদ্র বানাবার কারখানা

এদেশে ব্রিটিশদের ১৯০ বছরব্যাপী ধারাবাহিক শোষণ লুণ্ঠনের অন্যতম হাতিয়ার ছিল তাদের তৈরি বিচার ব্যবস্থা। এ ব্যবস্থার প্রধান লক্ষ ছিল একটা অস্থিতিশীল সমাজ কায়েমে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার নামে অভ্যন্তরীণ অসন্তোষকে বিভ্রান্ত করে দমিয়ে রাখা। কারণ স্থিতিহীন সমাজেই শোষণ লুণ্ঠন চলে সুবিধাজনকভাবে। বঞ্চিত মানুষ তাই বারবার ন্যায়বিচার পেতে আদালতের বারান্দায় মাথা কুটে মরছে আর নিক্ষিপ্ত হয়েছে অন্তহীন ভোগান্তিতে। কিছু কিছু ন্যায়-বিচার হতো না যে তা নয়। এর মাধ্যমে ধূর্ত ব্রিটিশরা এদেশের জনমনে এই ধারণা দেয়ার চেষ্টাই করেছে যে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠায় তারা সত্যই আন্তরিক। এ ক্ষেত্রে এদেশীয়দের প্রতি তারা যতো কড়াকড়িভাবে আইন প্রয়োগ করতো তা নিজেদের বেলায় করতো না। সার্বিকভাবে দেশে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠিত না হওয়ায় দু'শতাব্দীকাল বাংলার মানুষকে অসংখ্য দুর্ভীক্ষ, মন্বন্তর, মহামারী মোকাবিলা করে প্রাণ হারাতে হয়েছে। বস্তুত বিচার ব্যবস্থাকে কেন্দ্র করে তৈরি আইন আদালত, পুলিশ, প্রশাসনিক কাঠামো সবই ছিল কেন্দ্রীয় শোষণ যন্ত্রের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। ব্রিটিশদের শাসন ও বিচার ব্যবস্থা এদেশের প্রাকৃতিক সহজ সরল নির্মল ও সুখী সমৃদ্ধ সমাজ ওলট পালট করে দিয়ে কি দুর্বিষহ পরিবেশ সৃষ্টি করেছে তার কিছু খণ্ডচিত্র নিম্নে উদ্ধৃত হলো সরকারি নথিপত্র ও সমকালীনপত্র পত্রিকা থেকে : বর্ধমান প্রাদেশিক কাউন্সিলের প্রধান জর্জ ভান্সি টর্টে বলেন, '১৭৫৭ সালে যখন আমরা এদেশে প্রাধান্য বিস্তার করি তখন বাংলাদেশের যে অবস্থা ছিল সে অবস্থা বর্তমানেও আছে বললে কেউ বিশ্বাস করবে না। এ দেশ এখন ধ্বংসপ্রাপ্ত। এর কারণ ব্যবসা বাণিজ্যের অচলাবস্থা, ধাতব মুদ্রার পাচার,

www.pathagar.com

অত্যাচার এবং অভাবের কারণে রায়তদের অন্যত্র পলায়ন।[৮৮]

পূর্ববঙ্গে ১৭৮৮-৮৯ সালের দুর্ভিক্ষে অসংখ্য লোকের মৃত্যু ঘটেছে। লোকের অভাবে কৃষিজমি জঙ্গলে পরিণত হয়। কতিপয় পরগনায় প্রায় তিন চতুর্থাংশেরও অধিক লোক মারা যায় বা অন্যত্র পলায়ন করে। তাদের জমি বুনো শূকর আর ব্যাঘ্রের আবাস ভূমিতে পরিণত হয়।[৮৯] গত ৯ মাসে কোর্টে এত মামলা রুজু হয়েছে যে আর যদি মামলা মোটেই গ্রহণ না করা হয় আর প্রতিদিন ১০টি মামলা ফয়সালা করা হয় তাহলে পুঞ্জীভূত মামলা শেষ করতে পুরো নয় থেকে দশ বছর সময় লাগবে।[৯০] আদালতে রাজস্ব মামলা এত বেড়েছে যে সেখানে মামলা করে বিচার পাবার কারো কোন সম্ভাবনা নেই। বিচারের দরজা প্রায় রুদ্ধ।[৯১] কোন উচ্চবাচ্য করলেই তারা আদালতে দৌড় দেয়। আদালতে যাওয়ার মানেই হচ্ছে মামলা অনির্দিষ্টকালের জন্য চলতেই থাকবে। (বিআরসি : ২৭ ফেব্রুয়ারি ১৭৯৫, নং-২৯) কেউ খাজনা বাকি ফেললে তাকে কাচারিতে ডেকে এনে চরম দৈহিক সাজা দেয়া হতো। খাজনা শোধ না করা পর্যন্ত কাচারিতে পায়ে বেড়ি লাগিয়ে বন্দি করে রাখা হতো। ছোটবড় সব প্রজার জন্যই ছিল এ ব্যবস্থা। চরম দৈহিক নির্যাতনের পরও খাজনা শোধ না করা হতো তাদের বিষয় সম্পত্তি ক্রোক করা হতো এবং বকেয়া খাজনা আদায় করে তাকে বন্দিশালা থেকে মুক্ত করা হত।[৯২] বিগত ২৫ বছরের কোম্পানির শাসন এদেশের প্রত্যেকের সম্পদ সম্মান হরণ করে নিয়েছে। বর্তমানে পুরানো বনেদী শ্রেণীর লোকেরা পরম বিপর্যস্ত। তাদের আগের সামাজিক অর্থনৈতিক প্রভাব প্রতিপত্তি এখন নেই বললেই চলে। অথচ কয়েক বছর আগেও আমি নিজে দেখেছি যে মুহূর্তের নোটিশে যার তার কাছ থেকে বিপুল টাকা ধার করা যেত। সে দিন এখন আর নেই।[৯৩] প্রত্যেক ইংরেজ ও তার দোসর বানিয়ার স্বপ্ন কি করে রাতারাতি ধনকুবের হওয়া যায়।[৯৪] প্রত্যেক কর্মচারীই মনে করে যে, বাংলাদেশ একটি অফুরন্ত ধনভান্ডার এবং যতই শোষণ করা হোক না কেন এ ধনের যে শেষ নেই। এ ধারণা ভুল।[৯৫] প্রত্যেক জেলা থেকে জেলা জজগণ রিপোর্ট দেন যে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের আইনে রায়ত তথা প্রজা সাধারণ প্রায় ক্রীতদাসে পরিণত হয়েছে। এদের রক্ষা করার আইনত কোন উপায় নেই।[৯৬] তখন একজন রায়ত যদি সামান্য ভাত ও সামান্য লবণের সুরাহা করতে পারত তাতেই সে সুখীবোধ করতো।[৯৭]

১৮৪৬ সালে ক্যালকাটা রিভিউ পত্রিকায়, 'জমিদার এন্ড রায়ত' শীর্ষক একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। এর বাংলা অনুবাদ হচ্ছে: 'বাংলার যে কোন স্থানেই আমরা যাই না কেন চোখে পড়বে সেই একই দৃশ্য। রায়তের খাদ্যের মধ্যে শুধু ভাত আর কাপড়ের মধ্যে শুধু একটি নেংটি। তার শ্রম থেকে যা কিছু উৎপন্ন হয় তা উধাও হয়ে যায় নিমিষের মধ্যে। তার ওপরওয়ালাদের পাওনা দাবি অনন্ত। সব দাবিই একে একে তাকে মেটাতে হয়। এরপর সঞ্চয় আর থাকে না। ফলে তার হাতে কোনদিন পুঁজি সৃষ্টি হয় না। বাধ্য হয়ে তাকে দ্বারস্থ হতে হয় মহাজনের কাছে। তার রক্ত শোষণ করে ফুলে ফেঁপে ওঠে

www.pathagar.com

মহাজন। বাংলার মাটি উর্বরতার জন্য খ্যাত। বীজ ফেললেই ফসল। প্রকৃতির এই বদান্যতায় রায়তের যদি স্বাধীনতা থাকত, শোষণ থেকে নিরাপত্তা থাকত, তবে দেশে সুখ শান্তি আর আনন্দের অবধি থাকতো না। কিন্তু বাস্তবে কি? রায়তের জীবনে আছে শুধু অভাব, দুঃখ-কষ্ট লাঞ্ছনা। তাদের দুঃখ, তাদের কান্না, তাদের আর্তনাদ কারো মনে সহানুভূতির উদ্রেক করে না, জাগায়না কোন মায়া মমতা। শুধু প্রাণে বেঁচে থাকতে হলে একজনের মাসিক খরচ পড়ে দেড় থেকে তিন টাকা। পরিবারের সদস্যানুপাতে খরচও তদানুরূপ বেশি। আমরা বিশ্বাস করি না যে বাংলার কোন জেলার একশ' জনের মধ্যে পাঁচজনেরও বার্ষিক আয় একশ' টাকার অধিক। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই কোন রায়তের একক আয় দিয়ে পরিবারের ভরণ পোষণ চলে না। তার স্ত্রী পুত্র পরিজন সবাইকেই কাজ করতে হয় উপোষ এড়ানোর জন্য। সে খায় শুধু মোটা ভাত আর সামান্য ডাল। শাক সবজি মাছ তার জন্য বিলাস। তার পোশাক হচ্ছে একটি নেংটি, তার ওপর বড়জোর একটা গামছা। শোয়ার জন্য আছে একটা মোটা চাটাই ও একটা বালিশ। নলখাগড়া শনের তৈরি কুঁড়ে ঘরটি তার আবাস। একটি লাঙ্গল, দুটো হালের গরু, একটি বা একাধিক মাটির লোটা ও কিছু বীজ ধান নিয়ে তার গোটা সম্পদ। সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত, দুপুর থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত সে মাঠে কাজ করে। হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রম করে কিন্তু এতদসত্ত্বেও তার দারিদ্র্য ঘোচেনা, বুকে তার পাঁজর দেখা যায়। এ বিবরণে নিশ্চয়ই কোন অতিশয়োক্তি নেই। এমনকি কোন আকাল না থাকলেও স্বাভাবিক সময়েও রায়তকে বছরের বেশ সময় উপোষ করতে হয়। অত্যাচারে, অভাবে, অসহায় অবস্থায় রায়ত হারিয়েছে তার বিবেক বুদ্ধি, চিন্তাশক্তি, মানবিক মূল্যবোধ। দেহ ও মনে সে এখন পশুর তুল্য।'

বেনামে প্রবন্ধটি লিখেন তৎকালীন কলকাতা পাবলিক লাইব্রেরির গ্রন্থগারিক ও প্রখ্যাত সাহিত্যিক পিয়ারি চান্দ (প্যারি চাঁদ) মিত্র। ব্রিটিশদের আইন ও বিচার ব্যবস্থা এদেশের জনগণের ওপর কি রকম অন্যায় অবিচার প্রতিষ্ঠা করেছিল তার সারসংক্ষেপ বিমূর্ত হয়ে উঠেছে এ প্রবন্ধে। প্রবন্ধটি ব্রিটিশ জনমতে বিরাট আলোড়ন সৃষ্টি করে। লেখকের পরিচয় প্রকাশের জন্য সরকারি-বেসরকারি তরফ থেকে চাপ আসতে থাকে। ব্রিটিশ পার্লামেন্টের তদন্ত কমিটি পর্যন্ত ক্যালকাটা রিভিউর সম্পাদক আলেকজান্ডার ডাফকে তলব করে জানতে চায় লেখকের বক্তব্য কতটুকু সত্য? ডাফ প্রথমেই বলেন, সম্পাদক হিসেবে আমি প্রবন্ধটি পুংখানুপুংখ রূপে যাচাই করেই তা প্রকাশ করার অনুমতি দিয়েছি। আমার দীর্ঘ দিনের অভিজ্ঞতা ও অন্যান্য তথ্য থেকে আমি যা জানি তা লেখকের অভিমত থেকে ভিন্নতর কিছুই নয়। দূর থেকে গ্রামের দৃশ্য দেখে গ্রাম সম্পর্কে কোন সিদ্ধান্ত নিলে তা ভ্রান্ত হবে। গ্রামের সুন্দর ছায়াঘেরা বাঁশবন, বেতবন, ঝাউগাছ, পিপুল গাছ, তেঁতুলগাছ, আম, জাম, কলা, কাঁঠাল, ইত্যাদি ফল বাগান, মাঠে সবুজ ঘাস ও ফসল হচ্ছে তার বাহ্যিক রূপ, কিন্তু এর অভ্যন্তরীণ সামাজিক ও আর্থিক অবস্থা বড়ই করুণ, বড়ই বেদনাদায়ক।[৯৮]

www.pathagar.com

নীলকর কেনেথ এস ব্রোদী ১৮২৩ সাল থেকে চার বছর যশোর এবং ময়মনসিংহ জেলায় দীর্ঘ ১৩ বছর এ দেশে বসবাস করার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার বিবরণ দিয়ে পার্লামেন্টের তদন্ত কমিটির কাছে বলেন, 'আমি জানি রায়তরা সবাই মহাজনের কাছে ঋণে আষ্টেপৃষ্টে বাঁধা। ৫০ বছর আগে রায়তরা যে অবস্থায় ছিল এখনও সে অবস্থায়ই আছে। সে সর্বদা অভাবগ্রস্ত ও ঋণে জর্জরিত। তার ওপরে জমিদার, ইজারাদার, নীলকর যেই থাকুন না কেন রায়ত তার মালিক কর্তৃক অত্যাচারিত উৎপীড়িত। উচ্চ পদস্থ ব্যক্তিরা অধস্তনদের অত্যাচার করবে শোষণ করবে এটা যেন ভারতের নীতি। বানিয়া নামে পরিচিত একটা বিরাট শ্রেণী আছে। এরা ফসল তোলার আগে স্থানীয় লোকদের অতি উচ্চাহারে সুদে ঋণ দিয়ে থাকে এবং ফসল উঠলে অতি কমমূল্যে তা কিনে কৃষককে আবার ঋণের মধ্যে আবদ্ধ রাখে। একজন সাধারণ কৃষক যা খায় তা হচ্ছে মোটা ভাত, তার সঙ্গে একটু লবণ ও মরিচ।[৯৯]

ব্রিটিশ ইন্ডিয়া এসোসিয়েশন ব্রিটিশ পার্লামেন্টকে জানায় যে সরকার লবণ উৎপাদন ও বিতরণ একচেটিয়াভাবে নিয়ন্ত্রণ করার ফলে লবণের মূল্য এতো বেশি যে সাধারণ কৃষকের পক্ষে লবণ খাওয়া দুষ্কর। লবণের দুর্মূল্যের কারণে সমুদ্রোপকূলে যাদের বাস তারা লবণ মিশ্রিত মাটি খেয়ে থাকে। দেশের অভ্যন্তরে লোকেরা তাও যোগাড় করতে পারে না। তারা লবণের বদলে বৃক্ষলতা পুড়িয়ে এ্যালকালিযুক্ত ছাই খায়।[১০০]

উল্লেখিত প্রামাণ্য দলিলাদিতে এটা পরিষ্কার যে ব্রিটিশ আমলে আইন আদালতে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠিত থাকলে দেশে এতো অন্যায়, অনাচার আর অবিচার চলতে পারতো না। আমাদের পূর্ব পুরুষরা ব্রিটিশ যুগে কি বিভীষিকাময় নিপীড়ন মোকাবেলা করেছেন এবং বিচার ব্যবস্থা যে তাদের নিপীড়ন থেকে রক্ষা করেনি উল্লেখিত দলিল দস্তাবেজ তার সাক্ষ্য প্রমাণ বহন করে চলেছে। ১৮শ শতাব্দীর ৬০ ও ৭০ দশকে ঘন ঘন কৃষক বিদ্রোহে ঔপনিবেশিক শক্তি অবশেষে বাধ্য হয় ১৮৫৯ ও ১৮৮৫ সালে বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব আইন পাস করতে। ১৮৮৫ সালে বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব আইন পাস হওয়ার ফলে জমিদারী শোষণ বন্ধ হয় বটে, তবে তার বদলে আসে তহশীলদার। স্থায়ী শক্তি হিসেবে আবির্ভূত হয় গ্রামীণ মাতব্বর বা প্রভু। গ্রামের সাধারণ কৃষক তাদের করতলগত।

জবাবদিহির ঊর্ধ্বে থাকা তহশীলদাররা ঘুষের বিনিময়ে খতিয়ান পর্চার মাধ্যমে একজনের স্থাবর সম্পত্তি অন্যজনের মালিকানা তৈরির অধিকারী। আর উৎপাদন ক্ষেত্রে গ্রামীণ প্রভুর ভূমিকা শোষণমুখী। দরবার সালিশ, মামলা মোকদ্দমার পরামর্শ থেকে সাধারণ কৃষক গ্রামীণ প্রভুর ওপর নির্ভরশীল এবং এ নির্ভরশীলতা সদা বিদ্যমান।

দেশবাসীর প্রতি বিচার ব্যবস্থার প্রবক্তাদের ঘৃণা বিদ্বেষ

এ উপমহাদেশে বিচার ব্যবস্থার প্রবর্তক, সমর্থক ও প্রতিপালক উপনিবেশবাদী ইংরেজগণ এদেশবাসীকে অত্যন্ত নিম্নশ্রেণীর মানুষ মনে করতো। জনগণের প্রতি তাদের তুচ্ছতাচ্ছিল্যের সীমা পরিসীমা ছিল না। ইংরেজ জাতি প্রায় চারশ' বছর এদেশে বসবাস

www.pathagar.com

করেছে। প্রথম দুশো বছর ছিল বণিক হিসেবে আর পরবর্তী দুশো বছর ছিল শাসক হিসেবে। এদেশবাসী তাদের ঘৃণা-বিদ্বেষের অনলে পুড়েছে পুরো ১৯০টি বছর। সমসাময়িক ইংরেজ উইলিয়াম হিকি তার মেমোরিজ অব উইলিয়াম হিকিতে লিখেছেন, পলাশি যুদ্ধের আগে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কর্মচারীরা দেশবাসীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সংযোগ রক্ষা করে চলতো। তারা তখন এদেশের ভাষা শেখার চেষ্টা করেছে, অনেকে বাঙালি মেয়ে বিয়ে করেছে, দেশীয় আচার প্রথামতো চলতে চেষ্টা করেছে, পূজা-পার্বণ ও অন্যান্য সামাজিক উৎসবে যোগদান করেছে, দেশীয়দের সাথে একসাথে হুকোয় ধূমপান করেছে।[১০১] কিন্তু এ সম্পর্কে পরিবর্তন শুরু হয় পলাশী যুদ্ধের পর থেকে। কারণ ব্রিটিশরা এখন শাসক আর বাঙালিরা শাসিত।

অতএব ঔপনিবেশিক শাসক জাতি হিসেবে ইংরেজরা এদেশবাসীকে অনুকম্পার দৃষ্টিতে দেখতে শুরু করে। বাঙালি, হিন্দু, মুসলমান নির্বিশেষে এদেশবাসী ছিল নেটিভ' তথা তাদের চোখে অত্যন্ত নিম্ন শ্রেণীর মানুষ। কোম্পানির শাসনে ব্রিটিশ অভিজাত শ্রেণীর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার পর এ অনুকম্পা পরিশেষে উন্নাসিকতা ও ঘৃণায় রূপান্তরিত হয়। শাসকসুলভ দম্ভে এদেশে ইংরেজ সাহেবদের বাসস্থানের ফটকে তখন সাইনবোর্ডে লেখা থাকত 'ডগস এন্ড ইন্ডিয়ান নট অ্যালাউড'। সমকালীন ইউরোপীয়ানদের চোখে বাঙালি বলতে ছিল হিন্দু। শহরবাসী অভিজাত মুসলমানদের বলা হতো মুর অর্থাৎ বিদেশাগত বনেদি মুসলমান। স্পেনের মুসলমানদের তারা মুর বলতো। গ্রামীণ সাধারণ মুসলমানদের হিন্দু বলেই গণ্য করা হতো। ইংরেজদের চলাফেরা, কাজ কর্মে, আচরণে তারা সচেষ্ট ছিল যে, তারাই শ্রেষ্ঠ সভ্যজাতি আর বাঙালিরা হচ্ছে অজ্ঞ, কুসংস্কারাচ্ছন্ন ইতরপ্রাণী বিশেষ। এ দৃষ্টিভঙ্গির প্রথম বহিঃপ্রকাশ ঘটে লর্ড কর্ণওয়ালিসের সময়। তিনিই প্রথম এদেশে সমস্ত প্রশাসনিক ঐতিহ্যকে উপেক্ষা করে পশ্চিমী শাসন ব্যবস্থা প্রবর্তন করেন। দেশীয় লোকদের তিনি সব দায়িত্বপূর্ণ পদ থেকে অপসারণ করে সেখানে উচ্চ বেতনে ইউরোপীয়ানদের নিয়োগ করেন। কর্ণওয়ালিস মনে করতেন, 'বাঙালিরা অবিশ্বস্ত হঠকারি, দুর্নীতিপরায়ণ, অতএব প্রশাসনিক ক্ষেত্র থেকে তাদের উৎখাত না করলে সততা ও দক্ষতা বজায় রাখা অসম্ভব।'[১০২] এদেশে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির রাজনৈতিক আধিপত্য স্থাপনের পর থেকে দেশবাসীর প্রতি ছিল ইংরেজদের অবজ্ঞা এবং ঔদাসীন্য। বর্ণবাদী কর্ণওয়ালিস থেকে শুরু হয় জঘন্য ঘৃণা-বিদ্বেষ। কর্ণওয়ালিসের পর এদেশের গভর্নর জেনারেল নিযুক্ত হন স্যার জন শোর। তিনি এর আগে ২০ বছর ছিলেন কোম্পানির কর্মচারী। তিনি হিন্দুদের সম্পর্কে মন্তব্য করেন এই বলে যে, 'এদেশের হিন্দুদের চরিত্র সম্পর্কে আমার অভিমত হচ্ছে এরা অত্যধিক নিম্নমানের মানুষ। দাসত্ববোধ, হঠকারিতা ও ছলচাতুরি দিয়ে গঠিত এদের চরিত্র।'[১০৩] কলকাতা বোর্ড অব ট্রেডের সভাপতি ও পরে কোর্ট অব ডাইরেক্টরস এর সদস্য ও চেয়ারম্যান চার্লস গ্রান্ট মন্তব্য করেন 'বাঙালিরা অর্থাৎ হিন্দুরা বিচিত্র জীব। এরা উপরস্থ মনিবের নিকট অত্যধিক

www.pathagar.com

নমনীয়। মনিবের পায়ে ধরে করজোড়ে অপেক্ষা করে এবং মনিব যা কিছু ন্যায় অন্যায় আদেশ করে তা মানার জন্য শ'শ' ব্যস্ত থাকে। কিন্তু যারা তাদের নিচে বা অধীনস্থ তাদের প্রতি সদা উগ্রভাব দেখায়, দুর্ব্যবহার করে, মানুষ বলে গণ্য করে না। অর্থাৎ এরা আপন কর্তার কাছে থেকে যে দুর্ব্যবহার পেয়ে থাকে, তার প্রতিশোধ গ্রহণ করে তার অধিনস্থ ব্যক্তিকে অপদস্ত করে।'[১০৪] ব্রিটিশ প্রবর্তিত ঔপনিবেশিক আদালত ও এদেশবাসীর প্রতি তাচ্ছিল্য প্রদর্শনে পিছিয়ে থাকেনি। মুর্শিদাবাদ প্রাদেশিক কোর্ট এদেশবাসীর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে মন্তব্য করে তাদের নৈতিক চরিত্র অত্যধিক নিম্নমানের। অজ্ঞতা, মন্ত্রে বিশ্বাস, কুসংস্কার, স্বার্থপরতা, মোকদ্দমা প্রিয়তা, ধূর্ততা, নিচলোভ, প্রতিহিংসা, চৌর্যবৃত্তি, ঈর্ষা পরায়ণতা, সত্যের প্রতি অভক্তি, আলস্য, পরশ্রীকাতরতা, তাদের চরিত্রের মূল বৈশিষ্ট্য।'[১০৫] বাংলার গভর্ণর জেনারেল লর্ড হেস্টিংস মন্তব্য করেন, 'এদেশের হিন্দুরা এমন একটি প্রাণী যার কার্যাবলী পশুর সঙ্গে মিল বেশি। অনেকাংশে এরা পশুর চেয়েও অধম। বিভিন্ন পেশায় তারা চিরকালের জন্য বর্ণ প্রথার দরুন আবদ্ধ। এসব পেশায় তাদের যে কৌশল ও দক্ষতা দেখা যায়, একটি কুকুর, হাতি বা বানরকে প্রশিক্ষণ দিলে ওই পশুও ওই দক্ষতা অর্জন করতে সক্ষম। এদের এহেন আত্মীক অধ:পতনের দরুনই ব্রিটিশরা এত সহজে এত অনিচ্ছা সত্ত্বেও এদেশে রাজ্য প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়েছে।[১০৬] স্বাধীন বাংলাদেশে প্রচলিত ভারতীয় দণ্ডবিধি প্রণেতা লর্ড টমাস ব্যারিংটন মেকলের মন্তব্য ছিল আরো কঠোর। নোভাক বাংলাদেশে রিফ্লেক্সন অন ওয়াটার' পুস্তকে বাঙালিদের সম্পর্কে লর্ড মেকলের একটি উদ্ধৃতি সংযোজন করেছেন। উদ্ধৃতিটি হচ্ছে: মহিষের যথা শৃংগ, মৌমাছির যথা হুল, বাঘের যথা থাবা, নারীর যথা সৌন্দর্য, বাঙালি জাতির তদ্রুপ প্রবঞ্চনা, বড় বড় প্রতিজ্ঞা তথা প্রতিশ্রুতি, মোলায়েম অজুহাত, অবস্থাগত মিথ্যা প্রমাণাদির বিশদ উপস্থাপনা, ছল-চাতুরি মিথ্যা শপথ, মিথ্যা সাক্ষ্য দান, জালিয়াতি, এগুলো হচ্ছে- নিম্নগাঙ্গে উপত্যকার বাসিন্দাদের আত্মরক্ষা এবং আক্রমণের চিরন্তন অস্ত্র।'[১০৭]

এ ব্যাপারে টমাস মনরো'র তাৎপর্যপূর্ণ বক্তব্যটি ছিল দারুণ প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেছেন, 'সব আক্রমণকারী বিদেশী বিজেতারা বিজিত বাঙালি জাতির প্রতি ঔদ্ধত্য প্রদর্শন করেছে। কিন্তু ইংরেজরা তাদের প্রতি যে ঘৃণা, অবজ্ঞা ও তুচ্ছতাচ্ছিল্য প্রদর্শন করেছে তার তুলনা হয়না। তাদেরকে সমস্ত দায়িত্বপূর্ণ কাজ থেকে উৎখাত করা হয়েছে, রুজি-রোজগারের সব পথ রুদ্ধ করা হয়েছে- তাতেও যেন সাধ মেটেনি। অবশেষে তাদের জাতীয় চরিত্রের ওপর কালিমা লেপন করা হয়েছে।[১০৮] উপনিবেশবাদী ব্রিটিশরা এদেশবাসীর জাতীয় চরিত্রের ওপর কলংক দিয়েই ক্ষান্ত হয়নি। স্মরণাতীত কাল থেকে চলে আসা এদেশের হিন্দু-মুসলিম সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বিনষ্ট করেছে, মোঘল আমলের পদ-পদবীর অবমূল্যায়ন করেছে আর দেশবাসীর সংস্কৃতি ঐতিহ্যকে করেছে চরম অবমাননা। দেশবাসীকে নির্বিঘ্নে শোষণ করতে শান্তিপ্রিয় হিন্দু-মুসলমান সম্প্রদায়কে

www.pathagar.com

পরস্পরের বিরুদ্ধে উস্কে দিয়ে সৃষ্টি করেছে সমাজে অশান্তি ও হানাহানি। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির একদা নিম্ন বেতনভুক কর্মচারী রবার্ট ক্লাইভ সফল চক্রান্তের মাধ্যমে বাংলাদেশ দখলের পর ইংরেজ শিবিরে রাতারাতি বিখ্যাত হয়ে গেলেন। এ সাফল্যে খুশি হয়ে ব্রিটিশরা ক্লাইভকে প্রথমে লর্ড ও পরে ব্যারণ অব প্লাশী উপাধিতে ভূষিত করে। এই ক্লাইভ ওয়ারেন হেস্টিংসকে লেখা এক চিঠিতে বলেন- "মুসলমানদের প্রতি যতই সদয় ব্যবহার করা হোক না কেন তারা আমাদের প্রতি নমনীয় মনোভাব গ্রহণ করবে না। তারা তাদের নিজস্ব আশা-আকাঙ্ক্ষা ভয়ভীতি দ্বারা পরিচালিত হবে।' ১৮১৩ সালে স্যার জন ম্যালকম বলেছিলেন, 'কিছুকাল আগে আমাদের সরকার প্রতিষ্ঠিত হবার কারণে মুসলমানদের যে ক্ষতি হয়েছে তা তাদের স্মরণে রয়েছে। তাই হিন্দুরা আমাদের প্রতি যতটা অনুগত হবে মুসলমানদের নিকট হতে ততটা আনুগত্য আশা করা যায়না। ভারতবর্ষে আমাদের নিরাপত্তা হিন্দুদের আনুগত্যের ওপর নির্ভরশীল।' টমাস মনরো মন্তব্য করেছিলেন, 'মুসলমানদের বিরোধিতার মোকাবেলায় হিন্দুদের সহযোগিতার কারণে কোম্পানির শাসন টিকে থাকবে।' লর্ড এলেনবরা বলেছিলেন, 'আমি এ বিষয়ে কিছুতেই চক্ষু বন্ধ রাখতে পারি না যে, ওই জাতিটা (মুসলমানরা) মূলগতভাবেই আমাদের বিরুদ্ধভাবাপন্ন। এ জন্য আমাদের সঠিক নীতি হবে হিন্দুদের মনতুষ্টি করা।' সুলতান মাহমুদের আক্রমণের ফলে সোমনাথ মন্দির ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। মুসলমানদের বিরুদ্ধে হিন্দুদের উস্কে দেয়ার জন্য তিনি তা মেরামত করেন এবং এর সাথে এক তোরণের সংযোজন করেন।[১০৯]

বিজয়ী ঔপনিবেশিক ব্রিটিশদের ক্রোধ, ঘৃণা ও প্রতিহিংসা থেকে মুসলিম শাসনামলের পদ-পদবী এবং পোশাক-পরিচ্ছদও রক্ষা পায়নি। আহমদ শাহ আবদালী ছিলেন মুসলমানদের গর্ব এবং গৌরবের প্রতীক। বিশ্ব মুসলিমের এই মহাঅধিনায়কের স্মৃতিকে অসম্মান ও কলংকিত করার উদ্দেশ্যে ঔপনিবেশিক সরকার ব্রিটিশ শাসনের সর্বনিম্ন কর্মচারির পদবি দেয় আবদালী। তাকে পরিধান করায় আবদালীর পাজামা ও শেরওয়ানি। তদানীন্তন ভারতের গভর্নর জেনারেলদের পিয়নের পোশাক ছিল পুরোপুরি আহমদ শাহ আবদালীর পোশাকের অনুরূপ। আবদালী শব্দটি ব্যবহারে মুসলমানদের অনুভূতি গভীরভাবে আহত হওয়ায় পাকিস্তান আমলে আবদালী শব্দকে পরিবর্তন করে 'আরদালি' করে দেয়া হয়। ব্রিটিশরা ভারতে আধিপত্য বিস্তারে সবচেয়ে প্রচণ্ড বাধার সম্মুখীন হয়েছে মহীশুরের অধিপতি টিপু সুলতান দ্বারা। ব্রিটিশদের সাথে যুদ্ধে পরাজিত শাসকদের মধ্যে টিপু সুলতান বরাবরই ছিলেন স্বাধীনতাকামী ভারতবাসীর শ্রদ্ধার পাত্র এবং একই কারণে ইংরেজদের নিকট তিনি ছিলেন চরম ঘৃণিত। ইংরেজদের এই ঘৃণা টিপু সুলতানের রাজ্য দখলের মধ্যেই শেষ হয়ে যায়নি; তার সুলতান পদবি এবং তার রাজকীয় পোশাক পর্যন্ত পরিব্যাপ্ত হয়েছিল। টিপু সুলতানের মাথার পাগড়ি ছিল দেখতে বৃহস্পতি গ্রহ ও উপগ্রহের অনুরূপ। ইংরেজরা টিপু সুলতানের মাথার পাগড়ি নির্ধারণ

www.pathagar.com

করে হাইকোর্টের বিচারপতি, জেলা জজ, ম্যাজিস্ট্রেট, সচিব, সদস্য এবং অন্যান্য উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাদের পিয়ন খানসামার পাগড়িরূপে। ভারতবর্ষে মুসলিম শাসনামলে বিচারকের সম্মানসূচক পদবি ছিল কাজী। তখন কাজীরা ছিলেন সত্য, সততা ও ন্যায়বিচারের প্রতীক। দেশের প্রধান বিচারপতির পদবী ছিল কাজী উল কুজ্জাত তথা কাজীদের কাজী। কুজ্জাত কাজী শব্দটির বহুবচন। ব্রিটিশ আমলে কাজী পদটির অবমাননা করার জন্য তাদেরকে বিয়ে নিবন্ধনের দায়িত্ব দেয়া হয়। এখনো আমাদের দেশে বিবাহ রেজিস্ট্রারকে কাজী বলা হয় এবং এটা আমাদের সংস্কৃতির অঙ্গীভূত হয়ে গেছে। মুসলিম শাসনামলে রাজ্য বা প্রদেশের শাসনকর্তার পদবী ছিল সুবাদার। সুবা শব্দের বাংলা প্রতিশব্দ হচ্ছে প্রদেশ বা রাজ্য। নবাব আলীবর্দী খাঁর পরে নবাব সিরাজউদ্দৌলাও ছিলেন বাংলা, বিহার, উড়িষ্যার সুবাদার। সিরাজউদ্দৌলা সহ ভারতের বিভিন্ন অংশে প্রাদেশিক মুসলিম সুবাদারদের সাথে যুদ্ধ করেই ব্রিটিশদের ভারতের শাসনভার দখল করতে হয়েছিল। যে কারণে প্রাদেশিক গভর্নর বা সুবাদারদের প্রতি তারা ছিল অত্যন্ত রুষ্ট এবং ক্রুদ্ধ। ইংরেজদের এ ক্রোধ সুবাদারদের পদবী পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছিল। ফলশ্রুতিতে তারা সুবাদার পদকে নিম্নমুখী ও অবমূল্যায়ন করে মনের ঝাল মেটায়। ব্রিটিশ সেনাবাহিনীতে একটি নন কমিশনড পদবী রাখা হয় সুবাদার নাম দিয়ে। স্বল্প শিক্ষিত সিপাহীরা প্রমোশন পেয়ে সুবাদার পদে উন্নীত হতেন। পুলিশ বাহিনীতেও একজন সিপাহী কর্মচারির পদবী ছিল সুবাদার। মুসলমানদের আত্মমর্যাদাবোধ ও আত্মবিশ্বাস বিনষ্ট করার উদ্দেশ্য নিয়ে অবমূল্যায়িত সুবাদার পদবীটি কিন্তু আজো তেমন অবস্থাতেই আছে। মোঘল আমলে সুবাদার তথা প্রাদেশিক গভর্নরের সর্বপ্রধান নির্বাহী কর্মকর্তার পদবি ছিল নাজির। বর্তমান সময়ে কেবিনেট সেক্রেটারী এবং মিলিটারি সেক্রেটারির দায়িত্ব একীভূত করে নিলে যে পদ হবে তাই ছিল মোঘল আমলে নাজির-এর পদ। ব্রিটিশরা এই উচ্চ পদটিকে নিম্নমুখী অবমূল্যায়ন করে জেলা প্রশাসকের দফতরের এলডি ক্লার্কের পদটি নাজির হিসেবে পদায়ন করে। এ অবস্থা এখনও বহাল রয়েছে। নায়েব শব্দের অর্থ হলো ডেপুটি বা সহকারী। সুবা বাংলার সহকারী গভর্নরের পদবি ছিল নায়েবে নাজিম কিংবা নায়েব সুবাদার। ব্রিটিশ রাজত্বে এই নায়েব পদটি অবমূল্যায়ন করে অতি নিম্নস্তরে নিয়ে আসা হয়। যারা জমির খাজনা আদায় করতেন তাদের পদবি দেয়া হয় নায়েব।

রিসাল একটি আরবি শব্দ। বাংলা ভাষায় এর অর্থ হলো বাণী। রিসালদার অর্থ হলো বাণী বাহক বা বাণী ধারক। মোঘল শাসনে এ পদটি ছিল তথ্যমন্ত্রী, বর্তমানে তথ্য ও বেতারমন্ত্রীর সমমর্যাদা সম্পন্ন কর্মকর্তার। ব্রিটিশ আমলে গুরুত্বপূর্ণ এ পদটিকে সেনা কর্মচারী বা কেরানী পদমর্যাদায় নিয়ে আসা হয়। মোঘল আমলে মীর বকশির, পদমর্যাদা ছিল আধুনিক যুগের অর্থমন্ত্রীর সমতুল্য। ব্রিটিশ শাসনে মীরবকশির পদটি অনেক নিচে নামিয়ে আনা হয়। কালক্রমে পদটি গুরুত্ব হারিয়ে বিস্মৃতির অন্ধকারে হারিয়ে গেছে।

www.pathagar.com

আরবী শব্দ হাবল হাবলুনের অর্থ হলো রশি বা রজ্জু। হাবিল বা হাবেলী শব্দের অর্থ হচ্ছে সেনানিবাস। হাবিলদার হলেন- ওই কর্মকর্তা যিনি ক্যান্টনমেন্ট বা সেনানিবাসের সকল সৈন্যদের সংঘবদ্ধ রাখেন। মোঘল আমলে এ পদটি ছিল সেনানিবাসের প্রধান কর্মকর্তা বা আধুনিক ব্রিগেডিয়ারের সমমর্যাদা সম্পন্ন। ব্রিটিশ যুগে হাবিলদার পদটি অনেক নিচে নামিয়ে এনে অল্প কয়েকজন সৈন্যের কর্তৃত্ব তাকে দেয়া হয়। পুলিশ বিভাগেও একই ধাঁচের পদবী বন্টন করা হয় যা আজো বহাল আছে। আর্মীমেস বা বাবুর্চিখানা তদারকির দায়িত্ব প্রাপ্ত কর্মকর্তার পদবীও হচ্ছে হাবিলদার। আজকাল বেসরকারী অফিসের বাবুর্চিখানার প্রধানকেও হাবিলদার বলা হয়। ফারসী 'খান' শব্দের অর্থ হলো নেতা বা অধিপতি। 'সামান' শব্দের অর্থ হচ্ছে যুদ্ধে ব্যবহৃত দ্রব্যসামগ্রী। ব্রিটিশ সেনা বাহিনীর কোয়ার্টর মাস্টার জেনারেল এর পদের সমতুল্য ছিল মোঘল যুগের খানই সামান বা খানসামার পদবী। সামরিক দ্রব্যাদির তত্ত্বাবধান ছাড়াও খানসামার দায়িত্ব প্রসারিত ছিল সরকারের আয়ত্তাধীন সকল বেসামরিক দ্রব্যাদি পর্যন্ত। মোঘল প্রশাসনে খানসামা ছিলেন মন্ত্রী পর্যায়ের কর্মকর্তা। বর্তমান আমলের ত্রাণ, পুনর্বাসন, সিভিল সাপ্লাই ইত্যাদি মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বপূর্ণ মন্ত্রীর সমমর্যাদার পদ ছিল খানসামা বরং বলা যায় পদটি ছিল আরো অধিক গুরুত্বপূর্ণ। ব্রিটিশ শাসকরা মর্যাদাসম্পন্ন খানসামা পদটি একেবারে নিচে নামিয়ে সরকারি গৃহভৃত্যের পদে নিয়ে আসে। পিয়ন, চাপরাশী, অর্ডারলী পদেরও নিম্নস্তরে ছিল খানসামা এবং তাদের দায়িত্ব ছিল বাসার জিনিসপত্র দেখাশোনা, টেবিলে খাবার পরিবেশন ও বেগম সাহেবাদের ফুটফরমাস তামিল করা। আরবী কানুন শব্দের অর্থ আইন বিধিবিধান ফার্সী ভাষায় কানুনগো তাকেই বলা হয় যিনি আইন বিশারদ, আইন জানেন এবং আইন সংক্রান্ত কাজকর্ম করেন। মোঘল এবং তুর্কী প্রশাসনেও কানুনগো ছিলেন এডভোকেট, আইন বিশেষজ্ঞ, লিগ্যাল কনসালটেন্ট এবং আইন সংক্রান্ত উচ্চ পর্যায়ের কর্মকর্তা। কিন্তু ঔপনিবেশিক ব্রিটিশরা ভূমি জরিপ বিভাগের একজন কর্মচারীকে এ পদবী দেয় যাকে দ্বিতীয় শ্রেণীর কর্মকর্তাও বিবেচনা করা হয় না। এ অবস্থা কিন্তু আজও বহাল আছে। জমা শব্দের অর্থ হচ্ছে সংগ্রহ বা আদায়। জমাদার যিনি জমা করেন এবং জমা গ্রহণ করেন। মোঘল আমলে একটা বিরাট রাজস্ব এলাকার খাজনা সংগ্রহকারীর পদবী ছিল জমাদার বা রাজস্ব আদায়ের দায়িত্বে নিয়োজিত প্রধান কর্মকর্তা। ইংরেজ ডিস্ট্রিক্ট কালেক্টর বা কমিশনারের পদবী ছিল মুসলিম আমলের জমাদারের পদ। ব্রিটিশ আমলে পদটির অবমূল্যায়ন করে জমাদারকে দেয়া হয় মলবিষ্ঠা আদায়ের দায়িত্ব। তাকে দেয়া হয় একাধিক সুইপার বা ধাঙ্গড়ের কাজকর্ম তদারকির দায়িত্বভার। মহিলা মেথরদের দলপতির পদবীর নামকরণ করা হয় জমাদারনী।[১১০]

এছাড়া এদেশের সাধারণ নাগরিকের প্রতি ব্রিটিশ সৈন্য ও কর্মকর্তাদের ঔদ্ধত্যপূর্ণ আচরণ ও চাকরি ক্ষেত্রে কি রকম বৈষম্য ছিল তার কিছু খণ্ডচিত্র এখানে তুলে ধরা হলো, দেশবাসীর প্রতি ইংরেজদের ঔদ্ধত্য ও অশ্রদ্ধা এমন পর্যায়ে পৌঁছেছিল যে সরকারি

www.pathagar.com

কর্মকর্তারা বিশেষ করে শ্বেত সৈন্যরা গ্রামে গিয়ে পুরুষদের গ্রাম থেকে বলপূর্বক বের করে দিয়ে নারীদের ওপর পাশবিক অত্যাচার চালাতেও দ্বিধা করেনি।[১১১] ইংরেজ সাহেবকে দেখামাত্র দু'হাত জোড় করে কোম্পানীর শুভ কামনা করা, সাহেবের গাড়ি ঠেলে দেয়া, সাহেবের গাড়ি দেখলে পথচলা বন্ধ করে পথের কিনারে জোড় হস্তে গাড়ি অতিক্রম না করা পর্যন্ত দাঁড়িয়ে থাকা রেওয়াজে পরিণত হয়। এর ব্যাঘাত ঘটালে নিয়ম লংঘনকারীকে পরম শাস্তি পেতে হতো। এ রেওয়াজ ভঙ্গ করে রাজা রামমোহনের মতো অভিজাত ব্যক্তিকেও একবার শাস্তি পেতে হয়েছিল। ১৮০৯ সালের জানুয়ারি মাসে রাজা রামমোহন রায় (তখন তিনি রাজা উপাধি পাননি) ভাগলপুরের এক রাস্তা ধরে ঘোড়ার গাড়িতে যাচ্ছিলেন। পথিমধ্যে সেখানকার কালেক্টর স্যার ফ্রেডারিক কোন কাজে তার লোকজন নিয়ে দাঁড়িয়ে ছিলেন। পালকির দরজা বন্ধ হেতু রামমোহন তাকে দেখতে পাননি, অতএব গাড়ি থেকে নেমে সালাম না দিয়েই তিনি চলে যাচ্ছিলেন। এ অপরাধে কালেক্টর আদেশ করেন রামমোহনের গাড়ি থামাবার জন্য। রামমোহন অপরাধ মার্জনা চান। কিন্তু ফ্রেডারিকের গালি আর থামে না। অকথ্য ভাষায় গালিগালাজের সাথে তাকে বেত্রাঘাত করা হয় এবং শেষে তার পালকিটি উল্টিয়ে ঘোড়ার পিঠে উঠিয়ে দিয়ে রামমোহনকে বলা হয় পায়ে হেঁটে যেতে।[১১২] দেশবাসীর প্রতি জমিদার ও দালাল শ্রেণী দ্বারা জুলুম, পীড়ন, শোষণ, ঘৃণ্য ও তুচ্ছতাচ্ছিল্যের দরুন নিপীড়িত জনগণ সব সময় ইংরেজদেরকে এড়িয়ে চলতো। কিন্তু নব্য ধনী সমাজের অভিজাত শ্রেণীর লোকজন ব্রিটিশদেরকে সেবা করতে পারলে নিজেদেরকে ধন্য মনে করতো। সামগ্রীকভাবে সাধারণ মানুষের সাথে ইংরেজ সাহেবদের বিচ্ছিন্নতা বিরাজ করলেও ঢাকা, কলকাতা ও মুর্শিদাবাদের অভিজাত শ্রেণীর লোকজন সব সময় ইংরেজদের সান্নিধ্য কামনা করতো। এরা হচ্ছে সেই শ্রেণী থেকে আগত যারা ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির দেশীয় বানিয়া মুৎসুদ্দি শ্রেণী। পূজা পার্বণ ও অন্যান্য সামাজিক উৎসবে এসব বানিয়া পরিবার অগণিত টাকা খরচ করতো। প্রতি উৎসবে ইংরেজ সামরিক বেসামরিক অফিসারদের আমন্ত্রণ করা হতো। কোন না কোন সামরিক বা বেসামরিক অফিসার যেন তাদের বাড়িতে পদধূলি দিতে সক্ষম হন সে জন্য তাদের পাঁচ ছয় মাস আগে থেকেই নিমন্ত্রণ করা হতো, যেন অন্য কেউ তাদের উপস্থিতি আগে রিজার্ভ না করতে পারে'।[১১৩] উদারপন্থী রাজা রামমোহনের মতো ব্যক্তিত্ব যিনি ইংরেজ সাহেবদের দ্বারা ইতিপূর্বে অপদস্থ হয়েছিলেন তিনিও ভোজবাজিতে ব্রিটিশ সাহেবদেরকে নিমন্ত্রণ করে ধন্য হতে চেষ্টা করেন। তখন দেশীয় কারো বাড়িতে কোন ইংরেজ সাহেবের আগমন ঘটলে প্রতিবেশী ও সমাজের চোখে তার সম্মান বেড়ে যেতো। রাজা রামমোহন প্রদত্ত একটি পার্টির বিবরণ পাওয়া যায় ইংরেজ মিসেস ফেনী পার্কসের রোজনামচায়। ব্যক্তিগত ডায়রীতে তিনি লিখেছেন, '১৮২৩ সালের মে। সেদিন সন্ধ্যায় আমরা রামমোহন রায় প্রদত্ত একটি পার্টিতে গিয়েছিলাম। রামমোহন একজন ধনী বাংগালী বাবু। তার বাড়ির বিরাট আঙ্গিনা সম্পূর্ণ

www.pathagar.com

আলোকসজ্জিত করা হয়। আলোকসজ্জার ঝলমলের মধ্যে পোড়ানো হয় অসংখ্য আতশবাজি। বাড়ির বিভিন্ন কামরায় ছিল সুন্দরী নাচনেওয়ালী। তারা নাচছিল এবং সঙ্গে সঙ্গে গানও পরিবেশন করছিল। গানের স্টাইল অদ্ভুত ধরনের মাঝে মাঝে গানের সুর নাকের ভেতর দিয়ে বেরোয়। কতিপয় মেয়ে ছিল সত্যিই সুন্দরী। এদের একজনের নাম নিকী বাঈজী। তাকে বলা যায় প্রাচ্যের কোটালানী তথা সেরা গায়িকা।'[১১৪] এছাড়া শতবর্ষ আগে ঢাকার সাপ্তাহিক 'ঢাকা প্রকাশ' পত্রিকার কয়েকটি প্রতিবেদন ছিল এ রকম।

১.

প্রাইভেট ক্যাসী রয়াল ম্যানচেস্টার ফিউজিলিয়ার দলের একজন সৈন্য। পদাঘাতে জনৈক ঝাড়ুদারকে পরলোকে পাঠাইয়া এই ক্যাসী মহোদয় সম্প্রতি আদালতের আমলে আসিয়াছেন। পাঞ্জাব চিফ কোর্টে ইহার বিচার হইবে। সম্ভবত: উন্মত্ততার আবরণে সাহেবের পবিত্র দেহ সুরক্ষিত! দেখা যাক, পরিণাম কিরূপ দাঁড়ায়!

পেটেন্ট ল্যাটিন কোম্পানির স্বত্বাধিকারী মিঃ ডিউন। জনৈক পাখা টানা কুলির হত্যাপরাধে দণ্ডবিধির ৩০৪ অনুসারে আলিপুরের জয়েন্ট ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট অভিযুক্ত হইয়াছেন। অভিযোগের মর্ম এইরূপ: আসামী বায়ু পরিবর্তনের জন্য বারাকপুর গিয়াছিলেন, গত ১৮ই জুলাই তিনি সওয়ার যশোহর নামক পাখা টানা কুলিকে ডাকিলে সে বলে যে, এখন তাহার পালা নহে। ইহাতেই নাকি সাহেবের ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটে এবং সবুটপদপ্রহারে জর্জরিত অভাগা কুলির প্রাণবায়ু পলাইয়া গিয়া ছার কুলিজীবনের দায় হইতে অব্যাহতি লাভ করে। নেটিবের প্রাণ! সে জন্য আবার আদালতে অভিযোগ!! দুঃসাহসের একশেষই বলিতে হইবে!!! পরাজিত জাতি পদপ্রহারকে কৃপাচিহ্ন বলিয়া মনে করে না কেন, এ তত্ত্ব চিন্তা করিতে গিয়াই বোধ হয় প্রভুরা অবাক হইয়া থাকেন। ক্যাসি সাহেবের পক্ষে মিথ্যা সাক্ষ্য দেয়ার অপরাধে তাহার কতিপয় লোক ফৌজদারিতে অভিযুক্ত হইয়াছেন। শ্বেতাঙ্গের পদাঘাতে কৃষ্ণাঙ্গের মৃত্যু নিত্য সংঘটিত হইতে দেখিয়া ভারতবাসী আপনার অদৃষ্টপট পাঠ করিতে শিখিয়াছে। সুতরাং এখন আর ইহাতে অবাক হইবার কিছুই নাই। পদদলিত জাতি পদাঘাতে পরলোকে প্রেরিত হইবে উহাতে আপত্তি করিবারই বা কি আছে?

২.

শ্বেতাঙ্গ সৈনিকের অত্যাচার কাহিনীতে ভারতবাসী এখন অভ্যস্ত হইয়া পড়িয়াছে। কাজেই এই সকল লোমহর্ষক বিবরণী অবগত হইলে অদৃষ্টপটের দিকে চাহিয়া ভারত সন্তান এখন আপন কপালে করাঘাত করিয়াই ক্ষান্ত হইয়া থাকে। এ দিকে ব্রিটিশ বীরেরা স্বাচ্ছন্দে কালা আদমীর মুণ্ডপাত করিয়াও যখন বিচার প্রহেলিকার প্রচ্ছন্ন প্রভাবে অনায়াসে বিপন্মুক্ত হইতে সমর্থ হয়, তখন উত্তরোত্তর এই রূপ লীলা খেলার মাত্রা বাড়িয়ে যাইবে

www.pathagar.com

ইহাতে অবাক হইবার কিছুই নাই। সম্প্রতি কাল্কা-দিল্লী রেলওয়ে লাইনের বদলি স্টেশন হইতে যে ভীষণ সংবাদ আসিয়াছে, পাঠকবর্গের অবগতির নিমিত্ত নিম্নে তাহা উদ্ধৃত হইল। লর্ড কার্জনের ন্যায় বড় লাট এবং লর্ড কিচেনারের ন্যায় প্রধান সেনাপতির আমলেও যদি এ সকল অত্যাচার উৎপীড়নের নিবৃত্তি না হইল, তবে ভাগ্যহীন ভারতবাসী চিরদিনই এ কালানলে পুড়িয়া মরিবে। ট্রেন বাদলী স্টেশন পহুঁছিল। একটা সৈন্য গাড়ি হইতে নামিয়া অপর গাড়িতে প্রবেশ করিল। এ গাড়িতে এ দেশীয় আটটি যাত্রী ছিলেন ইহাদের মধ্যে স্ত্রীলোক ছিলেন দুইটি। একটি স্ত্রীলোকের কোলে দেড় মাসের একটি শিশু ছিল। সৈন্যটি জঘন্যভাবে নাচিতে নাচিতে এই গাড়িতে প্রবেশ করিয়া স্ত্রীলোকদিগের সম্মুখে অগ্রসর হইতে লাগিল। তাহার ভাবভঙ্গি দেখিয়া স্ত্রীলোক দুইটি ভয়ে মুর্চ্ছিত প্রায় হইয়া পড়িলেন, পুরুষরা ঘোরতর প্রতিবাদ করিতে লাগিলেন, তাহাতে সৈন্যের কর্তব্য বুদ্ধি উত্তেজিত হওয়া দূরে থাকুক, সে তখন পশুর ন্যায় ক্রোধে উত্তেজিত হইয়া উঠিল। পেশোয়ারের কমিসেরিয়াট ক্লার্ক বাবু সীতারামের সঙ্গে এই স্ত্রীলোক দুইটি আসিয়াছিলেন। বাবু সীতারাম সৈন্যকে এই গাড়ি হইতে নামিয়া যাইতে বলায় সৈন্যটি তাহাকে প্রহার করিল। এই সময়ে গাড়ি স্টেশন ছাড়িয়া চলিয়া যাইবার উপক্রম করিল। কিন্তু স্টেশন মাস্টার ভীত যাত্রীদিগের আর্তনাদ শুনিতে পাইয়া গাড়ি থামাইতে আদেশ করিলেন, গাড়ি থামিল। গাড়ি থামা মাত্রই আর একটি সৈন্য গাড়ি হইতে লাফাইয়া পড়িয়া তাহার সহচরের সাহায্য করিতে ছুটিল। তখন এক হুলস্থুল পড়িয়া গেল। গাড়িতে যে কয়েকটি পুরুষ ছিলেন, এই দুর্দান্ত গোরা সৈন্যের প্রহারে সকলকেই জর্জরিত হইতে হইল। বাবু সীতারামের মুখমণ্ডল রক্তে ভাসিয়া গেল। এই সময়ে গার্ড গাড়ির ভিতরে প্রবেশ করিয়া সৈন্যটিকে বাহির করিয়া আনিল। তখন তাহার তর্জন গর্জনে ও বীরবিক্রমের বিশাল অভিনয়ে রেলওয়ে প্লাটফরম কাঁপিয়ে উঠিল। যে তাহার সম্মুখীন হইল তাহাকেই কম বেশি প্রহৃত হইতে হইয়াছিল। যদিও গার্ড একটি সৈন্যকে বাহির করিয়া আনিল বটে, কিন্তু ইত্যবসরে অপর সৈন্যটি ঐ গাড়ির ভিতরে প্রবেশ করিয়া বাবু সীতারামকে আক্রমণ করিতে লাগিল। এই অবস্থায় স্ত্রীলোক দু'টি শিশু সন্তান লইয়া কি ভয়ানক অবস্থায় পড়িয়াছিলেন পাঠকগণ মনে মনে অনুমান করিয়া তাহা বুঝিতে পারিবেন। যাহা হউক, বহু কষ্টে উহাকেও ঐ গাড়ি হইতে বাহির করা হইল। দুইটি গোরা সৈন্যের পাশব আঘাতে বাবু সীতারামের মুখমণ্ডল হইতে অজস্র ধারায় রক্তপাত হইতেছিল। অনেক যত্নে তাহার রক্তরোধ করা হয়। এই ভীষণ লোমহর্ষক দৃশ্য দেখিয়া দর্শকমাত্রেই ভীত ও বিত্রস্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে, রেলওয়ে কর্তৃপক্ষ বা রেলওয়ে পুলিশ নাকি এ সম্বন্ধে কোনও প্রতিবিধান করিতে প্রয়াস পান নাই। রেলওয়ে বিভাগে শ্বেতকৃষ্ণ ভৃত্যগণের মাসিক মাহিনার পার্থক্য অতি আশ্চর্যজনক। তাহার নমুনা এইরূপ-

www.pathagar.com

শ্বেতাঙ্গ। কৃষ্ণাঙ্গ শিক্ষানবীস ফায়ারম্যান ৩০-৫০-১০, ফায়ারম্যান ৬০-৭০-৮, ১১-১৫, সান্টার ৯০-১০০, ১৬-১৯, ড্রাইভার ১০০-২০০, ৩০-৫০, এতদ্ব্যতীত ২৫০ টাকা হইতে ৪০০ টাকার পদগুলিতে কৃষ্ণচর্ম্মীর কোনও অধিকার নাই। সাম্যের বাহার আর কি চাই। তথ্যসূত্র:[১১৫]

অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় হচ্ছে, যে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক অপশক্তি এদেশ জবর দখল করে সুদীর্ঘ ১৯০ বছরকাল আমাদের স্বতন্ত্র সভ্যতা, পদপদবী, সংস্কৃতি, কৃষ্টি, ইতিহাস ঐতিহ্যকে অবমাননা, ঘৃণা, অবজ্ঞা, উপহাস ও তুচ্ছতাচ্ছিল্য করেছে, আমাদের বাধ্য করেছে মানবেতর জীবনযাপন করতে, তাদের মনগড়া আইন দিয়ে শোষণ নির্যাতন করেছে; আমাদের স্বাধীন দেশের শাসকগোষ্ঠী সেসব আইনের অনুশীলনসহ বহু কুপ্রথা জাতির ওপর চাপিয়ে দিয়ে বলছে এটাই আইনের শাসন আর এর নামই প্রকৃত স্বাধীনতা!?

এমন কি বিশ্বের সাবেক ব্রিটিশ উপনিবেশ দেশগুলো নিয়ে গঠিত ব্রিটিশ কমনওয়েলথ এর সদস্য পদে তালিকাভুক্ত হয়ে আমাদের সদ্য স্বাধীন দেশের শাসক শ্রেণী আহ্লাদে আটখানা হয়ে গোলামী মানসিকতারও চরম পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করেছে। এ ব্যাপারে ১৯৭২ সালে দৈনিক সংবাদে প্রকাশিত খবরটি ছিল, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ আজ ৩২তম সদস্য হিসেবে কমনওয়েলথের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী আবদুস সামাদ আজাদ কমনওয়েলথে বাংলাদেশকে সদস্য পদদানের ঘোষণাকে অভিনন্দন জানিয়েছেন।[১১৬] আমাদের দেশে প্রচলিত দণ্ডবিধির প্রণেতা ও অফিস আদালতে ইংরেজি ভাষা প্রচলনকারী ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির প্রতিভূ লর্ড মেকলে সাহেব আজ থেকে ঠিক ১৭০ বছর আগে যে ভবিষ্যত বাণী করে গেছেন তা যেন আজ ফুলে ফলে পল্লবিত হয়েছে দেখা যায়। লর্ড মেকলে তখন বলেছিলেন, ব্রিটিশ শাসন কায়েমের জন্য এমন একটি শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করতে হবে যা তৈরি করবে একটি খাঁটি ভদ্রলোক শ্রেণী। এই শ্রেণী যদিও রক্তে হবে ভারতীয় কিন্তু রুচি ও সংস্কৃতিতে হবে ইউরোপীয়।[১১৭]

এক নজরে ঔপনিবেশিক বিচার ব্যবস্থার কাঠামো

১৭৭২-১৮৩৪ সালের সময় পর্বে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক বিচার ব্যবস্থা তার মৌলিক অবয়ব গ্রহণ করে। এ ব্যবস্থার মৌলিক স্তর হলো জেলা। ১৭৯৩ সালে কর্ণওয়ালিসের পরিকল্পনায় ডিস্ট্রিক্ট কোর্টগুলোর নতুন নাম রাখা হয় জেলা আদালত। জেলা আদালত ছিল জজ ও ম্যাজিস্ট্রেটের অধীনে যার হাতে ছিল একই সঙ্গে বিচার সংক্রান্ত (জজের ভূমিকায়) এবং পুলিশ সংক্রান্ত (ম্যাজিস্টেটের ভূমিকায়) ক্ষমতা। ক্ষমতার এ সম্মিলন জজ-ম্যাজিস্ট্রেটকে জেলা পর্যায়ে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ আমলায় পরিণত করে। ফলে

www.pathagar.com

রাজস্ব আদায়ের মত গুরুত্বপূর্ণ কাজের দায়িত্বে নিয়োজিত কালেক্টরের কর্তৃত্ব খর্ব হয়। ক্ষমতার এ বিন্যাস রাজনৈতিকভাবে অসুবিধাজনক বিধায় বাংলার অধিকাংশ জেলায় ১৮২৩ থেকে ১৮৩২ সালের মধ্যে এ পদ দুটিকে পৃথক করা হয়। ১৮৩৩ সালে বিচার ব্যবস্থার মাঝারি স্তর ফৌজদারি বিচারের জন্য ভ্রাম্যমাণ আদালত বিলুপ্ত করে ফৌজদারি বিচারের ভার জেলা আদালতে ন্যস্ত হয়। পরবর্তী পদাধিকার দ্বারা তাকে সেশন জজ তথা দায়রা বিচারক পদে আখ্যায়িত করা হয়। ১৮৩৩ সাল থেকে জেলা পর্যায়ে ফৌজদারি বিচার ক্ষমতা দু'শাখায় বিভক্ত করা হয়। জজের পদ থেকে পৃথক করা ম্যাজিস্ট্রেট জেলার প্রাথমিক বিচার ক্ষমতার অধিকারী হলেন। বিচারার্থে সোপর্দ করার জন্য গুরুতর অপরাধীদের জেলা জজ আদালতে প্রেরণসহ ব্যাপক ধরনের অপরাধসমূহের বিচার করার ক্ষমতা তাকে দেয়া হয়। জেলা জজ যিনি সিভিল এবং সেশন জজ কিংবা দেওয়ানি এবং দায়রা বিচারক তিনি ম্যাজিস্ট্রেট প্রেরিত আসামীদের বিচার করবেন। তাছাড়া তাকে ম্যাজিস্ট্রেট আদালতের রায় পুনর্বিচারের ক্ষমতা দেয়া হয়।

স্থানীয় পর্যায়ে তদারকের অভাব : প্রাক ঔপনিবেশিক সমাজে জমিদার এবং গ্রাম সমাজের প্রথাগত নেতৃত্ব যে চিরপ্রচলিত ভূমিকা পালন করত তা বাতিল করার ফলে যে বিশেষ পরিস্থিতি সৃষ্টি হয় তা জেলা জজ ও জেলা ম্যাজিস্ট্রেট পদ সৃষ্টি দ্বারা খুব সামান্যই পূরণ করা সম্ভব হতো। লন্ডনে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির ব্যয় সচেতন কোর্ট অব ডাইরেক্টরস-এর নির্দেশে এদেশে ঔপনিবেশিক কর্তৃপক্ষ অর্থ ব্যয় সীমিত রাখার যুক্তিতে জেলা আদালতে বিচারকের সংখ্যা বৃদ্ধি করেনি। কোম্পানির চুক্তিবদ্ধ ইংরেজ বিচারকের বদলে কম বেতনে ভারতীয়দের বিচার বিভাগের নিম্নপদে নিয়োগ দিয়ে এ সমস্যার সমাধান করা যেত। কিন্তু এই সমাধানকে ঔপনিবেশিক শাসনের প্রতিবন্ধক হিসেবে দেখা হল। ১৭৯৩-এর পরিকল্পনায় জেলা জজ কর্তৃক পাঠানো মামলা বিচারের জন্য মুনসেফ বা দেশি কমিশনারদের দায়িত্ব দেয়া হয়েছিল। ১৮০৩ সালে লর্ড ওয়েলেসলি সদর আমিন নামে নতুন অধীনস্থ বিচারকের পদ সৃষ্টি করেন এবং ১৮৩১ সালে লর্ড বেন্টিঙ্ক প্রিন্সিপ্যাল সদর আমিন নামে আরেকটি উচ্চ পদ সৃষ্টি করেন। কিন্তু ১৭৯৩ সালের পরিকল্পনা মতে মুনসেফ কিংবা পরবর্তী সদর আমিনদেরকে কোন নির্দিষ্ট এখতিয়ারধীন এলাকা দেয়া হয়নি। লর্ড মোইরার উদ্যোগে প্রণীত ১৮১৪ সালের ২৩নং বিধিতে অবশ্য এরকম একটা উদ্দেশ্য ছিল। এ রেগুলেশন ও বিধিতে মুনসেফদেরকে বিচারের জন্য নির্দিষ্ট এলাকার এখতিয়ার দেয়ার প্রস্তাব ছিল। এটা ছিল থানা এলাকা যা কর্ণওয়ালিস ১৭৯২ সালে স্থানীয় পুলিশি এখতিয়ার হিসেবে প্রতিষ্ঠা করেন। মুনসেফদেরকে স্থানীয় দেওয়ানি মামলা বিচারের ক্ষমতা প্রদান এ বিধির লক্ষ্য ছিল। ১৮১৪ সালের এ পরিকল্পনা বাস্তবায়ন হলে জেলার পরিবর্তে থানা হতো বিচার ব্যবস্থার প্রাথমিক স্তর। স্থানীয় সমাজ যেখানে সবচেয়ে প্রত্যক্ষভাবে ঔপনিবেশিক বাস্তবতার

www.pathagar.com

সম্মুখীন হয়েছে সে স্তরে শাস্তিদাতা পুলিশ দারোগার পাশাপাশি একজন বিচারবিভাগীয় কর্মকর্তার নিয়ন্ত্রণমূলক উপস্থিতি থাকত। তাই মুনসেফ, সদর আমিন ও প্রিন্সিপ্যাল সদর আমিন পদ সৃষ্টি দ্বারা জেলা পর্যায়ে থেকে স্থানীয় পর্যায় পর্যন্ত বিচার বিভাগীয় উপস্থিতির প্রসার ঘটেনি। বিচার বিভাগীয় স্তর বিন্যাসের চূড়ায় থাকল জেলা জজ। ১৮৩৪ সালের মধ্যে ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রের বিচার ব্যবস্থা বাংলায় তার মৌলিক রূপ নেয়। এ ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য ছিল স্থানীয় পর্যায়ে নিয়মিত আদালতের অনুপস্থিতি। বিচার বিভাগের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ ছিল খাজনা ও জমি নিয়ে বিবাদ সংক্রান্ত। এসব বিচার কার্যক্রম স্থানীয় তদন্তের ওপর অধিক নির্ভরশীল ছিল। কারণ কৃষিভিত্তিক বাংলায় জমির স্বত্ব সম্পর্কিত দলিলাদি পর্যন্ত ছিল না। ১৮৩৪ সালের মধ্যে বিচার ব্যবস্থার যে চরিত্র দাঁড়ায় শেষ পর্যন্ত সেটাই টিকে থাকে। ১৮৬১ সালে রাজকীয় কর্তৃত্বাধীনে কলকাতায় একটি উচ্চআদালত প্রতিষ্ঠা দ্বারা পূর্বের সর্বোচ্চ বিচার ক্ষমতা সম্পন্ন সদর দেওয়ানি ও নিযামত আদালত বিলুপ্ত করা হয়। ১৮৬৮ সালে জেলার সদর আমিনের পদ বিলুপ্ত করে প্রিন্সিপ্যাল সদর আমিনের পদকে সাবঅর্ডিনেট জজ পদে রূপান্তর করা হয়। তাদের ক্ষমতা জেলা জজের ক্ষমতার সঙ্গে সমবিস্তৃত থাকলেও জেলা জজের মতো অধস্তন আদালতকে নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা ছিল। সর্বনিম্ন স্তরে মুনসেফের আদালত এবং জেলা পর্যায়ের নিচে দেওয়ানি আদালতের কোন নির্দিষ্ট স্তর সৃষ্টি করা হলো না।

প্রশাসনিক ও ফৌজদারি বিচার ক্ষমতার একত্রীকরণ: দেওয়ানি বিচার ব্যবস্থার পাশাপাশি ফৌজদারি বিচার ব্যবস্থা সম্পূর্ণ ভিন্ন ধারায় বিকাশ লাভ করে। এক্ষেত্রে জেলা জজের অধীনে বিচার ব্যবস্থার স্তর বিন্যাসের তুলনায় ফৌজদারি বিচার ক্ষমতার দ্বিধাকরণ প্রাধান্য পায়। জেলার প্রশাসনিক প্রধান জেলা ম্যাজিস্ট্রেটকে দণ্ডদানের প্রাথমিক ক্ষমতা অর্পণ করা হয়। ফৌজদারি বিচারের ক্ষেত্রে ১৮৩৪ সাল পরবর্তীতে জেলা ম্যাজিস্ট্রেট ও দায়রা জজের ফৌজদারি বিচার ক্ষমতার বিভাজনকে শক্তিশালী করেছে। জেলা পর্যায়ের ম্যাজিস্ট্রেটের সংখ্যা বাড়িয়ে তিন শ্রেণীতে ভাগ করা হয়। পূর্ণ ক্ষমতাবান ম্যাজিস্ট্রেট, প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট ও দ্বিতীয় শ্রেণীর ক্ষমতাবান ম্যাজিস্ট্রেট। কেবলমাত্র পূর্ণ ক্ষমতাবান জেলা ম্যাজিস্ট্রেট আসামীদের দায়েরা আদালতে সোপর্দ করতে পারতেন। নিম্ন পর্যায়ের ম্যাজিস্ট্রেট আদালত দায়রা আদালতের নিয়ন্ত্রণাধীন না রেখে জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের নিয়ন্ত্রণে দেয়া হয়।

এ ঘটনা জেলা প্রশাসনের কাঠামোর ভেতর ফৌজদারি বিচার ক্ষমতার আরো বিভাজন ঘটিয়েছে। এ ক্ষেত্রে মাদ্রাজ ও বোম্বে প্রেসিডেন্সী থেকে বাংলা পৃথক ছিল। বোম্বে (বর্তমানে মুম্বাই) এবং মাদ্রাজে দায়রা আদালতে আসামীকে সোপর্দ করতে 'ক্রিমিনাল জজ'-এর একটি পদ ছিল। এই বিচারকের পদ ক্ষমতা ছিল দায়রা জজ ও ম্যাজিস্ট্রেটের ক্ষমতার মধ্যবর্তী। ১৮৬০ এবং ১৮৭০ দশকে বাংলায় ম্যাজিস্ট্রেটের হাত থেকে ফৌজদারি বিচার ক্ষমতা বাতিল করে তা সম্পূর্ণ বিচার বিভাগীয় কর্মকর্তাদের হাতে

www.pathagar.com

দেয়ার জন্য একাধিক প্রস্তাব কখনো বাস্তবায়িত হয়নি। ফলে ম্যাজিস্ট্রেট এবং দায়রা জজের মধ্যে ফৌজদারী বিচার ক্ষমতার বিভক্তি বাংলায় ঔপনিবেশিক রাষ্ট্র ব্যবস্থার অন্যতম বৈশিষ্ট হয়ে রইল।

ম্যাজিস্ট্রেটের হাতে ফৌজদারী বিচার ক্ষমতা এবং পুলিশের হাতে আদালতে সোপর্দ করতে মামলা গ্রহণ ও আসামীকে যথেচ্ছ গ্রেফতারের ক্ষমতা অর্পণ শুধু যে সমাজকে দণ্ডদাতা প্রশাসনিক কর্তৃত্বের পদতলে নিক্ষেপ করেছে তা নয়, উপরন্তু এ ধরনের ক্ষমতার নিষ্পেষণ শক্তি প্রণালীবদ্ধভাবে সমাজের বিরুদ্ধে ব্যবহৃত হয়েছে এবং বিবাদকে সমাজব্যাধিতে স্থায়ী করেছে। ফৌজদারী বিচার সম্পর্কে বিশদ সরকারি পরিসংখ্যানের দিকে তাকালে এর সত্যতা স্পষ্ট হয়। ফৌজদারী ক্ষমতার খেলো এবং বিদ্বেষমূলক ব্যবহার প্রমাণিত হয় প্রথমত সে সব মামলার শতকরা হার দ্বারা যেগুলো মিথ্যা হিসেবে তালিকাভুক্ত হয়, বিচারের জন্য আদালতে নেয়া হয়নি এবং দ্বিতীয়ত বিচারের জন্য আদালতে প্রেরিত আসামীদের মধ্যে খালাসপ্রাপ্তদের খুবই উচ্চহার দ্বারা। যে কোন একটি বছর হিসেবে ১৮৬৫ সালের পরিসংখ্যানে দেখা ফৌজদারী আইনে অভিযুক্ত এবং আদালতে বিচারার্থে সোপর্দকৃত ৪৬% আসামী প্রাথমিক সাক্ষ্য প্রমাণে খালাস পায়। এ ঘটনাকে আকস্মিক মনে করলে ভুল হবে। প্রায় পূর্ণ শতাব্দীকালের পরের বার্ষিক তথ্য থেকে একই চিত্র পাওয়া যায়।[১১৮] বেকসুর খালাসের উচ্চহার প্রসঙ্গে যেটা সবচেয়ে লক্ষণীয় সেটা কিন্তু এই নয় যে, অভিযুক্ত বিচারান্তে খালাস পেল বরং এটাই লক্ষণীয় যে, হুমকি ও হয়রানিমূলক এমন এক ফৌজদারী বিচার প্রক্রিয়া সৃষ্টি করা হয়েছে যা অভিযুক্ত মাত্রের উপরই প্রায়শ: দীর্ঘকারাবাস কিংবা জামিনের জন্য ব্যয়সাধ্য ব্যবস্থা চাপিয়ে দেয়। অন্য কথায় তাৎপর্যপূর্ণ বিষয় হচ্ছে ফৌজদারী বিচার প্রক্রিয়ার অপব্যবহারের নিয়মিত চরিত্র লাভ এবং এ ধরনের ক্ষমতা অপব্যবহারের সুযোগ সৃষ্টিতে ম্যাজিস্ট্রেট এবং পুলিশের কার্যকর সহযোগিতা দান। ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শক্তি ফৌজদারী ও দেওয়ানি বিচার ব্যবস্থাকে পৃথক করে তাদের বিচার ব্যবস্থা গড়ে তোলে। কিন্তু ফৌজদারী বিচার প্রক্রিয়ার এ ধরনের খেলো এবং বিদ্বেষমূলক ব্যবহার দ্বারা যেভাবে বিবাদের পরিমাণ বৃদ্ধি করা হয় তাতে এই পৃথকীকরণ অন্ত:সারশূন্য প্রতিপন্ন হয়।

নিশ্চিত ব্যয় অনিশ্চিত রায়ের বিচার প্রক্রিয়া : ন্যায়বিচার ব্যবস্থার তৃতীয় মৌলিক বৈশিষ্ট্যকে যথাযথভাবেই বিচার প্রক্রিয়ার রোগ নির্ণয় বিদ্যা বলা যেতে পারে। এটা দ্বারা যা বেরিয়ে আসে তা হল বিচার প্রক্রিয়ার সাথে বিচার দক্ষতার মৌলিক অসংগতি। এই অসংগতি আরো বেশি লক্ষণীয় এজন্য যে, বিচার প্রক্রিয়ার প্রতি ব্রিটিশদের মনোযোগ যত প্রণালীবদ্ধ ও বিশদ ছিল তেমন আর কোন পর্যায়ের প্রতিই ছিল না। বিচার প্রক্রিয়ার সুস্পষ্ট প্রধান দুটি ত্রুটির মধ্যে ছিল একটি আদালতের সময় সাপেক্ষ বিচার প্রক্রিয়া অপরটি আপিল প্রক্রিয়া। এ প্রক্রিয়া অন্তত দু'টি কারণ দ্বারা বিচার দক্ষতার প্রতিবন্ধক

www.pathagar.com

ছিল যথা মামলায় শুনানি খেয়ালখুশিভাবে মূলতবি রাখা এবং সাক্ষ্য প্রমাণ নেয়ার হয়রানিমূলক বিধিসমূহ। মামলার শুনানি মূলতবি রাখার ব্যাপক ব্যবস্থার পরিণতিতে বিলম্বিত বিচার প্রক্রিয়া নিয়মিত বৈশিষ্ট্যে রূপ নেয়। যে কোন একটি বছর হিসেবে ১৮৮৫ সালকে নিলে দেখা যায়, খাজনা আদায় মামলায় দু'পক্ষের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় বিচার নিষ্পত্তিতে গড়ে ৩২৬ দিন এবং যেখানে প্রতিদ্বন্দ্বিতা হয়নি সেখানে গড়ে ১৩৪ দিন সময় লেগেছে।[১১৯] এ প্রেক্ষিতে সাক্ষ্য প্রমাণ গ্রহণ সম্পর্কিত বিধিসমূহ মুলতবি রাখার ব্যবস্থার কুফলগুলোকে বহুগুণ বৃদ্ধি করে। এ ধরনের বিধিগুলো বিচার প্রক্রিয়াকে অতিরিক্ত আনুষ্ঠানিকতা নির্ভর এবং আদালতে মিথ্যা সাক্ষ্য দানকে নিত্য ঘটনায় পরিণত করতে কার্যকর ভূমিকা রেখেছে। এছাড়া আপিল করার অবাধ স্বাধীনতা এবং যে পদ্ধতিতে আপিল বিচার ক্ষমতার অধিকারি বিচারকবৃন্দ কার্য পরিচালনা করতেন তা ছিল বিচার ব্যবস্থার দক্ষতার জন্য অন্যতম গুরুতর বাধা। আপিল প্রক্রিয়ার অযথা ব্যবহারের বিরুদ্ধে কোন বাধা ছিল না। অথবা থাকলেও তা ছিল খুব সামান্য। আপিল প্রক্রিয়ার নিত্য ব্যবহার আপিল আদালতের বিপরীতে প্রথম মামলার আদালতগুলোকে গুরুত্বহীন করে ফেলে। বাংলার তৎকালীন প্রধান বিচারপতি এই পরিস্থিতিকে 'অসংশোধনীয় মন্দ' হিসেবে উল্লেখ করেন।[১২০] আপিল বিচার ক্ষমতার অধিকারী বিচারকের প্রতি বৃহত্তর ভূমিকা পালনের সুযোগ দান রায়ের মান উন্নত করেনি বরং নিম্নতর আদালতগুলোর ওপর উচ্চতর আদালতগুলোর আমলাতান্ত্রিক নিয়ন্ত্রণ জোরদার করতে মূলত সাহায্য করে। এ ব্যবস্থা বাদী-বিবাদীর ওপর ব্যয়ের নিশ্চয়তা এবং ফলাফলের অনিশ্চয়তা চাপায়। মামলা-মোকদ্দমাকে নিরুৎসাহিত করার পরিবর্তে এ বিচার প্রক্রিয়া বরং তাকে আরো উস্কে দেয়। কারণ ব্যয়ের নিশ্চয়তা দ্বারা প্রতিপক্ষের ক্ষতি সাধন অন্যদিকে ফলাফলের অনিশ্চয়তা যে কেউ ন্যায়বিচারের উদ্দেশ্যকে ব্যর্থ করে দিতে পারে।

বিচার বিভাগীয় কর্তৃত্বের দুর্বলতা : ঔপনিবেশিক শাসনকে 'আইনের শাসন' প্রতিষ্ঠা হিসেবে যেভাবে চিহ্নিত করা হয় তা বহুভাবেই সন্দেহযুক্ত। ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসন ব্যবস্থার কাঠামোগত উপাদানগুলো বিশ্লেষণ করলে এ সন্দেহ সমর্থিত হয়। ঔপনিবেশিক শাসনকে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা হিসেবে চিহ্নিতকরণের সময় যেমন রাষ্ট্র কাঠামোর মধ্যে ক্ষমতার সীমা নির্ধারণ করা হয়নি তেমনি রাষ্ট্রের আনুষঙ্গিক দক্ষতার প্রশ্নও উত্থাপন করা হয়নি। ঔপনিবেশিক রাষ্ট্র কাঠামোর ভেতর বিচার বিভাগীয় কর্তৃত্বের দুর্বলতার কারণগুলোকে এভাবে চিহ্নিত করা যায়। যথা (ক) ফৌজদারী বিচার ক্ষমতার তাৎপর্যপূর্ণ অংশ আইন দ্বারা সরকারের নির্বাহী বা প্রশাসনিক শাখায় অর্পণ করা (খ) বিচারের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের উপস্থিতির প্রাতিষ্ঠানিক অপর্যাপ্ততা, যেমন চাহিদার তুলনায় অপ্রতুল আদালতের সংখ্যা এবং বিচার প্রক্রিয়ায় প্রশাসনিক পুলিশী উপস্থিতির প্রাধান্য (গ) প্রশাসনিক নীতিকে অধিক গুরুত্ব দিয়ে বিচার বিভাগে আমলাতান্ত্রিক স্তর বিন্যাস (ঘ) বিচার ব্যবস্থার নিজ বিবেচনা অনুযায়ী সিদ্ধান্ত গ্রহণের সীমাবদ্ধতা এবং (ঙ) বিচার বিভাগের প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণ।

www.pathagar.com

বিচার ব্যবস্থার কর্তৃত্বের ওপর প্রশাসনিক প্রাধান্য প্রথমত ফৌজদারী বিচার ক্ষেত্রে সুস্পষ্ট। প্রাথমিক ফৌজদারী বিচার ক্ষমতা জেলা জজ এর হাতে না দিয়ে জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের হাতে দেয়া হয় যিনি জেলা পুলিশের নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনার অধিকারী। জেলা ম্যাজিস্ট্রেট অবশ্য বিচার কাজ করার চেয়ে অধীনস্থ ম্যাজিস্ট্রেটদের বিচার সংক্রান্ত কাজের তদারকিই করতেন যাদের অনেকে আবার বিচার কাজের সাথে প্রশাসনিক কার্য একত্রে সম্পাদন করতেন। অর্থাৎ প্রাথমিক ফৌজদারী আদালতগুলো ছিল সরকারের নির্বাহী শাখার নিয়ন্ত্রণাধীন। দেওয়ানি আদালতগুলোকে ফৌজদারী মামলা গ্রহণ ও বিচারের ক্ষমতা দেয়া হয়নি। ঔপনিবেশিক আইন দ্বারা ফৌজদারী আইনের কার্যপরিধি বিরাটভাবে বিস্তৃত হওয়ায় ফৌজদারী বিচারে নির্বাহী কর্তৃত্বের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয়। এ অবস্থায় ব্রিটেনের উদাহরণ দিয়ে বলা যায় যে, সেখানে বহু ধরনের ছোটখাটো অপরাধ দেওয়ানী মামলার বিষয় হিসেবে তালিকাভুক্ত হতো সেগুলোই এখানে ফৌজদারী অপরাধ হিসেবে তালিকাভুক্ত হতো। এদেশে এভাবে বিচার ব্যবস্থার ওপর প্রশাসনের প্রাধান্যকে আইনে দ্বিগুণভাবে পবিত্র করে নেয়া হয়েছে। বিচার বিভাগীয় কর্তৃত্বের এই দুর্বলতা ছিল প্রধানত রাষ্ট্রের বিচার বিভাগীয় উপস্থিতির তুলনামূলকভাবে প্রাতিষ্ঠানিক অপর্যাপ্ততার কারণে। ঔপনিবেশিক কর্তৃত্ব বিচারের ক্ষেত্রে পূর্ববর্তী সমাজ ও রাষ্ট্রের সকল ভূমিকা নিজে দখল করেছিল এটা স্মরণে রাখতে হবে। ঔপনিবেশিক সমাজে কেন্দ্রীভূত শাসন কর্তৃত্বের যে বিচার সংক্রান্ত ভূমিকা ছিল এবং সাধারণভাবে সামাজিক বিবাদ এবং বিশেষত ভূমি ও ভূমি খাজনা সম্পর্কিত বিবাদ নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে জমিদার এবং গ্রাম সমাজের নেতৃত্বের যে বিচারমূলক ভূমিকা ছিল ঔপনিবেশিক কর্তৃত্ব এই উভয় ভূমিকাই নিজে অধিকার করে। আর সি দত্ত ১৮৭৪ সালের বাস্তবতা তুলে ধরে লিখেছেন, প্রয়োজন অনুযায়ী কি আদালতগুলোর সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছিল? যন্ত্রণাদায়ক অভিজ্ঞতা ভিন্নটাই প্রমাণ করে। গরীব লোকেরা সামান্য জমির টুকরো নিয়ে নিজেদের মধ্যে কলহ করে, বিচারের জন্য দেওয়ানি আদালতে না গিয়ে তাদের দেওয়ানি মামলার বিবাদকে ফৌজদারী মামলার চেহারায় সাজিয়ে ফৌজদারী আদালতের শরণাপন্ন হতো। কারণ দেওয়ানি আদালত ছিল সংখ্যায় নগণ্য। ফলে সেখানে কাজ হতো খুব ধীরে। কিন্তু ফৌজদারী আদালতেও গিয়ে লাভ ছিল না। সেখানেও অপেক্ষা করে থাকত বিলম্ব, ব্যয় এবং দুর্ভোগ।[১২১] ওই সময় বাংলা প্রেসিডেন্সীতে ১ লাখ ৬৫ হাজার ৪৯১ বর্গমাইল এলাকায় মাত্র ২৫৮টি দেওয়ানি এবং ৩৬৬টি ফৌজদারী আদালত ছিল।[১২২] বিচার ব্যবস্থার সাংগঠনিক দুর্বলতার আরেকটি মাত্রা ছিল আমলাতান্ত্রিক স্তর বিন্যাসের প্রাধান্য। এর পরিণতিতে উচ্চ আদালতে অত্যন্ত ব্যাপক নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা অর্পিত হয়। এটা ছিল উচ্চ আদালত কর্তৃক অধীনস্থ বিচারকদের তিরস্কার করা, সকল বিষয়ে তাদের কাছ থেকে কার্যাবলীর বিবরণ চাওয়া, বিজ্ঞপ্তি প্রেরণ করা, কিছু ক্ষেত্রে কার্যপ্রণালী সংক্রান্ত নিয়মাবলী তৈরি করা এবং সংক্ষেপে অধস্তন বিচারকদের সঙ্গে সম্পূর্ণরূপে

www.pathagar.com

অধীনস্থ কর্মকর্তা সমতুল্য আচরণ করার ক্ষমতা। এ ব্যবস্থার বিরুদ্ধে আপত্তি হচ্ছে এটা প্রশাসনিক এবং বিচার বিভাগীয় সম্পর্কের মধ্যে তালগোল পাকিয়ে ফেলতে চায়। বহু সংখ্যক বিজ্ঞপ্তি থাকে যেগুলো দ্বারা ম্যাজিস্ট্রেটরা তাদের বহু বিবরণ প্রস্তুত করেন। এ সব বিজ্ঞপ্তির কিছু সংখ্যক এমনভাবে উদ্ভাবিত যা ম্যাজিস্ট্রেটদের জন্য অনাবশ্যক ও নিদারুণ সমস্যা সৃষ্টি করে। বিজ্ঞপ্তিগুলো ব্যাখ্যা, সতর্কীকরণ এবং কার্যপ্রণালীর নিয়মাবলীকে একত্রে এভাবে মিলিয়ে ফেলে যে তাতে করে বিরাট রকম বিভ্রান্তি সৃষ্টি হয়।

মোট কথা এটা খুবই কাম্য যে বিচারকদের ওপর প্রশাসনিক এবং বিচার বিভাগীয় নিয়ন্ত্রণ পৃথক হওয়া উচিত। কার্যপ্রণালী সংক্রান্ত সম্পূরক নিয়মাবলী কেবলমাত্র জরুরি ক্ষেত্রে আসা উচিত এবং ঐগুলোকে ব্যাখ্যা, উপদেশ বা সতর্কীকরণের সঙ্গে গুলিয়ে ফেলা উচিত নয়।[১২৩] ফৌজদারী বিভাগে কমপক্ষে ১৭টি তালিকা খাতা এবং ফৌজদারী ও দেওয়ানি বিভাগে উভয়ের জন্য অভিন্নভাবে ১২টি তালিকা খাতা রয়েছে। এটা বিস্ময়কর যে ইংল্যান্ডের কোন আদালতে এত পূর্ণাঙ্গভাবে ও বিশদভাবে কোন কিছুর বিবরণ রাখা হয় না। এই পদ্ধতির দু'টি ভিন্ন উদ্দেশ্য হচ্ছে, পরিসংখ্যান সংগ্রহ করা এবং বিচারকদের কার্যপ্রণালীর ওপর নিয়ন্ত্রণ রাখা। এটা স্পষ্ট যে পরিসংখ্যান সংগ্রহ যেখানে উদ্দেশ্য সেখানে এই কাজের জন্য ম্যাজিস্ট্রেট যথাযথ কর্মকর্তা নন।

আর যেখানে ম্যাজিস্ট্রেটদের কাছ থেকে কাজের বিবরণ নেয়ার উদ্দেশ্য হল তাদের ওপর নিয়ন্ত্রণ আরোপ করা সেখানে তারা এ ধরনের বিবরণ যত কম লিখেন তত ভাল। বিচারকগণ তাদের পদোন্নতির সম্ভাবনা বৃদ্ধির জন্য বিবরণ পাঠাবার দিকে লক্ষ্য রেখে কাজ করেন।[১২৪] উচ্চাদালত যেভাবে অধস্তন বিচারকদের ওপর প্রশাসনিক কর্তৃত্ব প্রয়োগ করে তারই প্রতিবিম্ব দেখা যায় জেলায়, যেখানে জেলা জজ তার অধীনস্থ দেওয়ানি আদালতের বিচারকবৃন্দের ওপর কর্তৃত্ব প্রয়োগ করেন এবং জেলা ম্যাজিস্ট্রেট তার জেলার অধীনস্থ ম্যাজিস্ট্রেট আদালতগুলোর ওপর এমনকি আরো বেশি প্রত্যক্ষ প্রশাসনিক কর্তৃত্ব প্রয়োগ করেন। এভাবে যে ঘটনা ঘটে তা হল বিচার ব্যবস্থার প্রতিটি স্তরকে প্রশাসনিক কর্তৃত্বাধীনে নেয়া। অবশ্য এর অর্থ যদি এই হয় যে বিচার বিভাগের ওপরতলার ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত হল তবে সে ক্ষেত্রেও ওপরতলার ক্ষমতার এই কেন্দ্রীভবন বিচার বিভাগের স্বাধীনতার অভাবে ব্যাহত হল।

উচ্চআদালতের ল' রুলিংস তথা 'নজির' এর তাত্ত্ব : ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক বিচার ব্যবস্থায় বিচার বিভাগের স্বাধীনভাবে বিচার করার সুযোগ এবং আইনের নিজস্ব ব্যাখ্যাদানের ক্ষমতা দারুণভাবে সীমাবদ্ধ। এই সীমাবদ্ধতার উৎস হচ্ছে নিম্ন আদালতে মামলার রায় প্রদানের ক্ষেত্রে উচ্চআদালতের লং 'রুলিংস বা পূর্ব নজির তথা অতীত মোকদ্দমাদির নজির বলে আইনগত প্রশ্নের মীমাংসা দ্বারা খুব বেশি প্রভাবিত হওয়া। দেওয়ানি এবং ফৌজদারী আদালতে এই প্রভাব ভিন্নভাবে কাজ করত। দেওয়ানী

www.pathagar.com

আদালতের ক্ষেত্রে প্রশাসনিক সরকারের দু'টি স্ববিরোধী কঠোর সিদ্ধান্ত দ্বারা বিচার বিভাগের কর্মক্ষমতাকে দারুণভাবে সীমাবদ্ধ করা হয়। একদিকে সরকার এমন ব্যবস্থা করে যাতে উচ্চআদালত এবং সমস্ত জেলা আদালতের বিচার সংক্রান্ত সিদ্ধান্তসমূহের মাসিক বিবরণ প্রকাশ পায়। অন্যদিকে সরকার ১৮৫০ সাল থেকে নতুন ব্যবস্থানুযায়ী সর্বোচ্চ আদালত বাছাই এর মাধ্যমে যে সব মামলার রায়কে উল্লেখযোগ্য বিবেচনা করত সেই রায়গুলোকে নিম্নতর আদালতের বিচারকার্যে সহায়তাদানের জন্য প্রকাশ করত।

সরকারের এই স্ববিরোধী সিদ্ধান্তের ফল দাঁড়ায় এই যে সমস্ত পূর্ববর্তী বিচারে রায়ই এখন শক্তিশালী নজির হল। এভাবে অধস্তন আদালতের বিচারকগণ এখন এমন এক পরিস্থিতির সম্মুখীন হলেন যখন তারা যে স্পষ্ট রায়ই দান করুন না কেন তখন আইনজীবীরা বিভিন্ন সংখ্যক পূর্ববর্তী 'নজির' উল্লেখ করে তাকেই বাধা দেয়া শুরু করেন। এ রকম পরিস্থিতিতে বিচারকগণ দেখলেন এ থেকে পরিত্রাণের সর্বশ্রেষ্ঠ উপায় হলো স্পষ্ট ভাষায় রায়দানের চেষ্টা না করা, বরং অস্পষ্ট এবং সিদ্ধান্তহীন বাক্যে রায় দান করা। বিচার বিভাগের স্বাধীনভাবে রায় দানের ক্ষমতা এভাবে খর্ব করা হয়েছে। আর নজিরের বাধ্যবাধকতা দ্বারা নিরুৎসাহিত করা হয়েছে অধস্তন বিচারকদের সৃজনশীলতা। ফৌজদারী বিচার ক্ষেত্রে পরিস্থিতিটা ভিন্ন। এখানে প্রাথমিক ফৌজদারি আদালতের ওপর কর্তৃত্বের অধিকারী বিচার বিভাগের নির্বাহী শাখা অর্থাৎ উচ্চ আদালত ও জেলা বিচারকগণ। এ কর্তৃত্ব সীমিত ছিল ম্যাজিস্ট্রেটদের রায় পুনর্বিচার এবং জেলার নির্বাহী প্রধান কর্তৃক বিচারের জন্য প্রেরিত গুরুতর অপরাধের শুনানির মধ্যে। এ ক্ষেত্রেও বিচারের রায় পূর্ব নজির দ্বারা বন্দি ছিল।

কিন্তু দেওয়ানি আদালতের মতো না হয়ে এক্ষেত্রে পূর্ব নজির হিসেবে পূর্ববর্তী কোন কোন রায় গ্রহণযোগ্য সে সম্পর্কে খুব নির্দিষ্টভাবে বলা ছিল। এসব রায় তৈরি হয়েছে নির্বাহী বা প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষের তৈরি নজির দ্বারা। ১৮৬০ সালের দণ্ডবিধি তথা 'ইন্ডিয়ান পেনাল কোড' একটি সংবিধিবদ্ধ গ্রন্থ এবং বিচারকৃত মামলাসমূহের একটি সংকলন। কিন্তু এটা করেছিলেন তারা, যারা আইন তৈরি করেছিলেন, বিচারকবৃন্দ নন। অর্থাৎ ফৌজদারী মামলার বিচারক্ষেত্রে এটা করা হয়েছে নির্বাহী সরকার কর্তৃক পূর্ব নজির বাছাই করে আইন প্রণয়ন দ্বারা। বিচার বিভাগীয় কর্তৃত্বের দুর্বলতার শেষ মাত্রা বিচার বিভাগের প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণের সঙ্গে সম্পর্কিত। ১৭০১ সালের এ্যাক্ট অব সেটেলমেন্ট বা বন্দোবস্ত আইনে ইংল্যান্ডে যেখানে কোন বিচারককে পার্লামেন্টের উভয় সভার সম্মতি ছাড়া তার পদ থেকে অপসারণ করা যেতনা সেখানে ভারতে উচ্চ আদালতের বিচারককে রাজ সরকার কর্তৃক অপসারণ করা যেত। কারণ এখানে ১৮৬১ সালের উচ্চ আদালত আইন এবং ১৯১৫ সালের ভারত সরকার আইন অনুযায়ী বিচারক মহামান্য রাজা বা রানীর ইচ্ছা অনুযায়ী চাকরি করতেন।[১২৫] ভারতের জন্য ব্রিটিশ রাষ্ট্র সচিবের কর্তৃত্বাধীন বাছাই করা এক আমলাতান্ত্রিক বাহিনী হিসেবে সংগৃহীত অভিন্ন

www.pathagar.com

একদল কর্মকর্তার মধ্যে প্রশাসনিক ও বিচারবিভাগীয় পদসমূহ বিনিময়যোগ্য ছিল। এ ব্যবস্থার ক্ষতিকর দিক সম্পর্কে ১৮৬৮ সালে ভাইসরয়ের পরিষদ সদস্য, জুরিস্ট এবং আইন সদস্য হেনরী মেইন তার কার্যবিবরণীতে উল্লেখ করেন, এটা খুব বিতর্কমূলক কথা যে বিচার দক্ষতার জন্য প্রশাসনিক প্রশিক্ষণ অত্যাবশ্যক। পুডিং ভাল হয়েছে কিনা তার প্রমাণ আহারে। আমি মনে করি সিভিলিয়ান কিংবা ব্যারিস্টার যাই হোক না কেন বাংলা এবং উত্তর পশ্চিমের উচ্চ আদালতের প্রায় সকল বিচারকের ধারণা হল যে জেলা বিচারকের বিরাট সংখ্যাগুরু অংশই লজ্জাজনকভাবে অযোগ্য। আমি প্রশাসনিক প্রশিক্ষণের মূল্যকে খাটো করে দেখিনা। কিন্তু এই ধরনের প্রশিক্ষণ থেকে টেকসই বিচার কিংবা আদালতি অভিজ্ঞতা আসে এমন ধারণাকে আমি একেবারে অযৌক্তিক মনে করি। আমার মনে হয়েছে এখানে বিচার এবং প্রশাসনিক কার্যাবলীর মধ্যে বিনিময় এই দুই বিভাগের কৃতিত্বের জন্য ধ্বংসাত্মক হয়েছে।[১২৬] ১৮৬০ এবং ৭০ দশকে বিষয়টি নিয়ে দীর্ঘ বিতর্ক চললেও একটা পৃথক মর্যাদাবান বিচার বিভাগ আর প্রতিষ্ঠিত হলনা। বরং তার পরিবর্তে ক্যাম্পবেলের প্রস্তাবানুযায়ী ১৮৭৬ সাল থেকে সমান্তরাল পদোন্নতির ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হল; যার দ্বারা একটা নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত সিভিল সার্ভিসের দুই শাখার যে কোন একটি বেছে নিতে দেয়া হল। এভাবে সিভিল সার্ভিসের বিভক্তি দ্বারা প্রচলিত ব্যবস্থার কোন বিকল্প দেয়া হয়নি। প্রাদেশিক সরকার নিয়োগদান, বদলি এবং পদোন্নতি দ্বারা বিচারকদের নিয়ন্ত্রণ করতে যদিও এসব বিষয়ে উচ্চআদালতের সাথে আলোচনা করতে পারত। এভাবে চলে আসা প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণে বিচার বিভাগের স্বাধীনতার বিতর্কটি চাপা পড়ে যায় যখন ১৯১৯ সালে ভারত শাসন আইন অনুযায়ী সাংবিধানিক সংস্কারের ফলে উচ্চ আদালতের প্রশাসনিক ও আর্থিক ক্ষমতা স্থানীয় সরকারের সম্মতি সাপেক্ষে হল। ফলে বিচার বিভাগের স্বাধীনতা যেটুকু ছিল তাও হারাল।

আইনের শাসনের অন্ধকার দিক : ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক রাষ্ট্র ব্যবস্থা তার বিচার বিভাগের বিরাট রকম দুর্বলতা দ্বারা বিশেষভাবে চিহ্নিত। বেসামরিক শাসন ব্যবস্থায় শাস্তিদাতা প্রশাসনিক পুলিশ কর্তৃত্বের বিপরীতে বিচার বিভাগ ছিল দুর্বল। প্রশাসনিক পুলিশ কর্তৃত্বের এই আধিপত্য গড়ে উঠেছিল যেসব ভিত্তিতে তা হচ্ছে, বিচার বিভাগীয় উপস্থিতির তুলনায় কাঠামোগতভাবে পুলিশের গভীরতর উপস্থিতি, ফৌজদারী বিচার এবং প্রশাসনিক কার্যের সম্মিলন, ফৌজদারী আইনের ব্যাপক প্রয়োগের সুযোগ এবং ১৮৫৯ সাল থেকে শুরু করে পরবর্তীকালে জেলায় দেওয়ানি বিচার ছাড়া আর সকল কার্যক্ষমতা একটিমাত্র নির্বাহী প্রধান অর্থাৎ সর্বব্যাপী জেলা কর্মকর্তার হাতে কেন্দ্রীকরণ।

রাষ্ট্রক্ষমতার এই গতিধারায় আইন দ্বারা পবিত্রকৃত এক প্রশাসনিক স্বৈরতন্ত্রের চিত্রই ফুটে ওঠে। জাতীয়তাবাদী সংগ্রামের সূচনাপর্ব থেকে সুনির্দিষ্ট দাবি ছিল ঔপনিবেশিক শাসনের অবিচ্ছেদ্য অংশ জেলা প্রশাসনের কাঠামোর পরিবর্তন। প্রথমত প্রশাসনিক এবং ফৌজদারী বিচার বিভাগের পৃথকীকরণ, দ্বিতীয়ত স্বায়ত্বশাসিত সংস্থাসমূহের প্রসার

www.pathagar.com

ঘটানো। কিন্তু এ দাবি পূরণ করা হয়নি। এ দাবির পক্ষে যুক্তি ছিল যে প্রশাসন এবং ফৌজদারী বিচার ব্যবস্থার সম্মিলনের কার্যত অর্থ হলো পুলিশের তদন্ত, ম্যাজিস্ট্রেটের জিজ্ঞাসা এবং ফৌজদারী আদালতের বিচার ঘনিষ্ঠভাবে সংযুক্ত এবং প্রায়শই এক ব্যক্তির মধ্যে সমন্বিত হয়। আদালতে অভিযুক্তকারী এবং বিচারকের কাজের মধ্যে এই আইনি সম্মিলনের মধ্যে রয়েছে শাস্তিদাতা শক্তি যাকে প্রশাসনিক স্বৈরতন্ত্র হিসেবে অভিহিত করা যায়। এ অবস্থা পরিবর্তনে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের চাপের মুখে ঔপনিবেশিক শাসকবর্গ এমন চাতুর্যপূর্ণ পদক্ষেপ নিল যাতে নির্বাচিত আইন সভার জন্য সীমিত রাজনৈতিক সুযোগ দেয়া হল। কিন্তু জেলার বিচার এবং বিভিন্ন কার্যসংক্রান্ত কর্তৃপক্ষের ওপর জেলা প্রশাসন এবং প্রশাসনিক-পুলিশী কর্তৃপক্ষের শাস্তিদানমূলক আধিপত্য বহাল রাখা হল। এভাবে প্রশাসনিক স্বৈরতন্ত্রের মূলনীতিতে কোন ছাড় না দিয়ে জাতীয়তাবাদী স্বশাসনের আন্দোলনের দাবিতে বিভিন্ন স্তরে কিছুটা ছাড় দেয়া হয়েছিল। প্রাদেশিক ও কেন্দ্রীয় আইনসভায় শাসনমূলক ভূমিকা যখন ক্রমাগতভাবে মেনে নেয়া হচ্ছিল তখন ১৯১৯ সালে ভারত শাসন আইন দ্বারা সম্পাদিত সাংবিধানিক সংস্কারের নির্দিষ্ট চরিত্র দ্বারা বেসামরিক শাসনে আমলাতান্ত্রিক আধিপত্য রক্ষা করা হল। এ আইন দ্বারা সরকারি কার্যাবলী 'সংরক্ষিত' এবং 'হস্তান্তরিত' এ দুভাগে বিভক্ত হল। ব্রিটিশ রাষ্ট্র সচিবের কর্তৃত্বাধীনে সংরক্ষিত করা হয় পুলিশ ও জেলা প্রশাসনের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটগণ। অন্যদিকে শিক্ষা, কৃষি, স্বাস্থ্য, শিল্প, স্থানীয় স্বশাসন তথা জনকল্যাণ ও উন্নয়নমূলক ক্ষেত্রগুলোকে নির্বাচিত মন্ত্রিসভার নিয়ন্ত্রণে 'হস্তান্তরিত' ক্ষেত্র হিসেবে দেয়া হয়। এভাবে নির্বাচিত আইন সভার কর্তৃত্ব থেকে প্রশাসনকে বিচ্ছিন্ন করে রাখা হয়; রাজনৈতিক নিয়ন্ত্রণের বাইরে এই ক্ষমতার অবস্থান। কালক্রমে হস্তান্তরিত জেলা কর্মকর্তা মন্ত্রিসভার নিয়ন্ত্রণাধীন হলেও তার জবরদস্তিমূলক ক্ষমতার হ্রাস সাধনে সামান্যই ভূমিকা রাখতে পেরেছে। এভাবে ১৯১৯ সালের আইনগত সংস্কার দ্বারা প্রাদেশিক পর্যায়ে গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক ভূমিকা পালনের সুযোগ সৃষ্টি করা হলেও ঔপনিবেশিক শাসনের অপরিহার্য অংশ জেলা প্রশাসন ব্যবস্থার সংস্কারের জন্য খুব কমই করা হল। আর এভাবে ঔপনিবেশিক শাসন অবসানের পর ভারত ও পাকিস্তান রাষ্ট্র দু'টি এবং পরবর্তীকালে বাংলাদেশ রাষ্ট্র অপরিবর্তিত উত্তরাধিকার হিসেবে লাভ করে জেলা প্রশাসন ব্যবস্থাসহ বিচার ও বিভিন্ন বিভাগসমূহ আর জনগণকে দণ্ডদান ক্ষমতার অধিকারী প্রশাসনিক পুলিশী কর্তৃত্বের একচ্ছত্র আধিপত্য।[১২৭]

মনীষীরা যা বলেছেন–

প্রাচীন দার্শনিক এরিস্টটল মানুষকে সমাজে টিকিয়ে রাখতে আইনের প্রয়োজনীয়তার কথা বলেছেন। তিনি আইনকে সাংবিধানিক, ফৌজদারী, দেওয়ানি ও আন্তর্জাতিক

www.pathagar.com

আইনে বিভক্ত করেছেন। তবে তিনি সব মানুষ সমান একথা বিশ্বাস করতেন না। তার মতে, মানুষের অধিকারে তারতম্য আছে। তাই বিচারের লক্ষমাত্রা সমতাবিধান হওয়া উচিত নয়। তিনি বলেন, পিতা ও সন্তান এবং দাস ও প্রভুর অধিকার সমান নয়। তাই বিচারকের কাজ হবে সাম্যের ভিত্তিতে নয় অধিকারের ভিত্তিতে যার যা প্রাপ্য তাকে তাই দিয়ে দেয়া। ৪২৭ খৃষ্টপূর্বাব্দে গ্রীসের মহান দার্শনিক প্লুটো বলেছেন, ন্যায়বিচারের এক রূপ আর অবিচারের শতরূপ। এ কারণেই সুবিচার অপেক্ষা অবিচার করা বেশি সহজ। মহামতি প্লেটো যখন সাম্যবাদের পক্ষে বলেন, তখন তাঁর শিষ্য এরিস্টটল ক্রুদ্ধ হয়ে বলেন, তাতে মানুষের অলসতা বৃদ্ধি পাবে। তিনি বলেন, যারা ক্রীতদাস তারা জন্মগতভাবেই হীন এবং তাদের রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা অর্জনের কোন অধিকার নেই। রাষ্ট্রের কর্তব্য আইনের প্রতি মানুষের এই শ্রদ্ধা বিশ্বাসকে বাড়িয়ে তোলা। এরিস্টটলের মতে, যারা শারীরিক পরিশ্রম করে তাদের নাগরিকত্ব পাওয়ার অধিকার নেই। তিনি আরো মনে করতেন, কেবল দার্শনিক ও বিত্তশালী ভদ্রলোকই রাষ্ট্র পরিচালনার অধিকারী। প্রাচীনকালের বিশ্ব বিখ্যাত দার্শনিক পিথাগোরাস ছিলেন শান্তিবাসী ও সাম্যবাদী। ৪৬০ খৃষ্টপূর্বে দার্শনিক দিমোক্রিতুস বলে গেছেন, সংযম ও আইন অনুসরণ করার প্রবৃত্তি মানুষকে মহৎ করে। মানুষ আইন মানবে, বিবেকের নির্দেশে। তিনি বলেন, দুষ্টের দমনের ক্ষেত্রে আইন প্রয়োগে শৈথিল্য অগ্রাহ্য করতে হবে। মনীষী প্লুটাস বলেন, যেখানে ন্যায়বিচার আছে সেখানে স্বাধীনতা আছে। কবি ও দার্শনিক শেখ সাদী বলেছেন, কোন জাতির বিচারকরা যদি দুর্নীতিগ্রস্ত হয়ে পড়ে তাহলে সে জাতির পতন অবশ্যম্ভাবী। ইংরেজ দার্শনিক টমাস ফুলার বলেছেন, বিচার পদ্ধতির ক্ষেত্রে অনন্তকাল ধরে অনুসৃত অনমনীয়তা বস্তুত অবিচারেরই নামান্তর। ফরাসী দার্শনিক আনাতোলে ফ্রঁস বলেছেন, বৈষম্যহীন ভাল আইন মানুষকে সুপথে পরিচালিত করে। বিষপানে মৃত্যুদণ্ডাজ্ঞা প্রাপ্ত বিশ্ববিখ্যাত প্রাচীন গ্রীসের দার্শনিক ও দর্শন শাস্ত্রের জনক 'সক্রেটিস' হেমলক বিষের পেয়ালায় চুমুক দেয়ার আগে বলেছিলেন, যদিও তাকে এই দণ্ড অন্যায়ভাবে দেয়া হয়েছে তবুও প্রত্যেকের রাষ্ট্রীয় আইন মান্য করা উচিত। মার্কিন কৃষ্ণাঙ্গ জননেতা মার্টিন লুথার কিং বলেছেন, একটি অবিচার সমগ্র সুবিচারের প্রতি হুমকিস্বরূপ। মনীষী ম্যাসিঞ্জার বলেছেন যে দেশে ন্যায়বিচার নেই সে দেশে সমস্যারও সমাধান নেই। মনীষী আবুল ফজল বলেছেন, যে আইনের দ্বারা সমাজ শাসিত সে আইন যদি সজীব না হয়, তাহলে আইন তার সার্থকতা হারিয়ে ফেলে, আইন যদি সচল ও সজীব জীবনের অংশ না হয় তাহলে প্রাণহীন যন্ত্রের বেশি আর তার মূল্য থাকে না। খৃষ্টপূর্ব ৫৯৪ সালে এথেন্সের মনীষী সোলন বলেছেন, আইনের নামে নির্যাতন করার চেয়ে জঘন্যতম নির্যাতন আর নেই। মনীষী আবদুর রহমান শাদাব বলেছেন, মানুষ অন্যায় করে সত্য কিন্তু ন্যায়ের ধারণাকে সে বিসর্জন দিতে চায় না। আইন সার্থক হয় যদি অপরাধীরাও সেই আইনের প্রতি আস্থাবান থাকে। পাঠান সম্রাট শেরশাহ বলেছেন, সরকারের স্থিতিশীলতা নির্ভর করে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার ওপর।

www.pathagar.com

তবে সব রাখঢাক বাদ দিয়ে পাশ্চাত্যের কবি হেসিয়াড মানব রচিত আইন আদালতে দুর্বলের প্রতি শক্তিমানের একটি যুক্তির কথা অদ্ভুতভাবে প্রকাশ করেছেন। তিনি একটি রূপক গল্পের মধ্যে বলেন, 'একটি বাজপাখি একটি সুকণ্ঠি ভরত পাখিকে ছোঁ মেরে আকাশে তুলে নিয়ে গেছে। হতভাগা ভরত পাখি নিরুপায় হয়ে আত্মদান করেছে। বাজপাখি তখন বলছে কাঁদো কেন হে ভরত। যে দুর্বল সে আত্মসমর্পণ করবে শক্তিমানের কাছে। আত্মসমর্পণ করলে অনেক বেদনা থেকে মুক্তি পাওয়া যায় অন্যথায় অত্যাচারে অপমানে জর্জরিত হতে হয়।' আজ দেশের আইন আদালতে হাড় কঙ্কালসার ফরিয়াদী মানুষের ভিড় দেখলে কবি হেসিয়াডের ভরত পাখির পরিণতির কথা যে কারুর মনেই উঁকি দিতে পারে।

তথ্যসূত্র

১. পিএম জৈন: আউট লাইন অব ইন্ডিয়ান লিগ্যাল হিস্টোরি-৩য় সংস্করণ, পৃষ্ঠা ৪০-৪১।

২. কার্ল মার্কস : ভারতীয় ইতিহাসের কালপঞ্জি পৃষ্ঠা-৯২, ৯৩, ৯৪।

৩. প্রাগুক্ত : কার্ল মার্কস : পৃষ্ঠা ৯২, ৯৩, ১১৩।

৪. লেটার্স অব লর্ড হেস্টিংস-গভর্নর জেনারেল : ৬ ডিসেম্বর ১৭৭৩।

৫. দৈনিক মানবজমিন : উপসম্পাদকীয়, ২০ ডিসেম্বর ২০০০।

৬. ভবেশ রায় : বিলিভ ইট অর নট, পৃষ্ঠা-২৫২।

৭. দৈনিক ভোরের কাগজ : ২৯ জানুয়ারি ২০০৬।

৮. লর্ড মেফিউস : ইম্পিচমেন্ট অব ওয়ারেন হেস্টিংস, কিরনচন্দ্র রায় চৌধুরী : ভারতের ইতিহাস, তৃতীয় খণ্ড, পৃ: ৯৭, ৯৮, ১১৩, দৈনিক প্রথম আলো, ২৬ সেপ্টেম্বর ২০০৫।

৯. প্রাগুক্ত : কার্লমার্কস, পৃ: ১১৩, ১১৪।

১০. এইচ উইলিয়াম মরলি : দি এডমিনিস্ট্রেশন অব জাস্টিস ইন ব্রিটিশ ইন্ডিয়া, পৃ: ৪৫-৪৬।

১১. কিরন চন্দ্র চৌধুরী : ভারতের ইতিহাস কথা, পৃ: ৯৬।

১২. প্রাগুক্ত : মরলি, পৃ: ৪৬।

১৩. কেজে মিত্তাল : ইন্ডিয়ান লিগ্যাল হিস্টোরি, পৃ: ৩৮।

১৪. প্রাগুক্ত : কিরণ চন্দ্র চৌধুরী, পৃ: ৯৬।

১৫. প্রাগুক্ত : কার্ল মার্কস, পৃ: ৯৫।

১৬. সিরাজুল ইসলাম : হিস্টোরি অব বাংলাদেশ, পৃ: ১৬২-৬৩।

১৭. প্রাগুক্ত, মরলি, পৃ: ৪৯-৫০।

১৮. প্রাগুক্ত : মরলি, পৃ:-১৭।

১৯. পিএম জৈন : আউট লাইন অব ইন্ডিয়ান লিগ্যাল হিস্টোরী, পৃ: ১৫৩।

২০. প্রাগুক্ত : মরলি, পৃ: ৫২।

www.pathagar.com

২১. প্রাগুক্ত : জৈন, পৃ: ১৬৩।
২২. প্রাগুক্ত : জৈন, পৃ: ১৭১।
২৩. প্রাগুক্ত : মরলি, পৃ: ৫৬।
২৪. প্রাগুক্ত : মরলি, পৃ: ৫৬।
২৫. প্রাগুক্ত: মরলি, পৃ: ৫৭ ও ১৮০।
২৬. প্রাগুক্ত : জৈন, পৃ: ১৮২।
২৭. প্রাগুক্ত : জৈন, পৃ: ২০২।
২৮. প্রাগুক্ত : মরলি, পৃ: ৫৯, ৬০, ৭৭ ও ৭৮।
২৯. দিনাজপুর রেভিনিও বোর্ডের কাছে কালেক্টরের পত্র: ১০ জুলাই ১৮১১, বোর্ড অব রেভিনিও প্রসিডিংস ৩১ ডিসেম্বর ১৮১১, নং-৫।
৩০. জর্জ ডডওয়েল মিনিট : ৭ জুন ১৮১১, বোর্ড অব রেভিনিউ প্রসিডিংস, ৭ জুন ১৮১১, নং-১০৭।
৩১. বেঙ্গল রেভিনিও কনসাল্টেশনস : ৮ মার্চ ১৮২৭, পৃ: ১২৩, ১২৪।
৩২. মিনিট অব আর, রস: ২২ মার্চ ১৮২৭, বেঙ্গল জুডিশিয়াল কনসাল্টেশনস, হাউস অব কমন্স এ প্রেরিত পার্লমেন্টারি সিলেক্ট কমিটির রিপোর্ট। ১৮৩১-২ দ্র: ২১ পৃ: ১২৫।
৩৩. সুপ্রকাশ রায় : ভারতের বৈপ্লবিক সংগ্রামের ইতিহাস, পৃ: ২৮।
৩৪. আমাদের মুক্তি সংগ্রাম: পৃ: ১৫৩, ১৫৪, ১৫৫, ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার লাইব্রেরি, ভলিয়ম ২২১/২২, ২২ জানুয়ারি ১৯৯০।
৩৫. প্রাগুক্ত: সুপ্রকাশ রায়, পৃ: ২৭।
৩৬. প্রাগুক্ত: কার্ল মার্কস, পৃ: ১০২।
৩৭. প্রাগুক্ত: আমাদের মুক্তি সংগ্রাম, পৃ: ২৭৩, ৩০৬।
৩৮. প্রাগুক্ত: মরলি, পৃ: ৬৩, ৭০, ৭৩, ৭১, ৬৭, ৬৮, ৭৫ ও ৭৬।
৩৯. শ্রীবাস্তব, রমেশ চন্দ্র: ডেভেলপমেন্ট অব জুডিশিয়াল সিস্টেম, ইন ইন্ডিয়া আন্ডার দি ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি: (১৮৩৩-৫৮: পৃ: ৮০, ৮২)।
৪০. প্রাগুক্ত: শ্রীবাস্তব, পৃ: ১২৩, ১২৭, ১২৮।
৪১. সুপ্রকাশ রায়: ভারতের বৈপ্লবিক সংগ্রামের ইতিহাস, পৃ: ১৩।
৪২. দৈনিক প্রথম আলো: ৩০ সেপ্টেম্বর ২০০৫।
৪৩. গাজী শামছুর রহমান: বাংলাদেশের আইন ব্যবস্থা, পৃ: ৪০।
৪৪. প্রাগুক্ত: গাজী শামছুর রহমান,পৃ: ৪০-৪১।
৪৫. উডরফ এন্ড আমির আলী: সিভিল প্রসিডিউর ইন ব্রিটিশ ইন্ডিয়া, পৃ: ১, ২।
৪৬. এ আই আর: এস সি, পৃ: ৪৪৭।
৪৭. রতন লাল ও ধীরাজ লাল: ল' অব ক্রাইমস, পৃ: ১, ২।
৪৮. এগনিউ এন্ড হেন্ডারসন: দি কোড অব ক্রিমিনাল প্রসিডিউর, পৃ: ৪, ৫।
৪৯. প্রাগুক্ত: উডরফ এন্ড আমীর আলী, পৃ. ২।
৫০. প্রাগুক্ত: পিএম জৈন, পৃ: ৫৪০-৫৭০।
৫১. সিনহা, বলবীর সাহাই: লিগ্যাল হিস্টোরি অব ইন্ডিয়া, পৃ: ১৬৩।
৫২. শ্রী বাস্তব, রমেশ চন্দ্র: ডেভেলপমেন্ট অব জুডিশিয়াল সিস্টেম ইন ইন্ডিয়া আন্ডার দি ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি পৃ: ১৭৪-১৮৫।

www.pathagar.com

৫৩. প্রাগুক্ত: পিএম জৈন, পৃ: ৬২৪-২৫, ৬২৭-২৮।

৫৪. জে এইচ হেরিংটন: এনালাইসিস অব ল'স এন্ড রেগুলেশন ইন বেঙ্গল, ভলিয়ম নং-৩, লন্ডন, ১৮২১, পৃ: ৩১৬, ৩৩৫-৩৩৬।

৫৫. গোলাম হোসেন খান: সীয়ার আল মুতাআল্লেরীন, ৩য় খণ্ড, পৃ: ১৭৯।

৫৬. লোকেশ্বর বসু: আমাদের পদবীর ইতিহাস, পৃ: ৬৩।

৫৭. প্রমথ নাথ বর্মণ: সিঙ্গুরের দ্বারকানাথ বাবুর জীবনী।

৫৮. বোর্ড অব রেভিনিও প্রসেডিংস: ১০ মে ১৭৯৯, নং-১।

৫৯. চট্টগ্রাম কাউন্সিল প্রসিডিংস: ১৯ সেপ্টেম্বর ১৭৬৩, চট্টগ্রাম জেলা রেকর্ডস ভলিয়ম ৪৭৬, পৃ: ১-৩, বাংলাদেশ সচিবালয় রেকর্ড রুমে সংরক্ষিত।

৬০. বোর্ড অব রেভিনিও প্রসেডিংস : ২২ আগস্ট ১৭৯৭, নং-৩৬।

৬১. প্রমথনাথ মল্লিক : নোটেবল বাঙ্গালিজ ইন ১৮০৬ বেঙ্গল পাস্ট এন্ড প্রেজেন্ট, ভলিয়ম-৩০, জুলাই-ডিসেম্বর ১৯২৫।

৬২. পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য আর্কাইভস : ক্রিমিন্যাল ডিপার্টমেন্ট, ১৫ ডিসেম্বর ১৮৪০।

৬৩. ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায় : সংবাদপত্রে সেকালের কথা, ১ম খণ্ড, পৃ: ২১৫।

৬৪. ফ্রান্সিস বুকানন হেমিল্টন পেপারস : এম এস এস-ই ইউ আর, ডি, ৭৪, ভলিয়ম নং-১, পৃ: ৩৫।

৬৫. কিশোরী চাঁদ মিত্র : টেরিটোরিয়াল এরিস্টোক্রেসী অব বেঙ্গল-কান্দী ফেমিলী, ক্যালকাটা রিভিউ, ভলিয়ম-৫৮-১৮৭৪।

৬৬. বোর্ড অব রেভিনিও প্রসিডিংস : ১১ সেপ্টেম্বর ১৭৯৫, নং-১।

৬৭. বোর্ড অব রেভিনিও প্রসিডিংস : পহেলা আগস্ট ১৭৯৭, নং-৩৭।

৬৮. বোর্ড অব রেভিনিও প্রসিডিংস : পহেলা আগস্ট ১৮৯৭ নং-১ এবং বেঙ্গল রেভিনিউ কনসাল্টেশন : ৯ জুন ১৮০৩, নং-৪।

৬৯. এনকে সিনহা : দি ইকোনমিক হিস্টোরি অব বেঙ্গল-১৭৯৩-১৮৪৮, ভলিয়ম নং-১১১, কলকাতা ১৯৫৬-৭০।

৭০. ডব্লিও বোল্টস : কনসিডারেশন অন ইন্ডিয়া এফেয়ার্স-১৭৭২, পৃ: ৮৪।

৭১. লাগ্রান্দপ্রে: এ ভয়েজ ইন দি ইন্ডিয়ান ওসেন এন্ড বেঙ্গল, লন্ডন, ১৮০৩, ভলিয়ম-২, পৃ: ২৯-৩০।

৭২. পি জে মার্শাল : ইস্ট ইন্ডিয়া ফরচুন ব্রিটিশ ইন বাংলা ইন দি এইটিনথ সেঞ্চুরি-পৃ: ১১।

৭৩. গভর্নর জেনারেলের কাউন্সিল রেজুলেশন : ২৪ আগস্ট ১৭৯২, চট্টগ্রাম জেলা রেকর্ডস্' ভলিয়ম-১৯, পিপি-৪৭৭ এবং বাংলাদেশ সচিবালয়ের রেকর্ড রুম, ঢাকা।

৭৪. পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু : বিশ্ব ইতিহাস প্রসঙ্গ, পৃ: ৯।

৭৫. কেডস্ট্রাল সার্ভে রেকর্ডস : মৌজা নোট, ভলিয়ম, ৩, জেএল নং-১০১-১৫০০।

৭৬. বিনয় ঘোষ : বাংলার সামাজিক ইতিহাসের ধারা : পৃ: ২৩-২৪।

৭৭. মাসিক নতুন সফর : জুলাই-১৯৯৫ সংখ্যা, পৃ:-৮।

৭৮. ডব্লু ডব্লু হান্টার : এনালাইসিস অব রুরাল বেঙ্গল, পৃ: ১৫৩-৫৪।

৭৯. দৈনিক মিল্লাত : ১৩ নভেম্বর ১৯৯৬।

৮০. ইব্রাহীম খাঁ রচনাবলী : পৃ: ১২৮-২৯।

৮১. নিখিল নাথ রায় : মুর্শিদাবাদ কাহিনী, পৃ: ৩৫০-৩৫১।

৮২. ভবানীচরণ বন্দোপ্যাধ্যায় : নববাবু বিলাস, পৃ: ১ ও ৩৫।

www.pathagar.com

৮৩. দেওয়ান কার্ত্তিকেয় চন্দ্র রায়ের আত্মজীবন চরিত : নতুন সংস্কার-কলকাতা, ১৩৬৩, পৃ: ৪২।

৮৪. শিবনাথ শাস্ত্রী : রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গ সমাজ, পৃ: ৫৫-৫৬।

৮৫. অতুল সুর : কলকাতার চালচিত্র, পৃ: ৪৪।

৮৬. বেঙ্গল রেভিনিও কনসাল্টেশনস : ১৫ জানুয়ারি ১৮১৪, নং-২৫।

৮৭. প্রাগুক্ত : বেঙ্গল রেভিনিও কনসাল্টেশনস : তাং- ও নং-ঐ।

৮৮. ওয়ারেন হেস্টিংসকে প্রদত্ত জর্জ ভান্সি টর্টের বিবরণ : ২০ জানুয়ারি ১৭৭৫।

৮৯. রাজস্ব বোর্ডের কালেক্টরের পত্র : বোর্ড অব রেভিনিও প্রসিডিংস, ১৭ নভেম্বর ১৭৯৬।

৯০. রাজস্ব বোর্ডের কাছে বর্ধমান কালেক্টরের পত্র : ২১ ফেব্রুয়ারি ১৭৯৫, বিআরসি ২৭ মার্চ ১৭৯৪, নং-২৯।

৯১. পার্লামেন্টারি সিলেক্ট কমিটির পঞ্চম রিপোর্ট : ১৮১২, ভলিয়ম-৭, পৃ: ৫৫।

৯২. রাজস্ব বোর্ডের কাছে লেখা রাজা রামকৃষ্ণের পত্র : ২১ জুন, ১৭৯২, বিআরসি ২০ জুলাই ১৭৯২, নং-১৫।

৯৩. ঢাকা প্রাদেশিক কাউন্সিলের প্রধান হল্যান্ডের মন্তব্য : বেঙ্গল রেভিনিও কনসাল্টেশনস, ১৭ মার্চ ১৭৭৫ পি/৪৯/৫১/সি ১০৯৫।

৯৪. কাউন্সিলর মনসনের-এর মিনিট: ১২ মে ১৭৭৫, পি/৪৯/৫২/পি-৭১২।

৯৫. ওয়ারেন হেস্টিংস : রেভিনিউ অব দি স্টেট অব বেঙ্গল, লন্ডন ১৮৭৬, পৃ: ৩১।

৯৬. ক্যাম্পবেলস রিপোর্ট অন ল্যান্ড রেভিনিও এডমিনিস্ট্রেশন: পার্লামেন্টারি সিলেক্ট কমিটি রিপোর্ট ফ্রম হাউস অব কমন্স, ১৮৩১-২, ভলিয়ম-১১, পরিশিষ্ট-৬।

৯৭. পার্লামেন্টারি সিলেক্ট কমিটি রিপোর্ট ফ্রম হাউস অব কমন্স, ১৮৫২-৫৩, ৪র্থ রিপোর্ট, এভিডেন্স কিউ, ৭৫৫৮।

৯৮. হাউস অব লর্ডস সিলেক্ট কমিটির দ্বিতীয় রিপোর্ট: ১৮৫২-৩, আলেকজান্ডার ডাফস এভিডেন্স, কিউ- ৬১৯৮-৬২০১।

৯৯. প্রাগুক্ত: কিউ, ৭৪২৩, ৭৪৩৮, ৭৪৬৯, ৭৪৮২-৩।

১০০. ব্রিটিশ পার্লামেন্টারি সিলেক্ট কমিটির কাছে প্রদত্ত ব্রিটিশ ইন্ডিয়া এসোসিয়েশনের বিবরণ: হাউস অব লর্ডস সিলেক্ট কমিটি রিপোর্ট ১৮৫২-৫৩, পরিশিষ্ট-৭, প্যারা-৩১।

১০১. ডব্লিও বোল্টস: কনসিডারেশন অন ইন্ডিয়ান অ্যাফেয়ার্স, লন্ডন ১৭৭২।

১০২. দি কর্ণওয়ালিস করসপন্ডেনস: ভলিয়ম ৩, ১৮৫৯)।

১০৩. লর্ড টিনমাউথস জন শোর: এভিডেন্স বিফোর দি পার্লামেন্টারি সিলেক্ট কমিটি, পার্লামেন্টারি পেপারস ১৮১২-১৩, ভলিয়ম নং ৪, পৃ: ১৬)

১০৪. চার্লস গ্রান্ট: অবজারভেশন অন দি স্টেট অব সোসাইটি- ১৭৯২, পার্লামেন্টারি পেপারস ১৮৩১-২, ভলিয়ম ৮, এপেন্ডেক্স নং ১, পৃ: ২২।

১০৫. প্রিভিন্সিয়াল, কোর্ট অব আপিল এন্ড সার্কিট এট মুর্শিদাবাদ, ২৯ অক্টোবর, ১৮০১, ৫ম রিপোর্ট পার্লামেন্টারি পেপারস, ভলিয়ম-৮, পৃষ্ঠা: ৫২০।

১০৬. প্রিভিন্সিয়াল জার্নাল অব দি মার্কুইস অব হেস্টিংস: তালিকাভুক্তির তারিখ, ২ অক্টোবর ১৮১৩)।

১০৭. দৈনিক সংগ্রাম: ৬ মে ২০০৪।

১০৮. আর সি মজুমদার: হিস্টোরি এন্ড কালচার অব দি ইন্ডিয়ান পিপলস, ব্রিটিশ প্যারামাউন্সি এন্ড ইন্ডিয়ান রেনেসাঁ, ভলিয়ম-১০, ২য় খণ্ড, পৃ: ৩৩৯।

www.pathagar.com

১০৯. আজিজুর রহমান মল্লিক: দি ব্রিটিশ পলিসি এন্ড মুসলিমস ইন বেঙ্গল, ১৭৫৭-১৮৫৭, উদ্ধৃতি: দৈনিক সংগ্রাম- ১৩ সেপ্টেম্বর ১৯৯১ এবং ১৫ অক্টোবর ১৯৯৩।

১১০. ইসলামিক ফাউন্ডেশনের সাবেক মহাপরিচালক এজেডএম সামসুল আলমের লেখা ঔপনিবেশিক ষড়যন্ত্রের শিকার মুসলিম নাম ও সংস্কৃতি শীর্ষক প্রবন্ধ অবলম্বনে : মাসিক ইতিহাস অন্বেষা, জুলাই ২৯০৫ সংখ্যা, পৃষ্ঠা ৮ থেকে ১৩।

১১১. পার্লামেন্টারি সিলেক্ট কমিটির সামনে মেজর জেনারেল আলেকজান্ডার কিডস এর বিবরণী: ১৮১২-১৩, ভলিয়ম-৪, পৃ: ৭৪।

১১২. গভর্নর জেনারেল লর্ড মিন্টোর কাছে এ ব্যাপারে রামমোহন রায়ের আরজি : উদ্ধৃতি আরসি মজুমদার: হিস্টোরি এন্ড কালচার অব দি ইন্ডিয়ান পিপল ব্রিটিশ প্যারামাউন্সি এন্ড ইন্ডিয়ান রেনেসাঁ, ভলিয়ম ১০ ২য় খণ্ড, পৃ: ৩৪০।

১১৩. ক্যালকাটা কুরিয়ার: ৬ এবং ১০ অক্টোবর ১৮৩২।

১১৪. Fanny parkes: Wanderings of a pilgrim, Vol- 1. pp-29-30.

১১৫. দৈনিক প্রথম আলো, ৮ আগস্ট ২০০৩ এবং ১৩ জানুয়ারি ২০০৪।

১১৬. দৈনিক সংবাদ: ১৭ এপ্রিল ১৯৭২।

১১৭. সূত্র: ম্যাকাউলেয়িস মিনিট অব কোম্পানিজ এডুকেশন পলিসি- ১৮৩৫।

১১৮. এডমিনিস্ট্রেশন, রিপোর্টস : বেঙ্গল প্রেসিডেন্সী, ইন্ডিয়া অফিস লাইব্রেরী, লন্ডন।

১১৯. স্টেটেস্টিকস্ অব ব্রিটিশ ইন্ডিয়া ফর জুডিশিয়াল এন্ড এডমিনিস্ট্রেটিভ ডিপার্টমেন্টস : ইন্ডিয়া অফিস লাইব্রেরী, লন্ডন।

১২০. স্ট্রিফেন জেএফ: মিনিট অন দি এডমিনিস্ট্রেশন অব জাস্টিস ইন ব্রিটিশ ইন্ডিয়া, ১৮৭৭ সালে প্রকাশিত হোম ডিপার্টমেন্ট সিলেকশন নং-১৩৬, ইন্ডিয়া অফিস লাইব্রেরী, লন্ডন।

১২১. আর.সি. দত্ত: ১৮৭৪ পিজেন্ট্রি অব বেঙ্গল, পৃ: ৮৮, ৮৯।

১২২. প্রাগুক্ত: স্টিফেন জেএফ।

১২৩. জাস্টিস স্টিফেন ইন হোম ডিপার্টমেন্ট সিলেকশনস নং-১৩৬, পৃ: ৫৫, ৫৬)

১২৪. প্রাগুক্ত: জাস্টিস স্টিফেন পৃ: ৫৭।

১২৫. বিবি মিশ্র: দি এডমিনিস্ট্রেটিভ হিস্ট্রী অব ইন্ডিয়া, ১৮৩৪-১৯৪৭, পৃ: ৫৬২।

১২৬. প্রাগুক্ত: বিবি মিশ্র, পৃ: ১৯৬।

১২৭. হোসেন জিল্লুর রহমান : বাংলায় ঔপনিবেশিক প্রশাসনের সমাজতত্ত্ব, দৈনিক দিনকাল, ১৬ থেকে ২০ নভেম্বর ১৯৯৯, সংক্ষিপ্ত ও ঈষৎ পরিবর্তিত।

www.pathagar.com

অধ্যায়-চার

রক্তস্নাত স্বাধীনতা উত্তর পাক ভারত বিচার ব্যবস্থা: কি পেল জনগণ?

ক্ষমতার দ্বন্দ্বে শাসকদের মধ্যে যুদ্ধ বিগ্রহ ছাড়া ভারতে প্রায় সাড়ে ৭শ' বছরব্যাপী ইসলামী শাসন ও বিচার ব্যবস্থার বিরুদ্ধে গণবিদ্রোহের কোন ইতিহাস খুঁজে পাওয়া যায় না। কিন্তু ভারতে ব্রিটিশদের ১৯০ বছরব্যাপী শাসন ও বিচার ব্যবস্থাকে কৃষক বিদ্রোহ, প্রজা বিদ্রোহ, নীল বিদ্রোহসহ শ' শ' গণআন্দোলন বিদ্রোহ মোকাবিলা করতে হয়েছে। কারণ তাদের আধিপত্যবাদী শাসন ও বিচার ব্যবস্থা ছিল পদ্ধতিগত শোষণের অন্যতম হাতিয়ার। ইংরেজ আধিপত্যের বিরুদ্ধে এদেশবাসীর শত বর্ষব্যাপী প্রত্যক্ষ পরোক্ষ সংগ্রামের পর ১৮৫৭ সালের রক্তাক্ত সিপাহী বিপ্লবের প্রচণ্ডতায় প্রমাদ গোনে ব্রিটিশ সরকার। ভবিষ্যতে আরো ভয়াবহ বিপ্লবের আশংকায় ধূর্ত ব্রিটিশরা এদেশে একটা রাজনৈতিক সংগঠন প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে। এ লক্ষ্যে ভারতের তদানীন্তন গভর্নর জেনারেল লর্ড ডাফরিনের ধাত্রীত্বে ব্যারিস্টার উমেশচন্দ্র বন্দোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে ১৮৮৫ সালে প্রথম রাজনৈতিক দল ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠিত হয়। ঔপনিবেশিক সূতিকাগারে ভূমিষ্ঠ এ দলের সার্বিক পৃষ্ঠপোষকতায় ছিলেন স্যার এলান অক্টোভিয়ান হিউম ও উইলিয়াম ওয়েডার বার্ন। হিন্দু-মুসলমান নেতৃত্বে কংগ্রেসের তৎপরতা শুরু হয়। কিন্তু ব্রিটিশদের নেপথ্য ইন্ধনে ভারতের দুই বৃহৎ সম্প্রদায় হিন্দু-মুসলমানের বিভেদ রেখা ক্রমেই স্পষ্ট থেকে স্পষ্টতর হতে থাকে। এ প্রেক্ষাপটে ১৯০৬ সালে ঢাকার নবাব স্যার সলিমুল্লাহর নেতৃত্বে মুসলমানদের স্বতন্ত্র রাজনৈতিক দল নিখিল ভারত মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠিত হয়। রাজনৈতিক দল কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ গঠনের পর হিন্দু-মুসলমান সম্প্রদায়ের ক্রমবর্ধমান দাবি দাওয়ায় ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ে ব্রিটিশ সরকার। প্রথম দিকের স্বায়ত্বশাসনের দাবি পরবর্তীতে ক্রমেই স্বাধীনতার দাবিতে জোরালো হয়ে উঠতে থাকে। ব্রিটিশরা বুঝতে পারে তাদের দিন ফুরিয়ে আসছে এবং ভারতের এই দুই বৃহৎ সম্প্রদায় ঐক্যবদ্ধ থাকলে অচিরেই তাদের ভারত ছাড়তে হবে। উপায়ান্তরহীন ধূর্ত ব্রিটিশদের নেপথ্য উস্কানিতে এরপর ভারতের বিভিন্ন স্থানে ঘন ঘন হিন্দু-মুসলমান সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় হতাহতের সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকে। অন্যদিকে অখণ্ড ভারতের স্বাধীনতার জন্য ভিন্ন মাত্রায় সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবী দলও গোপনে সংগঠিত হয়। বিপ্লবীরা থানা আক্রমণ, অস্ত্রাগার লুণ্ঠন, পুলিশ হত্যাসহ সরকারি সম্পদ ধ্বংস করতে

www.pathagar.com

থাকে। এর বিরুদ্ধে কঠোর সরকারি দমন অভিযানে বহু প্রতিরোধ যোদ্ধা হতাহত এবং অনেককে মৃত্যুদণ্ডও দেয়া হতে থাকে। বস্তুত ১৯ শতকের প্রথমার্ধ ছিল দেশীয় ও আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে দারুণ ঘটনাবহুল। দু'টি বিশ্বযুদ্ধ এ সময়ে সংঘটিত হয় এবং দু'টি বিশ্বযুদ্ধেই ব্রিটেন অংশ নেয়। বিশেষ করে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ব্রিটেনের অর্থ, সম্পদ এবং এতো লোক ক্ষয় হয় যে, তার উপনিবেশগুলো ধরে রাখার ক্ষমতা সে হারিয়ে ফেলে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে পরাজিত জাপান, জার্মানী ও ইতালি যেমন ধ্বংস হয়েছিল, বিজয়ী ব্রিটেন, ফ্রান্সসহ অন্যান্য ইউরোপীয় সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলোও তেমনি শ্রান্ত-ক্লান্ত সর্বস্বান্ত হয়ে পড়েছিল। যুদ্ধের ফাঁকে ভারতীয় কংগ্রেস ও মুসলিম লীগও যথেষ্ট শক্তি সঞ্চয় করে এবং এতে যে প্রচণ্ড জাতীয় চেতনা সৃষ্টি হয় তা সদ্য রণক্লান্ত ব্রিটিশদের মোকাবেলা করা অসম্ভব হয়ে পড়ে। ১৯৪৩ সালে সিমলা সম্মেলন, একই বছর মহাদুর্ভিক্ষ, ১৯৪৫ সালে বোম্বে ও করাচীর নৌ বিদ্রোহের পর ক্যাবিনেট মিশন, হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে ভয়াবহ সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, এর আগে ১৯৪২ সালে কংগ্রেসের সহিংস ভারত ছাড় আন্দোলন ইত্যাদি নিয়ন্ত্রণ বহির্ভূত ঘটনাবলীতে ব্রিটিশরা বুঝতে পারে আর কোন চালাকিতে ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য টিকিয়ে রাখা যাবে না। এই বাস্তবতায় ব্রিটেন ভারত থেকে নিরাপদে প্রস্থানের পথ খুঁজতে থাকে। কিন্তু যাবার আগ পর্যন্ত তারা তাদের দুষ্কর্ম অব্যাহত রাখে। ১৯৪৬ সালে ব্রিটেনের নবনির্বাচিত প্রধানমন্ত্রী ক্লিমেন্ট অ্যাটলি ঘোষণা করেন ভারতবর্ষকে অবিলম্বে স্বাধীনতা দিয়ে দিবেন। ১৯৪৭ সালে ১৪ ও ১৫ আগস্ট অখণ্ড ভারতকে খণ্ডিত করে ব্রিটিশরা মুলমানদের জন্য পাকিস্তান ও হিন্দুদের জন্য ভারতের স্বাধীনতা দিয়ে দেয়। কিন্তু চলে যাওয়ার আগে তারা দু'দেশকে এমনভাবে খণ্ডিত করার ব্যবস্থা করেছিল যাতে দেশ দুটো চিরকালের জন্য পম্পরের সঙ্গে বিবদমান থাকে। হিন্দু মুসলমান নেতৃবৃন্দের অনৈক্যের সুযোগে ব্রিটিশদের কাছ থেকে ১৯০ বছরের শোষণ-লুণ্ঠনের ক্ষতিপূরণের হিসেব চাওয়া যায়নি। বরং ব্রিটিশরা দু'দেশের সীমান্তে অসংখ্য ছিটমহলের একগাদা জট পাকিয়ে রেখে কাশ্মীরকে দু'দেশের স্থায়ী বিরোধ হিসেবে রেখে যায়। ভারতের ভূ-খণ্ডের অভ্যন্তরে পাকিস্তানের পূর্ব অংশের ৫১টি ছিটমহলের অধিবাসীরা সর্বদা নিজ দেশে পরবাসী হয়ে রইল। দুদেশের সীমানা নির্ধারণের দায়িত্বে নিয়োজিত স্যার র‍্যাডক্লিফের কাগুজে মানচিত্রের রোয়েদাদে কোন নদী পড়েছে এক দেশে আর তার স্লুইসগেট পড়েছে অন্য দেশে। কোন বাড়ির সামনের ঘর ভারতে পেছনের ঘর পকিস্তানে। কোন কৃষকের বাড়ি পাকিস্তানে আর জায়গা জমি পড়েছে ভারতে। এই অসম বিভক্তির ধুম্রজালে লাখ লাখ হিন্দু-মুসলমান নারী-পুরুষ দাঙ্গা, লুটতরাজ, খুন ও বলাৎকারের শিকার হয়। ওই সময় সাম্প্রদায়িক সহিংসতায় নিহতের সংখ্যা ছিল অগণিত। ব্রিটিশদের পাক-ভারত সীমানা নির্ধারণের বিষয়টি পাকিস্তানের পূর্ব অংশ তথা পূর্ববঙ্গ বা পূর্ব পাকিস্তানবাসীর জন্য ছিল এক নিদারুণ বিপর্যয়। এ দুষ্কর্মে মুসলিম লীগও কম যায়নি। কারণ ১৯৪০ সালের ২৩ মার্চ লাহোরে

www.pathagar.com

অনুষ্ঠিত সর্বভারতীয় মুসলিম লীগ অধিবেশনে গৃহীত প্রস্তাবে ভারতের সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম অঞ্চল নিয়ে একাধিক স্বাধীন রাষ্ট্রের কথা উল্লেখ ছিল। অথচ ১৯৪৬ সালের ৯ এপ্রিল নয়াদিল্লীর এ্যাংলো এরাবিক কলেজে সর্বভারতীয় মুসলিমলীগেরই লেজিসলেটরস কনভেনশনে আগের প্রস্তাব সংশোধন করে 'একাধিক' শব্দের স্থলে 'এক' শব্দটি প্রতিস্থাপন করা হয়। ফলে ১৯৪৭ সালের ১৪ আগস্ট স্বাধীনতা না পেয়ে বাংলাদেশ অন্তর্ভুক্ত হয় স্বাধীন পাকিস্তানের একটি প্রদেশ হিসেবে। বিরাট আয়তনের ভারতের পূর্ব ও পশ্চিম প্রান্তে প্রায় এক হাজার মাইল ব্যবধানে দু'টি প্রদেশ নিয়ে গঠিত পাকিস্তান রাষ্ট্রটি ছিল বিশ্ব মানচিত্রে কিম্ভূতকিমাকার। আয়তনের দিক থেকে ভারত ছিল সমগ্র পাকিস্তানের থেকে প্রায় ৬ গুণ বড় এবং পূর্ব পাকিস্তান থেকে পশ্চিম পাকিস্তান ছিল প্রায় ৫ গুণ বড়।

১৯৪৭ সালে স্বাধীনতা অর্জনের পর ভারত ও পাকিস্তানে সেই ব্রিটিশ আমলের ঔপনিবেশিক আইন কানুন ও বিচার প্রক্রিয়া কিঞ্চিত সংশোধিত আকারে বহাল রাখা হয় যা স্বাধীন দেশের জনগণের চাহিদার সাথে মোটেই সামঞ্জস্যপূর্ণ ছিল না। বিলম্বিত, ব্যয়বহুল ও হয়রানীমূলক বিচার ব্যবস্থা ছাড়াও সদ্য স্বাধীন দেশে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠায় সবচেয়ে বড় বাধা ছিল ব্রিটিশদের প্রণীত কয়েকটি গণবিরোধী আইন। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য আইনগুলো হচ্ছে- ১৮৯৮ সালের ফৌজদারী কার্যবিধির ৫৪ ধারা, ১৮৬০ সালের দণ্ডবিধির ৭৭ ধারা, ১৮৫০ সালের জুডিশিয়াল অফিসার্স প্রোটেকশন এ্যাক্ট, ১৯২৬ সালের আদালত অবমাননা আইন, ১৯০৮ সালের তামাদী আইন এবং ১৮৭০ সালের কোর্ট ফি আইন।

ফৌজদারী কার্যবিধির ৫৪ ধারার ১ নং উপধারায় বলা হয়েছে, 'কোন পুলিশ অফিসার আদালতের অনুমতি ছাড়াই এমন যে কোন ব্যক্তিকে গ্রেফতার করতে পারবেন যিনি কোন অজ্ঞাত অপরাধের সাথে জড়িত বলে যুক্তিসঙ্গত সন্দেহ রয়েছে। দণ্ডবিধির ৭৭ ধারায় বলা হয়েছে- বিচারক এখতিয়ার বহির্ভূতভাবে বিচার কাজ করলেও যদি তা সরল বিশ্বাসে করা হয় তাহলে তা কোন অপরাধ হিসেবে গণ্য করা হবে না। ১৮৫০ সালের জুডিশিয়াল অফিসার্স প্রোটেকশন এ্যাক্টে বলা হয়েছে- কোন বিচারক তার বিচারিক দায়িত্ব পালনকালে তার এখতিয়ার থাকুক বা না থাকুক কোন কাজ সরল বিশ্বাসে করে থাকলে তার বিরুদ্ধে দেওয়ানী আদালতে কোন মামলা চলবে না। ১৯২৬ সালের আদালত অবমাননা আইনে আদালত অবমাননা অপরাধের জন্য ৬ মাস কারাদণ্ড ও ২ হাজার টাকা জরিমানার বিধান রাখা হয়েছে। ১৯০৮ সালের তামাদী আইনের সার সংক্ষেপ হচ্ছে এ আইনের বেঁধে দেয়া নির্দিষ্ট মেয়াদের পর কোন ব্যক্তি তার বৈধ অধিকার বা স্বত্বের জন্য কোন দাবি প্রতিষ্ঠা করতে আদালতের দ্বারস্থ হতে পারবে না। আর ১৮৭০ সালের কোর্ট ফি আইনে বলা হয়েছে, সম্পত্তির জন্য দেওয়ানী আদালতে মামলা করার আগেই সম্পত্তির মোট মূল্যের ১৫-২০ শতাংশ হারে কোর্ট ফি নগদ টাকায় কিনে আদালতে অগ্রীম জমা দেয়া না হলে আদালত মামলা গ্রহণ করবেন না।

www.pathagar.com

স্বাধীন দেশের সম্পূর্ণ অনুপযোগী গণবিরোধী এ কালো আইনগুলোর ত্রুটিপূর্ণ দিকগুলো হচ্ছে- ফৌজদারি কার্যবিধির ৫৪ ধারা ক্ষমতাবলে একজন পুলিশ অফিসার নিজেকে অলৌকিক ক্ষমতাবান ভাবতে পারেন। তিনি যে কাউকে কল্পনায় অপরাধী সাব্যস্ত করতে পারেন এবং সুনির্দিষ্ট অভিযোগ ছাড়াই কথিত যুক্তিসঙ্গত সন্দেহে গ্রেফতার করে বন্দি করে ২৪ ঘণ্টা হাজতে আটক রেখে ফৌজদারী আদালতে সোপর্দ করতে পারেন। আদালতে গ্রেফতারকৃত ব্যক্তির জন্য অপেক্ষা করে নিদারুণ ভোগান্তি। অথবা গ্রেফতারের ভয় দেখিয়ে পুলিশ অফিসার ওই ব্যক্তির কাছ থেকে অবৈধ অর্থ আদায় করতে পারেন। এভাবে একজন পুলিশ অফিসার জনগণের কাছ থেকে উৎকোচ আদায়ের জন্য অলিখিত রাজক্ষমতার অধিকারী এবং এ অবস্থা আজো বিদ্যমান। দণ্ডবিধির ৭৭ ধারার ক্ষমতা বলে বিচারক একজন নিরপরাধ আসামীকেও সরল বিশ্বাসে ফাঁসীতে ঝুলিয়ে দিতে পারেন। এজন্য বিচারককে কোথাও জবাবদিহি করতে হবে না। ব্রিটিশ দখলাধীন ভারতে ব্রিটিশরা এভাবে দণ্ডবিধির ৭৭ ধারার ক্ষমতাবলে বিচারককে বানিয়েছে অসীম শক্তিধর জল্লাদ আর ফৌজদারী কার্যবিধির ৫৪(১) ধারায় বেপরোয়া ক্ষমতা দিয়ে পুলিশ অফিসারকে বানিয়েছে বল প্রয়োগের লাঠিয়াল। ১৮৫০ সালের 'জুডিশিয়াল অফিসার্স প্রোটেকশন এ্যাক্ট'-এর ক্ষমতাবলে বিচারক 'সরল বিশ্বাসে' কাউকে তার বৈধ স্বত্ব বা দাবি থেকে বঞ্চিত করলেও ওই বিচারকের বিরুদ্ধে দেওয়ানি আদালতে কোন মামলা চলবে না। এভাবেই দণ্ডবিধির ৭৭ ধারা এবং ১৮৫০ সালে জুডিশিয়াল অফিসার্স প্রোটেকশন এ্যাক্ট বিচারকাজে নিয়োজিত বিচারকগণকে ফৌজদারি ও দেওয়ানী অপরাধ থেকে আগাম দায়মুক্তি দেয়া হয়েছে। ১৯২৬ সালের আইনে আদালত অবমাননার জন্য কারাদণ্ড ও জরিমানার বিধান রাখা হলেও এ আইনে আদালত অবমাননার কোন সংজ্ঞা নেই। সুনির্দিষ্ট সংজ্ঞা না থাকায় এ আইনে শাস্তি প্রদানের বিষয়টি বিচারকের খেয়াল-খুশির ওপর ন্যস্ত করা হয়েছে। তামাদী আইনে বিভিন্ন বৈধ দাবি আদালতে প্রতিষ্ঠা করার জন্য বিভিন্ন প্রকার সময় বেঁধে দেয়া হয়েছে। মামলা রুজু হওয়ার কারণ উদ্ভব হওয়ার পর আইনের বেঁধে দেয়া সময় অতিক্রান্ত হলে আদালতে আর কোন মামলা চলবে না। অর্থাৎ বৈধ দাবিদারও আর কোন প্রতিকার পাবে না যার নির্গতিলার্থ বঞ্চনা। অভিজ্ঞ আইনজীবী ছাড়া একজন সাধারণ নাগরিকের পক্ষে তামাদী আইনের এসব মেয়াদ মুখস্থ রাখা সম্ভব নয় যা নিছক আইনী প্রতারণা ছাড়া আর কিছু নয়। অগ্রিম নগদ টাকা দিয়ে কোর্ট ফি কিনে কোন দরিদ্রের পক্ষে মামলা দায়ের করা সর্বক্ষেত্রে সম্ভব নয়, বিশেষ করে ওই ব্যক্তি যদি আগেই তার সহায়সম্পত্তি থেকে জবরদস্তি উচ্ছেদ হয়ে থাকে। অবশ্য নিঃস্ব ব্যক্তির জন্য কোর্ট ফি ছাড়াই 'পপারস্যুট' নামের মামলা করার বিধান রয়েছে। কিন্তু নিজেকে নিঃস্ব প্রমাণে আইনী আনুষ্ঠানিকতায় একযুগ পার হতে পারে, মামলা দায়ের পরের কথা। এসব দুর্গম বাধা ডিঙ্গিয়ে কেউ যদি মামলা দায়ের করতে সক্ষমও হয় তাহলে আদালতে দখলস্বত্ব প্রমাণ অর্থাৎ নিজের পেশীশক্তির সাফাই গাইতে হবে এবং আদালতের প্রতি ধার্য তারিখে উকিল, মুহুরি, পেশকারকে তাদের চাহিদা মতো টাকা দেয়ার পাশাপাশি মামলা চলবে অনির্দিষ্টকাল

www.pathagar.com

পর্যন্ত। আবার ভাগ্যক্রমে ৫-১০ বছরের মধ্যে কোন মামলার রায় হলেও উচ্চতর আদালতগুলোতে পরপর ৪টি আপিল প্রক্রিয়ার ব্যয়বহুল সময়বহুল ও হয়রানিমূলক অগ্নিপরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলেই কেবলমাত্র সুপ্রীম কোর্ট থেকে চূড়ান্ত রায় পাওয়া যাবে। কারণ কোন আদালতেই রায় প্রদানের সুনির্দিষ্ট সময়সীমা নির্ধারণ বা বাধ্যবাধকতা নেই। এতে সময় লাগতে পারে ২০-৩০ বছর কিংবা তারও বেশি। আবার দেওয়ানি মামলার চূড়ান্ত রায় কার্যকর করতে ডিক্রি জারির জন্য আদালতে পৃথক দরখাস্ত দিয়ে অপেক্ষা করতে হবে। আইন আদালতে জটিল ও এই সময় সাপেক্ষ বিচার প্রক্রিয়ায় জয়ী হওয়া একজন দরিদ্রের পক্ষে সম্ভব নয়। যার অর্থ হলো সে বঞ্চিত হয়ে থাকবে। অন্যদিকে বিচারকের এখতিয়ার বহির্ভূত অর্থাৎ ক্ষমতা বহির্ভূত যা 'সরল বিশ্বাসের মোড়কে বৈধতা দেয়া হয়েছে। দণ্ডবিধির ৫২ ধারায় বলা হয়েছে যথাবিহিত সতর্কতা ও মনযোগ ছাড়া কিছু করা হলে বা বিশ্বাস করা হলে তা সরল বিশ্বাসে করা হয়েছে বা বিশ্বাস করা হয়েছে বিবেচনা করা হবে না।' এখানে লক্ষণীয় যে, ৫২ ধারায় 'সরল বিশ্বাসে' শব্দটির একটি নেতিবাচক সংজ্ঞা দেয়া হলেও সংজ্ঞার মধ্যে অন্তর্নিহিত নৈতিক সততা বা সৎ অভিপ্রায়ের উল্লেখ নেই। সবচেয়ে বড় কথা 'সরল বিশ্বাসে' শব্দটির পরিধি অনন্ত। সরল বিশ্বাসে শব্দটির সুবিধামতো ব্যাখ্যা দেয়ার সুযোগ রাখার ফলে বিচারক সরল বিশ্বাসের ছত্রছায়ায় আইন ভঙ্গ করেও রায় দিতে পারেন। পুলিশি ক্ষমতা 'যুক্তিসঙ্গত সন্দেহ' এর অর্থও অনন্ত এবং ধুরন্ধর এ শব্দটির ছত্রছায়ায় পুলিশ অফিসার একজন নিরপরাধিকেও অপদস্ত করার অধিকারী। কুশলী ভাষা বিন্যাসে আইনের শাসন ও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার নামে এসব কালো আইন ও বিচার প্রক্রিয়া প্রণীত হয়েছিল ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক রাজশক্তির প্রশ্নাতীত আনুগত্যের শর্তে এদেশীয় সরকারি কর্মকর্তাদের পুরস্কৃত করতে। এসব গণবিরোধী আইন প্রণয়নের সময় সেখানে এদেশবাসীর কোন প্রতিনিধিত্ব ছিল না কিংবা ছিল না কোন পার্লামেন্ট।

ধর্মের ভিত্তিতে ভাগ হয়ে ভারত ও পাকিস্তান স্বাধীনতা অর্জন করলেও এ দুটি দেশের প্রতিষ্ঠাতা পুরুষগণ স্বদেশে সেই ব্রিটিশদের প্রবর্তিত ঔপনিবেশিক আইন, কানুন, শাসন প্রশাসন ও বিচার ব্যবস্থা কিঞ্চিত সংশোধিত আকারে বহাল রাখেন। বৃথাই গেল ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে দু'শতাব্দীব্যাপী আমজনতার এতো রক্তস্রোত, বিপ্লব, আন্দোলন, সংগ্রাম ও ত্যাগ তিতিক্ষা। দু'দেশের নেতৃবৃন্দ দেশবাসীকে এমন কোন প্রতিশ্রুতিও দিলেন না যে, একটা নির্দিষ্ট সময় পরে অথবা ভবিষ্যতে এসব ঔপনিবেশিক আইন, কানুন, শাসন, প্রশাসন ও বিচার ব্যবস্থা বিলুপ্ত অথবা আমূল পরিবর্তন করে স্বাধীন দেশের উপযোগী তথা জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষা ও রুচি চাহিদানুযায়ী রাষ্ট্র ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হবে। যে দখলদার ব্রিটিশরা টানা দু'শতাব্দী ধরে দেশবাসীকে মানুষ বলে গণ্য না করে ঘৃণা, তুচ্ছতাচ্ছিল্য, নিপীড়ন, হত্যা ও তাদের সম্পদ হরণ করেছে; সেই ব্রিটিশদের তৈরি আইন কানুন ও বিচার ব্যবস্থা দেশবাসীর ওপর চাপিয়ে দিতে বিবেকবর্জিত স্বদেশী নেতৃবৃন্দের এতটুকু লজ্জাও করেনি। ১৯০ বছরের ঔপনিবেশিক

www.pathagar.com

গবেষণাগারে তৈরি আইন ও বিচার ব্যবস্থা শোষণ স্বকীয়তায় অনন্য হওয়ায় সদ্য স্বাধীন ভারতীয় জনগণের কণ্ঠে আওয়াজ ওঠে, 'ইয়ে আজাদী ঝুটা হ্যায়, লাখো ইনসান ভূখা হ্যায়' অর্থাৎ এ স্বাধীনতা মিথ্যা লাখ লাখ মানুষ ক্ষুধার্ত। স্বাধীন ভারতের প্রতিষ্ঠাতা পুরুষগণ স্বদেশে ব্রিটিশদের ঔপনিবেশিক শোষণ কাঠামোটি আড়াল ও নিজেদের অপকর্ম ঢাকতে রাষ্ট্রের সামনে গণতন্ত্র ও ধর্ম নিরপেক্ষতার সাইনবোর্ড ঝুলিয়ে দেন; আর পাকিস্তানী নেতৃবৃন্দ একই অপকর্ম করে রাষ্ট্রের সামনে ঝুলিয়ে দেন গণতন্ত্র ও পবিত্র ইসলাম ধর্মের সাইনবোর্ড। অথচ ইসলামের কোথাও এরকম বৈষম্যমূলক, জবাবদিহিতা বিহীন, বিলম্বিত হয়রানিমূলক ও ব্যয়বহুল বিচার ব্যবস্থার স্বীকৃতি নেই। ১৯৪৭ সালে স্বাধীন ভারত ও পাকিস্তানের পরিশ্রম বিমুখ নেতৃবৃন্দ সেই নিপীড়নাশ্রয়ী ঔপনিবেশিক আইন ও বিচার ব্যবস্থায় জনগণকে খাঁচাবন্দি করে এবং অনুকূল সময়ে তা থেকে মুক্তির প্রতিশ্রুতি না দিয়ে যদি স্বদেশবাসীর প্রতি কোন অপরাধ না করে থাকেন; তাহলে একথা নির্দ্বিধায় বলা যায় যে, ১৭৫৭ সালে স্বদেশকে বিদেশী ইংরেজদের হাতে তুলে দিয়ে মীরজাফর, জগতশেঠ, উমিচাঁদ, রায় দুর্লভরাও কোন অপরাধ করেননি। স্বদেশের কোটি কোটি সরলপ্রাণ জনতার সাথে ভারত ও পাকিস্তানের প্রতিষ্ঠাতা পুরুষগণের সেই ঐতিহাসিক বিশ্বাসঘাতকতার বিষয়টি আজ পর্যন্ত কোথাও আলোচিত হয়নি। সে ইতিহাস যদি কোনদিন লেখা হয় তাহলে এ দুটি দেশের মানুষ জানতে পারবে ব্রিটিশদের গোষ্ঠীস্বার্থে প্রণীত মান্ধাতা আইনের সুখ সৌধের চূড়ায় বসে ব্রিটিশদের মতোই সমাজের উপরিস্তরে ভোগবিলাসিতায় মত্ত একটি ক্ষুদ্র স্বদেশীগোষ্ঠী কিভাবে বৃহত্তর জনগণকে শোষণ লুণ্ঠন চালিয়ে আসছে; ব্রিটিশ আধিপত্যের অবসানের অর্ধশতাব্দী পরেও আইনের শাসনের ছড়ি ঘুরিয়ে তারা নিজেরাই কেবল অর্থবিত্তে সমৃদ্ধিশালী হচ্ছে। মানুষ আরও জানতে পারবে কেন তারা তৃতীয় বিশ্বের অপবাদ মাথায় নিয়ে সুদীর্ঘ ৫৮ বছর যাবত বংশ পরম্পরায় ক্লান্তিকর জীবন সংগ্রাম করেই যাচ্ছে অথচ ক্ষুধা দরিদ্র্যতাকে পরাভূত করতে পারছে না, একটু স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলতে পারছেনা, আইনের শাসন আর গণতন্ত্রের নামে প্রতারিত শোষিত-নির্যাতিত হচ্ছে। সেদিন হয়তো ক্ষুব্ধ জনতা আজকের প্রাতঃস্মরণীয়-বরণীয় প্রয়াত নেতৃবৃন্দের কংকাল কবর থেকে উত্তোলন করে চৌরাস্তার মোড়ে ফাঁসিতে ঝুলাবে; ঠিক যেমনটি ঝুলিয়েছিল বিশ্বাসঘাতক নেতা ওলিভার ক্রমওয়েল ও আয়রনটনের কংকালকে ইংল্যান্ডের ক্রুদ্ধ জনগণ।

ঔপনিবেশিক বিচারের নিক্তিতে বিদ্যমান পাক ভারত বাস্তবতা

১৯৪৭ সালে স্বাধীনতা অর্জনের পর গত ৫৮ বছরে পাকিস্তান ও ভারতের যথেষ্ট অগ্রগতি হয়েছে। দেশ দুটোতে তেল, গ্যাস, কয়লা, লোহাসহ বিভিন্ন প্রাকৃতিক সম্পদ রয়েছে। কর্মজীবী জনগণের শ্রমে ও ঘামে গড়ে ওঠা কৃষি উন্নয়ন, শিল্প উৎপাদন এবং বহির্বাণিজ্যের ক্ষেত্রেও দেশ দুটো যথেষ্ট অগ্রসর। তা সত্ত্বেও এ দুই দেশের বৃহত্তর জনগোষ্ঠী ক্ষুধা, দারিদ্র্য ও দুর্বিষহ বেকারত্বে ধুঁকছে। দেশের সিংহভাগ সম্পদের ভোগের

www.pathagar.com

অধিকারী ঔপনিবেশিক আইনের সুফলভোগী রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ, সরকারি আমলা ও তাদের সমর্থক ব্যবসায়ী শ্রেণী। ঔপনিবেশিক আমলের আইন ও স্বাধীন দেশের অনুপযুক্ত বৈষম্যমূলক বিচার ব্যবস্থাই এর অন্যতম প্রধান কারণ। বড় বড় শহরগুলোর সুউচ্চ বিলাস প্রাসাদেই সাধারণত: ধনী, আমলা, মুৎসুদ্দী, শিল্পপতি ও পুঁজিপতিদের বসবাস। নিভৃত পল্লী, মফস্বল শহর ও গ্রামগঞ্জ থেকে পর্যায়ক্রমে বড় বড় শহরগুলোতে ধনী দরিদ্রের বৈষম্য ব্যবধান প্রকট। অন্যায় অবিচারের সুযোগ নিয়ে মুষ্টিমেয় লোক লাভবান হলেও হতদরিদ্র বৃহত্তর জনগোষ্ঠী বরাবরই অন্যায় অবিচারের ভুক্তভোগী। স্বাভাবিকভাবেই তাদের ক্ষোভ শেষ পর্যন্ত বিক্ষোভে পরিণত হয়। মোট জাতীয় আয়ের সিংহভাগ যোগান দেয়া সত্ত্বেও দেশের শ্রমজীবী জনগণের জীবন মান উন্নত না হওয়ায় রাষ্ট্র ব্যবস্থার বিরুদ্ধে তাদের পুঞ্জীভূত ক্রোধ প্রায়ই সন্ত্রাস সহিংসতার রুদ্র মূর্তিতে ফেটে পড়ে। রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ এর নাম দিয়েছেন অধিকার আদায়ে এটা গণমানুষের গণতান্ত্রিক আন্দোলন। শাসক শ্রেণী বরারবই এই আন্দোলন দমনে কঠোরভাবে ফৌজদারি আইন প্রয়োগ করে আন্দোলনকারীদেরকে নির্বিচারে কারাবন্দি করেন। এসব আন্দোলন কখনও নিয়ন্ত্রণ বহির্ভূত হয়ে ঔপনিবেশিক রাষ্ট্র কাঠামো ভেঙ্গে পড়ার উপক্রম হলে শাসক শ্রেণী জনগণের ওপর সেনাবাহিনী লেলিয়ে দেন। তারা নির্বিচারে হত্যাকাণ্ড ঘটায় দেশে শান্তি-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠার নামে। এই বাস্তবতার মুখোমুখি হয়ে পাকিস্তান রাষ্ট্রটি ১৯৭১ সালে স্বাধীনতার ২৩ বছরের মাথায় দ্বিখণ্ডিত হয়ে গেছে। ভারত খণ্ডিত না হলেও ২৮টি অঙ্গরাজ্যের মধ্যে মনিপুর, আসাম, ঝাড়খণ্ডসহ ৭টি অঙ্গরাজ্যই ভারত থেকে বিচ্ছিন্ন হতে স্বাধীনতা সংগ্রাম করছে। বিচ্ছিন্নতাবাদীরা পুলিশ হত্যা, থানা লুণ্ঠন এবং সরকারি স্থাপনাসহ রেললাইন ব্রিজ, কালভার্টও বোমা মেরে উড়িয়ে দিতে পিছপা হচ্ছে না। অর্থাৎ উভয়পক্ষেই রক্ত ঝরছে এবং বাস্তবতা হচ্ছে ভারতের পিছিয়ে পড়া এক চতুর্থাংশ অঙ্গ রাজ্যগুলোতেই চলছে এখন সেনাবাহিনীর নিষ্ঠুর দমনাভিযান। এর আগে পশ্চিমবঙ্গের বিচ্ছিন্নতাবাদী নক্সালবাড়ী আন্দোলন এবং পাঞ্জাবের শিখদের খালিস্তান আন্দোলন অনেক রক্তপাতের পর অতিকষ্টে দমন করেছিল ভারতের সশস্ত্র বাহিনী। শিখ বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন দমনের জের ধরে শিখ দেহরক্ষীদের গুলিতে নিহত হয়েছিলেন ভারতের সাবেক প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী।

ব্রিটিশ আমলে মুসলমানদের থেকে হিন্দুরা শাসন, প্রশাসন ও বিচারকর্মে অধিকহারে অংশগ্রহণের অভিজ্ঞতা জ্ঞান কাজে লাগিয়ে স্বাধীন ভারতে ব্রিটিশ আমলের বহু আইন কিছুটা গণমুখী করা হয়েছে। যেমন- ১৯২৬ সালের আদালত অবমাননা আইনের সুস্পষ্ট ও দীর্ঘ সংজ্ঞা দিয়ে আইনটি ভারতে একাধিকবার সংশোধন করা হয়েছে। ভারতের দেখাদেখি পাকিস্তানেও আইনটি ১৯৭৭ সালে সংস্কার করা হয়। তবে ব্রিটিশ আইনগুলোর সংশোধন ও যুগোপযোগী সংস্কারের ক্ষেত্রে পাকিস্তান থেকে ভারত বরাবরই অগ্রসর। যে কারণে বিচ্ছিন্নতাবাদী তৎপরতা, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, দুর্নীতি, সন্ত্রাস

www.pathagar.com

সহিংসতা অস্বাভাবিকহারে চলা সত্ত্বেও ভারতে গণতান্ত্রিক সরকার ব্যবস্থা অনেকটাই স্থিতিশীল। আর জন্মের পর থেকে অদ্যাবধি পাকিস্তানে গণতান্ত্রিক সরকার ব্যবস্থা কখনও স্থিতি পায়নি। মাঝে মধ্যে গণতন্ত্র উঁকিঝুকি দিলেও সামরিক সরকারই পাকিস্তানীদের ললাটের লিখন। দেশটির অখণ্ডতা ধরে রাখতে সশস্ত্র বাহিনীই শেষ ভরসা। তা সত্ত্বেও শেষ রক্ষা হচ্ছে না। সিন্ধ ও পাঠান উপজাতি অধ্যুষিত অঞ্চলগুলোতে বিচ্ছিন্নতাবাদ মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে। স্বাধীনতার দাবিতে বেলুচিস্তানে চলছে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর সাথে ঘোরতর গেরিলা যুদ্ধ। ১৯৭১ সালে দ্বিখণ্ডিত হওয়ার ঘটনা থেকে শিক্ষা নিয়ে ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রকাঠামোটির আমূল পরিবর্তন না করে, আধুনিক বিশ্বের সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলোর তাঁবেদারি করার মধ্যেই নিরাপত্তা খুঁজছে পাকিস্তানের সামরিক বেসামরিক শাসকগণ। ঔপনিবেশিক আমলের আইনকানুনগুলো জনগণকে সার্বিকভাবে সুবিচার, শান্তি ও স্থিতিশীলতা দিতে না পারায় বেসামরিক সরকার সেখানে বার বার মুখ থুবড়ে পড়ছে এবং কখনও গণতন্ত্র প্রাতিষ্ঠানিক রূপ পায়নি। ১৯৪৭ সালে ব্রিটেনের কাছ থেকে স্বাধীনতা লাভের পর এ পর্যন্ত দেশটিতে ৪ বার সামরিক অভ্যুত্থান হয়েছে এবং ৫৮ বছরের ইতিহাসে ২৮ বছরই কেটেছে সামরিক শাসনাধীন। প্রথমবার ১৯৫৮ সালের অক্টোবর থেকে ১৯৬৯ সালের মার্চ পর্যন্ত জেনারেল আইয়ুব খান, দ্বিতীয়বার ১৯৭১ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত জেনারেল ইয়াহিয়া খান ক্ষমতায় ছিলেন। তৃতীয়বার বেসামরিক প্রধানমন্ত্রী জুলফিকার আলী ভুট্টোকে ক্ষমতাচ্যুত করে ১৯৭৭ সালের জুলাই থেকে ১৯৮৮ সালের আগস্ট পর্যন্ত জেনারেল জিয়াউল হক দেশ শাসন করেন। বেসামরিক প্রধানমন্ত্রী নওয়াজ শরীফকে ক্ষমতাচ্যুত করে চতুর্থবার ১৯৯৯ সালের ১২ অক্টোবর থেকে ২০০৮ সাল পর্যন্ত জেনারেল পারভেজ মোশাররফ ক্ষমতাসীন ছিলেন।

ঔপনিবেশিক রাষ্ট্র ব্যবস্থার মূল চরিত্রই হচ্ছে নানা অজুহাতে দেশে সম্পদের সুষম বণ্টন, সাম্য ও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা হতে না দেয়া যাতে অভাবে অবিচারে জর্জরিত জনগণ জীবন বাঁচানোর তাগিদেই নিজেদের নিয়ে সদা ব্যস্ত থাকে। এই বাস্তবতায় আমাদের প্রতিবেশী ভারতের সমাজ ও বিচার ব্যবস্থা কেমন চলছে তার ছিটেফোঁটা সংবাদ এদেশের গণমাধ্যগুলোতে বিভিন্ন সময় প্রকাশিত হয়েছে। বিভিন্ন সংবাদ সংস্থার উদ্ধৃতি দিয়ে প্রকাশিত ও সংগৃহীত সংবাদগুলো নিম্নে সংক্ষিপ্তাকারে পত্রস্থ করা হলো, ভারতের আনন্দবাজার পত্রিকায় বলা হয়, ভারতের প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি ইএস বেংকট রামাইয়া মন্তব্য করেছেন, 'ভারতের বিচার বিভাগের মান অনেক নেমে গেছে। সাম অফ দ্য জাজেস আর উইলিং টু বি ইনফ্লুয়েন্সড বাই ল্যাভিস পার্টিস এন্ড হুইস্কি বটলস্।' তিনি এমন অভিযোগও করেন যে, ৭০ থেকে ৮০ জন বিচারপতি কমবেশি দুর্নীতিগ্রস্ত।[১] নয়াদিল্লী থেকে এএফপি জানায়, দীর্ঘ ২৩ বছরের বিচার শেষে নয়া দিল্লীর একটি আদালত এক ব্যবসায়ী রামেশওয়েকে মাত্র ৬ মাসের কারাদণ্ড দিয়েছে। ১৯৭১ সালে তাকে গ্রেফতারের পর ১৯৭৩ সালে সুপ্রীম কোর্ট তার মামলাটি কলকাতা থেকে

www.pathagar.com

নয়াদিল্লী স্থানান্তরের পর তা শম্বুক গতিতে চলতে থাকে। মামলা চলাকালে ৭ আসামীর ৩ জন মারা যায়, দু'জন ১৯৮৩ সালে ও একজন ১৯৮৭ সালে খালাস পায়। আমদানি রফতানি নীতি লংঘনের দায়ে দোষীসাব্যস্ত করে আদালত অবশেষে গত বুধবার প্রদত্ত রায়ে রামেশওয়েকে ৬ মাস কারাদণ্ড দিয়েছেন।[২] নয়াদিল্লী থেকে এএফপি জানায়, একটি মামলার হাজতি আসামী ও গুরুতর অসুস্থ রাজন পিল্লাইর চিকিৎসার জন্য জামিনের আবেদন নাকচ করে দিয়ে আদালত মন্তব্য করেন মদ্যপান ছেড়ে দিলেই তিনি সুস্থ হবেন। পরদিন রাজনের শ্বাসকষ্ট ও কাশির সাথে রক্তক্ষরণ শুরু হলে হাসপাতালে স্থানান্তরের পর তার মৃত্যু ঘটে।

পক্ষান্তরে একই দিনে মাদ্রাজের একটি ফেরারি আসামী ও বর্বরোচিতভাবে স্ত্রীকে হত্যাকারী কংগ্রেসের সাবেক নেতা সুশীল শর্মাকে জামিন দিয়েছে। নয়াদিল্লী হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি রাজিন্দর সরকার বলেন, এরকম একটা হত্যা মামলার আসামীর জামিন পাওয়ার ঘটনা বিস্ময়কর। ভারতীয় সংবাদপত্রগুলো কড়া সমালোচনা করে বলছে, সুশীল শর্মার জামিন প্রমাণ করেছে দেশের বিচার বিভাগে পচন ধরেছে তেমনি রাজন পিল্লাইর মৃত্যু প্রমাণ করেছে মানুষের দুর্দশার প্রতি বিচার বিভাগের কোনই দৃষ্টি নেই। টাইমস অব ইন্ডিয়ার খবরে বলা হয় দুটি মামলায় আদালতের ভূমিকায় মনে হচ্ছে ভারতীয় বিচার বিভাগ দ্বিমুখী নীতিতে বিচারকার্য পরিচালনা করছে। এতে জনগণ বিচার বিভাগের প্রতি আস্থা হারাতে বাধ্য হচ্ছে। সম্পাদকীয়তে সাবধান করে দিয়ে বলা হয় ভারতীয় বিচার বিভাগের সুনাম দ্রুত বিলুপ্তির দিকে যাচ্ছে। ভারতীয় আইনজীবী সমিতি বলছে পিল্লাইর মৃত্যু ভারতের ফৌজদারি আইনের অমানবিক দিকটি ফুটিয়ে তুলেছে।[৩] বিশ্বের খ্যাতনামা সাপ্তাহিক দ্য ইকোনমিস্ট' এর চলতি সংখ্যায় ভারতকে খুনি, বদমাশ ও অপরাধীদের রাজত্ব বলে অভিহিত করেছে। রাসকেলস রুল বা বদমাশদের শাসন শীর্ষক এক নিবন্ধে ইকোনমিস্ট ভারতের রাজনীতিবিদদের অপরাধ চক্রের হোতা অথবা সরাসরি অপরাধী বলে অভিহিত করেছে। ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে প্রশাসন, বিচার ব্যবস্থা এবং সামাজিক রীতির এক বিশদ চিত্র তুলে ধরে নিবন্ধে বলা হয় সেদেশে অন্যায়ের কোন বিচার পাওয়া যায় না, বিত্তশালীদের কোন সাজা হয় না, পুলিশের দুর্নীতির দীর্ঘ ঐতিহ্য রয়েছে এবং বিচারকদেরকেও কেনা যায় বলে কথিত আছে। নিবন্ধে স্পষ্ট করে আরো বলা হয়, ভারতীয় রাজনীতি অপরাধের পাপচক্রে নিক্ষিপ্ত হওয়ার জন্য শুধুমাত্র পেশীশক্তি ও অর্থকেই দায়ী করা চলে না। এক্ষেত্রে নতুন মাত্রা যোগ করেছে বিচার ব্যবস্থা ভেঙ্গে পড়া। পুলিশ প্রশাসন দাবি করে আদালত অপরাধীদের হয় শাস্তি দিতে পারে না অথবা দেয় না। বিলম্বিত বিচার প্রক্রিয়া এক সাধারণ ঘটনা। কোন কোন রাজ্যে ছোটখাটো অপরাধের মামলা ১০ বছর বা তারও বেশি সময় ধরে বিচারের অপেক্ষায় পড়ে থাকে। আবার কোন মামলায় শাস্তি হলে বিবাদী পক্ষ উচ্চআদালতে আপিল করে। সেখানে বিচারের বিলম্ব প্রক্রিয়া আরও দীর্ঘ। ফলে একজন খুনি মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হলেও

www.pathagar.com

বিলম্বিত বিচার প্রক্রিয়ার কারণে ফাঁসিতে দণ্ড কার্যকর হওয়ার আগেই বার্ধ্যক্যজনিত কারণে স্বাভাবিক মৃত্যুবরণ করে। অন্যদিকে গুণ্ডারা সহজেই জামিনে বেরিয়ে এসে ভয় দেখিয়ে সাক্ষীদের মুখ বন্ধ করে দেয়।[৪] সমগ্র দেশে মামলার পাহাড় জমেছে। অপরদিকে বিলম্বিত বিচার অবিচারের নামান্তর বলে প্রচারিত হলেও রাজ্যের কোর্টসমূহে বিচারকের পদ শূন্য রয়েছে। এই মুহূর্তে পশ্চিমবঙ্গের কোর্টসমূহে ১৪ লাখ মামলা ঝুলে রয়েছে। দু' বছর আগে ছিল ১২ লাখ। এ তথ্য দিয়ে রাজ্যের আইনমন্ত্রী নিশীত অধিকারী বলেন, বকেয়া মামলা নিষ্পত্তির দায়িত্ব আদালতের, রাজ্য সরকারের নয়। বর্তমান আইনমন্ত্রী নিশীত অধিকারী পশ্চিমবঙ্গে ঝুলে থাকা মামলার সংখ্যা ১৪ লাখ বললেও, ১৯৯৬-এর ফেব্রুয়ারিতে তদানীন্তন আইনমন্ত্রী কাইয়ুম মোল্লা বলেছিলেন, পশ্চিমবঙ্গের জজকোর্টগুলোতে ঝুলে থাকা মামলার সংখ্যা ১৭ লাখ। ওই সময় কলকাতা হাইকোর্টে ঝুলে থাকা মামলার সংখ্যা ছিল ২ লাখ ৫০ হাজার। ১৯৮৩ সালের ২২ ফেব্রুয়ারি সুপ্রীম কোর্টের এক প্রাক্তন বিচারপতির হিসেবে ওই সময় আপিল সংক্রান্ত ২ লাখ মামলা সুপ্রীম কোর্টে অমীমাংসিত অবস্থায় ছিল। পরে সে সংখ্যা কমলেও সারাদেশের হাইকোর্টগুলোতে বিচারাধীন মামলার সংখ্যা ২৮ লাখ ২৬ হাজার ২৩৮টি। আবার সারা ভারতে নিম্ন আদালতে বিচারাধীন মামলার সংখ্যা হল ২ কোটি ৭১ লাখ ৪৪ হাজারের মতো।

১৯৯৪ সালের ৩ নভেম্বরের হিসাবে দেখা গেছে, এলাহাবাদ হাইকোর্টে ৭ লাখ ৬৫ হাজার ৪২৬টি এবং মাদ্রাজ হাইকোর্টে ৩ লাখ ৪৭ হাজার ৫১৪টি মামলা ঝুলে আছে। ওই সময় এক লাখের বেশি মামলা ঝুলে ছিল দিল্লী, মুম্বাই, অন্ধ্রপ্রদেশ, কর্নাটক, কেরালা, পাঞ্জাব এবং হরিয়ানাতে। সে সবের সংখ্যা এখন আরও বেড়েছে। গত বছর সেপ্টেম্বর মাসে বিহারের মুখ্যমন্ত্রী লালু প্রসাদ যাদব বলেছেন, বিহারে ঝুলে আছে ১৩ লাখ মামলা। বিলম্বিত রায়ের পরও আবার অনেককে হাইকোর্টে ছুটতে হয়। তারপরও অনেককে ছুটতে হয় সুপ্রীম কোর্টে। হিসাব করে দেখা গেছে অনেকে শেষ চেষ্টা হিসেবে যদি সুপ্রীম কোর্টে না যেতেন তাহলে বিগত বছরসমূহে অনেকের ফাঁসি হয়ে যেত। পশ্চিমবঙ্গের কথাই ধরা যাক, বিগত ১১ বছরে ২৯ জনের ফাঁসির আদেশ হলেও উচ্চআদলতে আপীল করে ৮ জন বেকসুর খালাস পেয়েছেন, ৭ জনের যাবজ্জীবন হয়েছে, ১ জনের সশ্রম কারাদণ্ড হয়েছে এবং বাদবাকিরা উচ্চ আদালতে আপীল করে রায়ের অপেক্ষায় রয়েছেন।[৫]

নয়াদিল্লী থেকে এএফপি'র রিপোর্টে বলা হয়, স্বাধীনতা লাভের প্রায় ৫০ বছর পরেও ১৭ কোটি ভারতবাসী চরম দারিদ্র্যের পাকে নিমজ্জিত। সরকার দারিদ্র্য হ্রাসের দাবি করলেও প্রকৃতপক্ষে দারিদ্র্য বাড়ছে বলে বিশেষজ্ঞরা হুঁশিয়ারি দিয়েছেন। ভারতে অনাহারে মৃত্যু ও পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত পেটের দায়ে সামান্য টাকায় সন্তান বিক্রির খবর অস্বাভাবিক কোন ঘটনা নয়।[৬] এএফপি জানায়, ভারতের পশ্চিমাঞ্চলীয় প্রদেশ মহারাষ্ট্রে

www.pathagar.com

গত জুন থেকে তিন মাসে দু'শতাধিক শিশু না খেয়ে মারা গেছে বলে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মনোহর যোশী গত মঙ্গলবার জানিয়েছেন। গত তিন মাসে মহারাষ্ট্রের চিকলধারার ধারনী জেলায় ৬ বছর পর্যন্ত বয়সের কমপক্ষে ২১২ জন শিশু অনাহারে মারা গেছে বলে তিনি উল্লেখ করেন। শিশু মৃত্যুর এরকম ঘটনা প্রতি বছরের নিয়মিত বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে।[৭] কলকাতা থেকে অমরসাহা প্রেরিত প্রতিবেদনে বলা হয় ৫৪ বছর ধরে মাচাল লালুং নামের আসামের এক ব্যক্তি বিনা বিচারে জেলে বন্দি আছেন। ১৯৫১ সালে জেলে যাওয়ার সময় তার বয়স ছিল ২৩ বছর। এখন তিনি ৭৭ বছরের বৃদ্ধ। ১৯৫১ সালে গ্রেফতারে পর বিচারক লঘুদণ্ড দিলেও তিনি আর মুক্তি পাননি জেল থেকে। মাচাল এখন মনে করতে পারেন না অতীতের কথা। সম্প্রতি উচ্চআদালতের দৃষ্টিতে আসেন মাচাল। সুপ্রীম কোর্ট থেকে প্রধান বিচারপতি তার বন্দি জীবন সম্পর্কে আসাম সরকারের মুখ্য সচিব ও আসাম হাইকোর্টের রেজিষ্ট্রার জেনারেলকে কারণ দর্শাও নোটিশ জারি করেছেন। হাইকোর্টের নবনিযুক্ত প্রধান বিচারপতি ওয়াইকে সাভারওয়ালও নোটিশ পাঠিয়ে জানতে চেয়েছেন কেন সুদীর্ঘকাল মাচাল জেলে বন্দি এবং তার শারীরিক ও মানসিক অবস্থা কেমন?[৮]

এএফপি জানায়, ভারতের সুপ্রীম কোর্ট এক লোকের বিচার ছাড়াই ৩৮ বছর জেলে কাটানোর বিষয়টি খতিয়ে দেখছে। সুপ্রীম কোর্ট এ বিষয়ে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নিম্ন আদালতকে নির্দেশ দিয়েছে। ১৯৬৮ সালের একটি হত্যা মামলার আসামী জগজীবন রাম যাদবের মামলার নথিপত্র পুলিশ হারিয়ে ফেললে সে বিচার ছাড়াই জেলখানায় ৩৮ বছর আটক থাকে। যাদব প্রায় চার দশক থেকে উত্তর প্রদেশের ফাইজাবাদ জেলে আটক রয়েছে।[৯] নয়াদিল্লী থেকে এপি জানায়, বিচার বিভাগের ব্যাপক দুর্নীতির চিত্র তুলে ধরার লক্ষে ভারতীয় টিভি চ্যানেলের এক রিপোর্টার একজন ম্যাজিস্ট্রেটকে মাত্র ৪০ হাজার রূপী ঘুষ দিয়েছে। একটি বানোয়াট মামলায় সে দেশের রাষ্ট্রপতি, প্রধান বিচারপতি ও সুপ্রীম কোর্টের একজন সিনিয়র আইনজীবীর বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি করিয়েছেন। উৎকোচ পেয়ে উক্ত ম্যাজিস্ট্রেট এতটাই বিবেকহীন হয়ে পড়েছিলেন যে, কাদের বিরুদ্ধে তিনি গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি করছেন তা খতিয়ে দেখারও প্রয়োজন মনে করেননি। ঘটনা প্রকাশের পর ম্যাজিস্ট্রেট ব্রহ্মভাটকে সাসপেন্ড করে সুপ্রীমকোর্ট ঘটনা তদন্তের জন্য ভারতের প্রধান গোয়েন্দা সংস্থা সিবিআইকে দায়িত্ব দিয়েছে। প্রধান বিচারপতি খারে গুজরাটের ওই ম্যাজিস্ট্রেটের বিরুদ্ধে আদেশদানকালে বলেন, ৪০ হাজার রুপি দিয়ে যেখানে বিচারের আদেশ পাওয়া সম্ভব এবং এই যদি হয় পরিস্থিতি তবে এ দেশের যে কি হবে তা জানেন কেবল সৃষ্টিকর্তা। মামলার বাদী জিটিভির প্রতিবেদক শেখর সংবাদপত্রকে বলেন, বিচার ব্যবস্থার অন্তরালে যে দুর্নীতি রয়েছে তা জনসমক্ষে প্রকাশ করে দেয়ার জন্যই তিনি ঘা মেরেছেন।[১০]

অমর সাহা, কলকাতা : এ যেন অবিশ্বাস্য ঘটনা। একটি মামলার বয়স এখন ১৭৩ বছর। হ্যাঁ, সত্যিই তাই। পৌনে ২০০ বছর পর মামলাটির এখনও নিষ্পত্তি হয়নি। এখন

www.pathagar.com

অবশ্য মামলাটি বিচারের জন্য অপেক্ষা করছে কলকাতা হাইকোর্টে বর্তমান প্রধান বিচারপতি ভিএস শিবপুরকর ও বিচারপতি অশোক গঙ্গোপাধ্যায়ের ডিভিশন বেঞ্চে। এটিই সম্ভবত ভারতের সবচেয়ে পুরনো মামলা। এখন এই মামলা দ্রুত নিষ্পত্তির দাবি তুলেছেন শোভাবাজার রাজবাড়ীর এক বংশধর অলককৃষ্ণদেব। কলকাতার বিখ্যাত শোভাবাজার রাজবাড়ীর প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন রাজা রাজকৃষ্ণদেব। জীবদ্দশায় তিনি তার ৮ ছেলেকে দেবোত্তরসহ ওই সম্পত্তি উইলের মাধ্যমে সমান ভাগ করে দিয়ে যান। ১৮২৫ সালে তার মৃত্যুর ৮ বছর পর ১৮৩৩ সালে রাজবাড়ীর মন্দিরের প্রতিদিনের পূজোর খরচ নির্বাহের জন্য জনৈক কৃষ্ণচন্দ্র ঘোষ মামলা দায়ের করেন সুপ্রিমকোর্টে। তখন উপমহাদেশে হাইকোর্ট প্রতিষ্ঠা হয়নি; জন্ম হয়নি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের। উইলের এক্সিকিউটর কৃষ্ণচন্দ্র মামলা দায়েরের পর এক ইংরেজ আইনজীবীকে রিসিভার নিয়োগ করেন। সেই থেকে রিসিভার বদল হয়ে চলে আসছে মামলাটি। মামলা দায়েরের ২৯ বছর পর কলকাতা হাইকোর্ট প্রতিষ্ঠা হলে সেখানকার মামলাটি স্থানান্তরিত হয়ে চলে আসছে। পৌনে ২০০ বছর আগে সেখানের দুর্গাপূজায় খরচ হতো ১শ' টাকা আর এখন ২০ লাখ টাকা। তাই রাজবাড়ীর বর্তমান বংশধর অলককৃষ্ণদেব হাইকোর্টে আবেদন জানিয়ে বলেছেন, মামলাটি দ্রুত নিষ্পত্তি করে অবিলম্বে দেবোত্তর সম্পত্তি বিক্রির অনুমতি দেয়া হোক।[১১] ভারতে সুষ্ঠু ও সময়োচিত বিচার প্রাপ্তির সম্ভাবনা অনেক ক্ষেত্রেই একটা দুরাশামাত্র। বিচার ব্যবস্থার শ্লথগতির কারণে অসহনীয় বিলম্ব ঘটে। বিভিন্ন রাজ্যের হাইকোর্টসমূহে ৩৩ লাখের মতো মামলা স্তূপীকৃত হয়ে আছে। এর মধ্যে ৫ লাখ মামলা ১০ বছর ধরে ঝুলছে। নিম্ন আদালতগুলোতে বিচারাধীন মামলার সংখ্যা ৪৫ লাখের অধিক। 'বেঙ্গালোর স্কুল অব ল' এর বিশ্লেষণ মতে আদালতের সমন কিংবা জরুরি নোটিশ জারি করতে অধিকাংশ ক্ষেত্রে ৩ মাস থেকে ৩ বছর লাগে। লিখিত বিবরণী পেশ করতে ৬ মাস থেকে ২ বছর সময় লেগে যায়। অধিকাংশ ক্ষেত্রে হাইকোর্টের জারিকৃত সমন এমন মন্তব্যসহ ফেরত আসে যে প্রাপক নিরুদ্দেশ।

ভারতীয় বিচার ব্যবস্থার দীর্ঘসূত্রিতার কাহিনী সর্বজনবিদিত। ভূপালের গ্যাস দুর্ঘটনা মামলা পরিচালনার জন্য নিউইয়র্কের বিশেষজ্ঞ মার্ক গালন্টার যুক্তি দেখিয়েছেন যে, ভারতের বিচার ব্যবস্থার দীর্ঘসূত্রিতার কারণে ক্ষতিগ্রস্তরা দ্রুত সুবিচার পায়নি। দুর্নীতি ও দীর্ঘসূত্রিতার কারণে ১৯৮৪ সালে ইন্দিরা গান্ধী নিহত হবার পরবর্তী দফায় শিখ হত্যার সাথে জড়িত হিন্দু খুনিদের শাস্তি এখনও হয়নি। ১৯৯২ সালে বাবরী মসজিদ ভাঙ্গার অভিযানে নেতৃত্বদানকারী উগ্রবাদী হিন্দু নেতা লালকৃষ্ণ আদভানিকে মামলা থেকে রেহাই দেয়া হয়েছে। সাবেক প্রধান বিচারপতি এসপি ব্রারচারের মতে ভারতের ২০ শতাংশ অর্থাৎ প্রতি পাঁচটির মধ্যে একটি বিচার কর্ম দুর্নীতিদুষ্ট। দাবি করা হয় যে, ব্রিটিশদের কাছ থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত ভারতে পাশ্চাত্য ধাঁচের বিচার ব্যবস্থা ও আইনের শাসন বিদ্যমান। কিন্তু বাস্তবতা এমন যে, বিনা বিচারে হাজার হাজার ব্যক্তি কারাগারে পচে মরে। বিনা বিচারে হত্যা ও আটকাবস্থায় নির্যাতন জনিত শত শত মৃত্যুর

www.pathagar.com

আপিল ক্ষমতা পরিচালনা করার অধিকারী হয়।[১৩] কলকাতা হাইকোর্টের স্থায়ী বিচারপতি আক্রাম ও মিঃ ওরমন্ড, অতিরিক্ত বিচারপতি টিএইচ এলিস, আমির উদ্দিন আহমদ ও অস্থায়ী বিচারপতি আমিন আহমেদকে নিয়ে তখন পূর্ব পাকিস্তান হাইকোর্ট গঠিত হয়েছিল।[১৪] পূর্ববঙ্গ তথা পূর্ব পাকিস্তান ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনের বিধান মতে পাকিস্তানের অন্যতম প্রদেশ হিসেবে শাসিত হতে থাকে। ব্রিটিশ শাসনের অবসান হলেও সদ্য স্বাধীন পাকিস্তানে বিচার ব্যবস্থার কোন পরিবর্তন ঘটেনি। ব্রিটিশ প্রতিষ্ঠিত দেওয়ানি ও ফৌজদারি আদালতগুলো পূর্ববঙ্গ তথা পূর্ব পাকিস্তানের মহকুমা ও জেলাগুলোতে চালু থাকে। ওই সকল অধস্তন আদালতগুলো নবপ্রতিষ্ঠিত পূর্ব পাকিস্তান হাইকোর্টের অধীনস্থ হয়। ব্রিটিশ আমলের ১৮৮৭ সালের দেওয়ানি আদালত আইন, ১৮৯৮ সালের ফৌজদারি কার্যবিধি ও ১৯০৮ সালের দেওয়ানি কার্যবিধির বিধান, অনুযায়ী মহকুমা ও জেলা আদালতগুলোর গঠন ও এখতিয়ার নিয়ন্ত্রিত হতে থাকে। তাছাড়া ব্রিটিশ আমলের যাবতীয় আইন সামান্য সংশোধিত আকারে স্বাধীন পাকিস্তানে কার্যকর করা হয়।

১৯৫০ সালের ফেডারেল কোর্ট (এনলার্জমেন্ট অব জুরিসডিকশন) এ্যাক্ট এবং ওই সালের প্রিভিকাউন্সিল (এবলিশন অব জুরিসডিকশন) এ্যাক্ট এর বিধান মতে ১৯৪৭ সালের ফেডারেল কোর্ট অর্ডার দ্বারা প্রতিষ্ঠিত পাকিস্তান ফেডারেল কোর্টে ঢাকা হাইকোর্টের রায়ের বিরুদ্ধে এবং ইংল্যান্ডের প্রিভিকাউন্সিলের পরিবর্তে আপিল দায়ের কারার বিধান বলবৎ করা হয়।[১৫] ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইন সংশোধন করে ১৯৫৪ সালে নব সংযোজিত ২২৩ক, ধারার বিধান মতে পাকিস্তানের শাসনতন্ত্র প্রণয়ন হওয়ার পূর্ব থেকেই হাইকোর্টকে রিট এখতিয়ার পরিচালনা করার ক্ষমতা দেয়া হয়েছিল। কিন্তু ওই সংশোধনী আইনটি পাকিস্তানের গভর্নর জেনারেলের সম্মতি লাভ না করায় পাকিস্তান ফেডারেল কোর্ট তা বেআইনী ঘোষণা করেছিল। ১৯৫৬ সালে ইসলামী প্রজাতন্ত্র পাকিস্তানের সংবিধান বলবৎ হলে ওই সংবিধানের বিধানমতে পাকিস্তান ফেডারেল কোর্টের স্থলে পাকিস্তান সুপ্রীম কোর্ট প্রতিষ্ঠিত হয় এবং পূর্ব পাকিস্তান হাইকোর্টসহ সব প্রাদেশিক হাইকোর্ট পাকিস্তান সুপ্রীমকোর্টের অধীনে ন্যস্ত করা হয়। ওই সংবিধানে সুপ্রীমকোর্ট ও হাইকোর্টকে সাবেক কলকাতা সুপ্রীমকোর্ট ও হাইকোর্টের মত দেশের সমগ্র এলাকায় রিট এখতিয়ার পরিচালনা করার ক্ষমতা দেয়া হয়।[১৬]

ব্রিটিশরা এদেশে যে শত শত আইন প্রণয়ন করেছিল তাতে এদেশের জনগণের কোন প্রতিনিধিত্ব ছিল না। তাদের খেয়ালখুশি মতো তৈরি এসব আইন ছিল পরাধীন জাতিকে শোষণ লুন্ঠন করার উদ্দেশ্যে। পরাধীন আমলের পরিত্যক্ত আইনগুলোকে জোড়াতালি দিয়ে পুনঃপ্রবর্তন করার ফলে সদ্য স্বাধীন পাকিস্তানের রাষ্ট্রক্ষমতায় যারা অধিষ্ঠিত থাকেন তাদের হয় পোয়াবারো। আর ব্যাপক জনগোষ্ঠী সেই আগের মতোই বঞ্চিত শোষিত হতে থাকে। ভগ্নহৃদয়ে জনগণ দেখতে পায় ব্রিটিশদের মতোই স্বদেশী শাসকরা

www.pathagar.com

এখন রাষ্ট্রীয় সম্পদ দু'হাতে লুটছে। হিন্দুদের পরিত্যক্ত বাড়িঘর যা রাষ্ট্রীয় সম্পদ হতে পারতো তা জবরদখল করছে মুসলিম লীগের চাঁইরা। রক্ত-মাংসে চেহারায় এদেশীয় হলেও মনমানসিকতায় এরা ছিল খাঁটি ইংরেজ। ইসলামী দর্শনে প্রতিটি সম্প্রদায়ের মধ্যে রাষ্ট্রীয় সম্পদের সুষম বন্টন এবং ইনসাফভিত্তিক আইন প্রণয়ন বাধ্যতামূলক। আচকান শেরওয়ানী ও জিন্নাহ টুপি মাথায় দিয়ে মুসলিম লীগের নেতারা সভা সমাবেশে সর্বদা বলতো তারা পাকিস্তানে কোরআন সুন্নাহবিরোধী কোন আইন পাস হতে দেবে না। কিন্তু বিবাহ ও সম্পত্তি বাটোয়ারা আইন ছাড়া রাষ্ট্রীয় বিচার ব্যবস্থার কোথাও কোরআন সুন্নাহভিত্তিক আইনের অস্তিত্ব তারা রাখেনি। এই মুসলিম লীগাররা মনে করতো তাদের বিরোধিতা করা মানে পাকিস্তানের বিরোধিতা করা, আর পাকিস্তানের বিরোধিতা করা মানে ইসলামের বিরোধিতা করা। এভাবে তারা নিজেদের হীন রাজনৈতিক স্বার্থ চরিতার্থ করতে ইসলামকে নিয়ে ভণ্ডামী, প্রতারণা ও সস্তা ধর্মপ্রীতি দেখিয়ে জনগণকে ধোকা দেয়া শুরু করে।

মর্মাহত মানুষ অবাক বিস্ময়ে দেখতে পায় যে নামেই শুধু ইসলামী প্রজাতন্ত্র পাকিস্তান, কিন্তু কর্মক্ষেত্রে সেই ঘৃণিত ঔপনিবেশিক কাঠামোটিই অটুট রেখেছে স্বদেশী শাসকগোষ্ঠী। এখন জমিদারি জুলুম নেই কিন্তু তার স্থান দখল করেছে তহশিলদার। তহশিলদাররা জমিদারদের মতো প্রজাদের দৈহিক নির্যাতন করতে পারতো না বটে, কিন্তু তারা দায়বদ্ধহীনভাবে একজনের সম্পত্তি অপর জনের নামে খতিয়ান পর্চা করে দিচ্ছে অবৈধ অর্থের বিনিময়ে যা মামলা-মোকদ্দমার সংখ্যা বৃদ্ধি করে চলেছে আগের মতোই। সেই তামাদি আইনের জুলুমে নির্দিষ্ট সময় পর মানুষের বৈধ দাবি নাকচ করে দিচ্ছে আদালত। পতিতাবৃত্তি আর পতিতালয়ও আছে ব্রিটিশ আমলের আদলে। সুনির্দিষ্ট অভিযোগ ছাড়াই ফৌজদারি কার্যবিধির ৫৪ ধারার সন্দেহভাজন অপরাধী হিসেবে পুলিশ যাকে তাকে গ্রেফতার করে ১৬৭ ধারায় রিমান্ডে নিয়ে পিঠের চামড়া তুলে দেয়ার পরও পুলিশকে জবাবদিহি করতে হচ্ছে না, যা পুলিশী উৎকোচের রাস্তাকে নিরাপদ রেখেছে। খাজনা অনাদায়ে বাড়ি নিলাম হচ্ছে সেই ব্রিটিশ আমলের মতোই। ভূমি বিরোধে গ্রাম্য টাউট আর লাঠিয়ালরাও আছে বহাল তবিয়তে। দাদন ব্যবসায়ী আর সরকারী ব্যাংক ঋণের সুদও আছে এবং সুদ পরিশোধে অক্ষম ব্যক্তির বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা আর তার সহায়সম্পদ ক্রোক করছে আদালত। ইসলামী আইনে ১৬ বছরের যুবতীকে বৈধভাবে বিয়ে করে কোন কারণবশত মামলা মোকদ্দমা হলে ব্রিটিশ আইনের ১৮ বছরের শর্ত পালিত না হওয়ায় জেল জরিমানা হচ্ছে। জাল দলিল দ্বারা লাঠিয়াল সহযোগে অপরের সম্পত্তি আত্মসাৎ চলছে সেই আগের মতো। দরিদ্র মানুষ এর বিরুদ্ধে আদালতে বিচার চাইতে গেলে উকিল, মোক্তার, পেশকার, পুলিশ দ্বারা দফায় দফায় লুণ্ঠিত হবার পর বহু স্তরবিশিষ্ট আদালতে দুর্গম ও ব্যয়বহুল আপিল প্রক্রিয়ায় অনির্দিষ্টকালের মামলা চালিয়ে মামলার খরচ যোগাতে ভিটেমাটি বিক্রি করে নিঃস্ব হচ্ছে

www.pathagar.com

সেই ব্রিটিশ আমলের মতোই। বিচার প্রক্রিয়ার এই জুলুমের বিরুদ্ধে টু শব্দটি করলে ব্রিটিশদের তৈরি সেই আদালত অবমাননা আইনটি প্রতিবাদী মানুষের টুটি চেপে ধরছে। ব্রিটিশদের তৈরি ১৯০৯ সালের আবগারী আইনটিও ইসলামী প্রজাতন্ত্র পাকিস্তানে বহাল তবিয়তে রাখা হয়। যে আইনের ৪৯ ধারায় বলা হয়েছে, কোন লাইসেন্সপ্রাপ্ত ভেণ্ডার অথবা তার কর্মচারী কোন মাদকদ্রব্যে পানি মেশালে বা ভেজাল করলে তার তিন মাস কারাদণ্ড বা এক হাজার টাকা অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হবে এবং ৫০ ধারায় বলা হয়েছে কোন লাইনেন্সপ্রাপ্ত ভেণ্ডার দেশী মদ প্রতারণাপূর্বক বিলেতি মদ হিসেবে বিক্রি করলে তার তিন মাস পর্যন্ত কারাদণ্ড ৫শ' টাকা অর্থদণ্ড অথবা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হবে।

এসব আইন, পরের সম্পদ আত্মসাৎ, বিলম্বিত ব্যয়বহুল হয়রানিমূলক বিচার ব্যবস্থা, সুদ, উৎকোচ, মাদকদ্রব্য, পতিতাবৃত্তি, জোর জবরদস্তি, মিথ্যাচার, ভণ্ডামি ইসলামে কড়াকড়িভাবে নিষিদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও ইসলামী প্রজাতন্ত্র পাকিস্তানের রাষ্ট্র কাঠামোতে এসব অনাচারই প্রতিষ্ঠিত করে তদানিন্তন শাসকগোষ্ঠী। প্রতারিত সমগ্র পাকিস্তানের মানুষ এসব ঘটনায় দারুণ মর্মাহত এবং পূর্ব পাকিস্তানবাসী ক্রুদ্ধ হয় এতে। পাকিস্তান সৃষ্টি হয়েছিল যুদ্ধের মাধ্যমে নয়; আন্দোলন, সংগ্রাম এবং আলোচনার মাধ্যমে যার অগ্রভাগে ছিল পূর্ববঙ্গের মানুষ।

১৯০ বছর পর স্বাধীনতা পাওয়ার আনন্দ দ্রুত উবে যেতে থাকে এবং পূর্ব পাকিস্তানবাসী দেখতে পায় শাসন-প্রশাসন, অফিস-আদালত, ব্যবসা-বাণিজ্য সর্বত্র একচ্ছত্র আধিপত্য বিস্তার করছে পশ্চিম পাকিস্তানি সংখ্যাগরিষ্ঠ উর্দূভাষীরা। তাদের অদূরদর্শী পৃষ্ঠপোষকতায় ধর্মের আনুষ্ঠানিকতা বেড়ে যায় এবং রাষ্ট্রীয় আনুকূল্যে পীরদের প্রভাব প্রতিপত্তিও বৃদ্ধি পায়। সরকারি কর্মকাণ্ড, টাকা, পোস্টকার্ড, ইনভেলাপ, মানি অর্ডার ফরমে উর্দুর পাশাপাশি ইংরেজি ভাষা ব্যবহার হচ্ছে যেখানে পাকিস্তানের গরিষ্ঠ জনতার বাংলাভাষার কোন স্থান নেই।

পশ্চিম পাকিস্তানি কেন্দ্রীক নতুন শাসকগোষ্ঠী মনে করে ধর্মীয় প্রতারণার পলেস্তারা দিয়ে আর বেশিদিন ঔপনিবেশিক আইন ও বিচার ব্যবস্থাকে আড়াল করে রাখা যাবে না। পাকিস্তানকে ঐক্যবদ্ধ রাখতে তাই পূর্ব পাকিস্তানের গণমানুষের বাংলা ভাষা বাদ দিয়ে তার স্থলে সমগ্র পাকিস্তানে পশ্চিম পাকিস্তানের উর্দুভাষা চাপিয়ে দেয়ার এক বিপজ্জনক ঝুঁকি নেয় তারা। ১৯৪৮ সালের ২৫ ফেব্রুয়ারি করাচিতে গণপরিষদের অধিবেশনে বাংলায় বক্তৃতা দিতে গিয়ে গণপরিষদ সদস্য ধীরেন দত্ত প্রত্যাখ্যাত হন। এ খবর পাওয়ার পর পরবর্তী ১১ মার্চের রাষ্ট্রভাষা বাংলার দাবির আন্দোলনে ঢাকা শহর প্রায় অচল হয়ে পড়ে। পাকিস্তানের প্রতিষ্ঠাতা এবং গভর্নর জেনারেল মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ ২১ মার্চ রমনা রেসকোর্স ময়দানে এক বিশাল জনসভায় ঘোষণা করেন উর্দুই হবে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা। ২৪ মার্চ কার্জন হলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সমাবর্তন অনুষ্ঠানেও মিঃ জিন্নাহ একই কথা বলেন। এর প্রতিবাদে ফুঁসে ওঠে পূর্ব পাকিস্তান। বাংলা ভাষাকে কেন্দ্র

www.pathagar.com

করে পাকিস্তানের দুই অংশের তিক্ততা বৃদ্ধি পেতে থাকে। ফলে গণমানুষের যে আন্দোলনটি হতে পারতো ঔপনিবেশিক আইন ও বৈষম্যমূলক বিচার ব্যবস্থা পরিবর্তনের; তা দিকভ্রান্ত হয়ে রূপ নেয় বাংলাভাষা প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে। ১৯৫২ সালে পল্টন ময়দানে তদানীন্তন প্রধানমন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দীন পুনর্বার উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা করার ঘোষণা দিয়ে পূর্ব পাকিস্তানকে বানিয়ে ফেলেন আন্দোলনের এক উত্তপ্ত চুল্লিতে। ৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি বাংলাভাষা প্রতিষ্ঠার দাবিতে হরতাল সমাবেশে ঢাকায় পুলিশের গুলিতে ২১ জন হতাহত হন। নিহত হন ৪ জন। পূর্ব পাকিস্তানিরা দেখতে পায় প্রতিবাদ বিক্ষোভ মিছিলে নিরস্ত্র মানুষ হত্যায় ব্রিটিশ ও পাকিস্তানি শাসকদের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। ১৯৫৬ সালে পাকিস্তান সরকার বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে স্বীকৃতি দিতে বাধ্য হয় কিন্তু তখন অনেক দেরি হয়ে গেছে। এর আগে ১৯৫৪ সালের জাতীয় নির্বাচনে পূর্ব পাকিস্তানিরা মুসলিম লীগের স্বেচ্ছাচারিতা ও হটকারিতার বিরুদ্ধে প্রতিশোধ নিয়ে নেয়। ওই নির্বাচনে পূর্ব পাকিস্তানের আঞ্চলিক জোট যুক্তফ্রন্ট মোট ৩০৯টি আসনের মধ্য ২৮৮ আসন লাভ করে।

১৯৪৭ সালের স্বাধীনতা আইন অনুযায়ী নবগঠিত পাকিস্তানের জন্য একটি শাসনতন্ত্র প্রণয়নের উদ্দেশে সে বছরই একটি গণপরিষদ গঠন করা হয়। ১৯৫৫ সালে পাকিস্তানের জন্য দ্বিতীয় গণপরিষদ গঠনের আদেশ জারি করা হয়। ১৯৫৬ সালের ২৯ ফেব্রুয়ারি পাকিস্তানের শাসনতন্ত্র অনুমোদনের জন্য শেষ বিতর্ক অনুষ্ঠিত হয়। এরপর সামান্য পরিবর্তন ও পরিবর্ধনের মাধ্যমে তদানীন্তন গভর্নর জেনারেল ইস্কান্দার মীর্জা শাসনতন্ত্রটি ১৯৫৬ সালের ২ মার্চ স্বাক্ষর করার পর তা কার্যকর হয় ২৩ মার্চ থেকে। বাংলা ভাষা নিয়ে তিক্ততা সৃষ্টি করে পাকিস্তানের এ গণতান্ত্রিক অভিযাত্রাটিও স্বাধীন দেশের জনগণের আকাঙ্ক্ষার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ ছিল না। ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক বিচার ব্যবস্থার মতো প্রকৃতপক্ষে এটিও ছিল ব্রিটিশ গণতন্ত্রের ঔপনিবেশিক সংস্করণ। কারণ ব্রিটিশ আমলে ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইন অনুযায়ী ১৯৩৭ সালে ভারতব্যাপী নির্বাচনের মাধ্যমে যে ১১টি প্রাদেশিক আইন পরিষদের মাধ্যমে প্রাদেশিক সরকার গঠিত হয়েছিল তার কোনটিরই বাজেট বা আইন প্রণয়নের ক্ষমতা ছিল না। তখন প্রদেশে ইংরেজ গভর্নরের পূর্ব অনুমোদন ছাড়া কোন প্রাদেশিক আইন বা প্রাদেশিক সরকারের বার্ষিক বাজেট জনগণের নির্বাচিত আইন পরিষদে উত্থাপন করা যেত না যা ছিল গণতন্ত্রের ঔপনিবেশিক সংস্করণ। এর নির্লজ্জ অনুকরণ করতে গিয়ে কেন্দ্রের তথা পশ্চিম পাকিস্তানের অনুমোদন ছাড়া বাজেট বা আইন পাস করা যেত না। আরো বিস্ময়ের বিষয় নির্বাচনে বিজয়ী এবং প্রতিদ্বন্দ্বী রাজনৈতিক দলগুলো দেশে সুবিচার প্রতিষ্ঠার প্রতিশ্রুতি না দিয়ে সবাই সুশাসন ও গণতন্ত্রের বুলি আওড়িয়ে যেতে থাকে। (এ অবস্থা আজো বিদ্যমান) স্বাধীন দেশের জনগণের চাহিদার অনুপযুক্ত বৈষম্যমূলক ঔপনিবেশিক আইন ও বিচার ব্যবস্থার অসন্তোষ বহাল রেখে কোন গণতন্ত্র ও সরকার স্থিতিশীল থাকতে পারে না; এই বাস্তবতা খুব শিগগিরই পরিস্ফুট হয়। সদ্য স্বাধীন দেশের ঐক্য ও অখণ্ডতা

www.pathagar.com

টেকসই রাখতে যেটা সবচেয়ে জরুরি ছিল সেই ন্যায়বিচার বাদ দিয়ে ক্ষমতার কাড়াকাড়িতে নির্বাচিত সদস্যরা এক পর্যায়ে হিংসা হানাহানি ও উন্মুক্ত সংঘাতে জড়িয়ে পড়েন। ফলশ্রুতিতে পূর্ব পাকিস্তান প্রাদেশিক পরিষদের অধিবেশনে সদস্যদের মারামারিতে ডেপুটি স্পিকার শাহেদ আলী গুরুতর আহত হয়ে ১৯৫৮ সালের ২৬ সেপ্টেম্বর ঢাকা মেডিকেলে মারা যান। এ প্রেক্ষিতে দেশের দুই অংশের চরম অরাজকতা ও অস্থিরতায় এক শ্বাসরুদ্ধকর পরিস্থিতির উদ্ভব হয় যা ক্ষমতালোভী সেনাবাহিনীর রাষ্ট্রক্ষমতা দখলের পথকে প্রশস্ত করে দেয়।

কেন্দ্র এবং উভয় প্রদেশের রাজনৈতিক ও সাংবিধানিক সংকটাবস্থায় শাহেদ আলীর মৃত্যুর পর এক মাসের মাথায় পাকিস্তানের তদানিন্তন প্রেসিডেন্ট ইস্কান্দার মীর্জা সারাদেশে সামরিক আইন জারি করে সেনা প্রধান আয়ুব খানকে প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক নিযুক্ত করেন, যদিও পাকিস্তানের শাসনতন্ত্রে সামরিক আইন জারির কোন বিধান ছিল না। এ জন্য শাসনতন্ত্রটিও বাতিল হয়ে যায়। পাকিস্তানের প্রথম সামরিক আইন ঘোষণাটি ছিল নিম্নরূপ-

ডেট লাইন ৩১ অক্টোবর, ১৯৫৮ নং এফ-৮১ প্রেস/৫৮, তাং ২৫ অক্টোবর ১৯৫৮। গেজেট অব পাকিস্তান।

১৯৫৮ সালের অক্টোবর মাসের ৭ম দিবসে সকাল ১০টা ৩০ মিনিটে প্রেসিডেন্ট ইস্কান্দার মীর্জা কর্তৃক ঘোষিত নিম্নলিখিত ঘোষণাপত্র সর্বসাধারণের অবগতির জন্য প্রকাশ করা হলো ঃ

'ক্ষমতার জন্য নির্মম হানাহানি, দুর্নীতি, আমাদের সরল সৎ, দেশপ্রেম ও পরিশ্রমী জনসাধারণের নির্লজ্জ শোষণ, শিষ্টাচারের অভাব এবং রাজনৈতিক উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য ইসলামের অপব্যবহার বিগত দু'বছর ধরে আমি চরম উদ্বেগের সাথে লক্ষ করছি। সাম্প্রতিককালে আমাদের রাজনীতিবিদদের কেউ কেউ রক্তাক্ত বিপ্লবের বুলি আওড়াচ্ছেন। এদের মধ্যে আর এক ধরনের ভাগ্যান্বেষী রয়েছেন যারা বিদেশে গিয়ে বিদেশী শক্তির সাথে যোগসাজশ স্থাপন করা উপযুক্ত মনে করে।... বিগত তিন বছর ধরে গণতান্ত্রিক উপায়ে শাসনতন্ত্রকে কার্যকরী করার জন্য আমি আমার সাধ্যানুযায়ী চেষ্টা করেছি। সকলের মধ্যে একতা সৃষ্টির জন্য আমি বহুবার প্রয়াস পেয়েছি। কিন্তু দেশপ্রেম বর্জিত কিছু দেশদ্রোহীর উদ্দেশ্যে, রাষ্ট্রপ্রধানকে আক্রমণ করে পাকিস্তানের মর্যাদাহানি করা ও সরকারকে ধ্বংস করার লক্ষে তারা বেশ কিছু সাফল্য অর্জন করেছে এবং যদি এ অবস্থা চলতে দেয়া হয় তাহলে তারা তাদের চূড়ান্ত উদ্দেশ্য হাসিলে সক্ষম হবে। অভ্যন্তরীণ পরিস্থিতি সম্পর্কে আমার বিবেচনা আমাকে এ কথা বিশ্বাস করতে বাধ্য করেছে যে বর্তমান পদ্ধতির সরকারের প্রতি জনসাধারণের বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশের আর কোন আস্থা নেই। এত দুঃখ দুর্দশার পর ১৯৫৬ সালের ২৩ মার্চ তারিখে যে শাসনতন্ত্র প্রবর্তিত হয়েছিল সেটা কার্যকরী প্রমাণিত হয়নি। বলা হয়ে থাকে শাসনতন্ত্র

www.pathagar.com

ঘটনা ঘটছে। ক্যালিফোর্নিয়া থেকে নির্বাচিত রিপাবলিকান প্রতিনিধি ডানা রোবারচর গত বছর বলেন, শিখ, কাশ্মিরী এবং অন্যান্য সংখ্যালঘুর জন্য ভারত নাজি জার্মানির মতোই ভয়ংকর। ভারতীয় পরিকল্পনাবিদদের স্বীকৃত মতে, ২৬ কোটি ভারতীয় এখনো দারিদ্র্যসীমার নিচে বাস করে যদিও ভারতের সিংহভাগ অর্থই ব্যয় হয় সামরিক খাতে। গৃহশুমারী তথ্য মতে, অধিকাংশ ভারতীয়ই বিপর্যস্ত জীবনযাপন করে। বিশ্বব্যাংকের অর্থনীতি বিষয়ক বিশেষজ্ঞ মার্টিন রাবলিন ব্যাখ্যা করে বলেছেন, ভারতের অধিকাংশ দরিদ্র জনগোষ্ঠী গ্রামাঞ্চলে বাস করে যারা কৃষির ওপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল যদিও এ খাতটি অনেকাংশে পশ্চাৎপদ ও সেকেলে। ভারতের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি ওসব অঞ্চলেই হয়েছে যেগুলো আগে থেকেই উন্নততর। অভ্যন্তরীণ এ বেহাল অবস্থা কাটিয়ে ওঠার চেষ্টা না করে ভারতীয় নেতৃত্ব ভারতকে সামরিক ক্ষেত্রে একটি পরাশক্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। কেবল সামরিক শক্তি এবং ভৌগোলিক বিশালত্বই যে একটি দেশকে বড় করে না কম্যুনিজম এবং সোভিয়েত ইউনিয়নের পতন তার প্রমাণ।[১২]

যৎসামান্য সংশোধনের পর ব্রিটিশদের সেই ঔপনিবেশিক আইন কানুনগুলোর অধীনে পাকিস্তান ও ভারতের বিচার ব্যবস্থা পরিচালিত হওয়ায় স্বাধীনতার ৫৮ বছর পরও এশিয়ার সে দুটি দেশের বৃহত্তর জনগোষ্ঠী দরিদ্রতাকে পরাভূত করতে পারেনি। গত অর্ধশতাব্দীরও বেশি সময় ধরে বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর বিচার-বঞ্চনাজনিত হতাশার ক্রোধকে লক্ষভ্রষ্ট করার কৌশল হিসেবে ভারত ও পাকিস্তানের কর্ণধারগণ ধর্মীয় সংঘাতভিত্তিক রাষ্ট্রচিন্তা, পারস্পরিক বৈরিতা, যুদ্ধবিগ্রহ এবং পরমাণু বোমাসহ যুদ্ধাস্ত্রের স্তূপ প্রদর্শনের মাধ্যমে সমাধান খুঁজে বেড়াচ্ছেন। অথচ ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক আমলের সেই বৈষম্যমূলক আইনকানুন ও বিচার প্রক্রিয়া আমূল পরিবর্তনের মাধ্যমে দেশে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করে এতোদিন দেশ দুটি হতে পারতো দক্ষিণ এশিয়ার শ্রেষ্ঠ সমৃদ্ধিশালী ও দাতাদেশ। আমেরিকা বহির্বিশ্বে যতো অপরাধই করুক না কেন নিজ দেশের অভ্যন্তরে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠিত থাকায় বৃহৎ এ দেশটির অর্ধশত অঙ্গরাজ্যের কোনটিতেই বিচ্ছিন্নতাবাদী তৎপরতার কোন ইতিহাস নেই। এ দৃষ্টান্তকে সামনে রেখে ভারত ও পাকিস্তান নিজেদের দেশের বিচ্ছিন্নতাবাদী তৎপরতারও অবসান করতে পারে।

পাকিস্তান আমলের বিচার ব্যবস্থা: ঔপনিবেশিক ইসলামী ও সামরিক আইনের জগাখিচুড়ি

১৯৪৭ সালের ১৪ আগস্টের পর থেকে ভারতীয় উপমহাদেশে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনের সমাপ্তি ঘটে। ব্রিটিশ পার্লামেন্টের ১৯৪৭ সালের ভারতীয় স্বাধীনতার আইনের বিধান অনুযায়ী ভারতীয় উপমহাদেশ পাকিস্তান ও ভারত নামে দুটি স্বাধীন রাষ্ট্রে বিভক্ত হয়। ব্রিটিশ আমলের বাংলা প্রদেশের পূর্বাংশের জেলাগুলো পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হয়। ওই আইনের ৯নং ধারার বিধান অনুযায়ী প্রণীত ১৯৪৭ সালের হাইকোর্ট (বেঙ্গল) অর্ডার দ্বারা ঢাকায় পূর্ব পাকিস্তান হাইকোর্ট প্রতিষ্ঠিত হয়। নব প্রতিষ্ঠিত পূর্ব পাকিস্তান হাইকোর্ট পূর্ববঙ্গ পরবর্তীকালে পূর্ব পাকিস্তান প্রদেশে কলকাতা হাইকোর্টের যাবতীয় আদি ও

www.pathagar.com

পবিত্র। কিন্তু শাসনতন্ত্র অথবা অন্য কোন কিছু থেকেও অধিকতর পবিত্র হচ্ছে দেশ এবং দেশের জনসাধারণের কল্যাণ ও সুখ। রাষ্ট্রপ্রধান হিসেবে আল্লাহ তায়ালা এবং জনসাধারণের কাছে আমার প্রধান দায়িত্ব হচ্ছে দেশের সংহতি। রাষ্ট্রদ্রোহী ও রাজনৈতিক ভাগ্যান্বেষীদের নির্মম কার্যকলাপে এ সংহতি ভয়াবহরূপে বিপদাপন্ন। বর্তমান শাসনতান্ত্রিক পদ্ধতিতে প্রতিষ্ঠিত সরকারের পক্ষে রাজনীতিকদের স্বার্থপরতা, ক্ষমতার মোহ এবং দেশদ্রোহিতা-মূলক কার্যকলাপ রোধ করা সম্ভব নয়। দেশকে ধ্বংস করার উদ্দেশ্যে পরিচালিত কার্যকলাপ আমি আর নীরব দর্শকের মত দেখতে পারি না। গভীর উৎকণ্ঠাপূর্ণ চিন্তা-ভাবনার পর আমি এ দুঃখজনক সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছি যে-

(ক) ১৯৫৬ সালের ২৩ মার্চের শাসনতন্ত্র বাতিল করা হলো। (খ) কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সরকারসমূহ অবিলম্বে বাতিল করা হলো। (গ) জাতীয় পার্লামেন্ট ও প্রাদেশিক পরিষদসমূহ ভেঙ্গে দেয়া হলো। (ঘ) সকল রাজনৈতিক দল বাতিল করা হলো। (ঙ) বিকল্প ব্যবস্থা গ্রহণ করা পর্যন্ত পাকিস্তান সামরিক আইনের আওতাভুক্ত হলো। আমি এতদ্বারা পাকিস্তান সেনাবাহিনীর সর্বাধিনায়ক জেনারেল মুহম্মদ আইয়ুব খানকে প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক হিসেবে নিযুক্ত করছি এবং পাকিস্তানের সকল সশস্ত্র বাহিনীকে তার নেতৃত্বাধীনে স্থাপন করছি। স্বাক্ষরঃ ইস্কান্দার মীর্জা, পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট। গেজেট অব পাকিস্তান। অতিরিক্ত সংখ্যা ১৫ অক্টোবর, ১৯৫৮ সাল। পাকিস্তান সরকারের বিজ্ঞপ্তি নং ৯৭৭/১৫৮, তারিখ ৭ অক্টোবর ১৯৫৮ সাল।

সামরিক আইন ঘোষণা

১. যেহেতু আমি জাতীয় প্রয়োজনের তাগিদে পাকিস্তানের আন্তর্জাতিক সীমানার অভ্যন্তরে এখতিয়ার প্রয়োগ করার এখতিয়ার প্রাপ্ত হয়েছি ও অপরিহার্য বিবেচনা করছি, যেহেতু আমি পাকিস্তানের সশস্ত্র বাহিনীসমূহের সর্বাধিনায়ক, এতদ্বারা নিম্নোক্ত নোটিশ প্রদান করছি-

২. সম্ভাব্য সুবিধাজনক পন্থায় সামরিক আইনের রেগুলেশন ও হুকুমনামা প্রকাশ করা হবে। উল্লেখিত রেগুলেশন ও হুকুমনামা লংঘন করলে যে কোন ব্যক্তি সামরিক আইন অনুসারে, এসব রেগুলেশনে বর্ণিত দণ্ডভোগের যোগ্য বলে বিবেচিত হবে।

৩. সাধারণ আইন অনুসারে নির্ধারিত অপরাধের জন্য উল্লেখিত রেগুলেশনসমূহে বিশেষ দণ্ডের বিধান প্রদান করা যেতে পারে।

স্বাঃ মুহম্মদ আইউব খান
এইচ পি, এইচ জে (জেনারেল)
সর্বাধিনায়ক ও পাকিস্তানের প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক।[১৭]

www.pathagar.com

সামরিক অবস্থান সুদৃঢ় করার পর ইস্কান্দার মীর্জাকে দেশ থেকে বিতাড়িত করে আয়ুব নিজেই স্বনির্বাচিত প্রেসিডেন্ট হয়ে যান। শুরু হয় পাকিস্তানে এক নতুন অধ্যায়। ১৪ বছরের সাজা ও মৃত্যুদণ্ডের ভয় দেখিয়ে মুনাফাখোর ব্যবসায়ীদের ভীত সন্ত্রস্ত করে সারাদেশে দ্রব্যমূল্য স্বাভাবিক করা হয়। দেশের উভয় অংশের রাজনৈতিক নেতাদেরকে নির্বিচারে বন্দি ও সব রাজনৈতিক দল নিষিদ্ধ করা হয়। দুর্নীতি দমনে কঠোরভাবে সামরিক আইন কার্যকর করা হয়। দেশের বিশৃংখল পরিস্থিতি স্বাভাবিক হলে গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত সরকারের হাতে রাষ্ট্রক্ষমতা দিয়ে ব্যারাকে ফিরে যাবেন বলেও আয়ুব খান ঘোষণা করেন। দ্রব্যমূল্য নিম্নমুখী, নৈরাজ্যকর পরিস্থিতির অবসানে পদক্ষেপ নেয়ায় জনগণ আয়ুবের এসব প্রতিশ্রুতিতে আস্থা স্থাপন করে। রাজনৈতিক নেতাদের মনপুতঃ না হলেও এই পরিবর্তনকে দেশবাসী স্বাগত জানায়। কারণ সদ্য স্বাধীনদেশে রাজনৈতিক কোন্দলে দেশবাসী অতিষ্ঠ হয়ে পড়েছিল।

দেশব্যাপী জনদুর্ভোগের জন্য আয়ুব খান ঔপনিবেশিক আইনকানুন ও বিলম্বিত হয়রানিমূলক বিচার ব্যবস্থাকে দায়ী না করে প্রশাসনের আমলাকূলকে দায়ী করে পাকিস্তানের উভয় অংশের সচিবসহ ৩০৩ জন উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাকে দুর্নীতিবাজ হিসেবে তালিকাভুক্ত করেন। তন্মধ্যে ৩০ জনকে নির্দোষ ঘোষণা করে চাকরিতে পুনর্বহাল করা হয়। ৭১ জন ছিলেন অবসরপ্রাপ্ত এবং ১৯৭ জনকে চাকরিচ্যুত করা হয়। চাকরিচ্যুত আসগর রিজভী অপমানে আত্মহত্যা করেন। বিস্ময়ের বিষয় দুর্নীতির তালিকাভুক্ত কারোর বিরুদ্ধেই দুর্নীতির সুনির্দিষ্ট অভিযোগ আনা হয়নি এবং সবাই ছিলেন সামরিক আইনের বলির পাঁঠা। এর বিরুদ্ধে বিচার চাওয়ার কোন উপায় ছিল না। কারণ সামরিক আইনের বিধান বলে দেশের যাবতীয় আদালতগুলো বহাল রাখা হলেও কোন আদালত সামরিক আইন বা সামরিক প্রশাসকের কোন আদেশের বৈধতা সম্পর্কে কোন মামলা গ্রহণ করতে পারত না। ১৯৫০ সালে জমিদারী প্রথা উচ্ছেদসহ আয়ুব ক্ষমতায় থাকাকালে দেশের দুই অংশের উন্নয়নে বেশ কিছু সংস্কার এবং উচ্চাভিলাষী ব্যয় বহুল প্রকল্পও বাস্তবায়ন করেন। নতুন নতুন শিল্প কারখানা স্থাপন এবং কৃষি উৎপাদনও বৃদ্ধি পায়। কিন্তু সেই ঔপনিবেশিক আমলের প্রশাসনিক, দেওয়ানি ও ফৌজদারি আইনের অধীনে সাধারণ আদালতগুলোর কর্মকাণ্ড অব্যাহত থাকায় জনগণের ভাগ্য সেই তিমিরাচ্ছন্নই হয়ে থাকে। ১৯৬২ সালে দেশ থেকে সামরিক আইন প্রত্যাহার করে প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক আয়ুব খান তার প্রণীত সংবিধান দেশে চালু করেন এবং রাজনীতির ওপর থেকে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করেন। ওই সংবিধানে সুপ্রীমকোর্ট সহ দেশের যাবতীয় আদালতগুলোর সব এখতিয়ার বহাল রাখা হয়। কিন্তু তাতে দেশবাসীর খুব একটা লাভ হয়নি। দেশের জনগণ ব্রিটিশ দখলদারদের বিরুদ্ধে শতাব্দীর পর শতাব্দী উদ্ধতভাবে লড়েছে তাদের শোষণ ও হয়রানিমূলক আইন ও বিচার ব্যবস্থা থেকে মুক্তি পেয়ে দেশে সাম্য ও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করতে। স্বাধীনতার ১৪ বছর পরেও

www.pathagar.com

সামরিক বেসামরিক সরকারের অধীনে পাকিস্তানে গণআকাংখিত ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠিত না হওয়ায় আবার হতাশ হয়ে পড়ে দেশবাসী। আয়ুব খানের মতো দোর্দণ্ড প্রতাপশালী সেনা শাসকের পক্ষেও রাষ্ট্রের প্রচলিত ঔপনিবেশিক কাঠামোটি পরিবর্তন করার ঝুঁকি নেয়ার সাধ্য ছিল না।

কারণ এর আপসহীন ও বড় সমর্থক ছিল দেশের আমলা, রাজনীতিবিদ, প্রশাসনের বিভিন্ন স্তর, বুদ্ধিজীবী, রাজনীতিবিদ, সেনা ও পুলিশ বাহিনীসহ ঔপনিবেশিক দাসানুদাস মানসিকতার সব সুবিধাভোগী গোষ্ঠী। আইন আদালতে ন্যায়বিচারের সংজ্ঞা তারাই নির্ধারণ করে দিয়েছিল যারা এদেশবাসীকে নিরবচ্ছিন্নভাবে শোষণ, লুণ্ঠন, নির্যাতন করেছে একটানা ১৯০ বছর ধরে। পাকিস্তানের বেসামরিক ও সামরিক শাসনামলে সে অবস্থা অপরিবর্তিত থাকায় তৃণমূল পর্যায়ে জনগণ সেই আগের মতোই শোষিত হতে থাকে। ফলে সামরিক শাসনের অধীনেও কোন আশার আলো দেখতে না পেয়ে এবং অব্যাহত শোষণ বঞ্চনা অবিচারে পাকিস্তানের জাতীয় জীবনে সৃষ্টি হয় জগত ও জীবনের প্রতি হতাশা, যে মানসিক পরিবেশ সৃষ্টি হয় তা পলায়ন পরাজয়ের মধ্যে জীবনের মধ্যে নয় বরং অদৃষ্টবাদকে পুষ্ট করে চলে প্রতিনিয়ত।

একটা সরকারি চাকরি লাভ হয় সর্বোচ্চ সাফল্য ও সচ্ছলতার মাপকাঠি। ইসলামের ইহলৌকিক বিধিবিধান অনুজ্জ্বল রেখে সরকারি পৃষ্ঠপোষকতায় পারলৌকিক বিধিবিধান উজ্জ্বল করে দেখানো হয় এবং আয়ূবের আশীর্বাদপুষ্ট ধর্মীয় পণ্ডিতগণ দেশবাসীর দারিদ্র্যে জন্য ব্যক্তিজীবনে ইসলামের অনুশীলন থেকে দূরে থাকায় আল্লাহর অসন্তুষ্টি এর প্রকৃত কারণ বলে প্রচার করেন; যেমনটি ইংল্যান্ডের রাজা প্রথম জেমস বলতেন রাজা কখনো অন্যায় করেনা- করলে বুঝতে হবে স্রষ্টা প্রজাদের ওপর ক্রুদ্ধ হয়েছেন।

আয়ুবী শাসনামলে গড়ে ওঠে সরকার সমর্থক নতুন অভিজাত শ্রেণী। ১৯৬২ সালে নতুন সংবিধান প্রণয়নের আগেই তিনি ১৯৫৯ সালের ২২ জুন পূর্ব পাকিস্তানে দায়রা বিচারে জুরি পদ্ধতি বাতিল করেন। এতোদিন ব্রিটিশ আমলের মতো দায়রা আদালতে জুরির মতামত নিয়ে ফৌজদারি মামলা বিচার করার পদ্ধতি চালু ছিল। জুরিপ্রথা বাতিলের পর জুরির পরিবর্তে দায়রা আদালতে এসেসরদের সাহায্যে ফৌজদারি মামলা বিচার করা হতো। জুরির মতামত যেমন বিচারকের ওপর বাধ্যকর ছিল, এসেসরদের মতামত তেমন বাধ্যকর ছিল না। প্রকৃতপক্ষে এটা বিচার বিভাগের যুগোপযোগী সংস্কার ছিল না এবং আয়ুবের সেদিকে কোন মনযোগও ছিল না। উপরন্তু তিনি নিজের ক্ষমতা নিরাপদ রাখতে দমন পীড়নমূলক বিভিন্ন আইন জারি করে তার বিরোধিতাকারী নেতৃবৃন্দকে নির্বিচারে কারাবন্দি করেন। মৌলিক গণতন্ত্র নামে এক উদ্ভট গণতন্ত্র জনগণের ওপর চাপিয়ে দেন। যাতে দেশবাসীর অধিকার, চাহিদা, আশা-আকাঙ্ক্ষার কোন প্রতিফলন ছিল না। নতুন স্বাধীন দেশের গণআকাংখিত সমসাময়িক মূল্যবোধ ও চাহিদার সাথে খাপছাড়া পুরনো আইন ও বিচার ব্যবস্থা পরিবর্তন বিমুখ ঔপনিবেশিক মানসিকতার

www.pathagar.com

আয়ুবী বরকন্দাজদের বদৌলতে ধর্মাধিপত্য, নৈরাশ্য হতাশার দোলাচালে দুলতে থাকে জাতীয় জীবন যা শুধু কোনরকমে বেঁচে থাকার অর্থনীতি উপহার দেয়। পাকিস্তানের উভয় অংশের বিরোধী দলীয় রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ এই গণদুর্ভোগের জন্য আয়ুবের দুঃশাসনকে দায়ী করেন যা জনগণের কাছে বিশ্বাসযোগ্য হয়। পূর্ব পাকিস্তানের নেতৃবৃন্দ এর জন্য পশ্চিম পাকিস্তানের শোষণকে দায়ী করেন যা একেবারে অসত্য ছিল না। কারণ ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রকাঠামোর চরিত্রই এমন যে, রাষ্ট্রক্ষমতা যার কাছে কুক্ষিগত থাকবে সে এবং তার অনুচররা অর্থবিত্তে সমৃদ্ধ হবে পাশাপাশি রাষ্ট্রীয় সম্পদের সিংহভাগ ভোগ করবে। সুতরাং পূর্ব পাকিস্তানের সম্পদ দিয়ে পশ্চিম পাকিস্তান ও তাদের নেতৃবৃন্দ সমৃদ্ধিশালী হচ্ছিল যেহেতু রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা পশ্চিম পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের হাতে কুক্ষিগত ছিল কিংবা বলা যায় পূর্ব পাকিস্তান পরিণত হয়েছিল পশ্চিম পাকিস্তানের উপনিবেশে।

পূর্ব পাকিস্তানের প্রধান বিরোধী দল আওয়ামী লীগ এ অবস্থা থেকে উত্তরণের জন্য স্বায়ত্তশাসনের ও সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠানের দাবিতে তীব্র আন্দোলন গড়ে তোলে যা পূর্ব পাকিস্তানিদের কাছে গ্রহণযোগ্যতা পায়। এ জন্য নেতৃবৃন্দকে বহু জেল জুলুম ভোগ করতে হয়। ১৯৫৮ সালে ক্ষমতায় আসার পর আয়ুব খানের প্রতিশ্রুতি গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত সরকারের হাতে রাষ্ট্র-ক্ষমতা দিয়ে ব্যারাকে ফিরে যাবার কোন পদক্ষেপ না থাকায় পাকিস্তানের দুই অংশে গণঅসন্তোষ ধূমায়িত হতে থাকে। ফলশ্রুতিতে ১৯৬৯ সালে এক প্রচণ্ড গণঅভ্যুত্থানে আয়ুব ক্ষমতাচ্যুত হন। দৃশ্যপটে হাজির হন জেনারেল ইয়াহিয়া খান। তিনি দেশে পুনরায় সামরিক আইন জারি করে আয়ুব প্রণীত ১৯৬২ সালের সংবিধান বাতিল করেন। প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক ইয়াহিয়া খান ও তার অধীনস্থ সামরিক আদালতের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে রীট মামলা গ্রহণ নিষিদ্ধ করা ছাড়া তিনি সুপ্রীমকোর্টসহ দেশের সকল আদালতের পূর্বের সব এখতিয়ার বহাল রাখেন। জেনারেল ইয়াহিয়া খান সামরিক আইন তুলে নিয়ে জনসাধারণের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের দ্বারা সংবিধান প্রণয়ন ও দেশের শাসনভার জনপ্রতিনিধিদের নিকট হস্তান্তর করার লক্ষ্যে ১৯৭০ সালে লিগ্যাল ফ্রেম ওয়ার্কস অর্ডার জারি করে ওই সালে দেশে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠান করেন। নব নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের দ্বারা সংবিধান প্রণয়নের জন্য ১৯৭১ সালের পহেলা মার্চ ডাকা জাতীয় পরিষদের অধিবেশন অনির্দিষ্টকাল পর্যন্ত বন্ধ রাখার ঘোষণা দিলে সমগ্র পূর্ব পাকিস্তানে তার প্রতিবাদে অসহযোগ আন্দোলন আরম্ভ হয়। পরবর্তী ৭ মার্চ পাকিস্তান জাতীয় পরিষদের সংখ্যাগরিষ্ঠ আওয়ামী লীগ দলের নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ঢাকার ঘোড়দৌড় ময়দানে (বর্তমান সোহরাওয়ার্দী উদ্যান) জনসভায় পূর্ব পাকিস্তানের স্বাধিকারের জন্য সর্বাত্মক সংগ্রামের ঘোষণা দেন। এরপর ২৫ মার্চ মধ্যরাতে পাকিস্তান সামরিক বাহিনী নিরীহ বাঙ্গালি সৈনিক পুলিশ ও জনতার ওপর সশস্ত্র আক্রমণ শুরু করলে বাঙ্গালি সেনা ও পুলিশ বাহিনী বিদ্রোহ ঘোষণা করে

www.pathagar.com

এবং বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ শুরু হয়। তখন ২৬ মার্চ স্বাধীনতা ঘোষণা করা হয়।'[১৮] বাংলাদেশে দীর্ঘ ৯ মাসব্যাপী পাকিস্তানি সেনাবাহিনী নির্বিচার হত্যা লুণ্ঠনসহ এমন কোন অপকর্ম নেই যা করেনি। নিহত হয় লাখ লাখ বাঙ্গালী। পাকিস্তানের চির শত্রু দেশ ভারতের সহযোগিতায় বাঙ্গালিরা শক্ত প্রতিরোধ যুদ্ধ গড়ে তোলে যা সারাবিশ্বের শান্তিপ্রিয় মানুষের সহানুভূতি অর্জন করে। ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর পাক বাহিনীর আত্মসমর্পণের মধ্য দিয়ে পাকিস্তান দ্বিখণ্ডিত হয়ে স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয় ঘটে।

বাংলাদেশের বিচার ব্যবস্থা

বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণাকে অনুমোদন ও কার্যকর করার লক্ষ্যে মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে ১৯৭১ সালের ১০ এপ্রিল মুজিব নগর থেকে স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র জারি করে ১৯৭১ সালের ২৬ মার্চ থেকে সাবেক পূর্ব পাকিস্তানকে স্বাধীন ও সার্বভৌম গণপ্রজাতান্ত্রিক বাংলাদেশ বলে ঘোষণা করা হয় এবং একই তারিখে ১৯৭১ সালের ল'জ কন্টিনিউয়েন্স এনফোর্সমেন্ট অর্ডার জারি করে বিধান করা হয় যে, ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ পূর্ব পাকিস্তানে প্রচলিত সকল আইন উক্ত ঘোষণাপত্র ও প্রয়োজনীয় সংশোধন সাপেক্ষে স্বাধীন বাংলাদেশে চালু থাকবে এবং বিচার বিভাগসহ সকল সামরিক ও বেসামরিক সরকারি কর্মচারী বাংলাদেশের পক্ষে আনুগত্যের শপথ নিলে তাদের স্ব স্ব পদে বহাল থাকবেন। ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বরের বিজয়ের পর ১৯৭২ সালের ১১ জানুয়ারি বাংলাদেশ সাময়িক সংবিধান আদেশ জারি করে প্রধান বিচারপতি ও অন্য বিচারপতিদের সমন্বয়ে বাংলাদেশ হাইকোর্ট গঠন করা হয়। ১৯৭২ সালের ১৭ জানুয়ারি বাংলাদেশ হাইকোর্ট অর্ডার (১৯৭২ সালের রাষ্ট্রপতির ৫ নং আদেশ) জারি করে ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ পর্যন্ত ঢাকা হাইকোর্ট নামে পরিচিত পূর্ব পাকিস্তান হাইকোর্টকে ১৯৭১ সালের ২৬ মার্চ তারিখ থেকে বিলুপ্ত হয়েছে বলে গণ্য করা হয় এবং ১৯৭১ সালের ২৬ মার্চের পূর্বে সাবেক ঢাকা হাইকোর্ট রিট বিষয় ছাড়া যে সকল ক্ষমতা ও এখতিয়ার পরিচালনা করতেন বাংলাদেশ হাইকোর্টে ঐ সকল ক্ষমতা ও এখতিয়ার ন্যস্ত করা হয় এবং বাংলাদেশ হাইকোর্ট আদেশ জারি হওয়ার পূর্বে ঢাকা হাইকোর্টে বিচারাধীন সকল মামলা বাংলাদেশ হাইকোর্টকে বিচার করার ক্ষমতা দেয়া হয়। তা ছাড়া সাবেক ঢাকা হাইকোর্টের সকল কর্মচারীকে বাংলাদেশ হাইকোর্টের কর্মচারী হিসেবে এবং সকল এডভোকেটকে বাংলাদেশ হাইকোর্টের এডভোকেট হিসেবে গণ্য করা হয়। এক কথায় সাবেক ঢাকা হাইকোর্ট উক্ত আদেশবলে বাংলাদেশ হাইকোর্টে রূপান্তরিত হয়। ঐ আদেশের ৩ নং অনুচ্ছেদের বিধান অনুযায়ী রাষ্ট্রপতি নবগঠিত বাংলাদেশ হাইকোর্টের একজন প্রধান বিচারপতি ও কয়েকজন বিচারপতি নিযুক্ত করেছিলেন। সাবেক ঢাকা হাইকোর্টের বিচারপতি আবু সাদাত মোহাম্মদ সায়েমকে বাংলাদেশের প্রথম প্রধান বিচারপতি ও ঐ হাইকোর্টের কয়েকজন বিচারকসহ অন্যান্য কয়েকজনকে তখন

www.pathagar.com

বাংলাদেশ হাইকোর্টের বিচারপতি নিযুক্ত করা হয়েছিল। তাছাড়া ল'জ কন্টিনিউয়েন্স এনফোর্সমেন্ট আদেশ দ্বারা দেশের সকল অধস্তন দেওয়ানি ও ফৌজদারি আদালত চালু থাকে এবং অধস্তন আদালতের বিচারকগণ বাংলাদেশের আনুগত্যের শপথ নিয়ে স্ব স্ব পদে বহাল থাকেন। অর্থাৎ বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পরও পাকিস্তান আমলের বিচার ব্যবস্থা ১৯৭২ সালের বাংলাদেশের সংবিধান চালু হওয়া পর্যন্ত চালু থাকে।[১৯] ১৯৭২ সালের ৩ আগস্ট রাষ্ট্রপতির ৯১নং আদেশ জারি করে ফৌজদারি কার্যবিধির ৪৯১ ধারার বিধান মতে হাইকোর্টের হেবিয়াস কর্পাস রিট জারি করার ক্ষমতাও লোপ করা হয়। তাছাড়া সাবেক পাকিস্তান সুপ্রীম কোর্টে বিচারাধীন মামলাগুলো বিচার করার জন্য বাংলাদেশ হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি ও অন্য দু'জন বিচারপতিকে নিয়ে আপিল বিভাগ গঠন করে পকিস্তান সুপ্রীম কোর্টে বিচারাধীন মামলাগুলো আপিল বিভাগে স্থানান্তর করা হয়।[২০] ১৯৭২ সালের ৪ নভেম্বর বাংলাদেশ গণপরিষদ গণপ্রজাতান্ত্রিক বাংলাদেশের সংবিধান প্রণয়ন করে এবং সংবিধানের ১৫৩ অনুচ্ছেদের বিধান মতে ১৯৭২ সালের ১৬ ডিসেম্বর সংবিধান বলবৎ হয়। সংবিধানের ষষ্ঠ ভাগের প্রথম পরিচ্ছেদে বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট, দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে অধস্তন আদালত ও তৃতীয় পরিচ্ছেদে প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনাল সম্পর্কে বিধান করা হয়েছে।

সুদীর্ঘ দু'শতাব্দীরও বেশি সময়কাল ধরে ব্রিটিশ পাকিস্তানের ঔপনিবেশিক চরিত্রের আইন ও বিচার ব্যবস্থার চারদিক ঘিরে গ্রামীণ মাতবর, সমাজপ্রভু, রাজনীতিবিদ, আমলা-মুৎসুদ্দী, পুঁজিপতি ও রাষ্ট্রীয় শাসন প্রশাসনে এতগুলো স্থায়ী স্বার্থ স্তর সৃষ্টি হয়েছে যে, প্রচলিত অবস্থায় কোন ছোটখাটো পরিবর্তনই সব স্বার্থস্তরকে সন্তুষ্ট করতে পারতো না। প্রত্যেক স্তরের অস্তিত্ব নির্ভরশীল প্রচলিত ঔপনিবেশিক আইন ও বিচার ব্যবস্থা অটুট রাখার মধ্যে পরিবর্তনের মাধ্যমে নয়। তাই যখনই পরিবর্তনের উদ্যোগ নেয়া হবে তখনই মধ্যস্বত্বভোগী স্বার্থস্তরগুলো থেকে প্রবল প্রতিবাদ এমনকি শক্ত প্রতিরোধও আসবে। বস্তুত গণমানুষের ন্যায্য অধিকার হরণকারী আইন কানুনের ওপর নির্ভরশীল ঔপনিবেশিক চরিত্রের সরকার, মধ্যস্বত্বভোগী সামন্ত শ্রেণী ও ব্রিটিশ সৃষ্ট এদেশীয় ভদ্রলোক শ্রেণী- এই ত্রিশক্তির স্বার্থ ও নিরাপত্তা নিহিত আছে প্রচলিত মান্ধাতা ব্যবস্থা অটুট রেখে বৃহত্তর সমাজের দরিদ্রতা যেমন আছে তেমনি রেখে দেয়ার মধ্যে। কিন্তু পাকিস্তানিদের বিরুদ্ধে রক্তাক্ত যুদ্ধের মাধ্যমে ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জনের পর এ প্রাচীন অবস্থা পরিবর্তনের একটা বড় সুযোগ আসে। রাতারাতি অবশ্য সব আইন পরিবর্তন করা সম্ভব ছিল না। কিন্তু আইনগুলো গণমুখী করার লক্ষে অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি ও আইন বিশেষজ্ঞদের নিয়ে একটা আইন সংস্কার কমিশন গঠন করা যেত। দেশ গড়ার কাজে ওই সময় সবাই ছিলেন উন্মুখ। স্বাধীনতার পর রাষ্ট্র ক্ষমতায় যারা আসিন ছিলেন তারা খুব সহজেই এ অবস্থা পরিবর্তন করতে পারতেন। যুদ্ধবিধ্বস্ত সদ্য স্বাধীন দেশে সাম্য ও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠায় জনগণের চোখে ভাসছে তখন

www.pathagar.com

কতো স্বপ্ন-আকাঙ্ক্ষা। কিন্তু জাতির সব স্বপ্নসাধকে পদদলিত করে তখনকার শাসকগোষ্ঠি সেই ব্রিটিশ পরিত্যক্ত পাকিস্তানিদের আইন কানুন ও বিচার ব্যবস্থাই দেশবাসীর ওপর চাপিয়ে দেন এবং তা চিরস্থায়ী করতে বাংলাদেশ সংবিধানে ১৫২(১) অনুচ্ছেদ অন্তর্ভুক্ত করেন। অত্যন্ত চাতুর্যপূর্ণভাবে পাকিস্তান শব্দটি উহ্য রেখে প্রচলিত আইনের ব্যাখ্যায় সংবিধানের ১৫২(১) অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, 'প্রচলিত আইন : অর্থ এই সংবিধান প্রবর্তনের অব্যবহিত পূর্বে বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় সীমানায় বা উহার অংশবিশেষে আইনের ক্ষমতাসম্পন্ন, কিন্তু কার্যক্ষেত্রে সক্রিয় থাকুক বা না থাকুক এমন যে কোন আইন।

এভাবেই পাকিস্তান আমলে প্রচলিত সবগুলো ঔপনিবেশিক আইন স্বাধীন বাংলাদেশের সংবিধানে পবিত্র করে নেয়া হয়েছে; সেই পাপের বোঝা টানছে আজো জনগণ। স্বাধীন দেশের উপযোগী আইনকানুন প্রণয়নের পদক্ষেপ না নিয়ে পরিশ্রম বিমুখ ও পরিবর্তন বিমুখ শাসকগোষ্ঠি ঔপনিবেশিক আইনে দেশবাসীকে খাঁচাবন্দি করার সেই ঘটনাটি ছিল আমাদের রাজনৈতিক ইতিহাসে এক অবিস্মরণীয় দুষ্কৃতিমূলক ঘটনা যা আগামী প্রজন্মের ইতিহাসবিদদের গবেষণার বিষয়বস্তু হয়ে থাকবে। পরাধীন দেশের আইন কানুন, শাসন প্রশাসন ও বিচার ব্যবস্থা স্বাধীন দেশে বলবৎ করা উচিত কিনা সে সম্পর্কে কখনও গণভোট বা দেশবাসীর মতামত নেয়া হয়নি। ঔপনিবেশিক যুগের আইন কানুনগুলো সাংবিধানিক মোড়কে বহাল থাকার ফলশ্রুতিতে স্বাধীনতার পরে সামাজিক অগ্রগতির পথ সুগম হয়নি। বরং সমাজ বিবর্তনকে অধোগতি হতে সাহায্য করেছে। দুর্গম করেছে। প্রথা দৃষ্টিভঙ্গী প্রতিষ্ঠান ও মূল্যবোধে রয়ে গেছে অপরিবর্তনের ছোঁয়া। বিচার প্রক্রিয়ায় প্রাতিষ্ঠানিক নাম পাল্টেছে কিন্তু মান্ধাতা কর্মপদ্ধতি বদলায়নি। আজো আইন আদালতে বিচার প্রত্যাশী মানুষের সমস্যা অপরিবর্তিত রয়ে গেছে। সেই ব্রিটিশ পাকিস্তানি আমলের মতই কোর্ট কাছারিকে কেন্দ্র করে শহুরে সমাজ ও গ্রাম এবং শহরের মধ্যে অর্থনৈতিক দ্বৈততা সদা বিদ্যমান।

ব্রিটিশ পরিত্যক্ত ফৌজদারি দেওয়ানীসহ অন্যান্য যেসব আইন এদেশে প্রচলিত ও বলবৎ আছে তা খোদ ব্রিটেনের আইন আদালতেও চর্চা হয় না। আমাদের পক্বকেশ ব্যারিস্টারবর্গ মক্কেলের পক্ষে যেসব সনাতন আইনের চুলচেরা বয়ান দিতে গিয়ে নিত্য আদালতে গলদঘর্ম হচ্ছেন, সেসব আইন কানুন এখন ভলিয়মের পর ভলিয়ম থরে থরে সাজানো পাওয়া যাবে ব্রিটেনের জাতীয় আর্কাইভস, যাদুঘর অথবা লন্ডনের স্ট্যাটিকটিস অব ব্রিটিশ ইন্ডিয়া ফর জুডিশিয়াল এন্ড এডমিনিস্ট্রেটিভ ডিপার্টমেন্টস ইন্ডিয়া অফিস লাইব্রেরীতে। কিন্তু আমাদের পরিবর্তন বিমুখ নেতৃবৃন্দ গত ৩৫ বছরেও এসব প্রাচীন আইনের ব্যাপক সংস্কারের জন্য কোন উদ্যোগ নেয়নি। ঔপনিবেশিক মানসিকতার রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ দেশে সুবিচার প্রতিষ্ঠা অবহেলিত রেখে সুশাসন ও গণতন্ত্রের মরীচিকার পেছনে ছুটছেন এবং এ অবস্থা সদাবিদ্যমান। উঠতে বসতে তাদের মুখে

www.pathagar.com

সর্বদা আইনের শাসনের ফুলঝুরি। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ড. সিরাজুল ইসলাম ভারতীয় পণ্ডিত কে এন পানিক্করের উদ্ধৃতি দিয়ে লিখেছেন, 'সব ঔপনিবেশিক শাসনেই এ ধরনের প্রথানুগত সুবিধাভোগী শ্রেণী থাকে যাদের প্রধান ভূমিকা হচ্ছে ঔপনিবেশিক শাসনের সুফল প্রচার করা, সামাজিক স্থিতিশীলতা বজায় রাখতে সংগঠন প্রতিষ্ঠা করা ও প্রকৃত সমস্যাকে আঘাত না করে নানা ধরনের উপরি সংস্কারের আন্দোলন পরিচালনা করা। তাদের প্রচারের ভাষা জনকল্যাণ, শিক্ষা, প্রগতি, সংস্কৃতি ইত্যাদি শব্দে ভরপুর। পানিক্করের ভাষায় এরাই হচ্ছে ঔপনিবেশিক শাসনের সত্যিকার পুলিশ ও সৈন্য'।[২১]

বাংলাদেশের বিচার বিভাগীয় কাঠামো

মান্ধাতা আইন ও পদ্ধতিগত ত্রুটিতে বিচার প্রার্থীদের নাজেহাল হওয়ার বিষয়টি বাদ দিলে বাংলাদেশের বিচার বিভাগীয় কাঠামো যে কোন উন্নত দেশের সমকক্ষ বলা যায়। সর্বনিম্ন পর্যায়ে রয়েছে গ্রাম আদালত ও সর্বোচ্চ পর্যায়ে রয়েছে সুপ্রিমকোর্ট। মধ্যবর্তী স্তরগুলোতে দেওয়ানী, ফৌজদারি আদালত, আপিল আদালত, প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনালসহ বিভিন্ন বিশেষ ট্রাইব্যুনাল রয়েছে। বিবদমান পক্ষদের সম্মতিক্রমে গ্রাম আদালতে সালিশীর মাধ্যমে দেওয়ানি ও ফৌজদারি বিরোধ মেটানো সম্ভব। '১৯৭৬ সালের গ্রাম আদালত অধ্যাদেশ দ্বারা গ্রামের ছোটখাটো অপরাধ এবং ৫ হাজার টাকা পর্যন্ত দাবির দেওয়ানি মামলা বিচার করতে ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান ও প্রত্যেক পক্ষের দু'জন প্রতিনিধি নিয়ে গ্রাম আদালত গঠন করে মামলা বিচার করার বিধান করা হয়েছে।'[২২] গ্রাম আদালত ফৌজদারি মামলায় আসামীকে কারাদণ্ড দিতে বা জরিমানা করতে পারেন না। তবে আসামি দোষী সাব্যস্ত হলে তাকে ক্ষতিগ্রস্ত পক্ষকে ক্ষতিপূরণ দিতে আদেশ দিতে পারেন। এছাড়া দেওয়ানি মামলায় দাবিকৃত টাকা ডিক্রি দিতে, অস্থাবর মালামাল ফেরত দিতে বা সম্পত্তির দখল ফেরত দিতে আদেশ দিতে পারেন।[২৩] গ্রাম আদালত সর্বসম্মতভাবে বা পাঁচজনের মধ্যে ৪ জনের গরিষ্ঠতায় রায় দিলে তা পক্ষদের ওপর বাধ্যকর হবে। যদি গ্রাম আদালত ৪ জন ও ২ জনের গরিষ্ঠতায় রায় দেন তবে যে কোন পক্ষ ওই রায়ের বিরুদ্ধে ৩০ দিনের মধ্যে ফৌজদারি মামলায় এলাকার ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট ও দেওয়ানি মামলায় এলাকার সহকারী বিচারকের আদালতে আপিল করতে পারেন। ম্যাজিস্ট্রেট বা সহকারী বিচারক ন্যায়বিচার হয়নি বলে নিশ্চিত হলে গ্রাম আদালতের রায় বাতিল বা পরিবর্তন অথবা মামলা পুনর্বিচারের জন্য গ্রাম আদালতে পাঠাতে পারেন।[২৪] গ্রাম আদালতের বিচারে সাক্ষ্য আইন, দেওয়ানি ও ফৌজদারি কার্যবিধির বিধান প্রযোজ্য না হলেও হলফ আইনের কতিপয় বিধান প্রযোজ্য। গ্রাম আদালতে মামলা বিচারের সময় কোন পক্ষ উকিল নিযুক্ত করতে পারে না।[২৫]

পৌর সালিশী বোর্ড: ১৯৭৯ সালের বিরোধ নিষ্পত্তি (পৌর এলাকা) অধ্যাদেশ মতে গ্রামের মত শহরের ছোটখাটো অপরাধ ও ৫ হাজার টাকা পর্যন্ত মানের দেওয়ানি মামলা

www.pathagar.com

বিচারের জন্য পৌরসভা বা পৌর কর্পোরেশনের ওয়ার্ড কমিশনার ও বিবদমান পক্ষদের দু'জন প্রতিনিধি নিয়ে পৌর সালিশি বোর্ড গঠন করে মামলার বিচার করার বিধান করা হয়েছে। গ্রাম আদালতের মতো শহর এলাকার সালিশি বোর্ডের ফৌজদারি মামলায় ক্ষতিপূরণ ও দেওয়ানি মামলায় ডিক্রি দেয়াও ঐ ডিক্রির বিরুদ্ধে আপিল ইত্যাদি সম্পর্কে একই রকম বিধান করা হয়েছে।[২৬]

ফৌজদারি আদালতের স্তর ও ক্ষমতা: বাংলাদেশে সুপ্রিমকোর্ট ও অন্য আইনের বিধানমতে গঠিত আদালতগুলো ছাড়া পাঁচ ধরনের ফৌজদারি আদালত ফৌজদারি বিচার করেন। যেমন- (১) সেশন বা দায়রা আদালত, (২) মেট্রোপলিটান ম্যাজিস্ট্রেট আদালত, (৩) প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট আদালত, (৪) দ্বিতীয় শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট, (৫) তৃতীয় শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট আদালত।[২৭] বাংলাদেশ বর্তমানে কয়েকটি জেলা ও মেট্রোপলিটন এলাকার সেশন ডিভিশন বা দায়রা বিভাগে বিভক্ত এবং প্রত্যেক দায়রা বিভাগে ফৌজদারি মামলা বিচার করার জন্যে দায়রা আদালতগুলি গঠিত হয়েছে। সরকার প্রত্যেক জেলার জেলা জজ বা জেলা বিচারককে দায়রা বিচারক, অতিরিক্ত বিচারককে অতিরিক্ত দায়রা বিচারক ও সাবজজকে সহকারী দায়রা বিচারক নিযুক্ত করেছেন। যে জেলায় জেলা ম্যাজিস্ট্রেট, অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট ও কোনো প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট কতিপয় অপরাধ ব্যতীত যে কোন ধরনের ফৌজদারি মামলা বিচার করার জন্যে বিশেষ ক্ষমতাপ্রাপ্ত হয়েছেন ঐ জেলার সহকারী দায়রা বিচারকগণ অতিরিক্ত দায়রা বিচারক নিযুক্ত হয়েছেন বলে গণ্য হন। অতিরিক্ত দায়রা বিচারক প্রশাসনিক বিষয়ে অধীনস্থ হলেও বিচার সম্পর্কে দায়রা বিচারকের সমক্ষমতা পরিচালনা করেন। দণ্ড বিধিতে উল্লেখিত যে কোন অপরাধের বিচার করতে পারেন হাইকোর্ট বিভাগ বা দায়রা আদালত বা ফৌজদারি কার্যবিধির দ্বিতীয় তফসিলের ৮নং কলামে বর্ণিত যে অপরাধের বিচার অন্য যে আদালত করতে পারবেন বলে উল্লেখ করা হয়েছে সে আদালত এবং অন্য আইনে বর্ণিত অপরাধের বিচার করেন সে আইনে উল্লেখিত আদালত।

তবে কোনো আদালতের নাম উল্লেখিত না থাকলে ফৌজদারি কার্যবিধির দ্বিতীয় তফসিলের ৮নং কলামে উল্লেখিত যে কোন আদালত তদ্রূপ অপরাধের বিচার করতে পারেন। মৃত্যুদণ্ড বা যাবজ্জীবন কারাদণ্ডযোগ্য অপরাধ ব্যতীত পনের বছরের কম বয়সী অপরাধীদের বিচার করতে পারেন জেলা ম্যাজিস্ট্রেট, প্রধান মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট বা কিশোর অপরাধীদের বিচারের জন্য আইনের অধীনে ক্ষমতাপ্রাপ্ত ম্যাজিস্ট্রেট। সরকার প্রধান মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট, জেলা ম্যাজিস্ট্রেট বা অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেটকে মৃত্যুদণ্ডযোগ্য অপরাধ ব্যতীত অন্য সব অপরাধ বিচার করার এবং যে কোন প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেটকে মৃত্যুদণ্ড বা যাবজ্জীবন বা দশ বছরের বেশি কারাদণ্ডযোগ্য অপরাধ ব্যতীত অন্য সকল প্রকার অপরাধ বিচার করার ক্ষমতা দিতে পারেন। হাইকোর্ট বিভাগ আইন

www.pathagar.com

অনুমোদিত যে কোনো দণ্ডে আসামিকে দণ্ডিত করতে পারেন। দায়রা বিচারক বা অতিরিক্ত দায়রা বিচারক আইনে অনুমোদিত যে কোনো দণ্ডে আসামিকে দণ্ডিত করতে পারেন। তবে তারা হাইকোর্ট বিভাগের অনুমোদন ব্যতীত মৃত্যুদণ্ড কার্যকরী করতে পারেন না। সেজন্যে তারা কোনো আসামিকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করা সমীচীন মনে করলে তার দণ্ডাদেশ অনুমোদনের জন্য মামলার নথি হাইকোর্ট বিভাগে পাঠিয়ে দেন। সহকারী দায়রা বিচারক মৃত্যুদণ্ড ও দশ বছরের বেশি কারাদণ্ড ব্যতীত আইন অনুমোদিত অন্য যে কোনো দণ্ড দিতে পারেন। তবে সহকারী দায়রা বিচারক অতিরিক্ত দায়রা বিচারক হিসেবে গণ্য হলে তখন মৃত্যুদণ্ড ব্যতীত আইন অনুমোদিত অন্য যে কোনো দণ্ড দিতে পারেন।

মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট ও প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট পাঁচ বছরের অনধিক কারাদণ্ডসহ নির্জন কারাবাস, বেত্রদণ্ড ও দশ হাজার টাকার অনধিক অর্থদণ্ডে আসামিকে দণ্ডিত করতে পারেন। তৃতীয় শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট দু' বছরের অনধিক কারাদণ্ড ও দু' হাজার টাকার অনধিক অর্থদণ্ডে আসামিকে দণ্ডিত করতে পারেন। বিশেষ ক্ষমতাপ্রাপ্ত ম্যাজিস্ট্রেট সাত বছরের অনধিক কারাদণ্ডে আসামিকে দণ্ডিত করতে পারেন। সরকার প্রত্যেক জেলায় জেলা ম্যাজিস্ট্রেট, অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট ও সহযোগী জেলা ম্যাজিস্ট্রেট নিয়োগ করেন। অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট ও সহযোগী জেলা ম্যাজিস্ট্রেট যে জেলায় কর্মরত ঐ জেলায় জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের সমক্ষমতা পরিচালনা করলেও তারা জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের অধীনস্থ বলে গণ্য হন। সরকার জেলা ম্যাজিস্ট্রেট ভিন্ন প্রত্যেক জেলায় যত সংখ্যক প্রয়োজন ততজন প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণীর ক্ষমতাসম্পন্ন ম্যাজিস্ট্রেট নিয়োগ করতে এবং তারা কোন এলাকায় কাজ করবেন তা নির্ধারণ করতে পারেন। সরকার প্রত্যেক থানায় একজন প্রথম বা দ্বিতীয় শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট নিয়োগ করতে পারেন। থানা ম্যাজিস্ট্রেট মহকুমা ম্যাজিস্ট্রেটের সকল ক্ষমতা পরিচালনা করতে পারেন। সাধারণত থানা ম্যাজিস্ট্রেটগণ বর্তমানে থানা সদরের পরিবর্তে জেলা সদরে বসেন। মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেটগণ ভিন্ন অন্য ম্যাজিস্ট্রেটগণ জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের ও সকল অতিরিক্ত ও সহকারী দায়রা বিচারকগণ দায়রা বিচারকের অধীনস্থ এবং দায়রা বিচারক তার অধীনস্থ অতিরিক্ত ও সহকারী দায়রা বিচারকদের নিকট কাজ বিতরণ করেন। জেলা ম্যাজিস্ট্রেট ও অন্য ম্যাজিস্ট্রেটগণ আপিল ও রিভিশন বিষয়ে ভিন্ন অন্য ব্যাপারে দায়রা বিচারকের অধীনস্থ নন।

প্রত্যেক মেট্রোপলিটন এলাকায় সরকার একজন প্রধান মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট সমক্ষমতাসম্পন্ন এক বা একাধিক অতিরিক্ত প্রধান মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট ও অন্যান্য মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেটদের ফৌজদারি মামলা বিচার করার জন্য নিযুক্ত করেন। প্রধান মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট তার এলাকার মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেটকে প্রদত্ত সমক্ষমতা পরিচালনা করেন। অন্য মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেটগণ তার অধীনস্থ এবং তিনি তাদের নিকট কাজ বিতরণ করেন। ১৯৭৬ সালে স্বতন্ত্র মেট্রোপলিটন দায়রা আদালত গঠন

www.pathagar.com

করার বিধান করা হলেও তা এখনও কার্যকর হয়নি। সরকার সরকারি গেজেট বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে যে কোন এলাকায় বসবাসকারী বিদেশী নাগরিক ভিন্ন অন্য যে কোনো ব্যক্তিকে উপযুক্ত মনে করলে বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত এলাকার জন্যে জাস্টিস অব দি পিস নিযুক্ত করতে পারেন। সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতিগণ সমগ্র দেশের, দায়রা বিচারক, জেলা ম্যাজিস্ট্রেট ও মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেটগণ তাদের স্ব স্ব এলাকার জাস্টিস অব দি পিস।

ফৌজদারি আপিল: দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেটের দণ্ডাদেশের বিরুদ্ধে জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট দণ্ডিত ব্যক্তি আপিল করতে পারেন এবং জেলা ম্যাজিস্ট্রেট আপিল নিষ্পত্তির জন্য সরকার কর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট পাঠাতে পারেন এবং সেরূপ ক্ষমতাপ্রাপ্ত অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট ঐ প্রকার আপিল দায়েরও করা যায়। সহকারী জেলা ম্যাজিস্ট্রেট, অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট বা প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেটের দণ্ডাদেশের বিরুদ্ধে দণ্ডিত ব্যক্তি দায়রা বিচারকের নিকট আপিল দায়ের করতে পারেন। তবে সহকারী দায়রা বিচারক বা ম্যাজিস্ট্রেট পাঁচ বছর বা তার বেশি কারাদণ্ড দিলে ঐ মামলার যে কোন বা সকল দণ্ডিত ব্যক্তিকে বা ম্যাজিস্ট্রেট কাউকে রাষ্ট্রদ্রোহিতার জন্যে দণ্ডিত করলে ঐ দণ্ডিত ব্যক্তিকে হাইকোর্ট বিভাগে আপিল দায়ের করতে হয়।

দায়রা বিচারক তার নিকট দায়েরকৃত আপিল নিজে বা বিচারের জন্যে পাঠালে অতিরিক্ত দায়রা বিচারক তার বিচার করতে পারেন। দায়রা বিচারক বা অতিরিক্ত দায়রা বিচারক কাউকে দণ্ডিত করলে তাকে ঐ দণ্ডাদেশের বিরুদ্ধে হাইকোর্ট বিভাগে আপিল দায়ের করতে হয়। প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট বা মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট বা দায়রা আদালতে আসামি দোষ স্বীকার করে দণ্ডপ্রাপ্ত হলে বা দায়রা আদালত কোনো আসামিকে এক মাসের অনধিক কারাদণ্ডে দণ্ডিত করলে বা দায়রা আদালত, মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট, জেলা ম্যাজিস্ট্রেট বা প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট কাউকে পঞ্চাশ টাকার অনধিক অর্থদণ্ডে দণ্ডিত করলে তার বিরুদ্ধে আপিল করা যায় না। তাছাড়া সংক্ষিপ্ত বিচারে ম্যাজিস্ট্রেট আসামিকে দুশ' টাকার অনধিক অর্থদণ্ডে দণ্ডিত করলেও তার বিরুদ্ধে আপিল করা যায় না।

ম্যাজিস্ট্রেট আসামিকে বিচারে খালাস করে দিলে তার বিরুদ্ধে দায়রা বিচারকের নিকট এবং দায়রা আদালত বিচারে আসামিকে খালাস করে দিলে তার বিরুদ্ধে হাইকোর্ট বিভাগে সরকার আপিল দায়ের করতে পারেন। যে কোন ফৌজদারি আদালত বিচারে আসামিকে খালাস করে দিলে ঐ বিচারের আইনগত ত্রুটির অজুহাতে ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে অভিযোগকারী হাইকোর্ট বিভাগে আপিল দায়ের করতে পারে। যে কোন ফৌজদারি আদালত বিচারে আসামিকে কম শাস্তি দিলে সরকার তার বিরুদ্ধে হাইকোর্ট বিভাগে ও ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে অভিযোগকারী তার বিরুদ্ধে আপিল আদালতে আপিল দায়ের করতে পারেন। আসামি দণ্ডাদেশের বিরুদ্ধে আপিল দায়ের করলে ফৌজদারি

www.pathagar.com

আপিল আদালত দণ্ডাদেশ বাতিল করে দিয়ে আসামিকে খালাস করে দিতে পারেন বা পুনর্বিচারের আদেশ দিতে পারেন বা দণ্ডাদেশ বহাল রেখে আসামির শাস্তি কমিয়ে দিতে পারেন বা দণ্ডাদেশ পরিবর্তন করে দিয়ে শাস্তি বহাল রাখতে বা কমিয়ে দিতে পারেন। শাস্তি কমের বিরুদ্ধে আপিল করা হলে আপিল আদালত আসামিকে তার বিরুদ্ধে কারণ দর্শানোর সুযোগ দিয়ে যে ফৌজদারি আদালতের রায়ের বিরুদ্ধে আপিল করা হয়েছে সে আদালত যে পরিমাণ শাস্তি দিতে পারেন তার সমপরিমাণ শাস্তি বাড়িয়ে দিতে পারেন। দণ্ডিত আসামি আপিল দায়ের করার পর ফৌজদারি আপিল আদালত যুক্তিসংগত মনে করলে আসামিকে আপিল বিচার সাপেক্ষ জামিনে মুক্তি দিতে পারেন। আপিল আদালত আসামিকে জামিনে মুক্তি না দিলে হাইকোর্ট বিভাগ আপিল বিচারসাপেক্ষে আসামিকে জামিনে মুক্তি দিতে পারেন। আসামিকে বিচারে এক বছরের অনধিক কাল কারাদণ্ডে দণ্ডিত করলে এবং আসামি তার বিরুদ্ধে আপিল করতে চাইলে আসামির বিচারকারি ফৌজদারি আদালত আসামিকে আপিল দায়ের করার সুযোগ দেয়ার জন্য স্বল্প সময়ের জন্যে জামিনে মুক্তি দিতে পারেন। হাইকোর্ট বিভাগ সুপ্রিমকোর্টের আপিল বিভাগ আসামিকে তার দণ্ডাদেশের বিরুদ্ধে আপিল করার বিশেষ অনুমতি দিয়েছেন বলে সন্তুষ্ট হলে তাকেও উক্ত আপিল শুনানিসাপেক্ষে জামিনে মুক্তি দিতে পারেন।[২৮]

ফৌজদারি মামলা দায়ের ও বিচার পদ্ধতি: কগনাইজেবল বা আমলযোগ্য অপরাধ যে স্থানে সংঘটিত হয় সে সম্পর্কে কেউ ঐ এলাকার থানায় এজাহার দিলে থানার ভারপ্রাপ্ত পুলিশ কর্মকর্তা ম্যাজিস্ট্রেটের আদেশ ব্যতীত এবং ননকগনাইজেবল বা আমল-অযোগ্য অপরাধের মামলায় কেউ থানায় এজাহার দেয়ার পর এলাকার ম্যাজিস্ট্রেটের আদেশপ্রাপ্ত হলে থানার ভারপ্রাপ্ত পুলিশ কর্মকর্তা মামলার অভিযোগ সম্পর্কে অনুসন্ধান করে সাক্ষ্য-প্রমাণ সংগ্রহ করে আসামির বিরুদ্ধে এলাকার ম্যাজিস্ট্রেটের আদালতে ফৌজদারি মামলা দায়ের করেন। এজাহার গ্রহণ করার পর পুলিশ অনুসন্ধানকালে আসামিকে গ্রেফতার করতে পারেন। আমলযোগ্য অপরাধ সংঘটিত হয়েছে বলে সন্দেহ হলে পুলিশ অপরাধ সম্পর্কে অনুসন্ধান করে স্বয়ং এলাকার ম্যাজিস্ট্রেটের আদালতে মামলা দায়ের করতে পারেন। থানায় এজাহার না করে কোনো অভিযোগকারী তার এলাকার ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট লিখিত অভিযোগ দায়ের করলে ম্যাজিস্ট্রেট তার ও তার পক্ষে উপস্থিত অন্য সাক্ষীর জবানবন্দি গ্রহণ করে আসামির প্রতি সমন বা গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি করার আদেশ দিতে পারেন বা আসামির প্রতি পরোয়ানা জারি না করে স্বয়ং মামলার অভিযোগ সম্পর্কে তদন্ত করতে পারেন বা তার অধীনস্থ ম্যাজিস্ট্রেটকে বা অন্য কোন ব্যক্তিকে তা তদন্ত করতে আদেশ দিতে পারেন বা পুলিশকে তদন্ত বা অনুসন্ধান করার আদেশ দিতে পারেন। তদন্তে বা অনুসন্ধানে অভিযোগ সঠিক বলে সাব্যস্ত না হলে ম্যাজিস্ট্রেট অভিযোগ বাতিল করে দিতে পারেন।

www.pathagar.com

ম্যাজিস্ট্রেট শান্তিভঙ্গের আশঙ্কা করলে বা কেউ অপরাধ সংঘটিত করতে পারে মনে করলে তার নিকট থেকে জামানত তলব করতে পারেন। কেউ জনসাধারণের ব্যবহারযোগ্য রাস্তা, নদী বা খালে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করলে বা তার ক্ষতি করলে বা জনস্বাস্থ্যের হানিকর কোনো কাজ করলে বা কোনো দুর্ঘটনার কারণ উদ্ভব হলে ঐ প্রতিবন্ধকতা বা ক্ষতিকারক জিনিস অপসারণ করার আদেশ দিতে পারেন। ম্যাজিস্ট্রেট গুরুতর শান্তিভঙ্গের বা ক্ষতির আশংকা করলে জরুরি অবস্থায় যে কোন ব্যক্তিকে নিষেধাজ্ঞার আদেশ জারি করে ঐ কাজ থেকে বিরত রাখতে পারেন।[২৯]

সাধারণত যে ফৌজদারি আদালতের এলাকায় অপরাধ সংঘটিত হয় ঐ আদালত মামলার তদন্ত ও বিচার করেন। অপরাধ সম্পর্কে ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট পুলিশ কর্মকর্তা লিখিত প্রতিবেদন পেশ করলে বা কেউ লিখিত অভিযোগ দায়ের করলে বা ম্যাজিস্ট্রেট স্বয়ং অপরাধ সম্পর্কে জানলে বা অন্য কোনো ব্যক্তির নিকট থেকে অপরাধ সম্পর্কে জানতে পারলে জেলা ম্যাজিস্ট্রেট, মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট বা বিশেষভাবে ক্ষমতাপ্রাপ্ত ম্যাজিস্ট্রেট (সাধারণ থানা ম্যাজিস্ট্রেট) ফৌজদারি মামলা বিচারের জন্য গ্রহণ করেন। বিচারের জন্যে গ্রহণকারী ম্যাজিস্ট্রেট ঐ মামলা স্বয়ং বিচার করতে পারেন বা অন্য ম্যাজিস্ট্রেট বা দায়রা আদালতে ঐ মামলা বিচারের জন্য পাঠাতে পারেন। দায়রা আদালতে সরাসরি কোনো ফৌজদারি মামলা দায়ের করা যায় না। যেসকল মামলা বিচার করার এখতিয়ার এলাকার ম্যাজিস্ট্রেটের নেই সে সকল মামলা ঐ ম্যাজিস্ট্রেট দায়রা আদালত বা জেলা ম্যাজিস্ট্রেট যার এখতিয়ারাধীন যে মামলা ঐ মামলা ঐ আদালতে বিচারের জন্যে পাঠান। জেলা ম্যাজিস্ট্রেট প্রাপ্ত মামলা বিচারের জন্য অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট পাঠাতে পারেন। অতিরিক্ত দায়রা বিচারক ও সহকারী দায়রা বিচারকের নিকট যে সকল মামলা সরকারের আদেশে বা দায়রা বিচারকের আদেশে বিচারের জন্য পাঠানো হয় তারা ঐ ফৌজদারি মামলার বিচার করেন।

বিচারার্থ আসামিকে ম্যাজিস্ট্রেট বা দায়রা বিচারকের নিকট হাজির করা হলে বিচারক মামলার নথি ও দাখিল করা কাগজপত্র বিবেচনা করে, প্রয়োজন বোধে আসামিকে কোনো কিছু জিজ্ঞাসা করে এবং পক্ষদের বক্তব্য শুনে আসামির বিরুদ্ধে আনিত অভিযোগ অমূলক মনে করলে আসামিকে ছেড়ে দিতে পারেন। কিন্তু তিনি তা অমূলক মনে না করলে আসামির বিরুদ্ধে আনিত অভিযোগ গঠন করে আসামিকে অভিযোগ পড়ে শুনান এবং আসামি অভিযোগ স্বীকার করে কিনা জিজ্ঞাসা করেন। যদি আসামি অভিযোগ স্বীকার করে এবং তাকে কেন শাস্তি দেয়া হবে না তার যুক্তিসঙ্গত কারণ দেখাতে না পারেন তবে তাকে বিচারক শাস্তি দেন। আসামী অভিযোগ অস্বীকার করলে বা দোষ স্বীকার করা সত্ত্বেও আসামিকে শাস্তি দেয়া না হলে বিচারক অভিযোগকারী ও তার সাক্ষীদের সাক্ষ্য গ্রহণ করেন, আসামির বক্তব্য শুনেন এবং আসামি তার নির্দোষিতা প্রমাণের জন্য সাক্ষী হাজির করলে তাদের সাক্ষ্য গ্রহণ করে সাক্ষ্য-প্রমাণ বিবেচনা করে

www.pathagar.com

বিচারক আসামি দোষী সাব্যস্ত না হলে তাকে খালাস দেন এবং দোষী সাব্যস্ত হলে তাকে শাস্তি দেন। সাধারণত প্রকাশ্য আদালতে জনসমক্ষে ফৌজদারি মামলার তদন্ত ও বিচার করা হয়। তবে বিচারক জনসাধারণকে বা কোনো ব্যক্তিকে আদালতগৃহে প্রবেশ না করার আদেশ দিতে পারেন। ফৌজদারি মামলায় আসামি হাজির না হলে বা তাকে গ্রেফতার না করা গেলে জাতীয় দৈনিক পত্রিকায় আসামিকে আদালতে হাজির হওয়ার বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের পর অথবা আদালতে হাজির হওয়ার পর আসামি আত্মগোপন করলে বর্তমানে আসামির অনুপস্থিতিতে ফৌজদারি মামলা বিচার করা যায়।

ফৌজদারি মামলায় আসামি তার পক্ষ সমর্থন করার জন্য উকিল নিযুক্ত করতে পারেন। সাধারণত আসামি সাক্ষ্য দিতে বাধ্য নয়, তবে নির্দিষ্ট ধরনের ফৌজদারি মামলায় বিবাদি তার সপক্ষে সাক্ষ্য দিতে পারেন। তা ছাড়া ফৌজদারি মামলায় অভিযুক্ত আসামি দরখাস্ত দিয়ে আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্য সাক্ষ্য দিতে চাইলে হলফান্তে তার সাক্ষ্য গ্রহণ করা যায়। অভিযোগকারী পক্ষের সাক্ষ্যপ্রমাণ গ্রহণ করার পর বিচারক আসামিকে জিজ্ঞাসাবাদ করতে পারেন যেন আসামি তার বিরুদ্ধে প্রদত্ত সাক্ষ্য সম্পর্কে ব্যাখ্যা দিতে পারেন। কিন্তু আসামি প্রশ্নের উত্তর না দিলে বা মিথ্যা উত্তর দিলে তার জন্য তাকে শাস্তি দেয়া যায় না। তবে বিচারক আসামির নিরুত্তর না মিথ্যা উত্তর থেকে সঙ্গত অনুমানে পৌঁছতে পারেন। এরূপ জিজ্ঞাসাবাদের সময় আসামিকে হলফ নিতে বলা যায় না। এককথায় ফৌজদারি বিচারে অভিযোগ প্রমাণ করার দায়িত্ব অভিযোগকারী পক্ষের। আসামিকে ফৌজদারি মামলায় তার নির্দোষিতা প্রমাণ করতে হয় না। পূর্বে আসামি আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্য আদালতে হলফান্তে সাক্ষ্য দিতে পারতেন না। ১৯৭৮ সালের আইন সংশোধন অধ্যাদেশ জারির পর থেকে আসামি নিজেও আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্য হলফান্তে সাক্ষ্য দিতে পারেন। ১৮৭২ সালের সাক্ষ্য আইনের বিধান অনুযায়ী সাক্ষ্য-প্রমাণ গ্রহণ করা হয়। এক পক্ষের সাক্ষীকে অপর পক্ষ জেরা করতে পারেন। কোনো কোনো ফৌজদারি মামলা আদালতের অনুমতি নিয়ে পক্ষগণ আপস নিষ্পত্তি করতে পারেন কিন্তু গুরুতর অপরাধের মামলা আপসে নিষ্পত্তি করা যায় না। এছাড়া কোন জলাধার বা ভূমির বিরোধে শান্তি ভঙ্গের আশংকা থাকলে ওই সম্পত্তির দখল সাব্যস্ত হওয়া পর্যন্ত ম্যাজিস্ট্রেট বিরোধীয় সম্পত্তি ক্রোকাবদ্ধ করতে পারেন। অথবা ওই সম্পত্তির তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত করে বিবদমান পক্ষদের সেখানে প্রবেশ নিষিদ্ধ করতে পারেন। ম্যাজিস্ট্রেট স্ত্রী-সন্তানদের খোরপোষ দিতে স্বামী বা বাবাকে আদেশ দিতেও পারেন।[৩০]

বিচারাধীন ফৌজদারি মামলায় জামিন: কোন আসামিকে জামিনযোগ্য অপরাধের অভিযোগে গ্রেফতার করলে বা ঐ অভিযোগে অভিযুক্ত আসামি হাজির হলে তাকে জামিনে মুক্তি দিতে হবে। দারোগা বা আদালত উপযুক্ত মনে করলে জামিনের পরিবর্তে আসামিকে তার ব্যক্তিগত মুচলেকায় মুক্তি দিতে পারেন। কোনো আসামিকে জামিন অযোগ্য অপরাধের অভিযোগে গ্রেফতার করা হলে বা ঐ অভিযোগে অভিযুক্ত আসামি

www.pathagar.com

আদালতে হাজির হলে আদালত তাকে সুবিবেচনায় জামিনে মুক্তি দিতে পারেন। কিন্তু আদালতের নিকট যদি দৃশ্যত প্রতীয়মান হয় যে, আসামি মৃত্যুদণ্ড বা যাবজ্জীবন কারাদণ্ড পাওয়ার মত অপরাধ করেছেন তখন বিচারক তাকে জামিনে মুক্তি দেবেন না। তবে আসামি স্ত্রীলোক বা ১৬ বছরের কম বয়স্ক বা অসুস্থ বা অক্ষম হলে বিচারক অপরাধে অভিযুক্তকে জামিনে মুক্তি দিতে পারেন। হাইকোর্ট বিভাগ, দায়রা আদালত বা যে আদালত আসামিকে জামিনে মুক্তি দিয়েছে সে আদালত সঙ্গত কারণে ঐ আসামির জামিন বাতিল করে দিয়ে তাকে গ্রেফতার করে হাজতে পাঠাতে আদেশ দিতে পারেন। দায়রা আদালত বা হাইকোর্ট বিভাগ বিচারাধীন আসামিকে ও কোনো দণ্ডপ্রাপ্ত ব্যক্তি আপিল করুক বা না করুক তাকে জামিনে মুক্তি দেয়ার আদেশ দিতে পারেন এবং নিম্ন আদালত বা দারোগা বেশি জামানত তলব করলে জামানতের পরিমাণ কমিয়ে দিতে পারেন। নির্দিষ্ট সময়ে মামলার তদন্ত বা শুনানি শেষ না হলে সঙ্গত কারণ না থাকলে আসামি জামিনে মুক্তি লাভ করার অধিকারী।[৩১]

ফৌজদারী রিভিশন : হাইকোর্ট বিভাগ বা দায়রা বিচারক যে কোনো নিম্ন আদালতের নথি তলব দিয়ে এনে নিম্ন আদালতের নথি পর্যালোচনা করে ঐ ফৌজদারি কার্যধারা বা কোনো আদেশ আইনসম্মত কিনা তা দেখতে পারেন এবং ম্যাজিস্ট্রেটকে বাতিলকৃত ফৌজদারি মামলা পুনঃতদন্ত করতে আদেশ দিতে পারেন এবং খালাসপ্রাপ্ত আসামিকে শাস্তি দেয়া ব্যতীত আপিল আদালত যে সকল অদেশ দিতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত সেরূপ আদেশ দিতে পারেন। কোনো ব্যক্তিকে বেআইনিভাবে আটক করে রাখলে হাইকোর্ট বিভাগ তাকে মুক্তি দেয়ার আদেশ দিতে পারেন। আদালতের পরোয়ানা অপব্যবহার করা রোধ করার জন্যে বা ন্যায় বিচার সংরক্ষণের জন্যে হাইকোর্ট বিভাগ যে কোন আদেশ বাতিল করতে পারেন।[৩২]

অন্যান্য আইনে ম্যাজিস্ট্রেটের বিচার ক্ষমতা : ১৮৬০ সালের দণ্ডবিধিতে ও অন্য আইনে উল্লিখিত অপরাধের বিচার করেন বাংলাদেশের ফৌজদারি আদালতগুলো। ১৯৭৪ সালের বিশেষ ক্ষমতা আইনের অধীনে দায়রা বিচারকদের বিশেষ ট্রাইব্যুনাল হিসাবে এবং ১৯৫৮ সালের ফৌজদারি সংশোধনী আইনের অধীনে তাদের বিশেষ বিচারক হিসাবে ঐ সকল আইনে ফৌজদারি মামলা বিচার করার ক্ষমতা দেয়া হয়েছে। তা ছাড়া মুসলিম পারিবারিক আইন অধ্যাদেশে বর্ণিত অপরাধে অভিযুক্ত অপরাধীদের এবং শুল্ক আইন প্রভৃতি অনেক আইনে অপরাধীদের বিচার করার ক্ষমতা ম্যাজিস্টেটদের উপর ন্যস্ত করা হয়েছে। কিশোর অপরাধীদের বিচার করতে পারেন জেলা ম্যাজিস্ট্রেট, প্রধান মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট ও বিশেষভাবে ক্ষমতাপ্রাপ্ত অন্য ম্যাজিস্ট্রেট বা দায়রা বিচারক। ১৯৭৪ সালের শিশু আইনের বিধান অনুযায়ী কিশোর অপরাধীকে কারাদণ্ড বা অর্থদণ্ডে দণ্ডিত না করে সংশোধনের আদেশ দিতে হয়। ১৯৯৫ সালের নারী ও শিশু নির্যাতন বিশেষ বিধান আইনের আওতাধীন অপরাধের বিচার করার জন্যে দায়রা

www.pathagar.com

বিচারকদের নিয়ে নারী ও শিশু নির্যাতন দমন বিশেষ আদালত গঠন করা হয়েছে।[৩৩] এছাড়া বিভিন্ন সরকারের আমলে এসিড নিক্ষেপের মতো গুরুতর অপরাধসহ ফৌজদারি মামলা দ্রুত নিষ্পত্তির জন্য প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেটদের বিশেষ ক্ষমতা দিয়ে দ্রুত বিচার ট্রাইব্যুনালও গঠন করা হয়েছে। বাংলাদেশে সাধারণত ১৮৬০ সালের দণ্ডবিধি এবং ১৮৯৮ সালের ফৌজদারি কার্যবিধির অধীনেই ফৌজদারি অপরাধের বিচার করা হয়। তবে দণ্ডবিধিতে যেসব অপরধের শাস্তির বর্ণনা নেই সেসব নতুন অপরাধ দমনে সরকার বিচ্ছিন্নভাবে নতুন আইন করে তা বিচারের জন্য বিশেষ ট্রাইব্যুনালও গঠন করে থাকেন।

দেওয়ানি আদালতের ক্ষমতা ও শ্রেণীবিভাগ

প্রত্যেক জেলা পর্যায়ে চার প্রকারের দেওয়ানি আদালত কার্যকর রয়েছে। যথা (১) জেলা জজ-এর আদালত, (২) অতিরিক্ত জজ-এর আদালত, (৩) সাব জজ-এর আদালত ও (৪) সহকারী জজ-এর আদালত। তবে এসব আদালত বাংলাদেশ সুপ্রিমকোর্টের হাইকোর্ট বিভাগের অধীনে বিচারিক দায়িত্ব পালন করেন। প্রত্যেক জেলার দেওয়ানি আদালতের প্রধান হচ্ছেন জেলা জজ। অন্যান্য অধস্তন দেওয়ানি আদালতগুলো জেলা জজ-এর প্রশাসনিক কর্তৃত্বাধীন। অতিরিক্ত জজ-এর কাছে জেলা বিচারক যেসব বিষয় প্রেরণ করেন সেসব বিষয় সিদ্ধান্ত দেয়ার ক্ষেত্রে তিনি জেলা জজ-এর সমক্ষমতার অধিকারী।[৩৪] সাধারণত জেলা বিচারক তার অধীনস্থ সাবজজ ও সহকারী বিচারকদের রায়, ডিক্রি ও আদেশের বিরুদ্ধে আপিল গ্রহণ ও নিষ্পত্তি করেন। তিনি উত্তরাধিকার আইন, অছি আইন, ওয়াকফ আইন, বিকৃতমনা আইন, কোম্পানি আইন, গৃহঋণদান সংস্থা আইন, শিল্প ব্যাংক আইন প্রভৃতি বিভিন্ন আইনের বিধানমতে আনীত আদি মামলারও বিচার করেন। তা ছাড়া তিনি তার অধীনস্থ সাবজজ ও সহকারী জজের আদালত থেকে যে কোনো আদি মামলা এনে বিচার করতে পারেন বা অন্য সাবজজ বা সহকারী জজের আদালতে তা বিচারের জন্যে পাঠাতে পারেন। তিনি সহকারী জজের রায়, ডিক্রি ইত্যাদির বিরুদ্ধে দায়েরকৃত আপিল সাবজজের এবং অতিরিক্ত বিচারকের নিকট এবং সাবজজের রায়, ডিক্রি ইত্যাদির বিরুদ্ধে দায়েরকৃত আপিল অতিরিক্ত বিচারকের নিকট বিচার করে নিষ্পত্তি করার জন্যে পাঠাতে পারেন। সহকারী বিচারক ও সাবজজ দেওয়ানি অধিকার সংক্রান্ত যে কোন আদি দেওয়ানি মামলা গ্রহণ করতে ও বিচার করতে পারেন। তবে সহকারী জজগণ যে সকল তায়দাদের দেওয়ানি মামলা বিচার করেন তার উর্দ্ধে তায়দাদের মামলা সাবজজ আদালতে দায়ের করতে হয়। বর্তমানে জ্যেষ্ঠ সহকারী জজ এক লাখ টাকা মূল্যমানের ও কনিষ্ঠ সহকারী জজ ৫০ হাজার টাকা মূল্যমানের আদি দেওয়ানি মামলা বিচার করতে পারেন।[৩৫]

এর উর্ধ্বে তায়দাদের দেওয়ানি মামলা সাবজজ আদালতে দায়ের করতে হয়। অর্থঋণ আদালত আইনের অধীনে যে সাবজজকে অর্থঋণ আদালত নিযুক্ত করা হয়েছে তার আদালতে ঐ আইনে উল্লেখিত দেওয়ানি মামলা দায়ের করতে হয়। ব্যাংক ও

www.pathagar.com

অর্থলগ্নিকারী প্রতিষ্ঠানের পাওনা সংক্রান্ত মামলা দ্রুত নিষ্পত্তি করার জন্য অর্থঋণ আদালত গঠন করা হয়েছে। উত্তরাধিকার আইনের অধীনে জেলা প্রতিনিধি নিযুক্ত হলে সাবজজ উত্তরাধিকার সনদ প্রদানের ও উইলের প্রবেট বা চরমপত্রের প্রত্যয়নপত্র প্রদানের অপ্রতিবাদী মামলা বিচার করতে পারেন। পূর্বে এক বা একাধিক থানা একজন মুন্সেফ অর্থাৎ সহকারী জজ আদালতের অধীন ছিল। তখন মহকুমা সদরে মুন্সেফ অর্থাৎ সহকারী জজের আদালত অবস্থিত ছিল। সাবেক মহকুমাগুলো লুপ্ত করে দিয়ে প্রত্যেক মহকুমাকে জেলায় উন্নীত করা হলে এবং থানাকে উপজেলায় পরিবর্তিত করা হলে মুন্সেফের আদালতগুলো সাবেক মহকুমা সদর থেকে উপজেলা সদরে স্থানান্তরিত হয়েছিল। পরে উপজেলা বাতিল করে দিয়ে নাম পাল্টিয়ে থানা করা হলে থানা সদর থেকে মুন্সেফের অর্থাৎ সহকারী জজের আদালতগুলো বর্তমানে জেলা সদরে নিয়ে আসা হয়েছে। পারিবারিক আদালত আইনে নির্দিষ্ট মামলা বিচার করার জন্যে সহকারী জজের আদালতকে নিয়ে পারিবারিক আদালত গঠন করা হয়েছে। পারিবারিক আদালত দাম্পত্য দখল উদ্ধার, বিবাহ বিচ্ছেদ, মোহরানা ও খোরপোষ আদায়, নাবালকের অভিভাবক নিযুক্তি ইত্যাদি মামলার বিচার করেন। সহকারী বিচারক ও পারিবারিক আদালতের রায়, ডিক্রি ও আদেশের বিরুদ্ধে জেলা বিচারকের নিকট আপিল দায়ের করতে হয়। সাবজজদের এক লাখ ৩০ হাজার টাকা মান পর্যন্ত মামলার রায়, ডিক্রি ও আদেশের বিরুদ্ধে জেলা বিচারকের নিকট ও তদূর্ধ্ব মানের মামলার রায়, ডিক্রি ও আদেশের বিরুদ্ধে হাইকোর্ট বিভাগে আপিল দায়ের করতে হয়।[৩৬]

দেওয়ানি আদালতগুলো সাধারণত দেওয়ানি অধিকার সংক্রান্ত বিরোধ নিষ্পত্তি করেন। কোনো আইনে সুস্পষ্ট এবং অস্পষ্ট বা পরোক্ষভাবে দেওয়ানি আদালত কর্তৃক কোনো দেওয়ানি মামলা বিচার করা নিষেধ না করলে দেওয়ানি আদালতের সর্বপ্রকার দেওয়ানি অধিকার সংক্রান্ত মামলা বিচার করার এখতিয়ার আছে। যে মামলায় সম্পত্তি ব্যক্তির অবস্থান বা পদের অধিকার নিয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতা হয় সেটিই দেওয়ানি ধরনের মামলা যদিও ঐ অধিকার ধর্মীয় আচার বা অনুষ্ঠান সংক্রান্ত বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের উপর সম্পূর্ণভাবে নির্ভরশীল হয়।[৩৭] অর্থঋণ আদালতের যে কোনো ডিক্রির বিরুদ্ধে হাইকোর্ট বিভাগে আপিল দায়ের করতে হয়। তাছাড়া সাবজজরা ছোট আদালত হিসেবে ৩০ হাজার টাকা মানের ও সহকারী জজগণ ছোট আদালত হিসেবে ২৫ হাজার টাকা মানের মামলা বিচার করতে পারেন।[৩৮]

জেলার আয়তন, লোকসংখ্যা ও গুরুত্ব অনুযায়ী বর্তমানে প্রত্যেক জেলায় জেলা বিচারকের আদালত ছাড়াও এক বা একাধিক অতিরিক্ত বিচারকের আদালত, সাবজজের আদালত ও সহকারী জজের আদালত আছে। বিচারকের অবর্তমানে অতিরিক্ত বিচারক অথবা যে জেলায় অতিরিক্ত বিচারক নেই সে জেলায় সর্ব জ্যেষ্ঠ সাবজজ জেলা বিচারকের দায়িত্ব পালন করেন।[৩৯] জেলা বিচারক ও অতিরিক্ত বিচারকের আদি

www.pathagar.com

মামলার রায়, ডিক্রি ও আদেশের বিরুদ্ধে হাইকোর্ট বিভাগে আপিল করা যায়। জেলা বিচারক, অতিরিক্ত বিচারক ও সাবজজের প্রদত্ত আপিলের রায়, ডিক্রি বা আদেশের বিরুদ্ধে বর্তমানে হাইকোর্ট বিভাগে দ্বিতীয়বার আপিল করা যায় না। তবে তদ্রুপ রায়, ডিক্রি বা আদেশে আইনগত ত্রুটির জন্যে ন্যায়বিচার থেকে বঞ্চিত হয়েছে বলে কেউ দেখাতে পারলে হাইকোর্ট বিভাগ তা পর্যালোচনা করতে পারেন।[৪০] যদিও বাংলাদেশের সংবিধানে উল্লেখিত মৌলিক অধিকার নাগরিকদের অনেক দেওয়ানি অধিকার সংরক্ষণের জন্য করা হয়েছে তবুও ঐ সকল অধিকার আদায়ের জন্য দেওয়ানি আদালতে মামলা করা যায় না। কারণ সংবিধানের ১০২ অনুচ্ছেদে ঐ সকল অধিকার আদায়ের জন্যে হাইকোর্ট বিভাগে রিট দরখাস্ত দাখিল করার বিধান করা হয়েছে। তেমনি চাকরি সংক্রান্ত যে সকল বিরোধ নিষ্পত্তি করার জন্যে প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনাল ও শ্রম আদালত গঠন করা হয়েছে এবং নির্বাচন সংক্রান্ত বিরোধ নিষ্পত্তি করার জন্য নির্বাচন ট্রাইব্যুনাল গঠন করা হয়েছে যা দেওয়ানি আদালতে বিচার করা যায় না। তবে কোনো চাকরি সংক্রান্ত বিরোধ প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনাল বা শ্রম আদালতের এখতিয়ার বহির্ভূত হলে সে মামলা দেওয়ানি আদালতের বিচার করার এখতিয়ার আছে। বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের নির্বাহী বা প্রশাসনিক কর্মচারীর চাকরি সংক্রান্ত বিরোধ নিষ্পত্তি করার জন্য দেওয়ানি আদালতে মামলা দায়ের করা যায় কারণ তার মামলা প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনাল বা শ্রম আদালতের বিচার করার এখতিয়ার নেই। অর্থসম্পদ, স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি, চুক্তি লেনদেন, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের পদ, ব্যবস্থাপনা ও প্রবেশাধিকার, টাকার দাবি, ক্ষতিপূরণের দাবি, বিবাহ, পিতৃত্ব, খোরপোষ, অভিভাবকত্ব, উত্তরাধিকার, পদ ও পদমর্যাদা ইত্যাদি যে কোনো দেওয়ানি অধিকার সংক্রান্ত যাবতীয় বিরোধ দেওয়ানি বিরোধ হিসেবে দেওয়ানি আদালতের বিচার করার এখতিয়ার আছে যদি না কোনো আইন দ্বারা দেওয়ানি আদালতের ঐ এখতিয়ার ক্ষুণ্ন করা হয়ে থাকে।

দেওয়ানি আদালতে মামলা দায়ের ও বিচার পদ্ধতি: কেউ দেওয়ানি আদালতে মামলা দায়ের করতে চাইলে তাকে আদালতে লিখিত আর্জি দাখিল করতে হয়। আর্জি কিভাবে তৈরি করতে হবে এবং তাতে কি কি বিষয় উল্লেখ করতে হবে তা দেওয়ানি কার্যবিধির ৭নং আদেশে উল্লেখ করা হয়েছে। মামলায় কাদের পক্ষ করতে হবে তা দেওয়ানি কার্যবিধির ১নং আদেশে উল্লেখ করা হয়েছে। সাধারণত সম্পত্তি সংক্রান্ত মামলা দায়ের করতে হয় যে আদালতের এলাকায় নালিশ সংক্রান্ত সম্পত্তি অবস্থিত ঐ আদালতে এবং সম্পত্তি ভিন্ন অন্য প্রতিকারের জন্য মামলা দায়ের করতে হয় যে আদালতের এলাকায় বিবাদী বসবাস করে বা ব্যবসা বাণিজ্য করে বা মামলার কারণ উদ্ভব হয়েছে সে আদালতে বাদীর আর্জি ত্রুটিযুক্ত না হলে এবং তা আইন গ্রহণযোগ্য হলে আদালত আর্জির অনুলিপিসহ বিবাদীকে আদালতে হাজির হয়ে জবাব দেয়ার জন্য সমন প্রেরণ করে থাকেন।[৪১] সমনজারি সংক্রান্ত নিয়মাবলী দেওয়ানি কার্যবিধি ৫নং আদেশে

www.pathagar.com

উল্লেখিত আছে। সমনজারির পর বিবাদি আদালতে হাজির না হলে বাদীর মামলা আদালতে একতরফা শুনানি করতে পারেন। বাদী তার দাবি প্রমাণ করতে পারলে তাকে ডিক্রি দেয়া হয়। বাদীর মামলা একতরফা ডিক্রি হলে বিবাদী তার উপর সমনজারি হয়নি বা ধার্য তারিখে যথাযোগ্য কারণে সে আদালতে হাজির হতে পারেনি প্রমাণ করতে পারলে আদালতে একতরফা ডিক্রি বাতিল করে দিয়ে বিবাদিকে মামলায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার সুযোগ দিতে পারেন। মামলার ধার্য তারিখে কোনো পক্ষ হাজির না হলে বা বাদী হাজির না হলে আদালত মামলা খারিজ করে দিতে পারেন। মামলা একতরফা খারিজ হলে বাদী ধার্য তারিখে যথাযোগ্য কারণে হাজির হতে পারেনি বলে প্রমাণ করতে পারলে আদালত একতরফা খারিজ আদেশ বাতিল করে দিয়ে বাদীকে পুনরায় মামলা পরিচালনা করার সুযোগ দিতে পারেন। সমন পাওয়ার পর বিবাদী আদালতে হাজির হয়ে বাদীর দাবি স্বীকার করলে আদালত তার বিরুদ্ধে মামলায় ডিক্রি দিতে পারেন। বিবাদী জবাব দাখিল করে বাদীর দাবি অস্বীকার করলে বা পাল্টা দাবি উত্থাপন করলে আদালত উভয় পক্ষকে তাদের সাক্ষী ও দলিলপত্র হাজির করার জন্য সময় দিতে পারেন। জবাব ও পাল্টা দাবি সম্পর্কিত বিশদ নিয়মাবলী দেওয়ানি কার্যবিধির ৮নং আদেশে উল্লেখ করা হয়েছে। আদালত মামলা বিচারাধীন থাকা অবস্থায় অস্থায়ী নিষেধাজ্ঞা দিতে পারেন এবং তা কেউ অমান্য করলে তাকে দেওয়ানি জেলে দিতে পারেন বা তার সম্পত্তি ক্রোক ও বিক্রি করতে পারেন, বিবাদীকে আদালতে হাজির করার জন্য গ্রেফতারি পরোয়ানা দিতে, আদালতে হাজির হওয়ার জন্য তার নিকট জামানত তলব করতে এবং জামানত দিতে অস্বীকার করলে তাকে দেওয়ানি জেলে দিতে, সম্পত্তি শাসন ও সংরক্ষণের জন্য তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত করতে, বিবাদীর সম্পত্তি অগ্রিম ক্রোকাবদ্ধ করতে বা অন্য যে কোন প্রকার অন্তর্বর্তীকালীন আদেশ দিতে পারেন।[৪২]

বিবাদী জবাব দাখিল করে বাদীর দাবি অস্বীকার করলে আদালত মামলার বিচার্য বিষয় গঠন করেন এবং যদি বাদীর মামলা আইনগত কোন বিধি নিষেধের জন্য অরক্ষণীয় প্রশ্নের কোন বিচার্য বিষয় গঠন করা হয়ে থাকে তবে আদালত ওই বিচার্য বিষয় সম্পর্কে প্রথমে শুনানি করেন। পক্ষদের মধ্যে নালিশি বিষয় নিয়ে পূর্বে মামলা হয়ে নিষ্পত্তি হয়ে থাকলে অর্থাৎ মামলা দোবারো দোষে বারিত হলে বা আর্জি দৃষ্টে মামলা তামাদি দোষে বারিত হলে বা মামলা অন্য কোনো আইনগত ত্রুটির জন্য অচল হলে সাক্ষ্য-প্রমাণ গ্রহণ করার পূর্বে আদালত মামলা খারিজ করে দিতে পারেন। আদালত আইনগত কোনো বিচার্য বিষয় প্রথমে শুনানি না করলে পক্ষদের আবেদনক্রমে দলিল ও সাক্ষী হাজির করার জন্য সমন জারি করেন। সমন করার পর সাক্ষী আদালতে হাজির না হলে বা দলিল দাখিল না করলে আদালতে সাক্ষীকে হাজির করার জন্য গ্রেফতারি পরোয়ানা দিতে তার সম্পত্তি ক্রোক ও বিক্রি করতে, তাকে জরিমানা করতে বা তার নিকট জামানত তলব করতে ও জামানত দিতে অস্বীকার করলে তাকে দেওয়ানি জেলে দিতে পারেন।

www.pathagar.com

মামলার শুনানির তারিখে যে পক্ষ সাক্ষ্য-প্রমাণ হাজির করতে ব্যর্থ হন আদালত তার বিরুদ্ধে পক্ষের সাক্ষ্য-প্রমাণ গ্রহণ করে সাক্ষ্য-প্রমাণ হাজির করতে ব্যর্থ পক্ষের বিরুদ্ধে সাধারণত রায় দেন। ধার্য তারিখে পক্ষরা সাক্ষ্য-প্রমাণ হাজির করলে আদালত ১৮৭২ সালের সাক্ষ্য আইনের বিধান অনুযায়ী দালিলিক সাক্ষ্য ও বাচনিক সাক্ষীদের জবানবন্দি গ্রহণ করেন এবং পক্ষদের বক্তব্য শুনেন। মামলার শুনানি সমাপ্ত হলে পর আদালত প্রকাশ্য আদালতে লিখিত রায় ঘোষণা করেন। রায় ঘোষণা করার পর মামলার নম্বর, পক্ষদের নামধাম, দাবির বিবরণ ও আদালত কর্তৃক যে প্রতিকার মঞ্জুর করা হয়েছে তা উল্লেখ করে রায়ের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ ডিক্রি তৈরি করা হয়। যে আদালত মামলায় ডিক্রি দিয়েছেন বা যে আদালতে ওই ডিক্রি জারি করার জন্য পাঠানো হয়েছে সে আদালত ডিক্রিজারি করে বাদীকে আদালতে যে প্রতিকার মঞ্জুর করেছেন তা বাদীকে দিতে বিবাদীকে বাধ্য করেন। ডিক্রিজারী করার ও ডিক্রিজারী সম্পর্কিত যাবতীয় নিয়মাবলী দেওয়ানি কার্যবিধির ২১ নং আদেশে বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। ডিক্রিকৃত সম্পত্তিতে ডিক্রিদারকে দখল দিয়ে, দাইকের সম্পত্তির ক্রোক ও বিক্রি করে, দাইককে গ্রেফতার করে ও দেওয়ানি জেলে দিয়ে তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত করে বা প্রতিকারের ধরন আবেদনক্রমে আদালত ডিক্রিজারী করার আদেশ দিতে পারেন।[৪৩]

দেওয়ানি রায় ও ডিক্রির বিরুদ্ধে আপিল: দেওয়ানি মামলার রায় ও ডিক্রি ও নির্দিষ্ট কিছু আদেশের বিরুদ্ধে সংক্ষুব্ধ ব্যক্তি উর্ধ্বতন আদালতে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে আপিল দায়ের করতে পারেন। একতরফা ডিক্রির বিরুদ্ধে এবং প্রাথমিক ডিক্রির বিরুদ্ধে আপিল দায়ের করা যায় এবং প্রাথমিক ডিক্রির বিরুদ্ধে আপিল দায়ের না করলেও চূড়ান্ত ডিক্রির বিরুদ্ধে আপিল করা যায়। তবে সোলেডিক্রির বিরুদ্ধে আপিল দায়ের করা যায় না। আপিলের রায় ও ডিক্রির বিরুদ্ধে পূর্বে উর্ধ্বতন আদালত (হাইকোর্টে) দ্বিতীয় আপিল করা যেত। ১৯৭৮ সালের আইন সংস্কার, অধ্যাদেশ দ্বারা দেওয়ানি কার্যবিধির ১০০-১০৩ ধারা বাতিল করে দেয়ার পর এখন দ্বিতীয় আপিল করা যায় না। আপিল আদালত মামলা চূড়ান্ত নিষ্পত্তি করতে পারেন, পুনর্বিচারে পাঠাতে পারেন, অতিরিক্ত সাক্ষ্য স্বয়ং গ্রহণ করতে বা নিম্ন আদালতকে গ্রহণ করতে নির্দেশ দিতে পারেন ও বিচার্য বিষয় গঠন করতে এবং তা বিচার করতে নিম্নআদালতে মামলা পাঠাতে পারেন। আপিল দায়ের ও শুনানি সম্পর্কিত বিশদ নিয়মাবলী দেওয়ানি কার্যবিধির ৪১ নং আদেশে উল্লেখ করা হয়েছে। আপিল আদালত আপিল শুনানির পর প্রকাশ্য আদালতে রায় ঘোষণা করেন। আপিল আদালতের রায়ে আপিলকৃত ডিক্রি বহাল, বাতিল বা পরিবর্তন করা সম্পর্কে উল্লেখ করতে হয়। আপিলের নম্বর, পক্ষদের নাম ধাম ও যে প্রতিকার মঞ্জুর করা হয়েছে বা অন্য যে সিদ্ধান্ত করা হয়েছে তা উল্লেখ করে আপিলের রায় ঘোষণার পর ডিক্রি তৈরি করা হয়। আদালতের কোনো আদেশ বা ডিক্রিতে দৃশ্যত কোনো ভুলত্রুটি প্রতীয়মান হলে অথবা উক্ত আদেশ বা ডিক্রি দেয়ার পর এমন কোনো সাক্ষ্য বা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় উদ্ঘাটিত হলে যা যথাযথ প্রচেষ্টা সত্ত্বেও সংক্ষুব্ধ ব্যক্তির গোচরে না থাকার কারণে উক্ত আদেশ বা ডিক্রি দেয়ার সময় সে আদালতে তা উত্থাপন করতে পারেনি বা অন্য পর্যাপ্ত

www.pathagar.com

কারণে সংক্ষুব্ধ ব্যক্তির আবেদনক্রমে উক্ত আদেশ বা ডিক্রি আপিলযোগ্য না হলে বা আপিলযোগ্য হওয়া সত্ত্বেও তার বিরুদ্ধে কোনো আপিল দায়ের করা না হলে যে আদালত উক্ত আদেশ বা ডিক্রি দিয়েছেন সে আদালত উক্ত আদেশ বা ডিক্রি রিভিউ বা পুনর্বিবেচনা করতে পারেন। কোনো আদেশ বা ডিক্রির বিরুদ্ধে আপিল করার বিধান না থাকলে নিম্নআদালতের আইনগত ত্রুটির জন্যে ভুল সিদ্ধান্তের ফলে ন্যায়বিচার ব্যর্থ হলে হাইকোর্ট বিভাগ নিম্ন আদালতের নথি রিভিশন বা পর্যালোচনা করে উপযুক্ত আদেশ দিতে পারেন। আদালত ন্যায়বিচারের স্বার্থে বা আদালতের কার্যাবলীর অপব্যবহার রোধ করতে যে কোনো আদেশ দিতে পারেন। মামলার কোনো কার্যধারায়, ভুল-ত্রুটি প্রকাশ পেলে বা কোনো আদেশ, রায় বা ডিক্রিতে কোনো কর্মচারীর বা গণনার ভুলে কোনো ত্রুটি প্রকাশ পেলে আদালত তা সংশোধন করতে পারেন।[৪৪]

প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনাল: সরকারি কর্মচারীদের নিয়োগ, পদোন্নতি, বরখাস্ত প্রভৃতিসহ কর্মের শর্তাবলী, কোনো রাষ্ট্রায়ত্ত, উদ্যোগ বা সংবিধিবদ্ধ সরকারি কর্তৃপক্ষের চালনা ও ব্যবস্থাপনা এবং অনুরূপ উদ্যোগ বা সংবিধিবদ্ধ সরকারি কর্তৃপক্ষের কর্মসহ কোনো আইনের দ্বারা বা অধীন সরকারের উপরের ন্যস্ত বা সরকারের দ্বারা পরিচালিত কোনো সম্পত্তি অর্জন, প্রশাসন, ব্যবস্থাপনা ও বিলি-ব্যবস্থা ও সংবিধানের ১০২(৩) অনুচ্ছেদ প্রযোজ্য হয় সেরূপ কোনো আইনের দ্বারা রাষ্ট্র কর্তৃক কোনো সম্পত্তি বাধ্যতামূলক গ্রহণ, রাষ্ট্রায়ত্তকরণ বা দখল ইত্যাদি বিষয় সম্পর্কে বিরোধ নিষ্পত্তির জন্য প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনাল গঠন করার জন্য সংসদ আইন পাস করতে পারেন।[৪৫]

উল্লেখ্য সরকার ১৯৮০ সালে প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনাল আইন পাস করে রাষ্ট্রায়ত্ত ও ব্যাংকসহ অন্যান্য সরকারি কর্মচারীদের চাকরি সংক্রান্ত বিরোধ নিষ্পত্তির জন্য প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনাল ও প্রশাসনিক আপিল ট্রাইব্যুনাল গঠন করেছেন। এর আগে এসব মামলা সাধারণত দেওয়ানি আদালতে নিষ্পত্তি করা হতো।

শ্রম আদালত ও অন্যান্য ট্রাইব্যুনাল:

সরকারি কর্মচারী, রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংক ও অন্যান্য কর্মচারীদের চাকরি সংক্রান্ত বিরোধ নিষ্পত্তি করার জন্য যেমন প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনাল ও প্রশাসনিক আপিল ট্রাইব্যুনাল আছে তেমনি শিল্প ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠান এবং কলকারখানা ইত্যাদি শ্রমিকদের চাকরি সংক্রান্ত বিরোধ নিষ্পত্তি করার জন্য ১৯৬৯ সালের শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের ৩৫ ধারার বিধানমতে শ্রম আদালত ও ৩৮ ধারার বিধানমতে শ্রম আপিল ট্রাইব্যুনাল গঠন করা হয়েছে। পরিত্যাক্ত সম্পত্তি সম্পর্কে বিরোধ নিষ্পত্তির জন্য ১৯৮৫ সালের পরিত্যক্ত দালান (সম্পূরক বিধান) অধ্যাদেশের ৯ ধারার বিধানমতে কোর্ট অব সেটেলমেন্ট গঠন করা হয়েছে। ১৯৮৪ সালের আয়কর অধ্যাদেশের ১১ ধারার বিধানানুযায়ী আয়কর সংক্রান্ত আপিল নিষ্পত্তি করার জন্য আয়কর আপিল ট্রাইব্যুনাল গঠন করা হয়েছে। ভূমি রাজস্ব, আবগারী, মূল্য সংযোজন কর ও শুল্ক সংক্রান্ত আপিল নিষ্পত্তি করার জন্য ভূমি রাজস্ব, আবগারি, মূল্য

www.pathagar.com

সংযোজন কর ও শুল্ক কর্তৃপক্ষ আছেন এবং ভূমি আপিল বোর্ড ভূমি রাজস্ব সংক্রান্ত ও জাতীয় রাজস্ব বোর্ড আয়কর, আবগারি, মূল্য সংযোজন কর ও শুল্ক সংক্রান্ত সর্বোচ্চ কর্তৃপক্ষ। ১৯৯৫ সালে মূল্য সংযোজনকর ও শুল্ক বিরোধ নিষ্পত্তি করার জন্য বহিশুল্ক, আবগারী ও মূল্য সংযোজন কর আপিল ট্রাইব্যুনাল গঠন করা হয়েছে। আয়কর আপিল ট্রাইব্যুনাল এবং শুল্ক, আবগারী ও মূল্য সংযোজন আপিল ট্রাইব্যুনাল আইনের প্রশ্নে নিষ্পত্তির জন্য তা হাইকোর্ট বিভাগে পাঠাতে পারে। ঐ প্রশ্ন হাইকোর্ট বিভাগের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী উপরোক্ত ট্রাইব্যুনাল মামলা নিষ্পত্তি করতে বাধ্য। নির্বাচন সংক্রান্ত বিরোধ নিষ্পত্তি করার জন্য নির্বাচনী আইনের বিধানমতে নির্বাচন ট্রাইব্যুনাল গঠিত হয়। ১৯৭৪ সালের বিশেষ ক্ষমতা আইনের বিধানমতে ঐ আইনের উল্লিখিত অপরাধের বিচার করার জন্য দায়রা বিচারকদের নিয়ে বিশেষ ট্রাইব্যুনাল গঠিত হয়েছে। ১৯৮৫ সালের পারিবারিক আইন অধ্যাদেশের বিধানমতে সহকারী বিচারকদের নিয়ে পারিবারিক বিরোধ নিষ্পত্তি করার জন্য পারিবারিক আদালত গঠন করা হয়েছে। দুর্নীতি দমন করার জন্য ১৯৫৮ সালের ফৌজদারি সংশোধনী আইনের বিধান অনুযায়ী দায়রা বিচারকদের বিশেষ বিচারক নিয়োগ করা হয়েছ। তাছাড়া আরো অনেক আইনে বিরোধ নিষ্পত্তি করার জন্য ট্রাইব্যুনাল ও আধাবিচারমূলক কর্তৃপক্ষ আছেন। ঐ সকল আইনের ট্রাইব্যুনাল বা আধাবিচারমূলক কর্তৃপক্ষের আদেশের বিরুদ্ধে আপিল করার বিধান করা হলে নির্দিষ্ট আপিল কর্তৃপক্ষের নিকট আপিল দায়ের করা যায়। ইউনিয়ন পরিষদের নির্বাচন সংক্রান্ত ট্রাইব্যুনালের রায়ের বিরুদ্ধে জেলা বিচারকের আদালতে আপিল করা যায় এবং ঐরূপ আপিলের রায়ের বিরুদ্ধে দেওয়ানি কার্যবিধির ১১৫ ধারার বিধানমতে হাইকোর্ট বিভাগে রিভিশান বা পর্যালোচনার আবেদন করা যায়।[৪৬]

১৮৭২ সালের সাক্ষ্য আইনের প্রাধান্য: বাংলাদেশের দেওয়ানি ও ফৌজদারি আদালতগুলো যথাক্রমে ১৯০৮ সালের দেওয়ানি কার্যবিধি ও ১৮৯৮ সালের ফৌজদারি কার্যবিধির বিধান অনুযায়ী মামলা বিচার করলেও সাক্ষ্য প্রমাণ গ্রহণ করার সময় ১৮৭২ সালের সাক্ষ্য আইনের বিধান অনুযায়ী মামলা বিচার করতে সাক্ষ্য গ্রহণ করেন। সাক্ষ্য আইনে মামলা বিচারের প্রাসঙ্গিক বিষয়, স্বীকরোক্তি, প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সাক্ষ্য, বিশেষজ্ঞের সাক্ষ্য, মৌখিক ও দালিলিক সাক্ষ্য, মামলা প্রমাণের দায়িত্ব, আচরণ স্বীকৃতি, সাক্ষীর সাক্ষ্যের গ্রহণযোগ্যতা ও কাকে কাকে সাক্ষ্য দিতে বাধ্য করা যায় ও কাকে কাকে বাধ্য করা যায় না, সাক্ষ্য গ্রহণ করার নিয়মাবলী ইত্যাদি উল্লেখ করা হয়েছে। দলিল কিভাবে প্রমাণ করতে হবে, দলিলে উল্লিখিত বিষয় মৌখিক সাক্ষ্য দ্বারা কখন খণ্ডন করা যায় এবং কখন খণ্ডন করা যায় না এবং কি পদ্ধতিতে মৌখিক সাক্ষ্য লিপিবদ্ধ করতে হবে, যে পক্ষ সাক্ষী হাজির করেছে সেই পক্ষে সাক্ষীর প্রাথমিক জবানবন্দি অর্থাৎ এজাহার কিভাবে গ্রহণ করা হবে এবং প্রতিপক্ষ তাকে কিভাবে জেরা করবে এবং ঐ সাক্ষীকে আদালতে হাজিরকারীপক্ষ পক্ষে কিভাবে পুনঃপরীক্ষা করা হয় এবং সাক্ষীর

www.pathagar.com

জবানবন্দি গ্রহণ করার কোন পর্যায়ে কি কি বিষয় জিজ্ঞাসা করা যাবে এবং কি কি জিজ্ঞাস করা যাবে না তাও সাক্ষ্য আইনে উল্লেখ করা আছে। সাক্ষ্য আইনের মূলনীতি হচ্ছে বিচার্য বিষয়ের মধ্যেই সাক্ষ্য সীমাবদ্ধ রাখা, শোনা সাক্ষ্য বর্জন করা এবং সর্বোত্তম সাক্ষ্য প্রদান করা। সাক্ষ্য আইনে কোন কোন সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য কোন কোন সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য নয় তা আদালত নির্ধারণ করতে পারেন। আদালত সাক্ষ্য গ্রহণ করলেই তা আদালতের নিকট বিশ্বাসযোগ্য হয় না। সাক্ষীর সঙ্গে পক্ষদের সম্পর্ক, তার আচরণ, হাবভাব, তার বক্তব্যের সংগতি ও অসংগতি প্রভৃতি বিবেচনা করে আদালত সাক্ষীর সাক্ষ্য বিশ্বাস বা অবিশ্বাস করেন। তদ্রূপ দলিল নবীন কি প্রাচীন, সরকারি কি বেসরকারি, রেজিস্ট্রি কি বিনারেজিস্ট্রি, সঠিক কি জাল প্রভৃতি বিষয় বিবেচনা করে আদালত দালিলিক সাক্ষ্য বিশ্বাস বা অবিশ্বাস করেন।

আদালত যে পক্ষের সাক্ষ্য বিশ্বাস করেন সে পক্ষের মামলা প্রমাণিত বলে মনে করেন এবং সে পক্ষের অনুকূলে মামলার রায় প্রদান করেন। সাধারণত দেওয়ানি মামলায় উভয়পক্ষের সাক্ষ্য বিবেচনা করে যে পক্ষে সাক্ষ্য অধিকতর ভারি সে পক্ষের অনুকূলে আদালত মামলার রায় দেন। কিন্তু ফৌজদারি মামলায় সাধারণত আসামিকে সাক্ষ্য দিয়ে, কোনো কিছু প্রমাণ করতে হয় না। ফরিয়াদি বা অভিযোগকারীকে আদালতে সাক্ষ্য দিয়ে সন্দেহাতীতভাবে তার অভিযোগ প্রমাণ করতে হয়। অভিযোগকারী আসামির বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দ্বারা সন্দেহাতীতভাবে অভিযোগ প্রমাণ করতে না পারলে আদালত অসামিকে শাস্তি না দিয়ে খালাস দেন।

হাইকোর্ট বিভাগের এখতিয়ার ও ক্ষমতা : সংবিধান বা অন্য আইনের দ্বারা হাইকার্ট বিভাগের উপর যে রূপ আদি, আপিল ও অন্য প্রকার এখতিয়ার, ক্ষমতা ও দায়িত্ব অর্পিত হয়েছে বা হতে পারে উক্ত বিভাগের সেরূপ এখতিয়ার, ক্ষমতা ও দায়িত্ব থাকার বিধান করা হয়েছে।

হাইকোর্ট বিভাগ যে কোন সংক্ষুব্ধ ব্যক্তির আবেদনক্রমে যে কোন মৌলিক অধিকার বলবৎ করার জন্য প্রজাতন্ত্রের বিষয়াবলীর সাথে সম্পর্কিত কোনো দায়িত্ব পালনকারী ব্যক্তিসহ যে কোনো ব্যক্তি বা কর্তৃপক্ষকে উপযুক্ত আদেশ বা নির্দেশ দিতে পারেন। তদ্রূপ হাইকোর্ট বিভাগ প্রজাতন্ত্র বা কোনো স্থানীয় কর্তৃপক্ষের বিষয়াবলীর সাথে সংশ্লিষ্ট যে কোনো দায়িত্ব পালনরত ব্যক্তিকে বেআইনি কার্য হতে বিরত রাখতে বা আইনের দ্বারা করণীয় কাজ করতে নির্দেশ দিতে বা কোনো কাজ বা কোনো কার্যধারা আইনসঙ্গত কর্তৃত্ব ব্যতীত করা হলে বা গৃহীত হলে তার আইনগত কার্যকারিতা নেই বলে ঘোষণা করতে বা বেআইনিভাবে কোনো ব্যক্তিকে আটক করা হলে ঐ আটকাদেশ আইনগত ক্ষমতা বহির্ভূত বলে ঘোষণা করতে বা কেউ কোনো সরকারি পদে আইনসঙ্গতভাবে আসীন না হলে তা বেআইনি বলে ঘোষণা করতে পারেন।

www.pathagar.com

সংবিধানের ১০২ অনুচ্ছেদে হাইকোর্ট বিভাগকে যে সকল আদেশ ও নির্দেশ দানের ক্ষমতা দেয়া হয়েছে ঐ যে বিশেষ বিশেষ ক্ষমতা সর্বসাধারণের নিকট হাইকোর্ট বিভাগের প্রহিবিশন, ম্যাণ্ডামাস, সারশিওরারাই, হেবিয়াস কর্পাস ও কোয়ারান্টো রিট নামে পরিচিত। বাংলাদেশের সংবিধানে সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতিদের স্বাধীনভাবে বিচার করার ক্ষমতা দেয়ায় সংবিধানের ১০২ অনুচ্ছেদে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে হাইকোর্ট বিভাগ এবং ১০৩ ও ১০৪ অনুচ্ছেদে প্রদত্ত ক্ষমতা বলে আপিল বিভাগ নির্বাহী বিভাগের যে কোনো আদেশ, নির্দেশ বা কাজ বিচার বিভাগীয় পর্যালোচনা করে তা আইনগত ক্ষমতা বহির্ভূত বলে বেআইনি ঘোষণা করতে অথবা ওই কাজ হতে বিরত থাকতে বা আইনের দ্বারা করণীয় কাজ করার জন্য নির্দেশ দিতে এবং মৌলিক অধিকারের পরিপন্থী কোনো আদেশ বা আইন বেআইনি ঘোষণা করতে পারেন। এক কথায় সুপ্রিম কোর্ট নির্বাহী বিভাগের যে কোন কাজের বিচার বিভাগীয় পর্যালোচনা করতে পারেন। তাছাড়া সুপ্রিম কোর্ট অধস্তন আদালত, ট্রাইব্যুনাল, বা সরকারি কর্মকর্তার যে কোন কার্যধারা পর্যালোচনা করে তার আইনগত কার্যকারিতা নেই বলে ঘোষণা করতে পারেন। সুপ্রিম কোর্ট বেআইনীভাবে আটক ব্যক্তিকে ছেড়ে দেয়ার আদেশও দিতে পারেন এবং কেউ কোনো সরকারি পদে আইনসঙ্গতভাবে আসীন না হলে তাও বেআইনি বলে ঘোষণা করতে পারেন।[৪৭]

আপিল বিভাগের এখতিয়ার ও ক্ষমতা: হাইকোর্ট বিভাগের রায়, ডিক্রি, আদেশ অথবা দণ্ডাদেশের বিরুদ্ধে আপিল শুনানির ও তা নিষ্পত্তি করার এখতিয়ার আপিল বিভাগকে দেয়া হয়েছে। কোনো আইন দ্বারা অন্য কোনো আদালত বা ট্রাইব্যুনালের রায়, ডিক্রি ও আদেশের বিরুদ্ধে আপিল শুনানির ও নিষ্পত্তি করার ক্ষমতা দিলে আপিল বিভাগ তদ্রূপ আপিল নিষ্পত্তি করতে পারেন।

বিচারাধীন যে কোন মামলায় ঐ বিভাগ ন্যায়বিচারের স্বার্থে যে কোন আদেশ, নির্দেশ, ডিক্রি বা রিট জারি করতে পারেন। ১৯৮০ সালের প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনাল আইন সংশোধন করে প্রশাসনিক আপিল ট্রাইব্যুনালের রায়ের বিরুদ্ধে আপিল বিভাগে আপিল দায়ের করার বিধান করা হয়েছে। রাষ্ট্রপতি কোনো জনগুরুত্বসম্পন্ন আইনের প্রশ্নে সুপ্রিম কোর্টের মতামত গ্রহণ করা প্রয়োজন মনে করলে তিনি প্রশ্নটি আপিল বিভাগের বিবেচনার জন্য প্রেরণ করতে এবং উক্ত বিভাগ স্বীয় বিবেচনায় উপযুক্ত শুনানির পর প্রশ্নটি সম্পর্কে রাষ্ট্রপতিকে স্বীয় মতামত জ্ঞাপন করতে পারেন।[৪৮]

আদালত অবমাননার দণ্ড ও আইন ঘোষণা : সুপ্রিম কোর্ট একটি কোর্ট-অব-রেকর্ড এবং ইহার অবমাননার জন্য যে কাউকে তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ তদন্ত করে এ আদালত আইনের বিধান সাপেক্ষে তাকে দণ্ডিত করতে পারেন। আপিল বিভাগ কর্তৃক ঘোষিত আইন হাইকোর্ট বিভাগের জন্যে এবং সুপ্রিম কোর্টের যে কোন বিভাগ কর্তৃক ঘোষিত আইন অধস্তন সকল আদালতের জন্য অবশ্য পালনীয়। দেশের সকল নির্বাহী ও বিচার বিভাগীয় কর্তৃপক্ষ সুপ্রিম কোর্টকে সহায়তা দান করতে বাধ্য।[৪৯]

www.pathagar.com

অধস্তন আদালত ও ট্রাইব্যুনালের তত্ত্বাবধান ও নিয়ন্ত্রণ : বর্তমানে সকল অধস্তন আদালত ও ট্রাইব্যুনালের উপর হাইকোর্ট বিভাগের তত্ত্বাবধান ও নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা আছে। হাইকোর্ট বিভাগ কোনো অধস্তন আদালতে বিচারাধীন কোনো মামলায় সংবিধানের ব্যাখ্যা সংক্রান্ত আইনের গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন বা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় জড়িত থাকলে ঐ মামলাটি হাইকোর্টে এনে স্বয়ং নিষ্পত্তি করতে পারেন বা উক্ত প্রশ্নটি নিষ্পত্তি করে রায়ের নকলসহ উক্ত রায়ের সঙ্গে সংগতি রক্ষা করে মামলাটি মীমাংসা করার জন্য অধস্তন আদালতে তা ফেরত পাঠতে পারেন।[৫০] সংবিধানের চতুর্থ সংশোধনীর দ্বারা সংবিধানের ১০৯ অনুচ্ছেদ সংশোধন করে হাইকোর্ট বিভাগের তত্ত্বাবধান ও নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা হতে ট্রাইব্যুনালকে বাদ দেয়া হয়েছিল। উক্ত সংশোধনীর ফলে ট্রাইব্যুনালগুলোর উপর হাইকোর্ট বিভাগ তত্ত্বাবধান ও নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা হারিয়ে ফেলায় ট্রাইব্যুনালগুলো নির্বাহী কর্তৃপক্ষের হাতিয়ারে পরিণত হয়েছিল এবং হাইকোর্ট বিভাগ তার বিরুদ্ধে প্রতিকারের ক্ষমতা হারিয়ে ফেলেছিল। ১৯৯১ সালের সংবিধানের দ্বাদশ সংশোধনী দ্বারা সংবিধানের ১০৯ অনুচ্ছেদ পুনরায় সংশোধন করে ট্রাইব্যুনালগুলোকেও আবারও পূর্বের মত হাইকোর্ট বিভাগের তত্ত্বাবধান ও নিয়ন্ত্রণে ন্যস্ত করা হয়েছে। এর ফলে ট্রাইব্যুনালগুলোর উপর নির্বাহী বিভাগের ক্ষমতা সীমিত হয়েছে এবং হাইকোর্ট বিভাগের তত্ত্বাবধান ও নিয়ন্ত্রণ পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

বাংলাদেশ সুপ্রিমকোর্ট : সংবিধানের ১নং অনুচ্ছেদে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশকে একটি একক, স্বাধীন ও সাবভৌম প্রজাতন্ত্র বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। বাংলাদেশ পাকিস্তান বা ভারতের মতো ফেডারেশন বা যুক্তরাষ্ট্র না হওয়ায় ঐ সকল দেশের মতো বাংলাদেশ পৃথক সুপ্রিমকোর্ট ও হাইকোর্ট রাখার প্রয়োজনীয়তা সংবিধান প্রণেতারা সমীচীন মনে করেননি। সেজন্য যুক্তরাজ্যের আদলে বাংলাদেশে আপিল বিভাগ ও হাইকোর্ট বিভাগ নিয়ে 'বাংলাদেশ সুপ্রিমকোর্ট' নামে একটি সর্বোচ্চ আদালত গঠন করা হয়েছে। বাংলাদেশের প্রধান বিচারপতি এবং উভয় বিভাগের বিচারপতিদের নিয়ে সুপ্রিমকোর্ট গঠিত। প্রধান বিচারপতি ও আপিল বিভাগে নিযুক্ত বিচারপতিগণ কেবল ঐ বিভাগে এবং অন্যান্য বিচারপতিগণ হাইকোর্ট বিভাগে আসন গ্রহণ করেন। সংবিধানের বিধানাবলী সাপেক্ষে প্রধান বিচারপতি ও অন্যান্য বিচারপতিগণ হাইকোর্ট বিভাগে আসন গ্রহণ করেন। সংবিধানের বিধানাবলী সাপেক্ষে প্রধান বিচারপতি ও অন্যান্য বিচারপতিগণ বিচারকার্য পালনের ক্ষেত্রে স্বাধীনভাবে কাজ করেন। প্রধান বিচারপতি ও অন্য বিচারপতিগণ রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নিযুক্ত হন। ১৯৭৫ সালে সংবিধানের চতুর্থ সংশোধনীর পূর্বে রাষ্ট্রপতি কর্তৃক প্রধান বিচারপতির সঙ্গে পরামর্শ করে অন্য বিচারপতিদের নিয়োগ করার বিধান ছিল। ঐ বিধান ৪র্থ সংশোধনীর দ্বারা বাতিল করা হলেও প্রধান বিচারপতির সাথে পরামর্শক্রমেই সাধারণত সুপ্রিমকোর্টের অন্য বিচারপতিদের নিয়োগ

www.pathagar.com

করা হয়। তাছাড়া রাষ্ট্রপতি স্বীয় বিবেচনায় প্রধান বিচারপতি পদে নিয়োগ দান করেন। নিযুক্তির পর বিচারপতিগণ গুরুতর অসদাচরণ বা শারীরিক ও মানসিক অসামর্থ্যের কারণে সুপ্রিম জুডিশিয়াল কাউন্সিলের রিপোর্টের ভিত্তিতে রাষ্ট্রপতি কর্তৃক অপসারিত না হলে পঁয়ষট্টি বছর বয়স পূর্ণ হওয়া পর্যন্ত স্বীয় পদে বহাল থাকেন। সংবিধানের চতুর্থ সংশোধনীর পূর্বে প্রমাণিত অসদাচরণ বা অসমর্থ্যের কারণে সংসদের মোট সদস্য সংখ্যার অন্যূন দুই-তৃতীয়াংশের গরিষ্ঠতার দ্বারা সমর্থিত সংসদের প্রস্তাব ভিন্ন রাষ্ট্রপতি কোনো বিচারককে অপসারণ করতে পারতেন না। সংবিধানের ৯৫(২) অনুচ্ছেদে বিচারপতির পদে নিয়োগের যোগ্যতা ও ৯৯ অনুচ্ছেদে অবসর গ্রহণের পর বিচারপতিদের আইন পেশা ও চাকরির অক্ষমতা সম্পর্কে উল্লেখ আছে।

বাংলাদেশের রাজধানীতে অর্থাৎ ঢাকায় বাংলাদেশ সপ্রিমকোর্টের স্থায়ী আসন থাকলেও রাষ্ট্রপতির অনুমোদন নিয়ে প্রধান বিচারপতি সময়ে সময়ে অন্য স্থানে বা স্থানসমূহে হাইকোর্ট বিভাগের অধিবেশনের ব্যবস্থা করতে পারেন। সংবিধানের অষ্টম সংশোধনীর দ্বারা উপরোক্ত বিধান বাতিল করে হাইকোর্ট বিভাগের রাজধানীতে স্থায়ী আসনে বসা ব্যতীত বরিশাল, চট্টগ্রাম, কুমিল্লা, যশোর, রংপুর ও সিলেটের আরো ছয়টি স্থায়ী বেঞ্চ গঠন করা হয়েছিল।

সুপ্রিমকোর্টের আপিল বিভাগ আনোয়ার হোসেন বনাম বাংলাদেশ মামলার রায়ে সংবিধানের ১০০ অনুচ্ছেদ বেআইনি ঘোষণা করে সংশোধনপূর্ব ১০০ অনুচ্ছেদ পুনর্বহাল করেন। উল্লেখ্য, ১৯৮২ সালে ঢাকার বাইরে তিনটি এবং পরে আরও তিনটি হাইকোর্ট বেঞ্চ গঠিত হয়েছিল।[৫১]

অধস্তন আদালতের বিচারকদের নিয়োগ : বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পরও ব্রিটিশ শাসন আমলে প্রতিষ্ঠিত এবং পাকিস্তান আমলে চালু অধস্তন আদালতগুলোর গঠন ও এখতিয়ারের বিশেষ কোনো পরিবর্তন হয়নি। অধস্তন আদালতগুলোর মূল কাঠামো এক প্রকার অপরিবর্তিতই রয়ে গেছে। সেজন্য সংবিধানের ১১৪ অনুচ্ছেদে সুপ্রিমকোর্ট ব্যতীত দেশে আইনের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত অন্যান্য অধস্তন আদালত থাকার কথা বলা হয়েছে। বাংলাদেশ অধস্তন দেওয়ানি আদালতগুলো এখনও ১৮৮৭ সালের দেওয়ানি আদালত আইনের বিধান দ্বারা গঠিত এবং ফৌজদারি আদালতগুলো ১৮৯৮ সালের ফৌজদারি কার্যবিধির বিধান দ্বারা গঠিত এবং ১৯০৮ সালের দেওয়ানি কার্যবিধি ও ফৌজদার কার্যবিধির বিধান দ্বারা ঐ সকল অধস্তন আদালতের এখতিয়ার ও কার্যবিধি নিয়ন্ত্রিত হয়। তবে ঐ আইনগুলো সময়ে সময়ে অনেক সংশোধনের ফলে বাংলাদেশে অধস্তন আদালতগুলোর গঠন ও এখতিয়ার বর্তমানে ব্রিটিশ ও পাকিস্তান আমল থেকে কিছুটা পরিবর্তিত হয়েছে। বর্তমানে বিচার বিভাগীয় পদে বা বিচার বিভাগীয় দায়িত্ব পালনকারী ম্যাজিস্ট্রেট পদে রাষ্ট্রপতি প্রণীত বিধিসমূহ অনুযায়ী নিয়োগ দান করেন।

www.pathagar.com

তাদের নিয়ন্ত্রণ (কর্মস্থল নির্ধারণ, পদোন্নতিদান ও ছুটি মঞ্জুরিসহ) ও শৃঙ্খলা বিধান বর্তমানে রাষ্ট্রপতির উপর ন্যস্ত আছে এবং সে সম্পর্কে রাষ্ট্রপতি সুপ্রিমকোর্টের সাথে পরামর্শক্রমে অধস্তন আদালতের বিচারকদের নিয়ন্ত্রণ ও শৃঙ্খলা রক্ষা করেন।

সংবিধানের চতুর্থ সংশোধনীর পূর্বে জেলা বিচারকদের সুপ্রিমকোর্টের সুপারিশক্রমে এবং অন্য বিচারকদের কর্মকমিশন ও সুপ্রিমকোর্টের সাথে পরামর্শক্রমে রাষ্ট্রপতি নিযুক্ত করতেন। তখন সাত বছরের কম সময় বিচার বিভাগীয় পদে কেউ বহাল না থাকলে বা দশ বছরের কম সময় কেউ এডভোকেট না থাকলে তাকে জেলা বিচারক পদে নিয়োগ করা যেত না। তখন বিচার বিভাগে নিযুক্ত ব্যক্তিদের এবং বিচার বিভাগীয় দায়িত্ব পালনরত ম্যাজিস্ট্রেটদের নিয়ন্ত্রণ (কর্মস্থল নির্ধারণ, পদোন্নতিদান ও ছুটি মঞ্জুরসহ) ও শৃঙ্খলা বিধান সুপ্রিমকোর্টের উপর ন্যস্ত ছিল। সংবিধানের চতুর্থ সংশোধনীর ফলে অধস্তন আদালতের বিচারকদের নিয়োগ, নিয়ন্ত্রণ ও শৃঙ্খলা বিধানের ক্ষমতা সুপ্রিমকোর্টের পরিবর্তে এককভাবে রাষ্ট্রপতির উপর ন্যস্ত করা হয়েছিল। তবে চতুর্থ সংশোধনী দ্বারা ১১৬ ক অনুচ্ছেদ সংবিধানে সংযোজন করে বিচার বিভাগে নিযুক্ত ব্যক্তিগণ ও ম্যাজিস্ট্রেটগণকে বিচারকার্য পালনের ক্ষেত্রে স্বাধীনভাবে কাজ করার ক্ষমতা দেয়া হয়। ১৯৭৮ সালে প্রধান সামরিক প্রশাসকের ঘোষণাপত্র আদেশ নম্বর ৪ দ্বারা সংবিধানের ১১৬ অনুচ্ছেদ সংশোধন করে সুপ্রিমকোর্টের সাথে পরামর্শক্রমে রাষ্ট্রপতিকে অধস্তন আদালতের বিচারকদের নিয়ন্ত্রণ ও শৃঙ্খলা রক্ষা করার বিধান করা হয়েছে।

সংবিধানের চতুর্থ সংশোধনীর দ্বারা সংসদীয় গণতান্ত্রিক সরকার পদ্ধতি পরিবর্তিত করে রাষ্ট্রপতি পদ্ধতির সরকার গঠন করার সময় অধস্তন আদালতের বিচারকদের নিয়োগ, নিয়ন্ত্রণ ও শৃঙ্খলা রক্ষা করা বিষয়ে সুপ্রিমকোর্টের ক্ষমতা খর্ব করার পর ১৯৯১ সালে সংবিধানের দ্বাদশ সংশোধনীর দ্বারা রাষ্ট্রপতি পদ্ধতির সরকারের পরিবর্তে সংসদীয় গণতান্ত্রিক সরকার পদ্ধতি পুনঃপ্রবর্তন করা হলেও অধস্তন আদালতের বিচারকদের নিয়োগ, বদলি, নিয়ন্ত্রণ, পদোন্নতি ও শৃঙ্খলা রক্ষা বিষয়ে সুপ্রিম কোর্টের সাবেক ক্ষমতা পুনর্বহাল করা হয়নি। এ জন্য বিচারকার্য পালনের ক্ষেত্রে অধস্তন আদালতের বিচারকদের স্বাধীনতা দেয়া হলেও এবং তাদের পদোন্নতি, বদলি, নিয়ন্ত্রণ ও শৃঙ্খলা রক্ষা বিষয়ে সুপ্রিমকোর্টের সাবেক ক্ষমতা পুনর্বহাল করা হয়নি। এজন্য বিচারকার্য পালনের ক্ষেত্রে অধস্তন আদালতে বিচারকদের স্বাধীনতা দেয়া হলেও এবং তাদের পদোন্নতি, বদলি, নিয়ন্ত্রণ ও শৃঙ্খলা রক্ষার ব্যাপারে রাষ্ট্রপতিকে সুপ্রিমকোর্টের সাথে পরামর্শ করার বিধান করা হলেও দেশের আইনজীবী সম্প্রদায় বিচার বিভাগের পূর্ণ স্বাধীনতার জন্য সুপ্রিমকোর্টের সাবেক ক্ষমতা বহাল করার জন্য আন্দোলন করেছেন। এখানে উল্লেখ্য, ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনের ২৫৪ ধারায় জেলা জজ, অতিরিক্ত জজ ও সহকারী দায়রা জজদের নিয়োগ, কর্মস্থল নির্ধারণ ও পদোন্নতির বেলায়

www.pathagar.com

হাইকোর্টের সঙ্গে পরামর্শ করার বিধান করা হয়েছিল। তাছাড়া যারা সরকারি চাকরিতে ছিলেন তারা ছাড়া অন্যূন পাঁচ বছর পর্যন্ত ব্যারিস্টার, এডভোকেট বা উকিল থাকলে তাদের মধ্যে হতে উক্ত পদে নিয়োগ করার জন্য হাইকোর্ট সুপারিশ করতে পারত। উক্ত আইনের ২৫৫ ধারায় অধস্তন দেওয়ানি বিচার বিভাগীয় পদে মুন্সেফ অর্থাৎ সহকারী বিচারক পদে নিয়োগের জন্য হাইকোর্ট ও প্রাদেশিক কর্মকমিশনের সাথে পরামর্শক্রমে নিয়োগবিধি প্রণয়ন করার এবং প্রাদেশিক কর্মকমিশন কর্তৃক প্রার্থীদের মধ্যে হতে পরীক্ষার মাধ্যমে বাছাইকৃত তৈরি তালিকা হতে নিয়োগ করার এবং দায়রা জেলা জজের নিম্নপদস্থ যে কোনো অধস্তন বিচারকের কর্মস্থল নির্ধারণ, পদোন্নতি ও ছুটি মঞ্জুরের ক্ষমতা হাইকোর্টের উপর ন্যস্ত করা হয়েছিল। পাকিস্তান আমলে এবং বাংলাদেশে চতুর্থ সংশোধনীর পূর্ব পর্যন্ত হাইকোর্টের সে ক্ষমতা অক্ষুণ্ন ছিল।[৫২]

আদালতের ভাষা: বাদশাহি আমলে এদেশে আইন আদালত ও সরকারি কার্যালয়ের ভাষা ছিল ফার্সি। কোম্পানির শাসন আমলের প্রথমদিকে ইংরেজ কর্মচারীগণ কোর্ট কাছারিতে এদেশী কর্মচারীদের সাহায্যে ফার্সি ভাষায় কাজ চালাত। ১৮৩৫ সালে ফার্সির পরিবর্তে ইংরেজি ভাষাকে সরকারি ভাষা হিসেবে প্রচলন করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় এবং ১৮৩৭ সাল থেকে ফার্সির পরিবর্তে কোর্ট কাছারিতে দেশী ভাষা অর্থাৎ বাংলা প্রদেশে বাংলা ভাষা চালু করা হয়। তখন নিম্নআদালতে বাংলা ও উচ্চ আদালতে ইংরেজি ভাষা ব্যবহার করা আরম্ভ হয়। দেওয়ানি কার্যবিধির ১৩৭ ধারায় ইংরেজির সাথে দেওয়ানি আদালতে দেশী ভাষা অর্থাৎ বাংলা ভাষার ব্যবহার স্বীকৃত হয়েছিল। আর ফৌজদারি কার্যবিধির ৫৫৮ ধারায় অধস্তন ফৌজদারি আদালতে কোন ভাষা ব্যবহৃত হবে তা নির্ধারণ করার ক্ষমতা দেয়া হয়েছিল সরকারকে।

ব্রিটিশ আমল থেকে এদেশে অধস্তন দেওয়ানি ও ফৌজদারি আদালতে ইংরেজির সাথে বাংলা ভাষাও চালু ছিল। সাধারণত মফস্বলের অধস্তন দেওয়ানি ও ফৌজদারি আদালতে বেশিরভাগ কাজে বাংলা ভাষা ব্যবহৃত হতো আর বড় শহর ও নগরের অধস্তন দেওয়ানি ও ফৌজদারি আদালতেও বেশিরভাগ কাজে ইংরেজি ভাষা ব্যবহৃত হতো। ১৯৪৭ সালে ঢাকা মফস্বল শহর থেকে প্রাদেশিক রাজধানীতে রূপান্তরিত হওয়ার পর থেকে ঢাকা নগরীর অধস্তন দেওয়ানি ও ফৌজদারি আদালতে ও অন্যান্য বড় শহরগুলোর অধস্তন দেওয়ানি আদালতে বাংলার চেয়ে ইংরেজির ব্যবহার বেড়ে যেতে থাকে। ১৯৫৬ ও ১৯৬২ সালে পাকিস্তানের সংবিধানে বাংলা ভাষাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসেবে স্বীকৃতি দেয়া হলেও এবং বাংলাদেশের সংবিধানের ৩নং অনুচ্ছেদে বাংলা ভাষাকে একমাত্র রাষ্ট্র ভাষা বলে ঘোষণা করা হলেও অধস্তন দেওয়ানি ও ফৌজদারি আদালতে ইংরেজি ভাষার ব্যবহার কমেনি। তাছাড়া ব্রিটিশ আমল থেকেই হাইকোর্টে ইংরেজি ভাষা ব্যবহৃত হতো এবং বাংলাদেশের সংবিধানে উপরোক্ত বিধান করা সত্ত্বেও বাংলাদেশ সুপ্রিমকোর্টে

www.pathagar.com

ইংরেজি ভাষা ব্যবহৃত হচ্ছে। বাংলাদেশের অফিস আদালতে বাংলা ভাষা প্রচলন নিশ্চিত করার জন্য ১৯৮৭ সালে বাংলা ভাষা প্রচলন আইন জারি করা হয়। তা সত্ত্বেও দেশের আদালতগুলোতে ইংরেজি ভাষার ব্যবহার অব্যাহত রয়েছে।

দেওয়ানি ফৌজদারি বিচার : যেভাবে নির্যাতিত নিঃস্ব হয় নাগরিক

আগেই বলা হয়েছে বাংলাদেশের বিচার বিভাগীয় কাঠামো যে কোন উন্নত দেশের সমকক্ষ। পড়লে মনে হবে ন্যায়বিচার বুঝি প্রত্যেক নাগরিকের দোরগোড়ায় হাজির থাকে। আদালতে শুধু বিচার চাইলেই দ্রুত বিচার পাওয়া যাবে। কিন্তু বাস্তব অবস্থা সম্পূর্ণ বিপরীত; বড়ই বেদনাদায়ক। উন্নত দেশের আইন ব্যবস্থায় নাগরিক অধিকারের নিশ্চয়তা দেয়। আমাদের দেশে কাগজপত্রে এই নিশ্চয়তা থাকলেও বিত্তশালী বুদ্ধিমানরা বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই আইনকে ব্যবহার করে দরিদ্রের সম্পদ আত্মসাৎ করছে। প্রয়োগ ক্ষেত্রে পদ্ধতিগত ত্রুটি ও আইনের ফাঁকফোকড়ই এর প্রধান কারণ। এই যেমন অত্যন্ত ব্যয়বহুল দেওয়ানি মামলার চূড়ান্ত রায় পেতে বিচারপ্রার্থীর কচ্ছপের আয়ুর প্রয়োজন। ২০-৫০ বছরের মধ্যে কবে দেওয়ানি মামলার চূড়ান্ত নিষ্পত্তি হবে তা অনিশ্চিত থাকায় বাদী, বিবাদী, উকিল, সাক্ষী এমনকি আদালতের বিচারক মারা যাবার পরও বংশ পরম্পরায় মামলার খরচ যোগাতে সংশ্লিষ্ট পরিবারগুলো ধ্বংস হয়ে যায় চূড়ান্ত রায় পাবার আগেই। অন্যদিকে ফৌজদারি আইনে মিথ্যা অভিযোগে একজন নিরপরাধ ব্যক্তিকে বছরের পর বছর কারাবন্দি রেখে তার পরিবারকে সর্বস্বান্ত করে শত্রুতা উদ্ধারের এমন নিরাপদ সুযোগ সম্ভবত বাংলাদেশ ছাড়া বিশ্বের আর কোথাও নেই। কার্যকর জবাবদিহির ব্যবস্থা না থাকায় পুলিশ অহরহ এ সুযোগটি ব্যবহার করছে অবৈধ উপার্জনের হাতিয়ার হিসেবে এবং নাগরিক জীবনের এই দুর্ভোগ আমাদের আইনি সংস্কৃতিতে অঙ্গীভূত হয়ে গেছে।

মিথ্যা মামলায় ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তির পক্ষে এদেশে কোন শক্তিশালী আইনি প্রতিকারের ব্যবস্থা নেই। ক্ষতিপূরণের মামলা করলে আবার কোর্ট ফি খরিদ করে আদালতের প্রতি ধার্য তারিখে আইনজীবী, পেশকার, মুহুরীকে টাকা দিয়ে বছরে পর বছর অনির্দিষ্টকাল সময় পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে। দরিদ্র মানুষের সামর্থ্য না থাকায় এবং পুনরায় নির্যাতিত হবার ভয়ে কেউ মানহানি বা ক্ষতিপূরণ মামলার ধারে কাছেও যান না। কেউ মামলা করতে সক্ষম হলেও আইনের দীর্ঘ জটিল ব্যয়বহুল প্রক্রিয়ায় তিনিও এক সময় মামলা চালাতে উৎসাহ হারিয়ে ফেলেন। সংক্ষেপে বলতে গেলে বেশিভাগ ক্ষেত্রে বিনাদোষে অনির্দিষ্টকাল কারাযন্ত্রণা ভোগ করে ক্ষতিপূরণ ছাড়া আদালতের রায়ে বেকসুর মুক্তি পাবার নাম হলো ফৌজদারি বিচার; আর পাঁচ টাকার সম্পদ উদ্ধারে কুড়ি টাকা খরচ করে অনির্দিষ্টকাল পর আদালতের যে রায় পাওয়া যায় তার নাম দেওয়ানি বিচার। এই বিচার ব্যবস্থার বিরুদ্ধে নিভৃতে ক্রন্দন ছাড়া প্রকাশ্যে কোন প্রতিবাদ করার নাম আদালত

www.pathagar.com

অবমাননা যা আবার ৬ মাস কারাদণ্ডযোগ্য অপরাধ। দেওয়ানি মামলার চূড়ান্ত রায় পাবার বিষয়টি লাইফ গ্যারান্টির মধ্যে পড়ে। যে কারণে কঠিন অসুখের অর্থ বোঝাতে যেকোন বাংলা অভিধানে 'আদালতি ব্যারাম' শব্দটি রয়েছে। বস্তুত একজন দরিদ্র বিচারপ্রার্থীর সামনে সমাধানের সকল পন্থা নিঃশেষ, অন্তহীন প্রতীক্ষা, ভিত্তিহীন প্রত্যাশা আর প্রতিকারহীন সংকটের দোলাচলে বিমূর্ত হয় ন্যায়বিচার। এভাবে ছলেবলে কৌশলে আইনের অপব্যবহার ও মান্ধাতা বিচার প্রক্রিয়ার পদ্ধতিগত ত্রুটির ওপর নির্ভর করে একজন ক্ষমতাবান সহজেই একজন দরিদ্রের স্থাবর-অস্থাবর সম্পদ আত্মসাত করে থাকে। ইতিহাস ও আইন বিশেষজ্ঞদের সমন্বিত প্রয়াস ছাড়া কোন একক ব্যক্তির পক্ষে এসব ভয়ানক জটিল আইন ও বিচার প্রক্রিয়ার পদ্ধতিগত ত্রুটি নির্ধারণ করা সম্ভব নয়। এভাবে জরাজীর্ণ আইনি ব্যবস্থার বাধ্যবাধকতা বা সীমাবদ্ধতার কারণে আমাদের বিচারকগণের আন্তরিকতা-সদিচ্ছা থাকার পরও তারা অনেক ক্ষেত্রেই ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠায় ব্যর্থ হন। তা সত্ত্বেও বিচারকগণের পরিশ্রম, দেশ ও স্বজাতি প্রেম, দক্ষতা-সততা, ঐকান্তিক প্রচেষ্টা, অধ্যবসায় ও আন্তরিকতার ফলে বিচারাদালতে যতটুকু ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে তা বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর চাহিদার তুলনায় একেবারেই অপ্রতুল। দেশে প্রচলিত ফৌজদারি ও দেওয়ানি আইনের প্রক্রিয়ায় সাধারণ মানুষ প্রতিনিয়ত কিভাবে নির্যাতিত ও নিঃস্ব হচ্ছে তার দুটি উদাহরণ আমাদের জাতীয় দৈনিকে প্রকাশিত প্রতিবেদন থেকে নিম্নে হুবহু উদ্ধৃত করা হলো-

মোস্তফা বাবুল, জামালপুর থেকে : স্বজনদের নিষ্ঠুর ষড়যন্ত্রের শিকার হয়ে আতিকুল্লাহ সিদ্দিক পিন্টু নামের এক সম্ভ্রান্ত পরিবারের সন্তান জীবনের ২১ বছর জেলে কাটিয়েছে। ৭ বছর বয়সে পিতার মৃত্যুর পর থেকেই তার ভবিষ্যত জীবন নিয়ে শুরু হয় ছিনিমিনি খেলা। একজন নাবালক এতিমের বিরুদ্ধে দায়ের করা হয় ধর্ষণসহ একাধিক চুরি-ডাকাতির মামলা। সাজানো এসব মামলায় পিন্টু ১৪ বছর বয়স থেকে ৭ বছর হাজতি আসামি এবং বাকি ১৪ বছর সাজাপ্রাপ্ত হয়ে জেল খেটেছে। জেলে থাকাকালে বিধবা মা নিখোঁজ হয়েছেন। ছোট ৩ বোন বিতাড়িত হয়েছে। ঘরবাড়িসহ প্রায় ৮ কোটি টাকা মূল্যের পৈতৃক সম্পত্তি আত্মসাত করা হয়েছে। সাজা ভোগের পর ৩৫ বছর বয়সে কারাজীবনের অবসান ঘটলেও স্বাভাবিক জীবনে ফিরে পিন্টু এখনও পরিচয় গোপন করে রয়েছে। নিরাপত্তার অভাব এবং আবারও কোন ষড়যন্ত্রে ফেঁসে যাবার ভয় তাকে তাড়া করছে। জেল থেকে বেরিয়ে পানের দোকানদারি করে তাকে জীবিকা নির্বাহ করতে হচ্ছে।

জামালপুর শহরের মিয়াপাড়ার সম্ভ্রান্ত মিয়াবাড়ির একেএম সিদ্দিকের একমাত্র পুত্রসন্তান আতিকুল্লাহ সিদ্দিক পিন্টু। ১৯৭২ সালে তার পিতা আকস্মিকভাবে মারা যান। পিন্টুর বয়স তখন ৭ বছর। মৃত্যুকালে তিনি স্ত্রী, ছেলে পিন্টুসহ ৩ শিশুকন্যা রেখে যান। পিন্টুর

www.pathagar.com

মায়ের নাম হীরা বেওয়া। ৩ বোন যথাক্রমে শামসুন নাহার পলি, কামরুন নাহার জলি ও গাবরুন নাহার মেরী। ওয়ারিশ সূত্রে পিন্টুর পিতা একেএম সিদ্দিক ৭ একর ৫৩ শতাংশ সম্পত্তির মালিক। মৃত্যুর পর বিষয়-সম্পত্তিই তার স্ত্রী এবং এতিম ছেলেমেয়েদের জীবনে কাল হয়ে দাঁড়ায়। ফুফাত এবং চাচাত ভাইরা ষড়যন্ত্র করে পিন্টুকে জেলে ঢুকিয়ে এবং মা ও বোনদের বিতাড়িত করে ঘরবাড়িসহ সমুদয় সম্পত্তি আত্মসাত করে ফেলেছে।

আতিকুল্লাহ সিদ্দিক পিন্টুর বয়স যখন ১৪ বছর তখন ফুফাত-চাচাত ভাইরা পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে ষড়যন্ত্র করে তাকে একটি ধর্ষণ মামলায় ফাঁসিয়ে দেয়। এ মামলায় ৯ মাস হাজত খাটতে হয়েছে তাকে। এরপর হাতে চাকু ধরিয়ে দিয়ে অস্ত্র মামলা এবং আলমিরা থেকে টাকা চুরির অভিযোগে তার বিরুদ্ধে মামলা হয় জামালপুর থানায়। এসব মামলায় তাকে হাজতে থাকতে হয়েছে ৩ বছর। থানা পুলিশ এবং ম্যাজিস্ট্রেটের হাতে-পায়ে ধরে মায়ের কান্নাকাটি ও তদবিরে পিন্টু এসব মামলা থেকে ছাড়া পেলে নতুন ফন্দি আঁটে তার ফুফাত-চাচাত ভাইরা।

তাকে খুবই আদর-যত্ন করে লাল-পালনের দায়িত্ব নেয় তারা। মা ও বোনদের প্রতিও সহানুভূতি দেখায়। কিছুদিন না যেতেই আবারও নিষ্ঠুর ষড়যন্ত্রের শিকার হয় পিন্টু, তার মা ও বোনেরা। একদিন বেড়ানোর কথা বলে পিন্টুকে রংপুরে নিয়ে যাওয়া হয়। ফুফাত ভাইর সঙ্গে রংপুরে গিয়ে পিন্টু আর ফিরে আসেনি। তাকে সেখান থেকে জয়পুরহাট থানায় নিয়ে ডাকাতি মামলায় ফাঁসানো হয়। পুলিশ তাকে গ্রেফতার করে। পিন্টুর ঠাঁই মেলে জয়পুরহাট জেলে। এই মামলার বিচার চলাকালে ৩ বছর তাকে হাজতেই থাকতে হয়েছে। জেলে থাকা অবস্থায় তার ৭ বছরের সাজা হয়। সেখান থেকে পিন্টুর কয়েদি জীবনের শুরু। জয়পুরহাট জেলে পিন্টু ৭ দিন খাওয়া দাওয়া ছেড়ে অনশন করলে ১৯৯০ সালে তাকে ময়মনসিংহ জেলে পাঠানো হয়। ময়মনসিংহ জেলে কয়েদি থাকা অবস্থায় ঈশ্বরগঞ্জ থানায় তাকে আরও একটি ডাকাতি মামলায় আসামী করা হয়। আইনি সহায়তা না পাওয়ায় এই মামলাতেও পিন্টুর ৭ বছরের কারাদণ্ড হয়। পিন্টুর সাজার মেয়াদ বেড়ে দাঁড়ায় ১৪ বছর। জয়পুরহাট এবং ঈশ্বরগঞ্জ থানার ২টি ডাকাতি মামলা ১৪ বছর সাজাপ্রাপ্ত কয়েদি এবং একের পর এক মামলায় ৭ বছর হাজতি আসামি হিসেবে তাকে জেলে কাটাতে হয়েছে। জামালপুর, ময়মনসিংহ, জয়পুরহাট, রংপুর, রাজশাহী, গাইবান্ধা, কাশেমপুর জেলে পিন্টুর হাজতবাস এবং সাজার মেয়াদ কেটেছে। মামলা-হয়রানিতে পিন্টুর জীবনের একুশ বছর ঝরে গেছে। সাজাভোগের শেষ দিনগুলো তার কেটেছে জামালপুর জেলে। অবশেষে ৩৫ বছর বয়সে ২০০৪ সালের ৩১ মে পিন্টু জেল থেকে বের হয়ে এসেছে। দীর্ঘদিন হাজতবাস এবং কারাভোগের পর পিন্টু স্বাভাবিক জীবনে ফিরে সম্পূর্ণ এক অপরিচিত মানুষ। মিয়াবাড়ির সন্তান বলে তাকে এখন কেউ চিনতে পারে না। তার জন্ম যে বাড়িতে সেই বাড়িটি অন্যের দখলে রয়েছে।

www.pathagar.com

জেল থেকে বের হয়ে মা-বোনদের খুঁজতে মিয়াবাড়িতে গিয়ে কাউকে পাওয়া যায়নি সেখানে। যে ঘরটায় তার মা-বোনরা থাকত সেটা দখল করে বিল্ডিং নির্মাণ করা হয়েছে। আগের ঘরবাড়ির কোন চিহ্নই সেখানে অবশিষ্ট নেই। মা ও বোনদের সন্ধান না পেয়ে পিন্টু জীবিকা নির্বাহের জন্য শহরের ফৌজদারি আদালত এলাকায় একটি পানের দোকান দিয়েছে। দোকানদারি করার পাশাপাশি পিন্টু তার মা ও বোনদের খুঁজে বের করার চেষ্টা করছে। ইতিমধ্যে ৩ বোনের খোঁজ মিললেও মা হীরা বেওয়া নিখোঁজ রয়েছেন। জেল থেকে বেরিয়ে পিন্টু জানতে পারে এক বোন পলির বিয়ে হয়েছিল শহরের সকাল বাজারে। স্বামী পরিত্যক্ত হয়ে পলি এখন ঢাকায় গিয়ে গার্মেন্টিসে চাকরি করছে। তার খোঁজ করতে গিয়ে ঢাকার শুক্রাবাদে সন্ধান মিলে কনিষ্ঠ বোন মেরীর। পরে খোঁজ মিলে মেঝো বোন জলির। তার চট্টগ্রামে বিয়ে হয়েছে। পিন্টু সাজা খাটার সময় রহস্যজনকভাবে মা হীরা বেওয়া নিখোঁজ হন। এ সময় ৩ বোন বিভিন্ন লোকের আশ্রয়ে লালিত-পালিত হয় এবং পরে তাদের বিয়েও হয়। বোনেরা প্রথমে ভাইকে দেখে চিনতে পারেনি। তাদের স্মৃতি থেকে ভাই হারিয়ে গিয়েছিল।

দেড় মাস হলো পিন্টু একে একে ৩ বোনের সন্ধান পেয়েছে। আবেগঘন পরিচয় ঘটে ভাইবোনদের। পিন্টুকে জড়িয়ে ধরে কেঁদেছে আর মায়ের খোঁজ জানতে চেয়েছে। বোনেরা জানে না তাদের মা জীবিত কি মৃত। পিন্টু জানিয়েছে, ফুফাত এক ভাই মিজানুর রহমান আরামের সঙ্গে টেলিফোনে যোগাযোগ করে মায়ের সন্ধান এবং পিতার সহায়সম্পত্তি বিষয়ে জানতে চেষ্টা করে। এতেই তার জীবন এখন হুমকির সম্মুখীন হয়ে পড়েছে। ফুফাত ভাই তাকে হুমকি দিয়ে বলেছে, তোমার মা মারা গেছেন। মরার আগে তোমাদের ওয়ারিশের জায়গাজমি সব বিক্রি করে গেছেন। এখন এসব নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করলে জীবন বিপন্ন হতে পারে। তার সন্ধান পাওয়া গেলে র‍্যাব দিয়ে ধরিয়ে ক্রসফায়ারে মেরে ফেলা হবে। শহরের ফৌজদারি এলাকায় পরিচয় গোপন রেখে পিন্টু পানের দোকানদারি করে জীবিকা নির্বাহ করছে। তার এখন ভয় স্বজনরা তাকে যদি চিনে ফেলে এবার হয়ত জেল খাটতে হবে না- তাকে সম্পত্তির লোভ-লালসা চরিতার্থ করতে হত্যা করা হতে পারে। পিন্টুর প্রতি মুহূর্ত কাটছে আতঙ্কে। তার পাশে দাঁড়াবার কেউ নেই। নিরাপত্তার স্বার্থে কাউকে মুখ খুলে নিজের জীবনের বিড়ম্বনার কাহিনীও বলতে সাহস পাচ্ছে না।[৫৩]

দেশে দেওয়ানি মামলা হওয়ার নির্দিষ্ট কোনো পদ্ধতি নেই বলে সব সময় আদালত উকিলের কাছে অসহায়। বিচারক কোনো পদক্ষেপের ওপর অটল থেকে বিচার শেষ করতে পারেন না। আমার একটি মামলার (নম্বর ৩২৭/৮৪) শুনানি চলছিল পঞ্চম অতিরিক্ত জেলা জজের আদালতে। এ অবস্থায় অ্যাপিলেট আদালতকে দোষ দিয়ে মিস আপিল (৪২৪) করে দেয় জেলা জজের কাছে। তারপর আদালত বদলিয়ে মামলাটি

www.pathagar.com

আসে দ্বিতীয় অতিরিক্ত জেলা জজের কাছে। দীর্ঘ দু'বছর পর আবারও শুনানির পর্যায়ে। তারপরও অ্যাপিলেট বারবার সময় প্রার্থনা করে মামলা পিছিয়ে নিচ্ছে। মামলার বর্তমান বয়স ৩০ বছর। মূল বিবাদী বা অ্যাপিলেটের দখলে নালিশি জমি থাকায় তারা মামলাটি শেষ করতে চায় না। বাদীদের অনেকে মারা গেছেন। আমরাও যদি মারা যাই তাহলে হয়তো আর মামলা কেউ চালাবে না। এভাবে নির্যাতিতরাই মৃত্যুর পরে নির্যাতনকারী হিসেবে দেশবাসীর কাছে চিহ্নিত হয়ে থাকবে।

অমানুষিক নির্যাতনের শিকার হয়ে আমি গ্রামের কাছে বিচার পেলাম না। আমাদের কাছে টাকা ও শক্তি নেই। আদালতে সে একই অবস্থা-বিচারহীনতা। বিচারব্যবস্থার কাঠামোগত কোনো দিক বা সময় নেই। বাংলাদেশে বুদ্ধিজীবীসহ এবং রাজনীতিবিদের কাছ থেকে দেওয়ানি মামলা সহজে সংক্ষিপ্ত সময়ে হওয়ার প্রস্তাব আসা এখন সময়ের দাবি, যুগের দাবি।

আমার দীর্ঘ ৩০ বছর আদালতে মামলা পরিচালনা ও পর্যবেক্ষণের অভিজ্ঞতা থেকে এ কথা আমি বলতে পারি, আদালতের চিন্তা করতে হবে যে লোক বিচার চায় তার বয়স কত। বিচারব্যবস্থা দ্রুততার জন্য সরকার ফিস বাড়িয়ে নিতে পারে। বিচারপ্রার্থীর গড় আয়ুর কথা আদালতের চিন্তা করতে হবে। বিচার শেষ না করতে পারলে আদালত বিচার নেবেন কেন?- মোঃ ফজলুল ইসলাম, মিরসরাই, চট্টগ্রাম।[৫৪]

বিলম্বিত ব্যয়বহুল বিচার ব্যবস্থা: দরিদ্রতা যার উপসংহার

ঢাকা, খুলনা, কুমিল্লা, রংপুর ও গাজীপুর এই ৫টি জেলা আদালতে ১০ বছরেরও বেশি সময় ধরে ১১ হাজার ২৭৭ মামলা বিচারাধীন। এর মধ্যে খুলনায় একটি মামলা গত ৫০ বছরে ১২০০ বার এবং ঢাকায় একটি মামলা ৩৫ বছরে ৫শ' বার মুলতবি হয়েছে। শুধু নিম্নআদালতেই যুগের পর যুগ ধরে মামলা বিচারাধীন থাকায় একদিকে বিচার প্রার্থীরা হয়রানির শিকার হচ্ছেন, অন্যদিকে সময় ও অর্থের অপচয় ঘটছে। এসব মামলা বছরের পর বছর ধরে ঘুরতে থাকায় অন্যান্য মামলার বিচার আটকে যাচ্ছে। সৃষ্টি হচ্ছে মামলার জট। এ অবস্থায় একটি পাইলট প্রকল্পের আওতায় ওই ৫টি জেলা আদালতের মামলাসমূহের ধরণ ও কতদিন ধরে বিচারাধীন রয়েছে তা চিহ্নিত করেছে। এবং এ মামলা দ্রুত নিষ্পত্তি করার একটি উপায় খুঁজে বের করার চেষ্টা চলছে।

দেশের জেলা আদালতসমূহ এবং সুপ্রীম কোর্টে ১০ লাখের বেশি মামলা বিচারাধীন। আদালতসমূহে মামলার জট সৃষ্টি হয়েছে। বিচার প্রার্থীরা হয়রানির শিকার হচ্ছেন। বর্তমান সরকার মামলার দ্রুত নিষ্পত্তি করতে ব্রিটিশ আমলের বেশ কয়েকটি আইনের সংস্কার করেছে। চাঞ্চল্যকর মামলা দ্রুত নিষ্পত্তি করতে দ্রুত বিচার ট্রাইব্যুনাল আইন করা হয়েছে। এ আইনের আওতায় মামলা দ্রুত নিষ্পত্তি হওয়ায় জনগণের প্রত্যাশা

www.pathagar.com

বেড়েছে। বিষয়টি মাথায় রেখে সরকার অন্যান্য মামলাও দ্রুত নিষ্পত্তি করতে উদ্যোগ নিয়েছে। এরই অংশ হিসেবে প্রাথমিকভাবে আইন মন্ত্রণালয় ঢাকা, খুলনা, কুমিল্লা, রংপুর ও গাজীপুর জেলা আদালতে বিচারাধীন মামলার ধরণ চিহ্নিত করেছে। কোন মামলা কতদিন ধরে বিচারাধীন এবং মামলার ধরণ কি সেটার একটি পরিসংখ্যান তৈরি করেছে।

একটি পাইলট প্রকল্পের আওতায় এটা করা হয়েছে। এ বিষয়ে প্রাপ্ত তথ্যানুযায়ী ঢাকায় ১০ থেকে ১৫ বছর ধরে ৪৫৯৪টি, ১৫ থেকে ২০ বছর ধরে ১৩৩৭টি, ২০ থেকে ২৫ বছর ধরে ৫৫৬টি, ২৫ থেকে ৩০ বছর ধরে ৯৬৫টি, ৩০ থেকে ৩৫ বছর ধরে ১২২৫টি এবং ৩৫ বছরেরও বেশি সময় ধরে ৮৯টি মামলা বিচারাধীন। ১০ বছরের বেশি সময় ধরে গাজীপুরে ২২৫টি, কুমিল্লায় ১০৪৭টি, খুলনায় ৯০২টি এবং রংপুরে ৩৭৭টি মামলা বিচারাধীন।

এসব মামলা কিভাবে দ্রুত নিষ্পত্তি করা যায় তার একটি পদ্ধতি তৈরি করার চেষ্টা চলছে। বিচারাধীন মামলাগুলোর ব্যবস্থাপনার জন্য একটি সঠিক তথ্য তালিকা অর্থাৎ ডাটাবেস তৈরি করা হচ্ছে। এ ৫টি জেলায় সফলভাবে বিষয়টি বাস্তবায়ন সম্ভব হলে সারাদেশেই জেলা আদালতসমূহে বিচারাধীন মামলার দ্রুত নিষ্পত্তি করতে নতুন করে উদ্যোগ নেবে সরকার।[৫৫]

সর্বমোট ৩২ লাখ মামলায় সারা দেশের আদালতগুলো সয়লাব হয়ে আছে। এসব মামলার সঙ্গে জড়িতদের সংখ্যা প্রায় সাড়ে ১৪ কোটি, যা দেশের মোট জনসংখ্যার চেয়েও বেশি। মামলাগুলোর পেছনে সংশ্লিষ্টদের দৃশ্যমান ব্যয় প্রতি বছর ২৯ হাজার কোটি টাকা। তবে মামলার জন্য প্রতি বছর সামগ্রিক ক্ষতির পরিমাণ বাংলাদেশের মোট জিডিপির দ্বিগুণের সমান। আর বর্তমানে আদালতে মামলা নিষ্পত্তির যে গতি, তাতে এই মামলাগুলো নিষ্পত্তি হতে সময় লাগবে প্রায় সাড়ে ৩ কোটি বছর।

বাংলাদেশের ভূমি সংক্রান্ত বিরোধ, তার আর্থসামাজিক প্রেক্ষাপট ও তা নিষ্পত্তির প্রক্রিয়া সম্পর্কে পরিচালিত সাম্প্রতিক এক গবেষণায় এসব ভয়াবহ তথ্য বেরিয়ে এসেছে। বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা এসোসিয়েশন ফর ল্যান্ড রিফর্ম এ্যান্ড ডেভেলপমেন্টের (এএলআরডি) সহায়তায় গবেষণাটি পরিচালনা করেছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের অধ্যাপক ও বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতির সাধারণ সম্পাদক ড. আবুল বারকাত।

গবেষণায় এ তথ্যও পাওয়া গেছে যে, দেশে একদিকে যেমন সামাজিক বিরোধ ও সংঘাত বৃদ্ধি পেয়েছে, অন্যদিকে বিরোধ নিষ্পত্তির সামাজিক উদ্যোগও এখন অকার্যকর হয়ে পড়েছে। ফলে মামলা করার প্রবণতা বেড়েছে। মূলত উপজেলা পর্যায়ে আদালত প্রতিষ্ঠার পর থেকে এই প্রবণতা বেড়েছে বলেও গবেষণায় পাওয়া তথ্যে দেখা গেছে।

www.pathagar.com

বিষয়টি সম্পর্কে অ্যাটর্নি জেনারেল এ এফ হাসান আরিফ বলেন, জমির মালিকানা সংক্রান্ত ডকুমেন্টেশন, কর প্রদান পদ্ধতি প্রভৃতি সহজ না করা পর্যন্ত মামলার সংখ্যা কমিয়ে আনা খুব কঠিন। বিদ্যমান ব্যবস্থায় রাজস্ব বিভাগ ও রেজিস্ট্রেশন বিভাগের মধ্যে একই জমির মালিকানা সংক্রান্ত তথ্য ভিন্ন হয় ফলে বিরোধ অনিবার্য হয়ে ওঠে।

হাসান আরিফ বলেন, জমিসংক্রান্ত বিরোধের নিষ্পত্তি সচরাচর সামাজিক কিংবা আদালত বহির্ভূত উদ্যোগের মাধ্যমে সম্ভব হয় না। আবার সামাজিক কিংবা আদালত বহির্ভূত উদ্যোগের রায় যদি অপেক্ষাকৃত ধনী কিংবা প্রভাবশালীর বিরুদ্ধে যায়, তাহলে তার বাস্তবায়ন কঠিন হয়ে পড়ে। তাই পারিবারিক কোনো বিরোধ, টাকা-পয়সার লেনদেন, এমনকি জমির আল ঠেলা পর্যন্ত বিরোধের মীমাংসা সামাজিক বা আদালত বহির্ভূত উদ্যোগের মাধ্যমে সম্ভব হতে পারে। কিন্তু জমির মালিকানা বিষয়ে বিরোধের ক্ষেত্রে তা সম্ভব হবে বলে মনে হয় না। গবেষণায় পাওয়া তথ্যাদি সম্পর্কে ড. বারকাত বলেন, অনিষ্পন্ন মামলাগুলোর মধ্যে শতকরা ৯০ ভাগ অর্থাৎ প্রায় ২৯ লাখই জমিসংক্রান্ত প্রত্যক্ষ কিংবা পরোক্ষ বিরোধ থেকে উদ্ভূত। একেকটি মামলায় বাদী, বিবাদী, সাক্ষীসহ জড়িত লোকের সংখ্যা গড়ে ৪৫ জন। এ হিসাবে দেশের প্রায় সাড়ে ১৪ কোটি মানুষ মামলায় জড়িত। প্রতিটি মামলা নিষ্পত্তি হতে সময় লাগে গড়ে সাড়ে ৯ বছর। সে হিসাবে এই ৩২ লাখ মামলা নিষ্পত্তি হতে সময় লাগবে প্রায় সাড়ে ৩ কোটি বছর। তাছাড়া বর্তমান মামলা নিষ্পত্তির চেয়ে নতুন দায়ের করা মামলার সংখ্যা অনেক বেশি। এর অর্থ সব মামলার নিষ্পত্তির প্রক্রিয়া কোনদিনও শেষ হবে না।

ড. বারকাত বলেন, মামলাগুলোতে বছরে ২৯ হাজার কোটি টাকার দৃশ্যমান ব্যয়ের মধ্যে মাত্র ৫০০ কোটি যায় সরকারি কোষাগারে বিভিন্ন ফি ইত্যাদির মাধ্যমে। বাকি ২৮ হাজার ৫০০ কোটি টাকা ঘুষ বা উৎকোচ আকারে যায় থানা পুলিশ থেকে আইনজীবী, পেশকার ও নানা পর্যায়ের মানুষের পেছনে। দৃশ্যমান এই ব্যয় ছাড়াও এসব মামলার পেছনে আরো অনেক ব্যয় আছে। সেগুলো এবং এর সঙ্গে জড়িত মানুষ ও পরিবারগুলোর মানসিক, স্বাস্থ্যগত ও সামাজিক ক্ষতির অর্থনৈতিক মূল্য হিসাব করলে প্রতি বছর তার পরিমাণ দাঁড়ায় বাংলাদেশের দুটি জিডিপির (মোট জাতীয় আয়ের) সমান। অর্থাৎ আমরা যদি মামলা সংক্রান্ত এসব সমস্যা অর্ধেকেও নামিয়ে আনতে পারি তাহলে অন্য কোনো অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড ছাড়াই জিডিপি দ্বিগুণ হয়ে যাবে। তিনি বলেন, গবেষণার অংশ হিসেবে করা বিভিন্ন কেস স্টাডিতে দেখা গেছে, মামলা করে অধিকাংশ ক্ষেত্রে বাদী-বিবাদী কোনো পক্ষেরই লাভ হয় না। কারণ, মামলার নিষ্পত্তি হতে হতে অনেক ক্ষেত্রে দু'পক্ষই সর্বস্বান্ত হয়ে যায়। সরকারেরও লাভ হয় না। কারণ বিচার ব্যবস্থার পেছনে সরকারকে ব্যয় করতে হয় আয়ের চেয়ে অনেক বেশি। প্রকৃত লাভ হয় কিছু পরজীবী শ্রেণীর মানুষের। তারা এসব মামলা থেকে বিপুল পরিমাণ ফায়দা

www.pathagar.com

লোটেন। বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তি কিংবা বিরোধ নিষ্পত্তির সামাজিক উদ্যোগ প্রসঙ্গে সরকারি ও বেসরকারি একাধিক সংশ্লিষ্ট সংস্থার প্রতিনিধিরা জানান, এই পদ্ধতিতে জমির মালিকানা সংক্রান্ত বিরোধ নিষ্পত্তি কঠিন হলেও অতীতে অনেক ক্ষেত্রে তা সফল হয়েছে। এখন দিন বদলেছে। মুরুব্বিরা এখন আর সালিশি ব্যবস্থায় বসার আহ্বান পান না কিংবা পেলেও আগ্রহী হয়ে যান না। কারণ, ক্ষমতার সামাজিক ভরকেন্দ্র বদলে গেছে। এখন রাজনৈতিক কর্তৃত্বের ছত্রছায়ায় সর্বত্র মুরুব্বিয়ানা করে বেড়াচ্ছে সদ্য কৈশোর পেরোনো কিছু তরুণ। এদের অনেকেই আবার শিক্ষা-দীক্ষাহীন বখাটে ও বিপথগামী। তারা এসব বিরোধকে কাজে লাগিয়ে দু'পক্ষের কাছ থেকে টাকা-পয়সাও নিয়ে থাকে। অনেক ক্ষেত্রে তারাই বিরোধ উসকে দেয়।[৫৬]

প্রচলিত আইনের নির্ভরযোগ্য সংকলন নেই

দেশে প্রচলিত আইন দফায় দফায় সংশোধন করা হলেও তার কোন নির্ভরযোগ্য সংকলন নেই। নেই কেন্দ্রীয়ভাবে আইন সংরক্ষণের কোন ব্যবস্থা। এ পরিস্থিতিতে সম্প্রতি প্রণয়ন করা আইনগুলো ছাড়া কিছুকাল আগে তৈরি আইনেরও কোন 'নির্ভরযোগ্য পাঠ' খুঁজে পাওয়া সম্ভব নয়। নির্ভরযোগ্য পাঠ হিসেবে বিবেচনা করার মতো আইনের কোন সংকলন দেশে না থাকায় বিভিন্ন সময় আদালতকে বিভ্রান্ত করার নজির রয়েছে। এমনকি সরকারি কাজকর্মে পর্যন্ত বিভ্রান্তি সৃষ্টি হওয়ার নজিরও আছে।

বর্তমানে দেশে মোট ১ হাজার ৬৫৮টি আইন আছে। এর মধ্যে বহাল রয়েছে ১ হাজার ১০০টি। ব্রিটিশ শাসনামলে ১৮৩৬ সাল থেকে ১৯৭১ সাল পর্যন্ত আইন ছিল ৮৩৭টি। এর মধ্যে ৩৪৬টি বাতিল করা হয়েছে। অবশিষ্টগুলোর মধ্যে ৬১টি আইন বাংলাদেশ কখনোই গ্রহণ করেনি। এ অবস্থায় বর্তমানে স্বাধীনতা-পূর্ব আইন বলবৎ আছে মোট ৪৩০টি। স্বাধীনতার পর বাংলাদেশে এ পর্যন্ত তৈরি করা হয়েছে মোট ৬৭১টি নতুন আইন। আবার এসব আইনেরও বহুদফা সংশোধন করা হয়েছে। আগের আইনগুলোও কয়েক সহস্র সংশোধনীর মাধ্যমে পরিবর্তন করা হয়েছে বাংলাদেশের সংসদে।

অথচ বাস্তবতা হচ্ছে একেকটি সংশোধনীর পর আইনটির বিধান কোন পর্যায়ে পৌঁছেছে সরকারিভাবে তা জানানোর কোন ব্যবস্থা করা হয় না। সংসদে পাস করা সংশোধনী রাষ্ট্রপতি অনুমোদন করার পর সংসদে পাস করা অংশটি গেজেট বিজ্ঞপ্তি আকারে প্রকাশ করা হয় মাত্র। আইন প্রণয়ন প্রক্রিয়ার সাংবিধানিক শর্ত হিসেবে এই বিজ্ঞপ্তিটি প্রকাশের মধ্য দিয়ে জাতীয় সংসদ সচিবালয় এই ব্যবস্থাটি করে। প্রয়োগের জন্য আইনটি সংশোধনের উদ্যোগ গ্রহণকারী মন্ত্রণালয় সংশোধনীর এই গেজেট বিজ্ঞপ্তি প্রয়োজনীয় স্থানে পাঠিয়ে নিজেদের দায়িত্ব শেষ করেন। আইনের কোন অংশ সংশোধিত হওয়ার পর এর কোন সংশোধিত সংরক্ষণ জাতীয়সংসদ কিংবা সরকারের পক্ষ থেকে প্রকাশ

www.pathagar.com

করা হয় না। যদিও বিভিন্ন সংশোধনীর পর একমাত্র বাংলাদেশের সংবিধান সংশোধিত আকারে সরকারিভাবে প্রকাশ করা হয়।

পরিবর্তিত অবস্থায় আইনটির পূর্ণাঙ্গ চিত্র খুঁজে পেতে নির্ভর করতে হয় বেসরকারি প্রকাশনা সংস্থার ছাপানো এবং ব্যক্তিবিশেষের প্রণয়ন করা আইনের ব্যাখ্যা সংবলিত বই কিংবা সংকলনের ওপর। আইন প্রণয়নকারী কোন কর্তৃপক্ষের প্রত্যয়ন ছাড়াই এসব বই বাজারে বিক্রি করা হয়। এমনকি সংশ্লিষ্ট আইনের মূল গেজেট বিজ্ঞপ্তির সঙ্গে বৈসাদৃশ্য থাকার পরও ভুলত্রুটিযুক্ত এসব বই এবং বিচারকের স্মৃতিশক্তির ওপর নির্ভর করে দেশের আদালতগুলোতে বিচার কাজ চলছে। নিম্ন আদালত থেকে শুরু করে উচ্চ আদালত পর্যন্ত রাষ্ট্রীয়ভাবে স্বীকৃত নির্ভরযোগ্য পাঠের কোন আইন বিচারকরা হাতে পাচ্ছেন না। আইনের প্রশ্নে সরকারি গেজেট বিজ্ঞপ্তির পরিবর্তে আইনজীবীদের সরবরাহ করা লেখক বিশেষের আইন বিষয়ক পুস্তক বা সংকলনকে বিচারের কাজে ব্যবহার করতে তারা বাধ্য হচ্ছেন। এর সুযোগে মামলার সুবিধা পাওয়ার জন্য আইনের সর্বশেষ সংশোধনীর অনেক আগের সংকলন আদালতে উপস্থাপন করারও যথেষ্ট নজির রয়েছে। প্রতিপক্ষ আইনজীবী বিষয়টি চিহ্নিত করতে না পারলে বিচার বিভ্রাট ঘটেছে এমন দৃষ্টান্তও রয়েছে। আইনজীবীর নৈতিকতাবিরোধী কাজ হিসেবে বিবেচনা না করে এসব ক্ষেত্রে আদালত বিষয়টিকে কৌসুলীর অজ্ঞাতপ্রসূত সরল বিশ্বাসের কর্মকাণ্ড বলে মেনে নিতে বাধ্য হচ্ছেন।

অপরদিকে বিভিন্ন সময়ে দেশের সর্বোচ্চ আদালতেও বিভিন্ন আইনের অংশবিশেষ বাতিল করা হয়েছে। মামলার রায় আকারে এগুলো আদালতগুলোতে স্বীকৃত বিভিন্ন ল' রিপোর্টে প্রকাশ পেলেও সরকারিভাবে এগুলো আইনের সংশোধনী আকারে কখনও গেজেট বিজ্ঞপ্তি আকারে প্রকাশ করা হয় না। সংশ্লিষ্ট আইনে গ্রহণ করা কোন পদক্ষেপ নিয়ে বিতর্ক আদালত পর্যন্ত গড়ালে আইনের এসব সংশোধনী 'মামলা আইন' হিসেবে বিচারের ক্ষেত্রে প্রাধান্য পায়। অথচ সরকারিভাবে যথাসংশ্লিষ্ট আইনে সংশোধনের ব্যবস্থা না থাকায় বিষয়টি সার্বজনীন আইন হিসেবে বলবৎ হয় না। এমনকি প্রয়োগের প্রশ্নে সরকারি কর্মকর্তা থেকে আইনজীবীরা পর্যন্ত এর সুযোগ গ্রহণ করতে দ্বিধা করেন না। এ ধরনের মামলা আইনে সংশোধিত হওয়ার পর এযাবত একমাত্র বাংলাদেশের সংবিধানের ১০০ অনুচ্ছেদটি সরকারিভাবে সংশোধন করে প্রকাশ করা হয়েছে। অনুসন্ধান করে দেখা গেছে, কার্যকারিতা অনুযায়ী সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের হাতে বিচ্ছিন্নভাবে দেশের প্রচলিত আইনগুলো রয়েছে। কেন্দ্রীয়ভাবে কোথাও সবগুলো আইন সংরক্ষণ করা হয় না। স্বভাবিকভাবেই একেকটি আইন বহুদফা সংশোধন করার পর আইনটি সর্বশেষে কি অবস্থায় পৌঁছেছে সরকারিভাবে কোথাও তা সংরক্ষণ করারও ব্যবস্থা নেই। সরকারের মন্ত্রণালয়ভিত্তিক কর্মবিভাজন অনুযায়ী দেশে প্রচলিত আইন

www.pathagar.com

সংরক্ষণ ও হালনাগাদ করার দায়িত্ব আইন মন্ত্রণালয়ের। প্রতিটি আইনকে সময়ভিত্তিক হালনাগাদ করে প্রকাশ করতে প্রতিটি সংশোধনীর পরই আইনের অভিযোজন করা এবং ছাপিয়ে প্রকাশ করার এই ব্যবস্থাটি প্রচলিত দায়িত্ব হিসেবেই এই মন্ত্রণালয়ের ওপর অর্পিত রয়েছে। এসব কাজ যথারীতি চলছে বলেই মন্ত্রণালয়ের পদস্থ কর্মকর্তারা মনে করেন। কিন্তু কোন শাখায় কে বা কারা এই কাজটি করেন জানার চেষ্টা করা হলে নির্দিষ্ট কোন শাখা বা বিভাগের হদিস তারা দিতে পারেনি।

স্বাধীন দেশের জন্য এটা অত্যন্ত দুঃখজনক। একজন নাগরিকের বিরুদ্ধে কি আইন দেশে প্রচলিত আছে জানার জন্য আইনের কপি হাতে পাওয়ার অধিকার মানবাধিকারের অন্যতম শর্ত। মূল্য দিয়ে হলেও প্রচলিত আইনের নির্ভরযোগ্য পাঠ সংগ্রহ করতে পারা ন্যায়বিচারের সাধারণ আইন অনুযায়ী প্রতিটি নাগরিকের অধিকার। আমাদের সংবিধানে আইন প্রণয়নের পর গেজেট বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের বিধান বাধ্যতামূলক করার অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য হচ্ছে নাগরিকদের এই অধিকার নিশ্চিত করা। সব ধরনের আইনের নির্ভরযোগ্য পাঠ প্রাপ্তির ব্যবস্থা নিশ্চিত করতেই সরকারি উদ্যোগে গেজেট বিজ্ঞপ্তি মুদ্রণ, প্রকাশ ও বিক্রয়ের ব্যবস্থা রয়েছে। সংশোধিত অবস্থায় আইনগুলো প্রাপ্তির ব্যবস্থা করা রাষ্ট্রের দায়িত্ব।[৫৭]

তথ্যসূত্র

১. দৈনিক বাংলাবাজার, ১৩ অক্টোবর ১৯৯৩।

২. দৈনিক সংগ্রাম ৬ জানুয়ারি ১৯৯৫।

৩. দৈনিক মিল্লাত ১৩ জুলাই ১৯৯৫।

৪. দৈনিক সংগ্রাম, ২১ জুলাই ১৯৯৫।

৫. সাপ্তাহিক বিক্রম: ১৭-২৩ জুন সংখ্যা ১৯৯৬।

৬. দৈনিক বাংলা, ২ এপ্রিল ১৯৯৬।

৭. দৈনিক মিল্লাত, ১৪ আগস্ট ১৯৯৬।

৮. দৈনিক প্রথম আলো, ১৩ নভেম্বর ২০০৫।

৯. দৈনিক যুগান্তর, ৯ ফেব্রুয়ারি ২০০৬।

১০. দৈনিক জনকণ্ঠ, ৩০ জানুয়ারি এবং দৈনিক দিনকাল ৩১ জানুয়ারি ২০০৪।

১১. দৈনিক প্রথম আলো: ৩০ মার্চ, ২০০৬।

১২. দৈনিক সংগ্রাম: ৮ জুলাই, ২০০৪।

www.pathagar.com

১৩. বদরুল হায়দার চৌধুরী পৃ: ৫।

১৪. ১৯৪৭ সালের হাইকোর্ট রিপোর্ট, পৃ: ১।

১৫. মফিজুল ইসলাম পাটোয়ারী): লিগ্যাল সিস্টেম অব বাংলাদেশ, পৃ: ৮।

১৬. ৭নং ডিএলআর-এফসি, পৃষ্ঠা ২৯১।

১৭. সূত্র, দৈনিক মিল্লাত: ৩০ জুন ১৯৯১।

১৮. প্রাগুক্ত: মফিজুল ইসলাম, পৃ: ৫৭০-৫৭৩।

১৯. চৌধুরী বদরুল হায়দার: এডলিউশন অব সুপ্রিমকোর্ট অব বাংলাদেশ, পৃ: ১২-১৪।

২০. প্রাগুক্ত: চৌধুরী বদরুল হায়দার, পৃ: ১৪-১৫।

২১. K.N. Panikkar. Presidential Address at India History congress. Aligarh- 1975.

২২. ১৯৭৬ সালের গ্রাম আদালত অধ্যাদেশ, ধারা ৩ ও ৫।

২৩. প্রাগুক্ত: ধারা-৭।

২৪. প্রাগুক্ত: ধারা-৮।

২৫. প্রাগুক্ত: ধারা-৮, ১৩ ১৪।

২৬. বিরোধ নিষ্পত্তি পৌর এলাকা অধ্যাদেশ ১৯৭৯, ধারা-৩, ৫, ৬, ৭, ১২ ও ১৩।

২৭. ১৯৭৬ সালে সংশোধিত ফৌজদারি কার্যবিধি, ধারা-৬।

২৮. প্রাগুক্ত: সংশোধিত ফৌজদারি কার্যবিধির ধারাসমূহ- ৭, ৯, ২৮, ২৯, ২৯ ক-ক-গ, ১০, ১২, ১৩, ১৭, ১৮, থেকে ২১, ২২, ২৫, ৩১, ৩২, ৩৩ক, ৪০৭ থেকে ৪১০, ৪১২-১৪, ৪১৭, ৪১৭ক, ৪২৩ এবং ৪২৬।

২৯. সংশোধিত ফৌজদারি কার্যবিধি : ধারা ১০৭, ১৩৩, ১৫৪-৫৭, ১৭৩, ২০০, ২০৪।

৩০. প্রাগুক্ত: ধারা- ২৪, ৪৫, ১৭৭, ১৪৫, ১৯১-৯২, ১৯৩, ২০৫গ, ২০৫গগ, ২৪১-৪৫, ২৬৫ক এবং ঠ, ৩৫২, ৩৩৯খ এবং গ, ৩৪০, ৩৪২, ৪৯৬-৯৭ (১)।

৩১. প্রাগুক্ত: ধারা ৩৪৫, ৪৯৭(৫), ৪৯৮।

৩২. প্রাগুক্ত: ধারা ৪৩৫-৪৩৯ক, ৪৯১, ৫৬১ক।

৩৩. ১৯৭৪ সালের বিশেষ ক্ষমতা আইনের ২৩নং ধারা এবং ফৌজদারি কার্যবিধি সংশোধনীর ৩নং ধারা।

৩৪. দেওয়ানি আদালত আইন: ধারা ৩, ৯, ১০।

৩৫. ১৯৯০ সালে সংশোধিত দেওয়ানি আদালত আইন: ধারা ১৯।

৩৬. প্রাগুক্ত: ধারা ২১।

৩৭. দেওয়ানি কার্যবিধি : ধারা- ৯।

৩৮. ১৯৯০ সালে সংশোধিত ছোট আদালত আইন: ধারা ১৫।

৩৯. দেওয়ানি আদালত আইন: ধারা ১০।

৪০. দেওয়ানি কার্যবিধি: ধারা ১১৫।

৪১. প্রাগুক্ত: ধারা ৯, ১৫-২০, ২৬, ২৭।

৪২. প্রাগুক্ত: দেওয়ানি কার্যবিধির আদেশ-৯, নিয়ম-৩, ৪, ৮, ৯, ৬, ১৩, আদেশ ১৬, ধারা-৯৬।

www.pathagar.com

৪৩. প্রাগুক্ত: ধারা-১১, আদেশ-১৪, নিয়ম-১-২, আদেশ-১৫, নিয়ম-৪, আদেশ-১৮ নিয়ম ১-৫, ধারা-৩০, ৩২, ধারা-৩৩ এর আদেশ ২০ নিয়ম ১,২ ধারা ২ (২) আদেশ ২০ নিয়ম ৬ এবং ধারা ৩৮ ও ৫১।

৪৪. প্রাগুক্ত: ধারা- ৯৬, ৯৭, ১০৪, ১০৭, ১১৫, ১৫২-৫৩, ১১৪ আদেশ ৪৭ এবং আদেশ ৪১ নিয়ম ৩০-৩২ ও ৩৫।

৪৫. সূত্র: বাংলাদেশ সংবিধানের ১১৭ নং অনুচ্ছেদ।

৪৬. ১৯৮৬ সালের বিএলডি (এডি) পৃষ্ঠা- ২৬৭।

৪৭. সূত্র: বাংলাদেশ সংবিধানের ১০১ এবং ১০২ নং অনুচ্ছেদ।

৪৮. বাংলাদেশ সংবিধানের ১০৩, ১০৪, ১০৬ অনুচ্ছেদ।

৪৯. প্রাগুক্ত: অনুচ্ছেদ ১০৮, ১১১-১১২।

৫০. প্রাগুক্ত: অনুচ্ছেদ ১০৯-১১০।

৫১. প্রাগুক্ত: অনুচ্ছেদ ৯৫(১), ৯৬, ১০০ এবং ১৯৮৯ সালের বিএলডি-বিশেষ সংখ্যা পৃষ্ঠা- ১, ডিএলআর (এডি) পৃষ্ঠা- ১৬৫।

৫২. বাংলাদেশ সংবিধানের ১০৯-১১০, ১১৫-১১৬ এবং এআইআর ১৯৬৬ (এসসি) পৃষ্ঠা- ৪৪৭।

৫৩. দৈনিক জনকণ্ঠ: ৩০ জুলাই, ২০০৫।

৫৪. দৈনিক ইত্তেফাক: ৭ এপ্রিল, ২০০৬।

৫৫. দৈনিক দিনকাল : ৩১ ডিসেম্বর ২০০৩।

৫৬ দৈনিক প্রথম আলো: ৭ অক্টোবর ২০০৩।

৫৭. দৈনিক যুগান্তর: ৩ ডিসেম্বর ২০০৩।

www.pathagar.com

অধ্যায় : পাঁচ

ভূমি ব্যবস্থাপনা : মামলা উৎপাদন কারখানা

বাংলাদেশের ভূমি রাজস্ব ও ভূমি ব্যবস্থা বিশ্বের জটিলতম সমস্যাগুলোর অন্যতম বলা যায়। মুঘল আমলেও এ জটিলতা ছিল যা দখলদার ব্রিটিশরা সহস্রগুণ বৃদ্ধি করে। এই জটিলতা শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে ক্রমশ বৃদ্ধি পেতে থাকায় দুরূহ এ জটিলতা সম্পর্কে গবেষণা অতি অল্পই হয়েছে। দুর্বোধ্য জটিলতা প্রয়োজনীয় উপাদান-উপকরণের অভাব বা স্বল্পতা হয়ত এর প্রধান কারণ। দেশের ভূমি ব্যবস্থা অত্যন্ত জটিল হওয়ায় দরিদ্রের ভূ-সম্পদ একজন ক্ষমতাবান সহজেই আত্মসাত করতে পারে যা নিয়ে প্রতিনিয়ত চলছে অজস্র খুনাখুনি আর মামলা-মোকদ্দমা। মুঘল যুগে আরবী-ফার্সী-সংস্কৃত পরিভাষা, বিভিন্ন পরগণায় বিভিন্ন প্রকার মাপ, ওজন, প্রথাভিত্তিক আইনকানুন, পরগণায় প্রথার পার্থক্য, রাজস্ব নিরিখের এবং দায় অধিকারে পার্থক্য, বিভিন্ন শ্রেণীতে পারস্পরিক দায় অধিকার, প্রত্যেক শ্রেণী-উপশ্রেণীর মধ্য দিয়ে অধিকার ব্রিটিশ শাসনামলে শত সহস্রগুণ বৃদ্ধি পায়। ব্রিটিশরা এ জটিলতা ইচ্ছা করেই বৃদ্ধি করে যাতে এ দেশের মানুষ সর্বদা ভূমি বিরোধে লিপ্ত থাকে। বাংলার কৃষিভিত্তিক সমাজে ভূমির মালিকানা বরাবরই মানুষের জীবন-জীবিকা ও বেঁচে থাকার প্রধান অবলম্বন। এই অবলম্বনকে নিরাপত্তাহীন করে মানুষকে হিংসা হানাহানি আর উন্মত্ততায় ব্যতিব্যস্ত রেখে ব্রিটিশদের ঔপনিবেশিক শাসন নিরাপদ রাখার কৌশল ছিল সুফলদায়ক। যে কারণে কোম্পানি যুগের বিখ্যাত লেখক চিন্তাবিদ JW Kaye দীর্ঘকাল ভূমি রাজস্ব ও ভূমি ব্যবস্থার ওপর গবেষণা করে বলেন- এ দেশের ভূমি ব্যবস্থা এক বিরাট বিষয়। সাধারণ মেধার বেশ উর্ধ্বে একজন ভদ্রলোক যদি সরল মনে স্বীকার করেন যে, তিনি দীর্ঘ ৩০ বছর কঠোর সাধনার পর এদেশের ভূমি ব্যবস্থায় তার অজ্ঞতা দূর হয়নি তবুও তার পক্ষে লজ্জা-অপমানের কিছুই নেই। আমি এমন কম লোককেই জানি যারা এ বিষয়ে পুরো দস্তুর দক্ষতা অর্জন করতে পেরেছেন। এটি এমন একটি বিষয় যার ওপর ভল্যুমের পর ভল্যুম লেখা যায় এবং লেখা হয়েছেও বটে। কিন্তু তবুও অজ্ঞতায় আমরা আগে যেখানে ছিলাম এখনও সেখানেই বিরাজ করছি।[১] ১৯৪৭ সালে ব্রিটিশ শাসনের অবসানের পর পাকিস্তানের ২৩ বছর শাসনামলেও এ সমস্যা সমাধানে কোন পরিকল্পিত উদ্যোগ নেয়া হয়নি। তারপর বাংলাদেশের স্বাধীনতার ৩৫ বছরেও এ দুরূহ জটিলতা নিরসনে কোন সুসমন্বিত পদক্ষেপ নেয়া হয়নি। জোট সরকারআমলে এডিবির অর্থায়ন ও অস্ট্রেলিয়ার

www.pathagar.com

সহযোগিতায় ২০০৩ সালে Certificate of Land ownership সংক্ষেপে CLO নামের একটি আধুনিক ভূমি ব্যবস্থাপনা প্রকল্প বাস্তবায়ন করার উদ্যোগ নেয়া হয়েছিল। কিন্তু দেশের মহাশক্তিধর মধ্যস্বত্ব ও সুবিধাভোগী শ্রেণীর প্রবল বাধার মুখে সে উদ্যোগ ভণ্ডুল হয়ে যায়। এরপর সরকার ভূমিদস্যুতা প্রতিহত করতে এবং ইতিমধ্যে বেদখল হওয়া সরকারি-বেসরকারি ভূমি উদ্ধারের জন্য ভূমি জবরদখলকারীদের বিরুদ্ধে ১৪ বছরের সাজার বিধান করে একটা কঠোর আইন প্রণয়নের পদক্ষেপ নিয়েছিল। ২০০৪ সালের ১০ ফেব্রুয়ারি সচিব কমিটির ১২ দফা সুপারিশমালার প্রেক্ষিতে মন্ত্রী পরিষদের বৈঠকে বিষয়টি অনুমোদন করা হয়। তাতে বলা হয়েছিল যে, কেউ জেলা প্রশাসকের কাছে দরখাস্ত করলে তদন্ত করে অপরাধ প্রমাণিত হলে জবরদখলকারী ১৪ বছর পর্যন্ত বিভিন্ন মেয়াদে কারাদণ্ড ভোগ করবে এবং তার কাছ থেকে ক্ষতিপূরণসহ সম্পত্তির দখল প্রকৃত মালিককে ফিরিয়ে দেয়া হবে। এ রায়ের বিরুদ্ধে মাত্র একবার আপীল করা যাবে ঢাকার জাতীয় কমিটির কাছে কিন্তু দেশের প্রবল ক্ষমতাবান ভূমি দস্যুচক্র সরকারের সে উদ্যোগটিও বানচাল করে দিয়ে তাদের প্রচণ্ড শক্তির পরিচয় দিয়েছে। ফলে ভূমি বিরোধ ও সংঘর্ষে প্রতিদিন খুন-জখমের ঘটনা ঘটে চলছে সেই আগের মতই যা সামাজিক অস্থিরতা ও মামলা মোকদ্দমার সংখ্যা কেবল বৃদ্ধিই করে চলেছে। অনুসন্ধানী দৃষ্টিতে তাকালে প্রতিদিন পত্রিকার পাতায় দেশের কোথাও না কোথও জমি নিয়ে সংঘর্ষে হতাহতের সংবাদ থাকবেই। গত ২১ জানুয়ারি ২০০৬ তারিখে প্রকাশিত তিনটি জাতীয় দৈনিকে এ সংক্রান্ত রিপোর্ট ছিল, জমি সংক্রান্ত বিরোধে বরিশাল সদর উপজেলার চর আইচা গ্রামে একই পরিবারের ৩ জন আহত (দৈনিক যুগান্তর), জামালপুরের মাদারগঞ্জে জমি দখল নিয়ে সংঘর্ষে ১০ জন আহত (আজকের কাগজ), চট্টগ্রামের চন্দনাইশে জমি নিয়ে সংঘর্ষে বড় ভাইর হাতে ছোট ভাই খুন। গাইবান্ধার গোবিন্দগঞ্জে জমি নিয়ে সংঘর্ষে ১ জন নিহত, ২৮ জন আহত। সিলেটের তাহিরপুরে জমি নিয়ে সংঘর্ষে ২৫ জন আহত (দৈনিক ইত্তেফাক), এতো গেল মাত্র একদিনের চিত্র। প্রকৃতপক্ষে বাংলাদেশে যত অপরাধ, যত অপকীর্তি, যত প্রতারণা তার সিংহভাগেরই মূল সূত্র হলো জমি মালিকানা ও জবর-দখল সংক্রান্ত বিরোধ থেকে উদ্ভূত। আমরা গত শতাব্দীর শেষ দশকের দিকে একই চিত্র দেখতে পাব। এর আগে পরেও সর্বদা একই চিত্র। এমনকি ভূমি জবরদখলকারীরা এতই ক্ষমতাবান যে সরকারি সম্পত্তিও তাদের কবল থেকে দখলমুক্ত করা যায় না। জাতীয় দৈনিকগুলো থেকে সংগৃহীত কিছু সংবাদ শিরোনাম নিম্নে উদ্ধৃত হলো- নড়াইল জেলার খড়োলিয়া গ্রামে জমি নিয়ে দু'দিনের রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষে ৫ মহিলাসহ ৮০ জন আহত। (বাংলাবাজার, ১৫ মার্চ ১৯৯৩), বরিশালের মেহেন্দিগঞ্জের আন্দারমানিক গ্রামে অন্যের জমি দখলের লোভে ৬ বছরের শিশু কন্যাকে ৮ টুকরা করিয়া হত্যা (ইত্তেফাক, ৭ জুন, ১৯৯৩), জমি দখলকে কেন্দ্র করে কেরানীগঞ্জে ব্যাপক সংঘর্ষ ও লুটপাটে ১০ জন গুরুতর আহত (বাংলাবাজর, ৩ জানুয়ারি ১৯৯৩)। শরীয়তপুরে

www.pathagar.com

জমি সংক্রান্ত বিরোধে গত এক বছরে ১৬টি খুন, আহত দু' শতাধিক (ইনকিলাব, ১৭ জানুয়ারি ১৯৯৮), সিলেটে জমি লইয়া সংঘর্ষে একজন নিহত (ইত্তফাক, ৭ মার্চ ১৯৯৩), বগুড়ার সারিয়াকান্দিতে জমি নিয়ে সংঘর্ষে ৮ জন আহত ও তরুণী অপহৃত (আল আমীন, ১৫ ডিসেম্বর ১৯৯২), রংপুরের মিঠাপুকুরে জমি নিয়ে সংঘর্ষে ২ জন নিহত ও ৩ জন আহত (আল আমিন, ১৪ নভেম্বর ১৯৯২), যশোরের শার্শায় জমি নিয়ে মামা-ভাগ্নে সংঘর্ষে ৬ জন আহত (আল আমিন, ১ ডিসেম্বর ১৯৯২), বগুড়ার শিবগঞ্জে জমি নিয়ে সংঘর্ষে ১ জন নিহত ও ৮ জন আহত (সংগ্রাম, ১১ নভেম্বর ১৯৯২), কুমিল্লার ব্রাহ্মণপাড়ায় জমি নিয়ে সংঘর্ষে ১ জন নিহত ১৫ জন আহত (আল আমিন, ১৮ নভেম্বর, ১৯৯২), নরসিংদীতে জমি দখলের সংঘর্ষে মহিলার গর্ভপাত (আল আমিন, ২৪ ডিসেম্বর, ১৯৯৪)

জমি সংক্রান্ত বিরোধে দুই সহোদরকে কুপিয়ে হত্যা (সংগ্রাম ২১ জুন ১৯৯০), জমি নিয়ে সংঘর্ষে গুলি ও বল্লমের আঘাতে ৩ জন নিহত ও ৬ জন আহত (দৈনিক দেশ, ৪ মার্চ ১৯৯১), জমি দখল অভিযানে কুমারখালিতে ১ জন নিহত ১৭ জন আহত (মিল্লাত, ২৯ নভেম্বর ১৯৮৮), দেশের সাড়ে ৪ লাখ একর সরকারি অর্পিত সম্পত্তি জবর-দখলে (জনকণ্ঠ, ১৬ সেপ্টেম্বর ২০০৩), অধিকাংশ ফৌজদারী অপরাধের কারণ ভূমি সংক্রান্ত বিরোধ (ইত্তেফাক, ২০ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৯), এই সংঘাত সংঘর্ষ ও হতাহতের তালিকা কিন্তু প্রতিদিনই দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হচ্ছে।

এভাবে গত আড়াই শতাব্দী ধরে ভূমি বিরোধে কতো লোক নিহত, আহত ও অবস্থাপন্ন কৃষক পথের ভিখেরী হয়ে গেছে এবং আজও হচ্ছে তার পরিসংখ্যান কোন কালেও পাওয়া যাবে না। কেন এমন হচ্ছে? কারণ এদেশের ভূমি ব্যবস্থাপনা অত্যন্ত ত্রুটিপূর্ণ এবং আইন কানুন সবলের পক্ষে তৈরি। আজ রাস্তাঘাটে, শহরে বন্দরে, গ্রামে-গঞ্জে ফুটপাতে যারা অসহায় উন্মাদগ্রস্ত ও উদ্দশ্যহীনভাবে, অনাহারে, অর্ধাহারে দিন কাটায় তাদের পূর্বপুরুষরা হয়তো একসময় ক্ষমতাবানদের দ্বারা বাস্তুচ্যুত হয়েছে। যাদের ছিল একদা জমি, বাড়ি ও সুখ শান্তি। তাদের হাড় কংকালসার, সন্তান-সন্ততিরা পথে-ঘাটে ছিন্নমূল হয়ে আমাদের সমাজ-সভ্যতাকে করছে তিরস্কার। বাংলাদেশের ত্রুটিপূর্ণ ও বর্তমান যুগের চাহিদা মেটাতে সম্পূর্ণ অনুপযোগী, ভূমি বিরোধ নিয়ে মামলার পরিণতি, বিলম্বিত বিচার ব্যবস্থায় কিভাবে সামাজিক বিশৃঙ্খলা বেড়ে চলেছে এবং দেশ ও জাতির কি পরিমাণ ক্ষতি হচ্ছে সে সম্পর্কে একটি গবেষণাপত্রসহ জাতীয় দৈনিকগুলোর সংগৃহীত প্রতিবেদন নিম্নে সংক্ষিপ্তাকারে পত্রস্থ করা হলো-

১৭৯৩ সাল থেকে ২০০৪ সাল পর্যন্ত মোট ৬০টি ভূমি সংক্রান্ত আইন প্রণীত হয়েছে। কিন্তু কোনও আইনই বাংলাদেশের ভূমি সমস্যার সমাধান দিতে পারেনি। বাংলাদেশের মানুষের পরিবর্তিত জীবনযাপনের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে মান্ধাতা আমলে প্রণীত গুরুত্বপর্ণ আইনগুলো সংস্কার করা হচ্ছে না। দেড়শ' বছর আগে প্রণীত আইন দিয়ে চলছে সব।

www.pathagar.com

সীমিত আকারে কিছু কিছু আইনের সংশোধন হলেও প্রয়োজনের মানদণ্ডে তা নগণ্য।

ভূমি সংস্কার বোর্ড সূত্রে জানা যায়, ১৭৯৩ সাল থেকে ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত ৩১টি, ১৯৪৮ সাল থেকে ১৯৭০ সাল পর্যন্ত ১১টি ও বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর ১৮টি ভূমি সংক্রান্ত আইন প্রণীত হয়। বিভিন্ন সময়ে ভূমি সংক্রান্ত এ সকল আইন বিচ্ছিন্ন ভাবেই প্রণীত হয়েছে যার অধিকাশই জটিল ও সাধারণের দুর্বোধ্য। পাশাপাশি বিরাজমান রয়েছে সার্কুলার নির্ভর ভূমি প্রশাসন ব্যবস্থা। অধুনিক ভূমি আইনের প্রভাবে ভূমি সংক্রান্ত সমস্যাগুলোর অধিকাংশই অমীমাংসিত থেকে গেছে কিংবা আরও জটিল হয়েছে। দেশের সকল প্রকার মামলা-মোকদ্দমার প্রায় সিংহভাগই ভূমি সংক্রান্ত। তাই ভূমি সংক্রান্ত আইনসমূহ সহজীকরণের মাধ্যমে প্রাচীন আইনগুলোকে জনগণের কল্যাণে আধুনিকায়ন ও যুগোপযোগী করে প্রণয়ন করা আবশ্যক। বিশেষ করে ভূমি সংস্কার ও ভূমিহীন পুনর্বাসন, ভূমি উন্নয়ন কর আদায়, ভূমি জরিপ ও রেকর্ড সংরক্ষণ, খাস জমি ব্যবস্থাপনা, সায়রাত মহাল ব্যবস্থাপনা, ভূমি ব্যবহার ব্যবস্থাপনা ও উত্তরাধিকার সংক্রান্ত আইন/নীতিমালাসমূহের সহজীকরণ ও আধুনিকায়ন করা দরকার।[২]

জমি নিয়ে মানুষের হয়রানি বন্ধ হয়নি। বাংলাদেশের সামাজিক বিরোধের অন্যতম প্রধান কারণ জমি ক্রয়, বিক্রয়, রেজিস্ট্রেশন, নামজারি ও সেটেলমেন্ট প্রভৃতি সংক্রান্ত বিবাদ। ১৯৬৫ সালে দেশে ভূমির রিভিশনাল জরিপের (আরএস) কাজ শুরু হয়। যা গত ৩৮ বছরেও এ কাজ পুরোপুরি শেষ হয়নি। ব্রিটিশ আমলে বাংলা প্রদেশে ১৮৮৮ সালে সর্বপ্রথম ভূমি জরিপ চট্টগ্রাম থেকে শুরু হয়। এ জরিপ সিএস ক্যাডাস্টরাল জরিপ নামে পরিচিত এবং এই সিএস জরিপ ১৯৪০ সালে দিনাজপুর জেলায় শেষ হয়। এতে সময় লাগে প্রায় ৫২ বছর। স্বাধীনতার ৩১ বছর পর ভূমি জরিপ, রেকর্ড, প্রণয়ন, ভূমির মালিকানা হস্তান্তর, রেজিস্ট্রেশন ও জাল দলিলসহ বিভিন্ন হস্তান্তরের মাধ্যমে সাধারণ মানুষের হয়রানি এবং ভূমি ব্যবস্থাপনায় জটিলতা ও অসুবিধার অবসান হয়নি[৩] আইন মন্ত্রণালয় সূত্রে জানা যায়, দেশে বিরাজমান সকল মামলার শতকরা ৮৩ ভাগই জমি সংক্রান্ত: বর্তমানে সংঘবদ্ধ জালিয়াত চক্র একজনের ভোগদখলকৃত জমি, বাড়ি, জাল দলিল সৃষ্টি করে জোরপূর্বক দখল করে, দেওয়ানি আদালতের দীর্ঘসূত্রিতার ভয় দেখিয়ে মোটা অংকের পণ দাবি করছে। কোনরূপ দলিল সৃষ্টি করতে পারলেই সন্ত্রাসী আর সন্ত্রাসী থাকে না, হয়ে যায় ভূমি মালিক। দেশে পর্যাপ্ত আইন রয়েছে, জনগণ আদালতের দ্বারস্থ হচ্ছেন, কিন্তু তাদের অশুভ চক্রান্তে নিরীহ জনগণ কোন প্রতিকার পাচ্ছেন না। বিচারের বাণী নিভৃতে কাঁদছে।

দেওয়ানি ও ফৌজদারি আদালতের জটিলতা, দীর্ঘসূত্রিতা, মানুষের কর্মস্পৃহা নষ্ট করে সর্বস্বান্ত করছে। সাবেক প্রধানমন্ত্রী নিজেই বলেছিলেন, কোর্টে প্রতিকার চেয়ে মামলা করা মানেই সেটা ডিপ ফ্রিজে পাঠানো। পত্রপত্রিকায় ভূমি জালিয়াতি সম্বন্ধে অনেক লেখালেখি হচ্ছে। কিন্তু এতেও কোন লাভ হচ্ছে না, হচ্ছে না আইনের কোন সংস্কার।

www.pathagar.com

ভূমি ব্যবস্থাপনা ত্রুটি আমাদের দেশে মামলা ও মোকদ্দমা বৃদ্ধির প্রধান কারণ। এ কারণে চিন্তা করতে হবে আদালতের মামলা সংখ্যা কিভাবে কমানো যায়। অর্থাৎ 'Prevention is better than cure' এ সত্যকে সামনে রেখে আমাদের কিছু সুনির্দিষ্ট পন্থা অবলম্বন করা প্রয়োজন।

সম্পত্তি অর্জিত হতে পারে সাধারণত দুইভাবে- ১. হস্তান্তর দ্বারা, ২. উত্তরাধিকারের মাধ্যমে। কিন্তু এ দুটি প্রক্রিয়ার আধুনিকীকরণ বা সংস্কার আজও হয়নি। বিশিষ্ট আইনবিদ গাজী শামছুর রহমান বলেছেন, দেশে অনেক আইনের কিছু কিছু পরিবর্তন হয়েছে, কিন্তু ১২৫ বছরের হস্তান্তর আইনের কোন সংস্কার হয়নি। আর যার কারণেই যত জাল-জালিয়াতির উদ্ভব হচ্ছে।

একশ' টাকা বা তদূর্ধ্ব মূল্যের কোন সম্পত্তি বিক্রি করতে হলে তা রেজিস্ট্রি বাধ্যতামূলক এবং প্রাপ্ত বয়স্ক যে কোন ব্যক্তি তা রেজিস্ট্রি অফিসে দাখিল করলে সাবরেজিষ্ট্রার রেজিস্ট্রি করতে বাধ্য। এখানে বিক্রেতার উক্ত সম্পত্তিতে স্বত্ব আছে কি নেই সেটা বিবেচ্য বিষয় নয়। বর্তমান রেজিস্ট্রি নিয়মে সাবরেজিস্ট্রারদের কিছুই করার নেই। যা তার সম্মুখে দাখিল করা হয় তাতেই তিনি অন্ধের মত সহি করে থাকেন। এই প্রচলিত রেজিস্ট্রেশন পদ্ধতিতে স্বত্ব ও দখলবিহীন দলিল সৃষ্টিই দেওয়ানী ও সেই সাথে ফৌজদারী মামলা বৃদ্ধির মূল উৎস।

আমাদের দেশে একজন লোক মারা গেলে তার উত্তরাধিকার সংক্রান্ত নথি সংরক্ষণ করার ব্যবস্থা নেই। দেখা যায়, ৫০/৬০ বছর পরে মৃত ব্যক্তির কোন না কোন দিক থেকে ওয়ারিশ সেজে সামান্য অল্প বয়স্ক একজন ওয়ার্ড কমিশনার বা উকিলের সার্টিফিকেট যোগাড় করে রেকর্ড, মালিকানা ও দখলবিহীন জমি যোগসাজশে বিক্রি করছে। রেজিস্ট্রি দলিল করেই সন্ত্রাসী কায়দায় নিরীহ লোকের জমি দখল করে নিচ্ছে। তারপর শুরু হয় কোর্ট-কাচারীতে ঘোরাঘুরির পালা। একবার বেদখল হলে সে জমি আর ৩০/৪০ বছরে ফিরে পাওয়া সম্ভব নয়। জজ কোর্ট, তারপর হাইকোর্ট সর্বশেষে সুপ্রীম কোর্টের রায় পেয়েও জমিতে ভোগদখলে যেতে পারছে না। আদালতের রায়, ডিক্রি ও আদেশ বলবৎকরণের ক্ষমতার অভাবে ঐ রায়ের বাস্তবায়ন আর হচ্ছে না। কোর্টের রায়গুলোকে ঘরে তুলেই রাখতে হচ্ছে কাগজ হিসেবে। আমাদের প্রচলিত দেওয়ানী বিচার ব্যবস্থায় সাধারণ নিয়ম Documents with possession। আর এটা এখন সহজ ব্যাপার সন্ত্রাসী, জালিয়াতিচক্রের জন্য। রেজিস্ট্রি অফিসে যেহেতু বিক্রেতার Signature এবং Thumb impression সংরক্ষণের ব্যবস্থা আছে। এ কারণে জালিয়াতচক্র শিক্ষিত লোকদের জমি, রেজিস্ট্রি অফিসের বিকল্প হিসেবে ভূয়া বায়নানামা সৃজন করে কোর্টের মাধ্যমে বিবাদীর অজান্তে রেজিস্ট্রি করে নিচ্ছে। আর ফটোকপি দাখিলান্তে কোর্ট থেকে মূল বায়নানামা উঠিয়ে নিচ্ছে। পরবর্তীতে থানাতে জিডি এন্ট্রি করে জানাচ্ছে- সেটা হারিয়ে গেছে বা গায়েব হয়ে গেছে এভাবেই তারা আইনের Coverage পাচ্ছে। তখন

www.pathagar.com

আর প্রকৃত মলিকের পক্ষে প্রমাণ করার কোন সুযোগ থাকছে না। আর যদি মালিকের মৃত্যু হয়ে যায় তাহলে তো ওয়ারিশদের পক্ষে প্রমাণ করা একেবারেই অসম্ভব। এ রেজিস্ট্রি দলিল বা কোর্টের রায় বাতিল করতে আবার আদালতের মাধ্যমে ছাড়া সম্ভব নয়। আর এখানে সময় লেগে যায় কমপক্ষে ২০/২৫ বছর। ভূমি ব্যবস্থাপনা ম্যানুয়েলের ৩১০, ৩১৪, ৩১৮ এবং ৩২৯ অনুচ্ছেদ অনুসরণ না করে দলিলের ফটোকপি জমা দিলেই তহশিল অফিস থেকে নাম পত্তনের প্রস্তাব দেয়। এক্ষেত্রে সরেজমিনে তদন্ত হয় না এবং এমনকি নোটিশও বাস্তবে জারি করা হয় না। যদিও প্রতিবেদনে লিখা থাকে নোটিশ যথাযথ জারি হয়েছে এবং সরেজমনে তদন্ত করিয়া দেখা যায় দরখাস্তকারী দখলে আছেন।' বিএলডি ১৯৮৩- তে মহামান্য হাইকোর্টের একটি রায়ে উল্লেখ আছে যে, খাজনার দাখিলা দখলের উত্তম প্রমাণপত্র এবং দখল সাধারণত স্বত্বকে নির্দেশ করে। এ কারণে দলিল ও নামপত্তন করে কোন উপায়ে খাজনা দিতে পারলেই নিম্নআদালত অনেক সময় তাদের পক্ষে রায় না দিয়ে পারেন না। আর এ সুযোগ ভোগ করছে ভূমিগ্রাসী, ভূমি লোভী, দালাল, জবরদখলকার, জালিয়াত চক্র। এ সকল কারণে ভূমি রেকর্ড প্রণয়নকারী জরিপ বিভাগও বিভ্রান্ত ও জটিল পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়ে থাকেন। ভূমি ব্যবস্থাপনায় জটিলতার কারণে সরকারি-বেসরকারি সম্পত্তি মামলায় জড়িত করে সরকারের রাজস্ব ফাঁকি দিয়ে ভোগদখল করছে জোতদার শ্রেণী। আমাদের দেশে আদালতের বিচার পদ্ধতি মূলত প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক (Adversary System of trial) এখানে পক্ষগণকে আদালতে সাক্ষ্য প্রমাণ হাজির করে তাদের নিজ নিজ মোকদ্দমা প্রমাণ করতে হয়। এখানে Goalbls, Theory গোয়েবলস থিওরি প্রধান হাতিয়ার। সরেজমিনে বিচারক তদন্ত করেন না বা ঘটনাস্থলে গিয়ে বিচারক সাক্ষ্যপ্রমাণ সংগ্রহ করতে পারেন না। যারা সন্ত্রাসী মাস্তানদের ভয়ে আদালতে সাক্ষী উপস্থিত করাতে পারেন না, রায় তাদের বিপক্ষে যায়। যে ক্ষেত্রে Adversary বিচার পদ্ধতি অনুপযোগী এবং কোন পক্ষ দাবি করবে, সে সব মোকদ্দমায় তদন্তমূলক বিচার পদ্ধতি (Inquistitorial System of trial) অনুসরণ করে বিচারকার্য সম্পন্ন করতে হবে। শুধুমাত্র আদালতে উপস্থিত সাক্ষীর উপর নির্ভর করে বিচার করলে, ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে সংশয় থেকে যায়। কারণ বর্তমানে নিরীহ, সত্যবাদী, সৎ, শান্তিপ্রিয় লোকেরা সন্ত্রাসী-মাস্তানদের ভয়ে আদালতে গিয়ে সাক্ষ্য দিতে পারেন না। তদন্তমূলক বিচার পদ্ধতিতে এই ধরনের সংশয় থাকে না।

দণ্ডবিধি, ফৌজদারি কার্যবিধি, দেওয়ানী কার্যবিধি, রেজিস্ট্রেশন আইন, এই আইনগুলো প্রণীত হয়েছে প্রায় দেড়শ বছর পূর্বে। কিন্তু এই দীর্ঘ সময়ে অপরাধী এবং অপরাধের ধরণ ও প্রকৃতির অনেক পরিবর্তন ঘটেছে। নতুন ধরনের অনেক অর্থনৈতিক ও সন্ত্রাসমূলক অপরাধ প্রতিনিয়ত সংঘটিত হচ্ছে, যা দণ্ডবিধি প্রণয়নের সময় ঘটতো না। এ কারণে দণ্ডবিধি, ফৌজদারী কার্যবিধি, রেজিস্ট্রেশন আইন এবং সাক্ষ্য আইনের

www.pathagar.com

সংশোধন আশু প্রয়োজন। বর্তমান প্রচলিত বিচার ব্যবস্থায় সাব জজ থেকে শুরু করে জেলা জজ পর্যন্ত বিচারকদের একই সঙ্গে ২টি দিকে বিচার করতে হয়। এক ফৌজদারি এবং অন্যদিকে দেওয়ানী। দেখা যায় ফৌজদারী মামলায় আইনজীবীগণ বেশি Interested এবং তৎপর। এ কারণে ফৌজদারী মামলার শুনানি করতে গিয়ে দেওয়ানী মামলার দিকে নজর দিতে পারছেন না বিচারকগণ। আর বাটোয়ারা মামলা নিষ্পত্তি নেই বললেই চলে।[৪] দেশে ভূমি নিয়ে মামলার সংখ্যা উদ্বেগজনক হারে বেড়ে চলছে। প্রতিবছর দেশে প্রায় সাড়ে ২৩ লাখ একর জমি নিয়ে মামলা হচ্ছে। যার চলতি বাজার মূল্য প্রায় এক লাখ ২৭ হাজার কোটি টাকা। আর এই মামলার কারণে প্রতিবছর সারাদেশে ভূমি মামলা আক্রান্ত পরিবারসমূহ প্রায় সাড়ে ১২ হাজার কোটি টাকার সম্পদ হারাচ্ছে। ভূমি মামলার পেছনে প্রতিবছর প্রায় ২৪ হাজার ৮৬০ কোটি টাকা ব্যয় হচ্ছে। যার ৫০ শতাংশই যাচ্ছে ঘুষের পেছনে, আর মাত্র এক শতাংশ যাচ্ছে রাষ্ট্রীয় কোষাগারে। বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ ডক্টর আবুল বারকাত সম্পাদিত 'ভূমি মামলার রাজনৈতিক অর্থনীতি' শীর্ষক এক গবেষণামূলক রিপোর্ট থেকে এ তথ্য জানা গেছে। রিপোর্টে বলা হয়, এ দেশে প্রতিবছর চলমান ভূমিকেন্দ্রিক মামলার সংখ্যা দাঁড়াচ্ছে ২৫ লাখ। হাইকোর্টের মোট মামলার ৬০ শতাংশ, জেলা জজকোর্টের ৭৫ শতাংশ, সেশন জজকোর্টের ৫৫ শতাংশ, ম্যাজিস্ট্রেট কোর্টের ৫৫ শতাংশ, রেভিনিউ কোর্টের একশ' শতাংশ, সার্টিফিকেট কোর্টের ৯৫ শতাংশ এবং গ্রাম কোর্টের ৫৫ শতাংশ মামলাই ভূমি সংক্রান্ত। যারা এ সকল মামলায় জড়িত রয়েছেন, তারা ইতিমধ্যে এ সকল মামলা পরিচালনার পেছনে প্রায় ২৫ হাজার থেকে ৩০ হাজার কোটি টাকা ব্যয় করেছেন। যা আমাদের মোট জাতীয় আয়ের প্রায় দশ শতাংশ।

রিপোর্ট থেকে দেখা যায়, প্রতিটি ভূমি মামলায় গড়ে ৪৫ জন করে মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন। আর গড়ে একটি মামলার নিষ্পত্তি হতে সময় লাগে সাড়ে নয় বছর। এক একটি মামলা নিষ্পত্তি হতে সর্বনিম্ন এক বছর থেকে ৩০ বছর পর্যন্ত সময় লেগে যায়। বর্তমানে পাঁচ থেকে ১২ বছর যাবৎ চলছে ৬ শতাংশ মামলা এবং ১৬ বছরেরও বেশি সময় ধরে চলছে আট শতাংশ মামলা।

ভূমি মামলা পরিবারের অর্থনৈতিক, শারীরিক, সামাজিক ও মানসিক সকল ধরনের দুর্দশা বাড়ায়। এ মামলার কারণে বাদী ও বিবাদীর আয় হ্রাস পায়। ফলে পারিবারিক বাজেট কর্তন করতে হয়। ভূমি মামলার প্রভাব শুধু যে বাদী-বিবাদীর ওপরই পড়ে তা নয়, তাদের আত্মীয়স্বজনের ওপরও এর নেতিবাচক প্রভাব পড়ে। আর এ মামলার কারণে প্রায় প্রতিটি পরিবারেই কোন না কোন সদস্যের অকালমৃত্যু ঘটে।

মামলা পরিচালনা করতে গিয়ে মামলার খরচ যোগাতে এবং পরিবার চালাতে প্রতিটি মামলাকারী গড়ে প্রায় পৌনে নয় বিঘা করে জমি হারাচ্ছেন। যার চলতি বাজারমূল্য প্রায় ২৮ লাখ ২ হাজার টাকা।

www.pathagar.com

এ প্রসঙ্গে রিপোর্টে বলা হয়েছে, ভূমি মামলা বাংলাদেশে বিশাল এক জাতীয় অপচয়ের কারণ। অর্থনীতি ও রাজনীতির দুর্বৃত্তায়নের কাঠামোতে আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির ক্রমাবনতির কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে এই ভূমি সংক্রান্ত মামলাসমূহ। এ সকল মামলা ঘুষ দুর্নীতি বৃদ্ধিতে এবং আইন ও বিচার ব্যবস্থা অকার্যকর করতে ভূমিকা রাখছে। ভূমি মামলায় পুলিশ দু'পক্ষের কাছ থেকেই ঘুষ খাচ্ছে। তবে যে বেশি ঘুষ দিচ্ছে পুলিশ আপাতত তার স্বার্থ দেখছে। আর সর্বাত্মক চেষ্টা করছে মামলা যেন চিরস্থায়ী হয়। এ বিষয়ে ভূমি অফিস, স্থানীয় সরকার, উকিল-মোক্তার কেউই কারও চেয়ে কম নয়। ভূমি মামলায় বাদী-বিবাদী কেউই আসলে জেতেন না, উভয়েই হারেন। কারণ যে পরিমাণ জমি নিয়ে মামলা হয়, তার দামের চেয়ে বেশি অর্থ খরচ হয়। সবচেয়ে বেশি দুর্দশা বা ভোগান্তির শিকার হচ্ছেন- যারা দীর্ঘদিন ধরে মামলা চালিয়ে যেতে বাধ্য হচ্ছেন। ভূমি মামলা মানুষে মানুষে সৌহার্দ্য ও সংহতি বিনষ্ট করে।[৫]

আমাদের বিচার ব্যবস্থার খণ্ডচিত্র

১৯৯২ সালের ২৬ মে দৈনিক মিল্লাতের আন্তর্জাতিক পাতায় কৌতূহলোদ্দীপক একটি সংবাদ প্রকাশিত হয়েছিল যা নিম্নরূপ, 'সিডনি থেকে রয়টার জানায়, ১৯৮০ সালে লিনডি চেম্বারলিন নামের এক মহিলাকে তার শিশুকন্যা হত্যার অভিযোগে অস্ট্রেলীয় একটি আদালত ভুলবশত ৩ বছরের কারাদণ্ড প্রদান করেন। কারাদণ্ড প্রাপ্ত এই মহিলা আদালতের বিরুদ্ধে ক্ষতিপূরণ মামলা দায়ের করে ৩৮ লাখ ডলারের ক্ষতিপূরণ আদায় করেছেন।

উন্নত দেশে এমন ঘটনা বাস্তবে সম্ভব হলেও বাংলাদেশের মানুষের কাছে তা অলীক স্বপ্ন মাত্র। বাংলাদেশের বিচার ব্যবস্থার নাম দিয়ে বৃটিশ ও পাকিস্তানীদের ঔপনিবেশিক ধাঁচের বিচার ব্যবস্থা আমাদের দেশে কেমনভাবে চলছে তা প্রায়ই বিক্ষিপ্তভাবে সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। এ নিয়ে সংবাদপত্রের সাথে বিচার বিভাগের দ্বন্দ্ব প্রায়ই লেগে থাকে। ফলে সংবাদপত্রের বিরুদ্ধেই আদালত অবমাননা মামলাগুলো দায়ের হয় সবচেয়ে বেশি। প্রায় সব ক্ষেত্রেই সংবাদপত্র আদালতে ক্ষমা চেয়ে মুক্তি পেতে বাধ্য হয়। ২০০০ সালের ক্যাসেট কেলেংকারি মামলাটি ছিল এই দ্বন্দ্বের চূড়ান্ত রূপ। আমাদের বিচার বিভাগ হয়তো পছন্দ করছে না যে তাদের এই দেড় শতাব্দীর সনাতন বিচার পদ্ধতি সম্পর্কে জনসচেতনতা বৃদ্ধি পাক। তবে আমাদের বিচার ব্যবস্থা সম্পর্কে সবচেয়ে বাস্তব সত্যটি বলেছিলেন সাবেক আইন ও বিচার মন্ত্রী মির্জা গোলাম হাফিজ। তিনি বলেছেন- আইনের চোখে সবাই সমান, এটা নীতি কথা। দু'জন গরীব লোক মামলায় জড়ালে দু'জনই ধ্বংস হয়ে যায়। মামলায় জড়িতদের একজন গরীব অন্যজন ধনী হলে গরীব মানুষটি হয় নিঃশেষ। আর মামলাবাজ দু'জনই যদি ধনী হয়, ধ্বংস হয় আইন।[৬] যা হোক বিভিন্ন সময় সংবাদপত্রে প্রকাশিত আমাদের বিচার ব্যবস্থার প্রতিচ্ছবি নিম্নে সংক্ষিপ্তাকারে পত্রস্থ করা হলো।

www.pathagar.com

১৯৬৫ সালের একটি মামলা আজো চলছে। ইতিমধ্যে দু'জন বিচারকের মৃত্যু হয়েছে। এ অবস্থায় বিচারের প্রতি জনগণের আস্থা থাকে কি করে?[৭] হাইকোর্ট ছুটি থাকে ৬ মাস। ঝুলে আছে লক্ষাধিক মামলা। এসব মামলার মধ্যে ১৫ থেকে ২০ বছর পড়ে আছে এমন মামলাও আছে[৮] ৯২ বছর বয়স্ক বৃদ্ধ আজিজুর রহমান ২৩ বছর ধরে ঘুরছেন একটি মামলার পেছনে। প্রাইজবন্ডের ৫০ হাজার টাকা পেতে এ মামলায় খরচ করেছেন ২ লাখেরও বেশি টাকা। মামলার ৩ জন উকিল, ১ জন মুহুরী ও দুই সাক্ষী ইতিমধ্যে মারা গেছেন।[৯] দীর্ঘ ১৪ বছরেও পাবনা দায়রা জজ আদালতে বিচারাধীন চাটমোহরের চাঞ্চল্যকর ১২ হত্যা মামলার কুলকিনারা হয়নি। এই সময়ের মধ্যে হাজতে ১ জন, পলাতক অবস্থায় ১ জন এবং জামিনে এসে ৩ জন আসামী মারা গেলেও মামলাটির নিষ্পত্তি হয়নি। এদিকে এই হত্যাকাণ্ডের জের ধরে আরো ১০টি হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হওয়ায় এই এলাকায় খুনের সংখ্যা ২২ জনে দাঁড়িয়েছে।[১০] বিনা বিচারে জেলে কাটিল মমিনের ২০টি বছর (ইত্তেফাক, ১ জুন ১৯৯৭)। পাঁচ বছর আগে খালাস পেয়েও ফজল খাঁ জেলেই আছেন (দৈনিক বাংলা, ২৯ অক্টোবর ১৯৮৫)। বিনা বিচারে জেলেই কেটেছে হানিফের ১২টি বছর (বাংলাবাজার, ২৯ আগস্ট ১৯৯৪)। ১৫ বছর ধরে বিচারের আশায় ঘুরছেন শেখ আব্দুল জব্বার। একটা জীবন তার কেটে গেছে পথে বিপথে ঘুরে। প্রশ্ন জাগে এই দেশে আইন কোথায় বাস করে। কোথায় সুবিচার পাওয়ার ঠিকানা? (ইত্তেফাক, উপ-সম্পাদকীয় ৪ সেপ্টেম্বর ১৯৮৬)। বিনা বিচারে ২২ বছর কারাবাসের পর অবশেষে ফালু মিয়ার জামিন লাভ (ইত্তেফাক, ১৫ নভেম্বর ১৯৯৩)। বিনা বিচারে ১৪ বছর জেল খেটে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের নির্দেশে মুক্তি পেয়েছেন ১০৩ বছর বয়সের বৃদ্ধ হাতেম আলী[১১] সংসদের ৫ বছর মেয়াদ শেষ হলেও নির্বাচনী বিরোধের মামলাগুলো শেষ হয়নি। ফলে ভোটের মামলাগুলোর স্বাভাবিক মৃত্যু ঘটেছে। নির্বাচনী ট্রাইব্যুনালে ১৭টি এবং হাইকোর্টে এ সংক্রান্ত বিচারাধীন মামলা অযথা ঝুলে আছে।[১২]

বিনা বিচারে দীর্ঘ ৯ বছরাধিক কাল থেকে জেলে আটক রয়েছে মোহাম্মদ হারুন ওরফে শফি। এ পর্যন্ত তার বিরুদ্ধে কোন সাক্ষী প্রমাণ পাওয়া যায়নি। আদালত তাকে জামিনে মুক্তির নির্দেশ দেয়া সত্ত্বেও তাকে মুক্তি দেয়া হয়নি (সংগ্রাম ১২ অক্টোবর, ১৯৮৬)। সাজাপ্রাপ্ত আসামী শ্যামল হাইকোর্ট হতে বেকসুর খালাস পাওয়ার পরেও ৫০ মাস বিনা কারণে কারাভোগ করেছে (ইত্তেফাক, ২৫ জুলাই ১৯৯৯)। ময়মনসিংহ জেলা কারাগারে গৌরাঙ্গ পাল ১২ বছর ধরে বিনা বিচারে জেল হাজতে আছে। তার মামলার নথিপত্র খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। ঘটনাচক্রে মুক্তি না পেলে তাকে আর কত যুগ আটক থাকতে হবে তা সে নিজেই জানে না (ইনকিলাব, ১ মে ১৯৮৮)। চেরাগ আলী ৭ বছর যাবত সুনামগঞ্জ জেলা কারাগারে বিনা বিচারে কারা ভোগ করিতেছে (ইত্তেফাক, ৬ মার্চ, ১৯৯৩)। বিনা বিচারে ১৫ বছর কারাগারে সরোয়ার (ভোরের কাগজ, ১১ নভেম্বর ১৯৯৫) বিনা বিচারে শিশু মিয়ার আট বছর কারাবাসের পর আদালতের বিচারে তাকে

www.pathagar.com

তিন মাসের কারাদণ্ড দেয়া হয়েছে। বিষয়টি আইন আদালতের পক্ষে গর্বের বিষয় কিনা তা ভেবে দেখা উচিত (ইত্তেফাক, উপসম্পাদকীয়, ১৩ নভেম্বর, ১৯৮৬) এক ভাইয়ের অপরাধে আরেক নিরপরাধ ভাই ৫ বছর ধরে জেল খাটছে (মিল্লাত, ১০ আগস্ট ১৯৯৪)। তোতা মিয়া ৭ বছর ধরে জেলে। এ সময়ের মধ্যে তাকে আদালতে হাজির করা হয়নি। তার বিরুদ্ধে কি অভিযোগ কেউ জানে না। তার মামলার কোন নথি খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। নথি না থাকায় আদালতে তার জামিন নামঞ্জুর করা হয়েছে (সংগ্রাম, ১৪ আগস্ট, ১৯৯৬)। বিনা বিচারে সুরুজ আলীর নয় বছর হাজত বাস (খবর ১৫ মার্চ, ১৯৮৭)। সাতক্ষীরা জেলার শ্যামনগর থানার ১১ বছরের শিশু নজরুল ইসলামকে ডাকাতি ও হত্যা প্রচেষ্টা মামলায় অভিযুক্ত করে গ্রেফতার করা হয়। ১২ বছর জেলে থাকার পর তার বিরুদ্ধে আনিত অভিযোগ সম্পূর্ণ অবৈধ, বাতিল এবং আইনগত ক্ষমতাবহির্ভূত ঘোষণা করে হাইকোর্ট তাকে মুক্তির নির্দেশ দিয়েছে (যুগান্তর ২৬ জুলাই, ২০০২)। ২১ বছর পর হাইকোর্ট থেকে জামিন পেলেন সুলতান (মিল্লাত, ২৮ এপ্রিল, ১৯৯৮)। হত্যা মামলাটি ১৮ বছর যাবত ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে (ইত্তেফাক, ৩ মার্চ ১৯৯৮)। দক্ষিণাঞ্চলের ৬টি জেলায় ১১ হাজার মামলা ১৫ বছর ধরে বিচারের অপেক্ষায় (বাংলার বাণী, ২৩ এপ্রিল, ১৯৯৬)। ঝালকাঠিতে ২২ বছরেও শেষ হয়নি একটি খুনের মামলা। ইতিমধ্যে ১ আসামী ও ৩ সাক্ষী মারা গেছেন (ভোরের কাগজ, ২ মার্চ, ১৯৯১)। গত ২২ বছর মামলা চালিয়েও রাজবাড়ীর তাফসীর আহমেদ মামলার রায় পাননি (সংগ্রাম, ১১ আগস্ট ১৯৮৯)। ২১ বছর পর সিরাজ মিয়া আদালতের রায় পেয়েছেন (মিল্লাত, ৩ ডিসেম্বর, ১৯৯৬)। আদালতের রায় পেলেও বৃদ্ধ মুল্লুকচাঁন জমির দখল পাননি। তিনি আজ ভিক্ষা করে পরিবারের জীবিকা নির্বাহ করছেন। (আল আমীন, ১৩ মে, ১৯৯৩)। কাশিয়ানী উপজেলার সিংগা গ্রামের ১১ একর ৪০ শতাংশ জমি নিয়ে সুদীর্ঘ ৫০ বছর মামলা চলার পর হাইকোর্টের রায় পেয়েও জলধর মণ্ডলের উত্তরাধিকারীগণকে জমির ভোগদখলে বাধা সৃষ্টি করছে (বাংলার বাণী, ২৩ মে, ১৯৯০)। দীর্ঘ ৩৮ বছর আইন আদালত সর্বত্র লড়ে শেষ পর্যন্ত সর্বোচ্চ আদালতের রায় পেয়েও নিজের বৈধ সম্পত্তি দখল নিতে পারেননি বৃদ্ধা রোকেয়া খাতুন। বিগত ১১ বছর যাবত সুপ্রীমকোর্টের নির্দেশ উপেক্ষিত হয়ে আসছে (ইনকিলাব, ২৯ জুন ২০০২)। জবরদখলকৃত জমি ফেরত পেতে মুহাম্মদ আলী ১৯৬২ সালে মামলা করে স্বপক্ষে ডিক্রী পান। এরপর জজকোর্ট, হাইকোর্ট ও সুপ্রীমকোর্টের রায় পেয়েও জমির দখল পাননি। অবশেষে তিনি মানবতার আদালতে বিচার চাইতে গতকাল আসেন জাতীয় প্রেসক্লাব প্রাঙ্গণে। তিনি বলেন, তরুণ বয়স থেকে আইনের আশ্রয় নিতে গিয়ে আমি আজ কর্মক্লান্ত বৃদ্ধ। আমার প্রিয়তমা স্ত্রী আর নেই। সন্তানরা দারিদ্র্যের কষাঘাতে ছিন্নভিন্ন। আদালত আমাকে ভোগান্তি ছাড়া আর কিছুই দেয়নি (সংগ্রাম, ২২ আগস্ট ১৯৯১)।

www.pathagar.com

১৯৬৩ সালে কালিগঞ্জের শাহেদ আলীকে অপহরণ ও লাশ গুমের মামলায় আঃ হাই ও তার ভাই ঢাকা জজ কোর্ট প্রদত্ত কারাদণ্ড ভোগের ১০ বছর পর মনোহরদী পুলিশ শাহেদ আলীকে গ্রেফতার করে। ১৯৭৫ সালে ওই মিথ্যা মামলা ও হয়রানির বিরুদ্ধে ঢাকা ম্যাজিস্ট্রেট কোর্টে মামলা করে ৩০ বছর ধরে রায় পাবার আশায় ঘুরছেন বৃদ্ধ আঃ হাই। কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে তিনি বলেন, রায়ের অপেক্ষা করে ২৫ বছর আগে তার বড় ভাই আউয়াল মারা গেছেন। বড় ভাইর মতো কষ্ট নিয়েই কি তাকে মরতে হবে- কে দেবে তার এই প্রশ্নের জবাব? (ইত্তেফাক, ২৮ সেপ্টেম্বর ২০০৫)। ষোল বছর আগে নিহত বলে কথিত তারি বড়ুয়াকে অবশেষে ফেনী পুলিশ গ্রেফতার করেছে। অথচ তাকে হত্যার দায়ে মামলার রায়ে চট্টগ্রামের দায়রা জজ আদালত ৪ ব্যক্তিকে ৭ বছর সশ্রম কারাদণ্ড দেন। হাইকোর্টে আপিল হলে ওই রায় বহাল থাকে। ৪ আসামি জেল খেটেছে। (মিল্লাত, ১৪ এপ্রিল ১৯৯২) বিনা বিচারে ১১ বছর জেল হাজতে বন্দি গৌরিপুরের ইউনুস আলী (মুক্তকণ্ঠ, ১৭ জুলাই ১৯৯৮)। চকরিয়া থানার শাহ আলম ১২ বছর যাবত বিনা বিচারে হাজতবাস করছেন (ইত্তেফাক, ১৭ সেপ্টেম্বর, ১৯৯১) সিরাজগঞ্জের উল্লাপাড়ার ১১ বছরের সেলিমের কৈশোর পেরিয়ে এখন সে ২১ বছরের পরিপূর্ণ যুবক। ইতিমধ্যে কারাগারে তার বন্দি জীবনের ১০ বছর কেটে গেছে। তার মামলাটির বিচার এখনও শুরুই হয়নি (সংবাদ, ২৯ অক্টোবর ২০০৩)। মানিকগঞ্জের জেলা ও দায়রা জজ আদালতের রায়ে খালাসের আদেশ হওয়া সত্ত্বেও ৪ বছর ধরে জালাল উদ্দিন অযথা জেলবন্দি হয়ে আছেন (ইনকিলাব, ১২ জুন ১৯৮৮)। ভৈরবের হতভাগী যুবতী তাসলিমা বিনা বিচারে ৩ বছর ১ মাস ধরে কারাবন্দি। তার মামলার নথিপত্র হারিয়ে যাওয়ায় কিশোরগঞ্জ উপজেলা ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে মামলার বিচারকার্য শুরু করা যাচ্ছে না। দরিদ্র তাসলিমার মামলার তদবির করার মতো টাকা পয়সা তার অভিভাবকের নেই (জনতা, ২৬ জুন ১৯৯৬) ঢাকার পুলিশের এসআই রুমা বেগমের ব্যক্তিগত আক্রোশের শিকার ডলি বেগম খুলনা ও মৌলভী বাজারের দুটি ভূয়া মামলায় খুলনা জেল হাজতে তিন মাস ধরে বন্দি আছেন। ওই মহিলা এসআই পুলিশ অফিসের সিল ও স্বাক্ষর জাল করে ডলিকে গ্রেফতার করিয়েছে বলে অভিযোগে প্রকাশ। বগুড়ার ডিসি অফিস থেকে খুলনা ডিসি অফিসে জানানো হয়েছে মামলা দুটি ভূয়া (আজকের কাগজ, ২১ মার্চ ২০০৬) দুবার আদালতের রায় পাবার দু'বছর পরেও ঢাকাস্থ মগবাজারের লতিফ ফিরে পাননি তার চাকরি (আজকের কাগজ, ১২ নভেম্বর ১৯৯৪) ১৯৮৩ সালে এয়ারপোর্ট কাস্টমস-এর ডেপুটি সুপার রউফ হত্যার দীর্ঘ ১১ বছর পরেও পুলিশ চার্জশীট দেয়নি। মামলার বিচারকার্যক্রম শুরু হওয়া অনিশ্চিত। (দিনকাল, ৪ মার্চ ১৯৯৪)। নাম বিভ্রাটের কারণে বরিশালের ৬৫ বছরের বৃদ্ধ মোসলেম ৪০ মাস অযথা কারাবাস ভোগ করিতেছে। হাইকোর্টের নির্দেশ সত্ত্বেও তিনি মুক্তি পাননি (ইত্তেফাক, ১২ জানুয়ারি ১৯৯৭)। শারীরিকভাবে লাঞ্ছিত এক সাবেক বিচারপতি দ্বারে দ্বারে ঘুরেও সুবিচার না

www.pathagar.com

পেয়ে মানসিকভাবে ভেঙ্গে পড়েছেন। আসামীর প্রতি পক্ষপাতিত্ব করে পুলিশ মামলার ফাইনাল রিপোর্ট দিয়েছে। এর বিরুদ্ধে নারাজি পিটিশন নামঞ্জুর করেছে ম্যাজিস্ট্রেট আদালত (আজকের কাগজ, ২০ মে ২০০৪)। নারায়ণগঞ্জের সহকারী দায়রা জজ এবং ৫নং বিশেষ ট্রাইব্যুনাল ৯ বছরের শিশু লেনিনকে ৭ বছরের কারাদণ্ডাদেশ দিয়েছেন। লেনিনের অভিভাবকদের কৌসুলির আবেদনের প্রেক্ষিতে হাইকোর্টের রুলনিশি জারি (আজকের কাগজ, ৯ সেপ্টেম্বর ১৯৯৪) আদালতে নির্দোষ প্রমাণিত হবার পরও গত এক দশকের বন্দিদশা মাগুরার আতিকুর রহমান মুক্তি পায়নি। তার বিরুদ্ধে দায়েরকৃত ৮টি ফৌজদারি মামলা মিথ্যা প্রমাণিত হয়েছে। আদালত তাকে নির্দোষ বলে রায় দেয়ার পরেও সে জেলখানায় বন্দি (সংগ্রাম, ৯ ডিসেম্বর ১৯৯২)। ফেনী জেলার মীর্জানগর গ্রামে শিক্ষার জন্য খাদ্য কর্মসূচি উদ্বোধনকালে হালিমা খাতুন নামের এক দরিদ্র মহিলা কোনরকমে মঞ্চের কাছে পৌছে প্রধানমন্ত্রীর পা জড়িয়ে ধরে তার স্বামী হত্যার বিচার চায়। প্রধানমন্ত্রী বিচারের নিশ্চয়তা দেয়ার পরই সে পা ছাড়তে রাজি হয়। স্থানীয় এসপি সিরাজুল ইসলাম জানান, ১৯৯১ সালে হালিমার স্বামী আবু বকর ও তার ভাইকে দুর্বৃত্তরা হত্যা করে। চলতি বছর ৯ ফেব্রুয়ারি সেশন জজ হত্যা মামলাটির ৩০ জন আসামিকে খালাস দেন। এর প্রতিবাদ হলে সেশন জজ আজিজুল হককে বরখাস্ত করা হয়। কিন্তু খুনিদের হুমকির কারণে হালিমা তার সন্তানদের নিয়ে নিরাপত্তাহীনতায় রয়েছেন। (আজকের কাগজ, ৩০ এপ্রিল ১৯৯৩) নিজ নাবালক সন্তান ফারুককে হত্যার মিথ্যার দায় মাথায় নিয়ে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড ভোগ করছেন শেরপুরের কমলা বেগম। দরিদ্র কমলার পক্ষে দণ্ডাদেশের বিরুদ্ধে আপিল করা সম্ভব না হওয়ায় অন্ধকার কারাপ্রকোষ্ঠে তার সাজার মেয়াদ ইতিমধ্যে আট বছর পেরিয়ে গেছে। কমলার আত্মীয়স্বজনের চক্রান্তে ৮ বছর বিভিন্ন জেলায় লুকিয়ে রাখা ফারুক গত ২৪ ফেব্রুয়ারি শেরপুর থানায় হাজির হয়ে মায়ের মুক্তি দাবি করেছে। অথচ তাকে হত্যার দায়ে ১৯৯৭ সালের ২৮ মে তৎকালীন শেরপুরের জেলা জজ কমলাকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডাদেশ দিয়েছিলেন। ঘটনাটিতে প্রমাণ হলো- এক শ্রেণীর দুর্বৃত্ত পুলিশ যে কোন নিরপরাধ ব্যক্তিকে ফাঁসিতে ঝুলিয়ে দিতে দ্বিধা করেনা এবং তাদেরকে কোথাও জবাবদিহিও করতে হয়না। আরও প্রমাণ হলো সম্মানিত বিচারকগণও আমাদের মত মানুষ এবং তারাও ভুলত্রুটির উর্ধ্বে ঐশী ক্ষমতার অধিকারী কোন দেবতা নন। আইনের শাসন সমুন্নত রাখার পণ্ডশ্রমে লিপ্ত রাজনীতিবিদদের এ ঘটনা থেকে শেখার আছে অনেক কিছু। (খবরপত্র সম্পাদকীয়: ১০ মার্চ ২০০৫)। ১৯৯৮ সালের একটি হত্যা মামলার প্রকৃত আসামী সুন্দর বাবুকে বাদ দিয়ে রাজধানীর সূত্রাপুর থানা পুলিশ শাহআলম বাবু নামের এক নিরপরাধ ব্যক্তির বিরুদ্ধে চার্জশীট দেয়। নিহতের স্ত্রী ও সাক্ষীরা মামলার শুনানিতে বারবার বলেন, শাহ আলম বাবু এ মামলার প্রকৃত আসামী নন। কিন্তু সংশ্লিষ্ট পুলিশ কর্মকর্তা ও রাষ্ট্রপক্ষের আইনজীবী নির্দোষ শাহ আলম বাবুকেই খুনি প্রমাণ করে ছাড়েন। তাই আদালতের রায়ে

www.pathagar.com

তার ফাঁসির হুকুম হয়ে যায়। রায় প্রদানের দিনও শাহ আলম বাবু আদালতে চিৎকার করে বলেন, তিনি নির্দোষ এবং মামলার বিষয়বস্তু সম্পর্কে তিনি কিছুই জানেন না। কিন্তু হাকিম নড়ে তো হুকুম নড়েনা। তাই খুন না করেও ৬ মাস ধরে ফাঁসির প্রকোষ্ঠে মৃত্যুর প্রহর গুণছেন নির্দোষ শাহ আলম বাবু। হাইকোর্টে আপিল না হলে হয়তো তার মৃত্যুদণ্ড কার্যকর হয়ে যেত। এদিকে গত ১৩ ফেব্রুয়ারি এ মামলার বাদী ও নিহতের স্ত্রী র‍্যাব সদস্যদের হাতে মামলার প্রকৃত আসামী সুন্দর বাবুকে ধরিয়ে দিলে থলের বিড়াল বেরিয়ে আসে। এখন নির্দোষ শাহ আলম বাবুর কি হবে এ নিয়ে ঢাকার আদালত পাড়ায় সৃষ্টি হয়েছে দারুন চাঞ্চল্য। আমরা মনে করি এরকম কর্মকাণ্ড কোনক্রমেই সমাজে সুশাসন প্রতিষ্ঠার প্রতীক নয়। (খবরপত্র সম্পাদকীয় ২ মার্চ ২০০৫) দেশের ১১টি কারাগারে এক হাজার ২৮ জন বিনা বিচারে কারাবন্দি রয়েছে। যাদেরকে ৫ বছর কাউকে ১০ বছরেও একবার আদালতে হাজির করা হয়নি।[১৩] পুলিশের সন্দেহ আইনে বিনা বিচারে আটক বাবুল মিয়া দীর্ঘ ৫ বছর পর ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার থেকে জামিনে ছাড়া পেয়েছেন। এ সময়ে চিকিৎসার অভাবে তিনি অন্ধ হয়ে গেছেন। (ইনকিলাব, ২৩ জুন ১৯৯৭) কক্সবাজারের অতিরিক্ত জেলা ও দায়রা জজ মোতাজিদুর রহমান একটি হত্যা মামলার রায় ঘোষণায় বিব্রত বোধ করে প্রকাশ্য আদালতে অভিযোগ করেন আসামিদের পক্ষে সাতকানিয়ার এক সহকারী জজ ও অন্যরা তাকে ঘুষ সেধেছেন। তিনি আরো অভিযোগ করেছেন ঘুষ প্রদানের প্রস্তাবকারীদের ফিরিয়ে দেয়ায় সোমবার দুপুরে তার বাসায় চুরি হয়েছে বলে তিনি মনে করেন (সংবাদ, ৩১ মার্চ ২০০৪) সুপ্রিম কোর্টের হাইকোর্ট ডিভিশনে প্রায় পৌণে দু'লাখ মামলার জট (খবরপত্র, ২৯ জুলাই ২০০৪) একশ' ৭ বছরের পুরনো আইনের দুর্বলতার সুযোগে সরকার বাদী মামলার আসামিদের শাস্তি নিশ্চিত নয়। খুন ডাকাতিসহ গুরুতর অপরাধের মামলা হলে সরকার পক্ষে বাদী হয় পুলিশ। মূল বাদীকে বানানো হয় সাক্ষী। ভুক্তভোগীদের ন্যায়বিচার পাবার অধিকার ক্ষুণ্ন করা হয় এভাবে মামলার শুরুতেই। ব্রিটিশ আমলে ১৮৯৮ সালের ফৌজদারি কার্যবিধির ৪৯৪ ধারায় এ ফাঁকফোঁকড় থাকায় সরকার মূল বাদীকে বাদ দিয়ে যখন তখন ওই মামলা প্রত্যাহার করে নিতে পারেন। আইনটির অপব্যবহারে বহুখুনি অপরাধীও পার পেয়ে যাচ্ছে। নিম্ন আদালত সচরাচর সরকারের আবেদন মঞ্জুর করে থাকে (আজকের কাগজ, ১৭ জুন ২০০৬) উচ্চ আদালতের নির্দেশে সারাদেশের সাড়ে ছয় শতাধিক মামলার কার্যক্রম স্থগিত হয়ে আছে। বিচারকার্য স্থগিত থাকায় বিচার প্রার্থীরা একদিকে ন্যায়বিচার থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন- অন্যদিকে আসামীরাও বহাল তবিয়তে আছে। ব্রিটিশ আমলের ফৌজদারি কার্যবিধির ৫৬১ ধারায় মামলার তদন্তসহ যাবতীয় কার্যক্রম স্থগিত রাখার বিধান রয়েছে। পুলিশের তদন্তকারী সূত্রগুলোর মতে বছরের পর বছর এভাবে স্থগিতাদেশ থাকার কারণে মামলার মেরিট নষ্ট হয়ে যেতে পারে। (আজকের কাগজ: ২৭ সেপ্টেম্বর ২০০৩) চট্টগ্রাম মহানগরীসহ এই বিভাগের ১১ জেলার থানা ও আদালতে

www.pathagar.com

৮২ হাজার মামলার পাহাড় জমেছে। থানা ডিবি ও সিআইডির কাছে তদন্তের অপেক্ষায় ঝুলছে ৪১ হাজার ২৬৮ টি মামলা। বিভিন্ন আদালতে নিষ্পত্তির অপেক্ষায় আছে আরো ৪০ হাজার ৭৯১টি মামলা এর পাশাপাশি থানাগুলোতে তা মিলের অপেক্ষায় দীর্ঘদিন থেকে ঝুলে আছে ২৮ হাজার ৬৯২টি গ্রেফতারি পরওয়ানা। মামলার ভারে আদালতে টালমাটাল অবস্থা। বিচারপ্রার্থীদের হয়রানির অন্ত নেই। বছরের পর মামলার ঘানি টানতে গিয়ে অনেকে পথে বসেছে (ইনকিলাব: ২৪ জুন (২০০৬)

এ তালিকা আরো দীর্ঘ করা যায়। এতে কোথায় আছে মানবতা, ধর্ম, ন্যায়পরায়ণতা, মানবাধিকার, আদর্শ, গণতন্ত্র, সুবিচার ও সাংবিধানিক বাধ্যবাধকতার রক্ষাকবচ? এই প্রাণ সংহারী পদ্ধতির নামই কি বিচার ব্যবস্থা? এর নাম ন্যায়বিচার হলে অভিধানে অবিচারের অর্থ বদলাতে হবে। নিরন্তর চলে আসা এই জীবন বিনাশী ঘটনায় জড়িত কেউ শাস্তি পায়নি, পাবে না। জবাবদিহিতা ও দায়বদ্ধতা নেই কোথাও। মানবাধিকার ও সংবিধানের অভিভাবক হাইকোর্ট কর্তৃক প্রতিটি ক্ষেত্রে সুয়োমটো রুল জারি করে সংশ্লিষ্ট অপরাধীদের শাস্তি নিশ্চিত করা ছিল দেশবাসীর পরম আকাংখিত। এই অসুস্থ বিচার ব্যবস্থার মাড়াই কলে পড়ে সারাদেশে কতো নিরপরাধ পরিবার প্রতি বছর এভাবে ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে তা নিয়ে সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে আজ পর্যন্ত কোন গবেষণা বা পরিসংখ্যান তৈরি করার উদ্যোগ নেয়া হয়নি। বিচার বিভাগীয় সিস্টেম লসে দেশের কি পরিমাণ ক্ষতি হচ্ছে তা নিরূপণে আদালত অবমাননার ভয়ে আজ পর্যন্ত উদ্যোগ নেয়নি কেউ। ফলে সামাজিক ভারসাম্য ভেঙ্গে পড়েছে সেই কবে থেকে। বাংলাদেশকে মানবতার বধ্যভূমিতে পরিণত করা এ লোমহর্ষক বিচার ব্যবস্থা যদি জাপান, আমেরিকার মতো দেশে চালু করা হয় তাহলে তাদের শক্তিশালী আর্থ সামাজিক কাঠামো লণ্ডভণ্ড হয়ে দরিদ্র বাংলাদেশের সমকক্ষ হতে তাদের ২৫/৩০ দিনের বেশি সময় লাগার কথা নয়। বিভিন্ন সময়ে পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত উল্লেখিত ঘটনাগুলো ৮৫% মুসলমানের বাংলাদেশে ইসলামের বিধিবিধান এবং দেশে প্রচলিত দণ্ডবিধি আইনে ৩৪৪ ধারা, সংবিধানের ৩১, ৩২, ৩৩(২), ৩৫(৫) অনুচ্ছেদ ছাড়াও রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি ১১ অনুচ্ছেদের গুরুতর লংঘন। এ ছাড়া এসব মানবসভ্যতা বিরোধী ঘটনা আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সনদের ৩, ৫, ৯ এবং ১৭খ ধারা চরম বরখেলাপ। পবিত্র কোরআনে বিচারকদের প্রতি মহান আল্লাহর নির্দেশ হচ্ছে, নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের নির্দেশ দিতেছেন, আমানত উহার হকদারকে প্রত্যার্পণ করতে। তোমরা যখন মানুষের মধ্যে বিচার কাজ পরিচালনা করিবে তখন ন্যায়পরায়ণতার সাথে বিচার করিবে। আল্লাহ তোমাদিগকে যে উপদেশ দেন তাহা কত উৎকৃষ্ট। আল্লাহ সর্বশ্রোতা, সর্বশ্রেষ্ঠ। ন্যায়বিচার হচ্ছে একটি আমানত, যা হকদার হচ্ছে বিচার প্রার্থীগণ, আর এখানে আমানতদার হচ্ছেন বিচারকগণ।'[১৪] অন্যদিকে রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি সম্পর্কে বাংলাদেশ সংবিধানের ১১ অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, 'প্রজাতন্ত্র হইবে একটি গণতন্ত্র যেখানে মৌলিক মানবসত্তার মর্যাদা ও মূল্যের প্রতি

www.pathagar.com

শ্রদ্ধাবোধ নিশ্চিত হইবে।' তাছাড়া ৩১ অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, 'আইনের আশ্রয়লাভ এবং আইনানুযায়ী ও কেবল আইনানুযায়ী ব্যবহার লাভ যে কোন স্থানে অবস্থানরত প্রত্যেক নাগরিকের এবং সাময়িকভাবে বাংলাদেশে অবস্থানরত অপরাপর ব্যক্তির অবিচ্ছেদ্য অধিকার এবং বিশেষতঃ আইনানুযায়ী ব্যতীত এমন কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাইবেনা যাহাতে কোন ব্যক্তির জীবন, স্বাধীনতা, দেহ, সুনাম বা সম্পত্তির হানি ঘটে।' ৩২ অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, 'আইনানুযায়ী ব্যতীত জীবন ও ব্যক্তি স্বাধীনতা হইতে কোন ব্যক্তিকে বঞ্চিত করা যাইবে না।' ৩৩(২) অনুচ্ছেদ মতে, গ্রেফতারকৃত ও প্রহরায় আটক ব্যক্তিকে নিকটতম ম্যাজিস্ট্রেটের সম্মুখে গ্রেফতারের চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে হাজির করা হইবে এবং ম্যাজিস্ট্রেটের আদেশ ব্যতীত তাহাকে তদাতিরিক্তকাল প্রহরায় আটক রাখা যাইবে না' এবং ৩৫(৫) অনুচ্ছেদ মতে, কোন ব্যক্তিকে যন্ত্রণা দেয়া যাইবে না কিংবা নিষ্ঠুর, অমানুষিক ও লাঞ্ছনাকর দণ্ড দেয়া যাইবে না কিংবা কাহারও সহিত অনুরূপ ব্যবহার করা যাইবে না।' পাশাপাশি ১৮৬০ সালের প্রচলিত দণ্ডবিধি আইনের ৩৪৪ ধারায় বলা হয়েছে, কোন ব্যক্তিকে দশ বা ততোধিক দিনের জন্য অন্যায়ভাবে আটক রাখা হলে অপরাধী ব্যক্তি তিন বছর পর্যন্ত মেয়াদের কারাদণ্ড এবং অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হবে।' দেখা গেছে ১৪২ বছর বয়সের ভারে ন্যুব্জ এই দণ্ডবিধির ৩৪৪ ধারাটি ফালু মিয়াকে ২২ বছর অন্যায়ভাবে আটক করে রাখার পরেও (সূত্র: ইত্তেফাক ১৫ নভেম্বর ১৯৯৩) মূল অপরাধীদের স্পর্শ করতে পারেনি। সংবিধানের ১১, ৩১, ৩২, ৩৩(২), ৩৫(৫) অনুচ্ছেদগুলোও এ ক্ষেত্রে কোন কার্যকর প্রতিকার করেনি। উল্লেখ্য, বিনাবিচারে ২২ বছর কারাবাসের পরে মুক্তি পাবার কিছুদিন পর ফালু মিয়া মারা গেছেন। আমাদের দেশের গণতন্ত্রের মহড়ার অগোচরে এভাবে অসংখ্য নিরপরাধ ফালু মিয়া যুগের পর যুগ ধরে রাষ্ট্রীয় লাঞ্ছনা ভোগ শেষে প্রাণ হারাচ্ছেন। গণতন্ত্র, রাজনীতি, সরকার, সংবিধান ও আইন আদালত শুধু নীরব দর্শকের মতো দেখছে ফালু মিয়াদের স্বাধীনতা, দেহ, সুনাম, সম্পত্তি ও জীবনহানির ভয়ংকর ঘটনাগুলো। অন্যদিকে আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সনদের ৩নং ধারায় বলা হয়েছে, প্রত্যেকেরই জীবনধারণ, স্বাধীনতা ও ব্যক্তি নিরাপত্তার অধিকার রয়েছে। ৫নং ধারায় বলা হয়েছে, কাউকে নির্যাতন অথবা নিষ্ঠুর অমানুষিক অথবা অবমাননাকর আচরণ অথবা শাস্তিভোগে বাধ্য করা চলবে না। ৯নং ধারায় বলা হয়েছে, কাউকে খেয়ালখুশী মত গ্রেফতার আটক অথবা নির্বাসন করা চলবে না এবং ১৭(খ) ধারায় বলা হয়েছে, কাউকেই তার সম্পত্তি থেকে খেয়ালখুশী মত বঞ্চিত করা যাবে না। পবিত্র ইসলামের বিধিবিধান, বাংলাদেশ সংবিধান এবং এই আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সনদের অঙ্গীকারগুলো আমাদের বিচার প্রক্রিয়ায় মান্য করা হয় কিনা তা উল্লেখিত সংবাদ শিরোনামগুলোই এর উৎকৃষ্ট প্রমাণ। এমন একটা দুটো হলে তা বিচ্ছিন্ন ঘটনা বলা যেতো। কিন্তু নাগরিক জীবনের উপর যুগের পর যুগ ধরে এই ভয়ানক অবিচার চলছে এবং বাধাহীনগতিতে ভবিষ্যতেও চলতে থাকবে। এর নাম কি সভ্য

www.pathagar.com

দেশের বিচার ব্যবস্থা? এর পরেও কি আমরা নিজেদেরকে সভ্য দেশের নাগরিক বলে দাবি করতে পারি? বিদ্যমান বিচার ব্যবস্থায় ব্রিটিশ-পাকিস্তানি আমল ও আজকের আমলে পার্থক্য হলো মানবাধিকার বিরোধী ঔপনিবেশিক আইন-কানুন ব্যবহার করে শোষণলব্ধ সম্পদ দিয়ে ব্রিটিশ ও পাকিস্তানিরা তাদের স্বদেশকে সমৃদ্ধ করেছে; আর বাংলাদেশ সমৃদ্ধ হচ্ছে সমাজের উঁচু স্তরের কিছু মুষ্টিমেয় লোক। তাদের হাতে অর্থবিত্তের পাহাড় জমে উঠেছে। ব্রিটিশ আমলের সেই অবৈজ্ঞানিক অসাধুতার স্থান দখল করেছে বর্তমানে আধুনিক যুগের বিজ্ঞানসম্মত অসাধুতা। এর অনুশীলনের পরিণতি হচ্ছে বাংলাদেশের দুর্ভাগ্যের কারণ। ফলে আজ সাধারণ মানুষ দরিদ্র থেকে ক্রমশ ছিন্নমূলে পরিণত হচ্ছে। ঔপনিবেশিক আইন ও বিচার ব্যবস্থা স্বাধীন দেশের জনগণের চাহিদা পূরণে ব্যর্থ হওয়ায় আজ রেল স্টেশন, বড় বাসস্ট্যান্ড, বাজার, লঞ্চ টার্মিনাল, হাট-গঞ্জ, গ্রামীণ জনপদ, কোর্ট প্রাঙ্গণ, বস্তি, শহর, ফুটপাত ক্রমশ ভরে উঠেছে অত্যাচারিত, লাঞ্ছিত, বঞ্চিত, আশ্রয়হীন, বেকার, ক্ষুধার্ত নরনারী ও শিশুতে। মানবাধিকার এ দেশে ধুলোয় লুটিপুটি খায়। এদেশ ও জনগণের সামনে কোন সুনির্দিষ্ট কর্মপরিকল্পনা বা লক্ষ্য নেই। রাষ্ট্র ব্যবস্থার এই অসাম্যের বিরুদ্ধে চিরবিদ্রোহী যুব সমাজের যে ক্রোধ তাই প্রশমিত হচ্ছে তাদের সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড দ্বারা। একের পর এক সন্ত্রাস বিরোধী নতুন আইন বলবৎ করে দেশকে আইনের জঙ্গলে পরিণত করা সত্ত্বেও এসব সন্ত্রাস বন্ধ করা যাচ্ছে না। এই সমাজে ড্রিল মেশিন দিয়ে খুঁচিয়ে, জবাই করে, টেঁটাবিদ্ধ করে, পানিতে ডুবিয়ে, শ্লীলতাহানি করে, এসিড নিক্ষেপে, চোখ তুলে, হাত পায়ের রগ কেটে, রশিতে ঝুলিয়ে বিষ খাইয়ে, সুয়ারেজ লাইনে ফেলে, পুলিশ হেফাজতে, পানির ট্যাংকে ফেলে, ছাদ থেকে ফেলে দিয়ে এবং শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ টুকরো টুকরো করে জ্যান্ত মানুষ খুন করা হয়। প্রভাতী দৈনিকগুলো নিত্য এসব সচিত্র সংবাদ ছেপে মানুষের চিন্তা চেতনাকে অসাড় করে দিচ্ছে। অভ্যন্তরীণ এই বিশৃঙ্খলা জাতি হিসেবে আমাদের অস্তিত্বকে করছে বিপন্ন। জাতীয় উদ্দীপনা ভেঙ্গে পড়েছে পাশাপাশি হতাশা সর্বত্র। প্রতিকারহীন সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে গণপ্রতিরোধ তাৎক্ষণিক হত্যাকাণ্ডে ভাষা খুঁজে পেয়েছে। সন্ত্রাস আর গণপিটুনির নৃশংসতায় শংকিত জনপদ থরথর কম্পমান। প্রতিটি রাজনৈতিক সরকার প্রকৃত সমস্যায় আঘাত না করার প্রতিশ্রুতিতে এসব ব্যর্থতার দায় কাঁধে বহন করে অবশেষে বিদায় নিচ্ছে। প্রচলিত বিচার ব্যবস্থার প্রতি অনাস্থায় চুয়াডাঙ্গায় ইটেরভাটায় জ্যান্ত মানুষ পুড়িয়ে ছাই, রাজপথে লুণ্ঠিত নাগরিক, ভার্সিটিতে শ্লীলতাহানির সেঞ্চুরিতে পৈশাচিক উল্লাস, বুলেটের তপ্তসীসায় ঝরে পড়া জীবন, রমনা-ভিক্টোরিয়া পার্কে সম্ভ্রম বিক্রি আর হাইকোর্ট মাজারে অভুক্ত সন্তানের সামনে পঙ্গু মা যেভাবে পচে মরছে; আমাদের সমাজ, রাষ্ট্র ও স্বাধীনতা যেন সেই একই পরিণতির দিকে অগ্রসর হয়েছে। স্বাধীনতার ৩৫ বছরের মাথায় জনগণের অস্তিত্বে বেজে উঠেছে অন্তিম কান্না। অন্ধকার যুগে আজ বন্দি প্রাণপ্রিয় স্বদেশ।

www.pathagar.com

আমাদের বিদ্যমান বিচার ব্যবস্থা শুধু বিজ্ঞান বিরোধীই নয় জীবন বিরোধীও বটে। রাষ্ট্রের উন্নয়নবিরুদ্ধ এই নির্মম ব্যবস্থা চালু থাকার ফলে দেশবাসীর প্রাত্যহিক অভাব এতোই ভয়ানক যে তাকে আর নতুন কিছু ভাববার অবসর দেয় না। ফলে এদেশ এক প্রাণহীন সভ্যতার স্তরে আটকা পড়ে আছে। মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় কিন্তু একথা বলা ছিল না। ৩৫ বছর ধরে এ অস্তিত্ব বিনাশী বিচার ব্যবস্থা স্বাধীন দেশে কার স্বার্থে কারা কেন বজায় রেখেছে তার বস্তুনিষ্ঠ অনুসন্ধানী প্রতিবেদন জনসমক্ষে প্রকাশ করা হবে সাংবাদিকদের জন্য আরেকটা মহান মুক্তিযুদ্ধ।

বিচার বিভাগের স্বাধীনতার জয়জয়কার

বিচারক এবং আদালত দুটি পৃথক সত্তা। বিচারক হচ্ছেন সত্য, সুন্দর, সততা ও ন্যায় বিচারের জীবন্ত প্রতীক। আর আদালত হচ্ছে কতগুলো জড়বস্তু সামগ্রীর সমাহার। আদালত বলতে আমাদের চোখের সামনে যে দৃশ্য ভেসে ওঠে তা হচ্ছে এজলাসে বিচারকের আসন, সামনে দু'পাশে সাক্ষী ও আসামীর দাঁড়ানোর জন্য দু'টি কাঠগড়া, পর্যাপ্ত সংখ্যক টেবিল, চেয়ার, ফ্যান, টেবিলে স্তূপিকৃত মামলার নথি, কাগজ, কলম, পেপার ওয়েট ইত্যাদি জড়বস্তু সামগ্রী। তাই আমরা আদালতকে বিচারক বলতে পারি না এবং বিচারককে আদালত বলতে পারিনা। কারণ আদালতের কর্মকাণ্ডের বাইরে বিচারকের ব্যক্তিগত জীবন আছে। যেমন বিচারক তার বাবা-মা-এর যত্ন নেন, স্ত্রী-সন্তানের ভরণপোষণ করেন, প্রাতঃভ্রমণ করেন, প্রাতঃরাশ সেরে বিচারালয়ে এসে বিচারকর্ম করেন, বাসায় গিয়ে বিশ্রাম নেন ইত্যাদি। এজন্য আমরা বলতে পারি না যে, আদালত তার বাবা-মায়ের যত্ন নেন, স্ত্রী সন্তানদের ভরণপোষণ করেন, আদালত প্রাতঃভ্রমণ বা প্রাতঃরাশ করেন, বিচারকর্ম করেন অথবা আদালত বিশ্রামে আছেন। কারণ বিচারকের জীবন্ত সত্ত্বা আছে, কিন্তু আদালতের নেই। জড় বস্তুসামগ্রী দিয়ে তৈরি আদালত তখনই গতিশীল হয়ে ওঠে যখন বিচারক সেখানে বিচারকর্ম করেন। বিচারক ছাড়া আদালত প্রাণস্পন্দনবিহীন জড়বস্তু সামগ্রীর সমষ্টি ছাড়া আর কিছু নয়। তবে বিচারক যখন এজলাসে বসে বিচারিক দায়িত্ব পালন করেন তখন আইনজীবীরা বিচারককে 'মাননীয় আদালত' বলে রূপক অর্থে বিচারকের প্রতি যে সম্মান প্রদর্শন করেন তা অস্বাভাবিক কিছু নয়। কারণ বিচারকের উপস্থিতিতে আদালতের প্রাণস্পন্দন তখন সক্রিয়। কিন্তু আদালতের বাইরে বিচারক এ সমাজের সবচেয়ে সম্মানিত ব্যক্তি হলেও তিনি কোন অর্থেই ওই সময় আদালত নন। অথচ আদালতের বাইরেও বিচারক আদালত হিসেবে গণ্য করার একটা রেওয়াজ সেই ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক আমল হতে আজো আমাদের দেশে বলবৎ আছে। যে কারণে ২০০৫ সালে একজন বিচারপতি ট্রেনের সিট রিজার্ভেশনে বিলম্ব ঘটায় সংশ্লিষ্ট রেল কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে হাইকোর্ট থেকে সুয়োমুটো আদালত অবমাননা মামলা দায়ের করা হয়েছিল। রাজপথে অপর বিচারপতিকে ট্রাফিক সার্জেন্ট-এর যথাযথ সম্মান প্রদর্শন না করা সংক্রান্ত হাইকোর্টের অপর একটি আদালত

www.pathagar.com

অবমাননা মামলায় শাস্তি প্রাপ্ত হয়ে শেষ পর্যন্ত বাংলাদেশের একজন পুলিশ প্রধানও চাকরি খুইয়েছেন। বিচারকের সীমাহীন ক্ষমতা প্রয়োগের স্বাধীনতার চেয়ে বড় প্রমাণ আর কি হতে পারে? এ বাস্তবতায় এটা পরিষ্কার যে, বিচারক অবমাননার শাস্তি রেখে ব্রিটিশরা পৃথক কোন আইন তৈরি না করায় উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া আইন ব্যবস্থায় বাংলাদেশেও দণ্ডবিধির ২২৮ ধারা ব্যতীত কোন আইন নেই। এ শূন্যতা পূরণে বিচারকগণ ১৯২৬ সালের আদালত অবমাননা আইনে এ অপরাধের বিচার করে থাকেন এবং এ আইনে অপরাধের কোন সংজ্ঞা না থাকায় বিতর্কিত হচ্ছে এ আইনে প্রদত্ত দণ্ড। ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শক্তি আইন আদালতে অতি দুর্বোধ্য ও জটিলতাপূর্ণ ভাষায় প্রচলন করে যা আজো বহাল আছে। আইনে সচরাচর দ্ব্যর্থক শব্দের ব্যবহার ছাড়াও অভিধানের অপ্রচলিত শব্দগুলো ব্যবহার করে তারা আইন আদালতের কর্মকাণ্ডকে জনগণের সামনে বরাবরই রহস্যাবৃত্ত করে রেখেছে। ধূর্ত ব্রিটিশরা আইন আদালতে জটিল, অপ্রচলিত ও বিকল্প শব্দগুলো ব্যবহার করেছে এজন্য যে, সাধারণ মানুষ যেন সহজেই বুঝতে না পারে যে প্রকৃত অর্থে আদালতে কি ঘটনা ঘটেছে। 'অবকাশ' শব্দটির কথাই ধরা যাক। শব্দটি ব্যবহৃত হয় সুপ্রিমকোর্টের অতিরিক্ত বা অস্বাভাবিক ছুটির ক্ষেত্রে এবং এই অবকাশ শব্দটি সাধারণ্যে অপ্রচলিত। উল্লেখ্য, আমাদের বিচার বিভাগ প্রতিবছর অতিরিক্ত বিশেষ ছুটি ভোগ করে যা সরকারের অন্যান্য বিভাগে নেই। যে কারণে সরকারি এবং বেসরকারি পর্যায়ে ছুটি ভোগ করলেও উচ্চআদালত ভোগ করে থাকে 'অবকাশ যাপন' আদালতের কর্মকাণ্ড হতে শুরু করে বিচারকের ক্ষমতা প্রয়োগ সর্বত্রই দুর্বোধ্য ও জটিল শব্দ প্রয়োগের ছড়াছড়ি। এই যেমন কোন নাগরিক এ দেশে প্রচলিত কোন আইন ভঙ্গ করলে তা বেআইনী কিংবা সরাসরি অপরাধ হিসেবে গণ্য হবে। কিন্তু কোন বিচারক যদি বিচারআদালতে আইন ভঙ্গ করে কোন রায় দেন তা বেআইনি বলা যাবে না। বলতে হবে এটা বিচারকের এখতিয়ারবহির্ভূত কাজ যা কোন অপরাধ হিসেবে গণ্য করা যাবে না। তারপরেও বিষয়টি নিয়ে প্রতিবাদের ঝড় ওঠার আশঙ্কা থাকলে সংশ্লিষ্ট বিচারক খুব সহজেই 'সরল বিশ্বাস' শব্দটির আশ্রয় নিয়ে পার পেয়ে যেতে পারবেন। কারণ আমাদের বিচারআদালতে সরল বিশ্বাসকৃত কোন কাজ অপরাধ হিসেবে গণ্য করা হয় না। এখতিয়ার বহির্ভূত এবং সরল বিশ্বাস শব্দ দুটি হচ্ছে ভাষার চতুর মারপ্যাঁচ। ভারত জবরদখলকারী বৃটিশ ঔপনিবেশিক ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর প্রশ্নাতীত আনুগত্যের পুরস্কার হিসেবে বিচারকদেরকে অপরাধের শাস্তি থেকে রক্ষা করতে তারা আইন আদালতে এই ভাষার মারপ্যাঁচ চালু করে যা আজো অবিকলভাবে বলবৎ আছে। শুধু তাই নয়, বিচারকদেরকে ফৌজদারি ও দেওয়ানি অপরাধ থেকেও আগাম দায়মুক্তির ব্যবস্থা রাখা হয়েছে ১৮৫০ এবং ১৮৬০ সালের দুটি আইনে। এর পাশাপাশি বিচারাদালতে বিচারকের যে কোন কর্মকাণ্ডের সমালোচনা কঠোরভাবে নিষিদ্ধ ও শাস্তিযোগ্য করে ১৯২৬ সালে প্রণয়ন করা হয় আদালত অবমাননা আইন। মজার

www.pathagar.com

ব্যাপার হলো এ আইনে আদালত অবমাননার কোন সংজ্ঞা নেই। একবিংশ শতাব্দীর সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত আইন তিনটি কিন্তু আমাদের দেশে আজো হুবহু বলবৎ রয়েছে। এর দাঁড়ি-কমা পর্যন্ত বদলায়নি কোন সরকার। শুধু বদলেছে বৃটিশ সিংহের প্রতীকের বদলে পাকিস্তানের চাঁদতারা তারপর এখন বাংলাদেশের শাপলা। গত দেড়শ' বছরেরও বেশি সময় ধরে বিচারক ও বিচারআদালত অন্তহীন স্বাধীনতা ভোগ করে আসছে। স্বাধীনতার পর ১৯৭৫ সালে বাংলাদেশ সংবিধানের চতুর্থ সংশোধনীতে অনির্বাচিত প্রেসিডেন্টের আজ্ঞাবহ করে বিচারকগণকে দায়বদ্ধ করা হয়েছিল। কিন্তু এই দায়বদ্ধতা সর্বজনগ্রাহ্য পদ্ধতিতে না হয়ে এক ব্যক্তিকেন্দ্রিক এবং এর মধ্যে কোন সৎ অভিপ্রায় না থাকায় পরবর্তী পঞ্চম সংশোধনীতে তা রহিত করা হয়। এছাড়া বিচার বিভাগের স্বাধীনতার ছন্দপতন হয়নি কখনও। গত দেড় শতাব্দী ধরে এদেশে বিচারক ও আদালত কি অসীম স্বাধীনতা ভোগ করে আসছে তা নিম্নে উদ্ধৃত সংশ্লিষ্ট প্রচলিত আইনগুলো পর্যালোচনা করলেই তার একটা পরিষ্কার চিত্র পাওয়া যাবে:

১৮৬০ সালের দণ্ডবিধি আইন

৭৭ নং ধারা: বিচারক এখতিয়ারবহির্ভূতভাবে বিচার কাজ করলেও যদি তা সরল বিশ্বাসে করা হয়, তাহলে তা কোনো অপরাধ হিসেবে গণ্য করা হবে না।

২২৮ নং ধারা: কোন বিচার বিভাগীয় কার্যক্রমে কর্তব্যরত সরকারি কর্মচারীকে কেউ ইচ্ছাকৃতভাবে অপমান করা বা বাধা প্রদান করলে সে ৬ মাস বিনাশ্রম কারাদণ্ড ও এক হাজার টাকা জরিমানা দণ্ডে দণ্ডিত হবে।

১৯০৮ সালের দেওয়ানি কার্যবিধি আইন

৩৯ আদেশের ৩নং বিধি: আদালতের নিষেধাজ্ঞা অবমাননাকারীকে একই আদালত সর্বোচ্চ ৬ মাসের কারাদণ্ড দিতে পারবেন।

১৫১ ধারা: আদালতের অন্তর্নিহিত ক্ষমতা (Inherent Power) অব্যাহত থাকবে (সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা ও সংশ্লিষ্ট নজির)

এই ধারা আদালতকে বিপুল ক্ষমতা দিয়েছে। ন্যায়বিচার করার জন্য বা আদালতের ক্ষমতার অপব্যবহার রোধ করার জন্য আদালত তার অন্তর্নিহিত ক্ষমতাবলে যে কোন আদেশ দিবার অধিকার রাখেন। (২১ ডিএলআর পৃ: ১৮৩)

* বিধিতে অথবা অন্য কোথাও সুনির্দিষ্ট প্রতিকারের সুযোগ থাকলে এ ধারা প্রয়োগ করা যায় না। ২৯ ডিএলআর (এসসি) ১০৩
* আদালত 'ন্যায়বিচারের স্বার্থে' এর নামে আইনের প্রতিষ্ঠিত নীতিমালা লংঘন করিতে পারেন না (৩৮ ডিএলআর পৃ: ৭০)

www.pathagar.com

বিচারকার্যে নিয়োজিত কর্মকর্তাদের রক্ষার উদ্দেশ্য প্রণীত আইন

[The judicial officers protection act. 1850]

(১৮৫০ সনের ১৮ নং আইন)

[৪ঠা এপ্রিল, ১৮৫০]

প্রস্তাবনা: বিচারিকভাবে কার্যরত ম্যাজিস্ট্রেট এবং অন্যদের অধিকতর রক্ষাকল্পে এতদ্বারা নিম্নোক্ত আইন প্রণীত হলো- ১। কোন (Judge), ম্যাজিস্ট্রেট, জাস্টিস অব দি পীস, কালেক্টর বা অন্য কোন ব্যক্তি বিচারিক কার্য সম্পাদনের সময় (acting Judicially) তার বিচারিক দায়িত্ব পালনকল্পে তৎকর্তৃক কৃত কোন কাজের জন্য বা তৎনির্দেশিত কোন কাজের জন্য তার এখতিয়ার থাকুক বা না থাকুক, কোন দেওয়ানি আদালতে কোন মোকদ্দমা চলবে না; শর্ত হল তিনি উক্ত সময়ে সরল বিশ্বাসে কোন অভিযোগকৃত বিষয়ে তার এখতিয়ার আছে বলিয়া বিশ্বাস করিয়া কোন কাজ করিয়া থাকিলে বা করার নির্দেশ দিয়া থাকিলে এবং অনুরূপ জজ বা ম্যাজিস্ট্রেট জাস্টিস অব দি পীস, কালেক্টর বা বিচারিক দায়িত্বে নিয়োজিত অন্য ব্যক্তির কোন আইনসংগত পরোয়ানা পালনে বাধ্য হলে অনুরূপ এবং আদেশদানকারী ব্যক্তির আদেশ বা পরোয়ানা জারি করিতে তিনি যদি বাধ্য হইতেন তবে অনুরূপ কোন পরোয়ানা বা আদেশ কার্যকরী করার জন্য আদালতে কোন কর্মকর্তা বা অন্য ব্যক্তির বিরুদ্ধেও দেওয়ানি আদালতে কোন মোকদ্দমা চলিবে না।

(বিশেষভাবে উল্লেখ্য, ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনের বিরুদ্ধে সমগ্র ভারতে ১৮৫৭ সালে যে মহা বিদ্রোহ সংঘটিত হয়েছিল তার সাত বছর আগে ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি সরকার প্রণীত এ আইনটি আজো স্বাধীন বাংলাদেশে অবিকলভাবে বলবৎ রয়েছে।)

আদালত অবমাননা আইন

[The contempt of courts Act: 1926]

১৯২৬ সালে ১২ নং আইন (৮ মার্চ, ১৯২৬)

আদালত অবমাননার দণ্ড প্রদানে কতিপয় আদালতের ক্ষমতা বর্ণনা ও সীমিতকরণের উদ্দেশ্যে প্রণীত আইন।

যেহেতু আদালতসমূহের অবমাননার শাস্তি বিধানের ক্ষেত্রে হাইকোর্ট বিভাগের ক্ষমতা সম্পর্কে সন্দেহের উদ্রেক হয়েছে এবং যেহেতু এসব সন্দেহ দূরীকরণ অপরিহার্য এবং আদালতসমূহের অবমাননার জন্য হাইকোর্ট বিভাগ কর্তৃক প্রয়োগযোগ্য ক্ষমতাসমূহ সংজ্ঞায়িত ও সীমিত করা প্রয়োজন।

অতএব এতদ্বারা নিম্নোক্ত আইন প্রণীত হল:

১. সংক্ষিপ্ত শিরোনাম আওতা এবং আরম্ভ : (১) অত্র আইনকে ১৯২৬ সালের আদালত অবমাননা আইন নামে অভিহিত করা যেতে পারে। (২) এটি সমগ্র বাংলাদেশে প্রযোজ্য।

www.pathagar.com

(৩) সরকার গেজেট প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে যে তারিখ নির্ধারণ করবেন সে তারিখ থেকে এটি কার্যকর হবে।[১৫]

২. আদালত অবমাননার জন্য উচ্চতর আদালত কর্তৃক শাস্তি দানের ক্ষমতা: (১), (৩) উপধারার বিধান সাপেক্ষে হাইকোর্ট বিভাগ তার অধীনস্থ আদালতসমূহের অবমাননার ব্যাপারে তার নিজের অবমাননার জন্য যে রকম ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব প্রদান করেন, একই রকম পদ্ধতি অনুসারে একই রকম ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব প্রয়োগ করবেন। (২) বাতিল, (৩) যে ক্ষেত্রে অনুরূপ অবমাননা দণ্ডবিধি মোতাবেক শাস্তিযোগ্য, সেক্ষেত্রে হাইকোর্ট বিভাগ কোন অধস্তন আদালতের কথিত অবমাননার বিষয় আমলে গ্রহণ করবেন না।

৩. আদালত অবমাননার শাস্তি: বর্তমানে বলবৎ অন্য কোন আইনে সুস্পষ্ট বিধান সাপেক্ষে আদালত অবমাননার জন্য ছয়মাস পর্যন্ত যে কোন মেয়াদের বিনাশ্রম কারাদণ্ড অথবা দু'হাজার টাকা পর্যন্ত যে কোন অংকের জরিমানা অথবা উভয় রকম দণ্ড দেয়া যেতে পারে; শর্ত হচ্ছে আদালতের সন্তুষ্টি মোতাবেক ক্ষমা প্রার্থনা করলে অভিযুক্তকে অব্যাহতি প্রদান বা প্রদত্ত দণ্ড থেকে নিষ্কৃতি দেয়া যেতে পারে।

আরো শর্ত থাকে অন্য কোন আইনে অন্যত্র যে কোন কিছু থাকা সত্ত্বেও হাইকোর্ট বিভাগ তার নিজের বা অন্য কোন অধস্তন আদালতের অবমাননার জন্য অত্র ধারায় নির্ধারিত দণ্ডের চেয়ে অতিরিক্ত দণ্ড আরোপ করবেন না।

১৯৮৫ সালের পারিবারিক আদালত

অধ্যাদেশের ১৯ ধারা:

বৈধ কারণ ছাড়া কেউ কোন পারিবারিক আদালতের অবমাননা করলে, কাজে বাধা প্রদান করলে, কোন প্রশ্নের জবাব দেয়া বাধ্যতামূলক হওয়া সত্ত্বেও তার জবাব না দিলে, শপথ নিতে অস্বীকার করলে বা তার দ্বারা প্রদত্ত কোন বিবৃতিতে স্বাক্ষর করতে অস্বীকৃতি জানালে পারিবারিক আদালত এই অপরাধকে আদালত অবমাননা হিসেবে আমলে নিয়ে অপরাধীকে ২০০ টাকা জরিমানা করতে পারবেন। কিন্তু তাকে কোন কারাদণ্ড প্রদান করা যাবে না।

উচ্চাদালতের নজির: (৩৭ ডিএলআর ২৭)

আদালত অবমাননার জন্য ক্ষমা ভিক্ষায় সন্তুষ্ট হলে আদালত তাকে দণ্ড থেকে অব্যাহতি দিতে পারেন। তবে কেউ যদি তার অবমাননাকর আচরণের পক্ষে যুক্তি প্রদর্শন পূর্বক ক্ষমা প্রার্থনা করে তবে সেটা নিঃশর্ত ক্ষমা প্রার্থনা হিসেবে গণ্য করা হবে না।

উচ্চাদালতের নজির: ৩৫ ডিএলআর ২৯০

বিধিবদ্ধ আইনের কোথাও কোথাও 'আদালত অবমাননা' বলতে কি বোঝায় তা সংজ্ঞায়িত করা হয়নি। তবে যেসব আচরণ আদালতের প্রতি অশ্রদ্ধা পোষণ করা কিংবা

www.pathagar.com

আদালতের নির্দেশ অমান্য করার শামিল যা আদালতের মর্যাদা এবং ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন করে সেসব আচরণ দ্বারা আদালত অবমাননা হতে পারে। এছাড়া ভরত, পাকিস্তান ও বাংলাদেশের উচ্চাদালতের রায়ে আদালত অবমাননা সম্পর্কিত সংগৃহীত আরো অন্যান্য নজিরগুলো হচ্ছে-

* হাইকোর্টের প্রশাসনিক কাজের সমালোচনাও অনেক ক্ষেত্রে আদালত অবমাননায় অভিযুক্ত হতে পারে। PLD. 1964, Lahore 434: 16, DIR. (WP) 177.

  একজন বিচার বিভাগীয় অফিসারকে দুর্নীতিবাজ হিসেবে আখ্যা দেয়া এবং তা যদি সত্যও হয় তবে ঐ বক্তব্য বা অভিযোগ আদালত অবমাননা। (State V. Reshi Kumar, AIR 1961 J & K 75/Advocate general of Kerala V. John (1965) Ker, 49: ILR (1964) 2 Ker, 142)

* যদি এ জাতীয় অভিযোগ প্রধান বিচারপতির কাছে লিখিত কোন পত্রে অথবা কোন মন্ত্রীর নিকট গোপনীয়ভাবে উত্থাপন করা হয় সে ক্ষেত্রেও এটি অবমাননার পর্যায়ভুক্ত। A.G. of Madras V. Thonthi, Air 1965 Mad, 487/state V. Mangilal 1960 M. PJ 441/state of Bihar, V. Gorakh Prasad, AIR 1961 Pat 360: (1961)2 CR IJ 362).

* বিচারকের যোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন উত্থাপন করা আদালত অবমাননা। (Bholanath in the matter of AIR 1961 pat.)

* হাইকোর্ট বা সুপ্রিমকোর্টের কোন বিচারকের বিরুদ্ধে প্রধান বিচারপতির কাছে অসদাচরণ বা দুর্ব্যবহারের অভিযোগ উত্থাপন করা আদালত অবমাননা। তবে এ বিষয়ে রাষ্ট্রপতির কাছে অভিযোগ দায়ের করা আদালত অবমাননা বলে বিবেচিত হবে না, যদি না প্রমাণিত হয় যে অভিযোগ মিথ্যা।[১৬]

* বিচারকগণ অনুচিত পন্থায় সম্পত্তি অর্জন করেছেন মর্মে কুৎসা রটানো গুরুতর আদালত অবমাননা।[১৭]

* Mishra V. Dixit মামলায় ইন্ডিয়ান সুপ্রিমকোর্ট উল্লেখ করেন, একজন বিচার বিভাগীয় কর্মকর্তা যদি ইচ্ছাকৃতভাবে হাইকোর্টের অবশ্য পালনীয় নজির (binding precedents of the high court) অনুসরণ করতে রাজি না হন, তবে তিনি আদালত অবমাননার অপরাধে অপরাধী হবেন।

বিচার ক্ষেত্রে স্বাধীনতার খণ্ডচিত্র : সর্বসাধারণের জন্য প্রযোজ্য বেআইনি কাজের সংজ্ঞা সম্পর্কে দণ্ডবিধি আইনের ৪৩ ধারায় বলা হয়েছে, 'কোন আইনের দ্বারা নিষিদ্ধ এবং দেওয়ানি মামলা দায়ের করার বিষয় হতে পারে এমন সকল কাজকে বেআইনি কাজ বলা হলে।' কিন্তু বিচারকের ক্ষেত্রে দেশে প্রচলিত ১৮৫০ সালের জুডিশিয়াল অফিসার্স প্রটেকশন এ্যাক্ট এবং ১৮৬০ সালের দণ্ডবিধি আইনের ৭৭ ধারায় বিচারকের যে কোন এখতিয়ারবহির্ভূত তথা ক্ষমতাবহির্ভূত তথা বেআইনি কাজকে 'সরল বিশ্বাসের' নামে

www.pathagar.com

আগাম দায়মুক্তি দেয়া হয়েছে। সরল বিশ্বাসের সংজ্ঞা সম্পর্কে দণ্ডবিধির ৫২ ধারায় বলা হয়েছে, 'যথাবিহিত সতর্কতা ও মনোযোগ ছাড়া কিছু করা হলে বা বিশ্বাস করা হবে তা সরল বিশ্বাসে করা হয়েছে বা বিশ্বাস করা হয়েছে বলে বিবেচনা করা হবে না।' দণ্ডবিধির এই ৫২ ধারার সংজ্ঞায় অতি সূক্ষ্ম কারচুপি হচ্ছে এই ধারায় সরল বিশ্বাসে শব্দটির একটি নেতিবাচক সংজ্ঞা দেয়া হয়েছে শুধু। কিন্তু এর মধ্যে অন্তর্নিহিত নৈতিক সততা বা সৎ অভিপ্রায়ের কোন স্পষ্ট উল্লেখ সংজ্ঞাটির মধ্যে নেই। এর নির্গলিতার্থ হচ্ছে দণ্ডবিধির ৫২ এবং ৭৭ ধারার ক্ষমতাবলে বিচারক মামলার নিরপরাধ আসামীকেও কারাদণ্ড এমনকি ফাঁসিতে ঝুলিয়ে দিতে পারেন। এজন্য বিচারককে কোথাও জবাবদিহি করতে হবে না এবং এমন ঘটনা এদেশে বিরল নয়। আমাদের জাতীয় দৈনিকগুলোতে বিভিন্ন সময়ে প্রকাশিত এ সংক্রান্ত কয়েকটি সংবাদ নিম্নে সংক্ষিপ্তাকারে পত্রস্থ করা হলো–

১৬ বছর আগে নিহত বলে কথিত তারি বড়ুয়াকে অবশেষে ফেনী পুলিশ গ্রেফতার করেছে। অথচ তাকে হত্যার দায়ে মামলার রায়ে চট্টগ্রামের দায়রা জজ আদালত ৪ ব্যক্তিকে ৭ বছর সশ্রম কারাদণ্ড দেন। হাইকোর্টে আপিল হলে এ রায় বহাল থাকে। চার আসামী জেল খেটেছে। (দৈনিক মিল্লাত, ১৪ এপ্রিল ১৯৯২), দুলাল নামের এক ব্যক্তিকে হত্যার দায়ে ঝালকাঠির অতিরিক্ত জেলা ও দায়রা জজ আদালত ১৯৯৮ সালে এক রায়ে ৮ জন আসামীকে ১০ বছর সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করেন। ৮০ বছরের এক বৃদ্ধসহ অন্যান্য দণ্ডিত আসামীরা প্রায় দু'বছর সাজা ভোগের পর হাইকোর্ট থেকে জামিন পেয়েছেন। সাজাপ্রাপ্ত এক আসামি চাকরি থেকে বরখাস্ত হয়েছেন আর মামলার খরচ চালাতে গিয়ে সব আসামী আজ পথের ভিখেরী। নিহত বলে কথিত দুলাল অবশেষে গত রোববার পুলিশের হাতে গ্রেফতার হয়েছে। (দৈনিক প্রথম আলো, ২৩ জানুয়ারি ২০০৪) জোসনা খাতুনকে অপহরণ করে হত্যা মামলায় দোষী সাব্যস্ত করে ঝিনাইদহ জেলা ও দায়রা জজ আদালত ১৯৯৭ সালে এক রায়ে মানিক শেখকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডাদেশ দেন। ইতিমধ্যে তার ৭ বছর জেল খাটাও হয়ে গেছে। অথচ সেই নিহত জোসনা গত বৃহস্পতিবার রাতে শৈলকুপা পুলিশের হতে আটক হয়েছে। (দৈনিক আমার দেশ; ২২ মার্চ ২০০৫), স্ত্রী নার্গিসকে হত্যার অপরাধে দোষী সাব্যস্ত করে হতভাগা স্বামী করিমকে যশোর নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আদালতের রায়ে দু'হাজার সালে ৪৭ বছরের কারাদণ্ড দেয়া হয়। দণ্ডাদেশ মাথায় নিয়ে সে জেল খাটছে। ১৬ মাস আগে সেই নার্গিস পুলিশের হাতে গ্রেফতার হয়ে জামিনে গেলেও করিম জেল থেকে আজো মুক্তি না পেয়ে সাজা ভোগ করছে। (দৈনিক নয়া দিগন্ত; ৫ মার্চ ২০০৫) ১৯৯৬ সালে বগুড়ার একটি বাসে ডাকাতির ঘটনায় এক পুলিশ, ২ জন যাত্রী ও বাস হেলপার নিহত হয়। বগুড়ার জেলা জজ আদালত এ মামলায় দোষী সাব্যস্ত করে ২০০১ সালে ৬ বাস ডাকাতকে মৃত্যুদণ্ডাদেশ দেন। এই রায়ের বিরুদ্ধে হাইকোর্টে আপিল হলে হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চ গত ১০ মার্চ ফাঁসির সাজার পরিবর্তে ৬ আসামির যাবজ্জীবন কারাদণ্ডাদেশ দেন।

www.pathagar.com

কিন্তু একই আদালত রায়টি রিকল করে মাত্র ১০ দিনের ব্যবধানে পুনরায় শুনানি শেষে গত ২০ মার্চ প্রদত্ত আরেক রায়ে ওই মামলার ৩ জনের যাবজ্জীবন সাজা বহাল রেখে বাকি ৩ জনকে খালাস দেন। একই আদালতে একই বিষয়ে দু'বার দু'রকম রায় দেয়ার ঘটনায় সুপ্রিম কোর্টে তোলপাড় শুরু হয়েছে। (দৈনিক দিনকাল: ৩০ মার্চ ২০০৪), কালিগঞ্জের শাহেদ আলীকে পিটিয়ে হত্যা ও লাশ গুম করার অপরাধে ১৯৬৩ সালে থানায় দায়েরকৃত হত্যা মামলায় দোষী সাব্যস্ত করে ঢাকার দায়রা জজ আসামী দু'ভাই আউয়াল ও হাইকে ৪ বছর সশ্রম কারাদণ্ড দেন।

কিছুদিন কারাভোগের পর দণ্ডিত দু'ভাই আপিল করে ১৯৬৯ সালে হাইকোর্ট থেকে খালাস পান। ঘটনার ১০ বছর পর নিহত শাহেদ আলী জীবিতাবস্থায় মনোহরদী পুলিশের হাতে গ্রেফতার হয়। এ হয়রানির বিচার চেয়ে ঢাকার ম্যাজিস্ট্রেট কোর্টে সেই ১৯৭৫ সালে মামলা করে ৩০ বছর ধরে ঘুরছেন আউয়াল। রায় দেখার আশায় ২৫ বছর অপেক্ষা করে মারা গেছেন তার বড় ভাই। আজো রায় হয়নি। (ইত্তেফাক, ২৮ সেপ্টেম্বর ২০০৫), খুন না করেও ফাঁসির প্রকোষ্ঠে শাহ আলম বাবু। ঢাকার মুখ্য মহানগর হাকিম আদালত ও মহানগর দায়রা জজ আদালতে এই মামলার বাদী রোকেয়া বেগম সাক্ষ্য দিতে গিয়ে এবং সূত্রাপুর থানার মিথ্যা চার্জশীটের বিরুদ্ধে নারাজী দরখাস্তে বারবার বলেছেন, আসামীর কাঠগড়ার দাঁড়ানো শাহ আলম বাবু নির্দোষ। তার স্বামী লিয়াকতের প্রকৃত হত্যাকারী হচ্ছে এই মামলার এজাহারভুক্ত আসামী সুন্দর বাবু। কিন্তু তার সব আবেদন আদালত নাকচ করে শাহ আলম বাবুকেই দোষী সাব্যস্ত করে মৃত্যুদণ্ডাদেশ দেন। বিষয়টি র‍্যাবকে অবহিত করা হলে র‍্যাব লিয়াকতের প্রকৃত খুনি সুন্দর বাবুকে অবশেষে গ্রেফতার করেছে। (দৈনিক খবরপত্র: উপ সম্পাদকীয় ১৫ মার্চ ২০০৫)

উল্লেখিত ঘটনাগুলোতে এটা পরিষ্কার আমাদের দেশের বিচারকগণ বিচারক্ষেত্রে যে কোন নিরপরাধ আসামীকেও বিভিন্ন মেয়াদের কারাদণ্ড এমনকি মৃত্যুদণ্ডও দেয়ার ক্ষমতা রাখেন। আইনের সরল বিশ্বাস শব্দটি রক্ষাকবচ থাকায় তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষণে সংশ্লিষ্ট বিচারকগণের অমনোযোগীতায় নিরপরাধ ব্যক্তিগণ এই সাজা পেয়েছেন। সরল বিশ্বাসের ওপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীলতা থাকায় মামলাগুলোর তদন্ত কর্মকর্তা ও সাক্ষীদের জেরা করে প্রকৃত সত্য উদঘাটনে সম্মানিত বিচারকগণের 'জুডিশিয়াল মাইন্ড' এর প্রয়োগ অব্যবহৃত থেকে গেছে। আমাদের বিচারব্যবস্থার এই অর্গলগুলো অনেকের জীবনের অনেক অবিচারের জন্য দায়ী। আইন বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, জাতীয় সংসদের কোন সংসদীয় কমিটি এমনকি মহামান্য সুপ্রীম কোর্টেরও এসব অবিশ্বাস্য ঘটনায় কোন তদারকি ও খবরদারী নেই। এসব বিষয়ে বিচারকদের জবাবদিহির বিরুদ্ধে সবচেয়ে বড় রক্ষাকবচ হচ্ছে ১৮৫০ সালে বৃটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি প্রণীত জুডিশিয়াল অফিসার্স প্রটেকশন অ্যাক্ট এবং মহারাণী ভিক্টোরিয়া আমলের ১৮৬০ সালের দণ্ডবিধি আইনের ৫২ এবং ৭৭ ধারা। উল্লেখ্য আদালত বা Court কোর্ট বলতে বিচারালয়কে বোঝায়। আর বিচার কার্যে আইনত দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি হলেন বিচারক।

www.pathagar.com

১৮৭২ সালের সাক্ষ্য আইনের ৩ ধারায় সাক্ষ্য গ্রহণে আইনত ক্ষমতাপ্রাপ্ত সব ব্যক্তি আদালতের অন্তর্ভুক্ত। বাংলাদেশের সংবিধানের ৯৪ অনুচ্ছেদের আওতায় গঠিত দেশের সর্বোচ্চ বিচারালয় সুপ্রিম কোর্ট গঠন করে সব আদালতকে এর অধীনস্থ করা হয়েছে। দেওয়ানি কার্যবিধির ৩ ধারা ও ফৌজদারি কার্যবিধির ৬ ধারা অনুযায়ী গঠিত সব নিম্ন আদালত ও বিচারালয় সুপ্রিমকোর্টের অঙ্গ বিধায় একজন তৃতীয় শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট থেকে সুপ্রিমকোর্টের একজন বিচারপতি পর্যন্ত সবাই বিচার কার্যে নিয়োজিত বলে বিবেচিত।

সংবিধানের ১১৬ক, অনুচ্ছেদেও বলা হয়েছে, 'এই সংবিধানের বিধানাবলী সাপেক্ষে বিচারকর্ম বিভাগে নিযুক্ত ব্যক্তিগণ এবং ম্যাজিস্ট্রেটগণ বিচারকার্য পালনের ক্ষেত্রে স্বাধীন থাকিবেন। 'কিন্তু সংবিধানের কোন অনুচ্ছেদেই এমন কথা লেখা নেই যে, একজন বিচারক যদি বিচারাদালতে দুর্নীতির আশ্রয় নিয়ে কিংবা সজ্ঞানে প্রচলিত আইন ভঙ্গ করেন তাহলে ক্ষতিগ্রস্ত নাগরিক আইন আদালতে কোন প্রতিকার পাবে। তবে শুধু রায় বাতিলের প্রতিকার পেতে আপিল প্রক্রিয়ায় মোট ৪টি স্তর অতিক্রম করতে হবে এবং প্রতিস্তরের আপিল প্রক্রিয়া অত্যন্ত জটিল, ব্যয়বহুল ও সময় বহুল। বৃটিশ আইনে রায় প্রদানের সময়সীমা বিচারকের খেয়ালখুশী নির্ভর হওয়ার কারণে যুগের পর যুগ ধরে অনির্দিষ্টকাল সময় পর্যন্ত বংশ পরম্পরায় মামলা চালিয়ে মামলার পক্ষগুলো ফতুর হয়ে যায়। কেউ মারা যায় চূড়ান্ত রায়ের সুফল পাওয়ার আগেই। বিচারে দীর্ঘসূত্রিতা সম্পর্কে জাতীয় পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত কয়েকটি সংবাদ নিম্নে পুনরুল্লেখ করা হলো: ১৯৬৫ সালের একটি মামলা আজো চলছে। ইতিমধ্যে দু'জন বিচারকের মৃত্যু হয়েছে। এ অবস্থায় বিচারের প্রতি জনগণের আস্থা থাকে কি করে? (ইনকিলাব, ১৯ আগস্ট ১৯৯০) হাইকোর্টে ছুটি থাকে ৬ মাস। ঝুলে আছে লক্ষাধিক মামলা। এসব মামলার মধ্যে ১৫ থেকে ২০ বছর পড়ে আছে এমন মামলাও আছে। (যুগান্তর, ৪ এপ্রিল ২০০০) ৯২ বছরের বৃদ্ধ আজিজুর রহমানের মামলাটি দীর্ঘ ২৩ বছর ধরে চলছে। মামলার ৩ উকিল, ১ মুহুরী ও ২ সাক্ষী ইতিমধ্যে মারা গেছেন (যুগান্তর, ৬ ডিসেম্বর ২০০০) ১৫ বছর ধরে বিচারের আশায় ঘুরছেন শেখ জব্বার। একটা জীবন তার কেটে গেছে পথে বিপথে ঘুরে। প্রশ্ন জাগে আইন এদেশে কোথায় বাস করে? কোথায় সুবিচার পাওয়ার ঠিকানা? (ইত্তেফাক, উপসম্পাদকীয় ৪ সেপ্টেম্বর ১৯৮৬) বিনা বিচারে জেলে কাটিল মমিনের ২০টি বছর (ইত্তেফাক ১ জুন ১৯৯৭) সংসদের ৫ বছর মেয়াদ শেষ হলেও নির্বাচনী বিরোধের মামলাগুলো শেষ হয়নি (যুগান্তর: ১৭ জুলাই ২০০১) ১৪ বছরেও পাবনা দায়রা জজ আদালতে বিচারাধীন চাটমোহরের ১২ হত্যা মামলার কুল কিনারা হয়নি। এই সময়ের মধ্যে হাজতে ১ জন্য, পলাতক অবস্থায় ১ জন এবং জামিনে এসে ৩ জন আসামী মারা গেছেন। (জনকণ্ঠ, ১৫ সেপ্টেম্বর ২০০২) হত্যা মামলাটি ১৮ বছর যাবত ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে (ইত্তেফাক, ৩ মার্চ ১৯৯৯) বিনা বিচারে ২২ বছর কারাবাসের পর ফালু মিয়ার জামিন লাভ (ইত্তেফাক, ১৫ নভেম্বর ১৯৯৩) বিনা বিচারে ৮ বছরের

www.pathagar.com

কারাবাসের পর শিশু মিয়াকে তিন মাসের কারাদণ্ড দেয়া হয়েছে। বিষয়টি আইন আদালতের পক্ষে গর্বের কিনা তা ভেবে দেখা উচিত (ইত্তেফাক, উপসম্পাদকীয় ১৩ নভেম্বর ১৯৮৬) ঝালকাঠিতে ২২ বছরেও শেষ হয়নি একটি খুনের মামলা। ইতিমধ্যে ১ আসামী ও ৩ সাক্ষী মারা গেছেন। (ভোরের কাগজ, ২ মার্চ ১৯৯১) দীর্ঘ ৩৮ বছর পর সর্বোচ্চ আদালতের রায় পেয়েও নিজের বৈধ সম্পত্তির দখল পাননি বৃদ্ধা রোকেয়া খাতুন। (ইনকিলাব, ২৯ জুন ২০০২) বিচারে দীর্ঘ সূত্রিতার তালিকা কিন্তু প্রতিদিনই দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হচ্ছে যা সমাজকে করছে অস্থির ও অস্থিতিশীল। এসব ক্ষেত্রেও বিচারকদের জবাবদিহিতার কোন ব্যবস্থা নেই। অর্থাৎ বিচারক ও বিচারাদালতের সীমাহীন স্বাধীনতার জয়জয়কার চলছে গত দেড়শ' বছর থেকে। এর উপসংহার হচ্ছে এদেশের দরিদ্রতা।

সরল বিশ্বাসের দুটি গল্প

সেই বৃটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির আমল হতে আমাদের বিচার সংস্কৃতিতে সরল বিশ্বাস শব্দ দুটিকে যুক্তিগ্রাহ্য করতে কাঠুরে ও শল্যচিকিৎসকের দু'টি গল্প চালু আছে। একটি গল্পে বলা হয়েছে, গাছ কাটার সময় কাঠুরের হাত থেকে ফস্কে যাওয়া কুড়ালের আঘাতে পাশে দণ্ডায়মান ব্যক্তি নিহত হলে তা সরল বিশ্বাসে কৃত অপরাধ হিসেবে গণ্য হবে যা কোন দণ্ডযোগ্য অপরাধ নয়। অপর গল্পে বলা হয়েছে, রোগীর জীবন বাঁচাতে কোন শল্যচিকিৎসকের অস্ত্রোপচারের ফলে রোগীর মৃত্যু হলে তা চিকিৎসকের সরল বিশ্বাসে কৃত অপরাধ হিসেবে গণ্য হবে যা কোন দণ্ডযোগ্য অপরাধ নয়। কিন্তু স্রষ্টার পরের আসনেই বিচারককে স্থান দেয়া হয়। বিশ্বে বিচারকের সম্মানের আসন কত উঁচুতে এতেই পরিষ্কার। কাঠুরে ও শল্যচিকিৎসকের পেশাগত চরিত্রের সাথে বিচারকের পেশাগত চরিত্রের মধ্যে রয়েছে আকাশ পাতাল পার্থক্য। ভিন্নমুখী এই তিনটি পেশার সরল বিশ্বাসকে এক কাতারে ফেলার মধ্যে সৎ উদ্দেশ্য ছিলনা ব্রিটিশদের। তাই সরল বিশ্বাসের নামে একজন অসচেতন কাঠুরের কুড়াল ও চিকিৎসকের অস্ত্রোপচারের ছুরির সাথে একজন প্রজ্ঞাবান বিচারকের কলমের তুলনা একবিংশ শতাব্দীতে বড়ই বেমানান, অশোভন, অসম্মানজনক, অবাস্তব ও অগ্রহণযোগ্য।

বিচারকের দুর্নীতির বিরুদ্ধে বিচারের আইনী হেঁয়ালী

বৃটিশ আইনে বিচারকের দুর্নীতির বিচারের জন্য যে আইনী ব্যবস্থা বিদ্যমান রয়েছে তা যেমনই হেঁয়ালীপূর্ণ তেমনই প্রতারণা সর্বস্ব। প্রয়োগক্ষেত্রে এসব আইন দারুণ অস্পষ্ট ও কণ্টকাকীর্ণ। যেমন ১৮৬০ সালের দণ্ডবিধি আইনের ২১৯ ধারায় বলা হয়েছে, 'বিচার বিভাগীয় কার্যক্রমের কোন পর্যায়ে যদি কোন সরকারি কর্মচারী দুর্নীতি বা দুরভিসন্ধিমূলকভাবে কোন রিপোর্ট আদেশ রায় বা সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন, তাহলে তিনি সর্বোচ্চ ৭ বছর পর্যন্ত মেয়াদের সশ্রম বা বিনাশ্রম কারাদণ্ড, অর্থদণ্ড বা উভয়দণ্ডে দণ্ডিত

www.pathagar.com

হবেন।' গত অর্ধ শতাব্দীর মধ্যে এ আইনে কোন বিচারকের সাজা হওয়া দূরের কথা; কোথাও কোন মামলা দায়ের হওয়ার কথাও শোনা যায়নি। কারণ ১৯৪৭ সালের দুর্নীতি নিরোধ আইনের কোথাও দণ্ডবিধির ২১৯ ধারাকে শাস্তিযোগ্য অপরাধ হিসেবে তালিকাভুক্ত করা হয়নি। বিচারপতি আবার দণ্ডবিধির ২১৯ ধারা আওতাভুক্ত নন। এখানে একটা শুভংকরী প্যাঁচ কষা আছে আর সে প্যাঁচ হলো বিচারপতির পদ হলো নির্বাচন কমিশনের মতো সাংবিধানিক পদ। তাই দণ্ডবিধির ২১৯ ধারা সংজ্ঞায় বিচারপতি সরকারি কর্মচারী না হয়ে, সাংবিধানিক পদাধিকারী হওয়ায় বিচারপতির বিরুদ্ধে অভিযোগের সুরাহা হবে সংবিধানসম্মত পন্থায়। সংবিধানের ৯৬(৩), (৫) খ এবং ৬ উপ অনুচ্ছেদ মতে 'জুডিশিয়াল কাউন্সিলের তদন্তে গুরুতর অসদাচরণে দোষী সাব্যস্ত বিচারক প্রেসিডেন্টের নির্দেশে অপসারিত হবেন।' এই সাংবিধানিক প্রতিশ্রুতিতেও একটা চতুন ভাষার মারপ্যাঁচ কষা আছে। কারণ সংবিধানের কোথাও 'গুরুতর অসদাচরণ'-এর কোন সংজ্ঞা বা ব্যাখ্যা নেই। তাই অভিযুক্ত বিচারক বা বিচারপতি তার বিরুদ্ধে আনিত অভিযোগটি লঘুতর অসদাচরণ বলে দাবি করলে বিস্ময়ের কিছু থাকবে না। আর সংবিধানের কোথাও লঘুতর অসদাচরণের কোন শাস্তি নেই। সবচেয়ে বড় কথা হল সংবিধানের কোন অনুচ্ছেদেই গুরুতর অথবা লঘুতর অসদাচরণের কোন মানদণ্ড নির্ণয় করা হয়নি। ভাষার এই অতিসূক্ষ্ম মারপ্যাঁচে কোন বিচারপতির বিরুদ্ধে নির্দিষ্ট দুর্নীতির অভিযোগ না এনে গুরুতর অসদাচরণের অভিযোগ আনার একটা ফস্কা সুযোগ রাখা হয়েছে যার কোন সংজ্ঞা বা ব্যাখ্যা নেই। অন্যদিকে *১৮৯৮ সালের ফৌজদারী কার্যবিধির ১৯৭ ধারায় বলা হয়েছে। বিচারক ও সরকারি কর্মচারীর বিরুদ্ধে মামলা। এই মামলা রুজু করিবার ব্যাপারে সরকারের ক্ষমতা:*

১. দণ্ডবিধির ১৯ ধারার অর্থ অনুসারে কোন জজ অথবা কোন ম্যাজিস্ট্রেট অথবা সরকার কর্তৃক বা সরকারের অনুমতি ব্যতীত অপসারণযোগ্য নহে এরূপ কোন সরকারি কর্মচারী যখন এরূপ কোন অপরাধে অভিযুক্ত হন যাহা তিনি তাহার সরকারি কর্তব্য বা পালনরত থাকাকালে বলিয়া কথিত সময়ে করিয়াছেন বলিয়া দাবি করা হইয়াছে, তখন সরকারের পূর্ব অনুমতি ব্যতীত কোন আদালত সেইরূপ অপরাধ আমলে লইবেন না।

২. উক্ত জজ, ম্যাজিস্ট্রেট বা সরকারি কর্মচারীর বিরুদ্ধে আনীত অপরাধ বা অপরাধসমূহের মামলা কাহার দ্বারা ও কিভাবে পরিচালিত হইবে সরকার তাহা স্থির করিতে পারিবেন এবং কোন আদালতে এই মামলা বিচার হইবে তাহাও নির্দিষ্ট করিয়া দিবেন। ফৌজদারী কার্যবিধির এই ১৯৭ ধারাটি অস্বচ্ছতায় পরিপূর্ণ। এতে সরকারের কোন বিভাগের, কার কাছ থেকে, কিভাবে অনুমতি নিতে হবে এবং সেই কথিত অনুমতি কতোদিনের মধ্যে পাওয়া যাবে তার কিছুই উল্লেখ নেই। বাস্তবতা হলো এই অনুমতি কোনদিনই পাওয়া যাবে না। সরকার ইচ্ছা করলেও পারবেনা। কারণ এক্ষেত্রে প্রধান বাধা হয়ে দাঁড়াবে দণ্ডবিধির ৫২ ও ৭৭ ধারা এবং জুডিশিয়াল অফিসার্স প্রটেকশন অ্যাক্ট

www.pathagar.com

যা পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে। বিচারকের দুর্নীতির বিচারের জন্য দণ্ডবিধির ২১৯ ধারা এবং ফৌজদারি কার্যবিধির ১৯৭ ধারাটি আমাদের আইন বইয়ের শোভাবর্ধনের জন্য বৃটিশরা রেখেছিল এজন্য যে যাতে লোকচক্ষুকে ধোঁকা দিয়ে জনমতকে শান্ত রাখা যায়। এখানেও ভাষার মারপ্যাঁচের নির্গলিতার্থ হচ্ছে বিচারকগণের স্বাধীনতার কোন সীমারেখা নেই।

বাংলাদেশ সংবিধানের ৯৬(৩), (৫) খ এবং ৬ উপ অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে- 'প্রধান বিচারপতি এবং পূর্ববর্তী দুইজন কর্মে প্রবীণ বিচারক নিয়ে গঠিত সুপ্রিম জুডিশিয়াল কাউন্সিল থাকবে এবং কাউন্সিলের তদন্তে গুরুতর অসদাচরণে দোষী সাব্যস্ত হলে প্রেসিডেন্টের নির্দেশে ওই বিচারক তার পদ থেকে অপসারিত হবেন।' এখানে লক্ষ্য করার বিষয় হলো গুরুতর লঘুতর কিংবা সদাচরণ অসদাচরণের সংজ্ঞা নির্ধারণের বিষয়ে দিনের পর দিন যুক্তিতর্ক চালানোর সুযোগ থাকলেও সংবিধানের কোন অনুচ্ছেদেই এমন গ্যারান্টি নেই যে, 'একজন বিচারক যদি বিচারাদালতে দুর্নীতির আশ্রয় নিয়ে বা সজ্ঞানে প্রচলিত আইনের শর্তভঙ্গ করেন তাহলে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি আইন আদালতে ওই বিচারকের বিরুদ্ধে কোন প্রতিকার পেতে পারবেন।' এখানে একটি ঘটনা উল্লেখ না করলেই নয়। সম্প্রতি হাইকোর্টের একজন বিচারপতির বিরুদ্ধে একটি মামলা ৫০ হাজার টাকা ঘুষ চাওয়ার অভিযোগ ওঠে। পত্রপত্রিকায় এ নিয়ে তোলপাড় শুরু হলে সুপ্রিম জুডিশিয়াল কাউন্সিল বিষয়টি নিয়ে তদন্ত শেষে রিপোর্টে বলেন, অভিযুক্ত বিচারপতির বিরুদ্ধে অভিযোগটি সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত না হলেও বর্তমান পরিস্থিতিতে তাকে ওই পদে রাখা যাবে না। তদন্ত রিপোর্টের প্রেক্ষিতে রাষ্ট্রপতি তাকে বিচারপতির পদ থেকে অপসারণ করেন। অপসারিত বিচারপতি পরে হাইকোর্টে রিট করে তার পূর্ব পদে বহাল হয়েছেন এবং হাইকোর্ট রাষ্ট্রপতির ওই আদেশটি নাকচ করে দিয়েছেন। এ ব্যাপারে ২০০৫ সালের ১৬ ফেব্রুয়ারি দৈনিক প্রথম আলো'র প্রতিবেদনে বলা হয়, 'সুপ্রিম জুডিশিয়াল কাউন্সিলের প্রতিবেদনের ভিত্তিতে হাইকোর্টের বিচারকের পদ থেকে সৈয়দ শাহিদুর রহমানকে অপসারণ করে দেয়া রাষ্ট্রপতির আদেশকে হাইকোর্ট অসাংবিধানিক ও বেআইনী ঘোষণা করে বাতিল করেছেন। হাইকোর্ট অভিযুক্ত বিচারকের তদন্তে দেয়া সুপ্রিম জুডিশিয়াল কাউন্সিলের প্রতিবেদনে সংবিধান লংঘিত হয়েছে বলেও মন্তব্য করেন।' রাষ্ট্রপতির আদেশ নাকচ করে দিয়ে বিচার বিভাগ তার নিরংকুশ স্বাধীনতার শ্রেষ্ঠত্বই পুনরায় প্রমাণ করে দিয়েছে। স্বাধীনতার পর এই প্রথমবারের মতো গঠিত সুপ্রিম জুডিশিয়াল কাউন্সিলের প্রথম রিপোর্টের উপর প্রাধান্য বজায় রেখে বিচার বিভাগ আবারো প্রমাণ করেছে তারা বিচারক্ষেত্রে সম্পূর্ণ স্বাধীন এবং এই স্বাধীনতা কোন আইনের শর্তযুক্ত নয়। সম্প্রতি হাইকোর্টের একটি রায়ে সংবিধানের পঞ্চম সংশোধনী বাতিল হওয়ায় আবারো প্রমাণিত হলো বিচার ক্ষেত্রে বিচারক ও আদালতের স্বাধীনতার কোন সীমারেখা নির্ধারিত নেই। বিষয়টি আপিল আদালতে বিচারাধীন থাকায় আমরা

www.pathagar.com

কোন মন্তব্য করলাম না। এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ করার দাবি রাখে যে, অন্যের আইনগত স্বাধীনতা যেন কেউ ক্ষুণ্ন না করতে পারে সে উদ্দেশ্যে সংবিধানের ৩৯(২) অনুচ্ছেদে যেখানে মতপ্রকাশ তথা সংবাদ ক্ষেত্রের স্বাধীনতাকে আদালত অবমাননাসহ আইনের ৭টি বাধানিষেধের বেড়াজালে দায়বদ্ধ করা হয়েছে সেখানে বিচারকের স্বাধীনতাকে আবারো স্বীকৃতি দিয়ে ৯৪(৪) অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে- 'এই সংবিধানের বিধানাবলী সাপেক্ষে প্রধান বিচারপতি এবং অন্যান্য বিচারক বিচারকার্য পালনের ক্ষেত্রে স্বাধীন থাকিবেন।' অর্থাৎ ব্রিটিশ আইন বলুন কিংবা বাংলাদেশ সংবিধানের সর্বোচ্চ আইন বলুন সর্বত্রই বিচারক ও বিচার বিভাগের স্বাধীনতার জয়জয়কার। রাষ্ট্রীয় অপর কোন বিভাগ বিচার বিভাগের মতো এমন প্রশ্নাতীত স্বাধীনতা ভোগ করেনা।

আদালত অবমাননা আইনের ঘাপলা

দীর্ঘ অনুসন্ধানে দেখা গেছে দেশে প্রচলিত কোন ব্রিটিশ আইনে একথা সুস্পষ্টভাবে বলা নেই যে, বিচারকের সুনির্দিষ্ট দুর্নীতি, আইন ভঙ্গের বিষয় বা বিতর্কিত কোন কর্মকাণ্ড কিংবা আদালতের রায়ের সমালোচনা করলে আদালত অবমাননার দায়ে তাকে দণ্ড পেতে হবে। বরং কথিত মতপ্রকাশের স্বাধীনতা দিয়ে '১৮৬০ সালের দণ্ডবিধি আইনের ৪৯৯ ধারার '১ম ব্যতিক্রম' উপধারায় বলা হয়েছে। জনসাধারণের কল্যাণের দিকে থেকে যে তথ্য প্রকাশ করা উচিত কোন ব্যক্তি সম্পর্কে অনুরূপ তথ্য প্রকাশ করা মানহানির অপরাধ হবে না। একই আইনের '২য় ব্যতিক্রম' উপধারায় কোন সরকারি কর্মচারী কর্তৃক সরকারী দায়িত্ব পালনকালে তার আচরণ বা চরিত্র সম্পর্কে সরল বিশ্বাসে কোন মতামত ব্যক্ত করা হলে তা মানহানির অপরাধ হবে না এবং '৬ষ্ঠ ব্যতিক্রম উপধারায় বলা হয়েছে, জনসাধারণের বিচারার্থে উপস্থাপিত কোন কার্য বা ঐ কার্যে কর্মকর্তার চরিত্র যতদূর প্রতিফলিত হয়েছে। সে সম্পর্কে সরল বিশ্বাসে কোন মতামত প্রকাশ করা হলে তা মানহানির অপরাধ হবেনা।' লক্ষ্য করার বিষয় হলো তথাকথিত মতপ্রকাশের স্বাধীনতা দিয়ে ধূর্ত ব্রিটিশরা এ আইনে বিচারক, আদালত এবং রায় শব্দগুলো সযত্নে পরিহার করেছে।

মানহানি তথা সুনামহানি যে কোন ব্যক্তি বিশেষ বা প্রতিষ্ঠানেরও হতে পারে। জনসমক্ষে কোন ব্যক্তি প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে ইচ্ছাকৃতভাবে দুর্নাম রটনা বা অসত্য তথ্য প্রকাশ বা প্রচার করা হলে তা মানহানিজনিত অপরাধ হিসেবে দণ্ডবিধির ৫০০ ও ৫০১ ধারায় গণ্য করে নির্ধারিত শাস্তির বিধান রাখা হয়েছে। তবে কথিত সেই দুর্নাম যাই বস্তুনিষ্ঠ হয় তবে তা মানহানির অপরাধ হিসেবে আইনত: গণ্য করা হয় না। দণ্ডবিধির ৪৯৯ ধারার ৬ষ্ঠ ব্যতিক্রম উপধারা মতে কোন বিচারকের সত্যিকার দুর্নীতির বা আইন লংঘনের বিষয়টি জনসমক্ষে সমালোচনা অথবা প্রকাশ করা হলেও তা মানহানির অপরাধ হিসেবে গণ্য করার কথা নয়। কিন্তু দেখা গেছে বিচারক এক্ষেত্রে মানহানির মামলার আশ্রয় না নিয়ে ১৯২৬ সালের আদালত অবমাননা আইনের আশ্রয়ে মামলা করেন এবং ঘাপলাটি

www.pathagar.com

এখানেই। শুরু হয়। কারণ ১৯২৬ সালের এই আইনে আদালত অবমাননা অপরাধের কোন সংজ্ঞা নেই। সংজ্ঞা না থাকায় বিচারক ১৯২৬ সালের আদালত অবমাননা আইনে খেয়াল খুশীমতো অভিযুক্ত করে যে কাউকে নির্ধারিত দণ্ড দিতে পারেন যা অবিচারের নামান্তর। ১৯২৬ সাল থেকে অব্যাহতভাবে চলে আসা এই অবিচারকে আইনসম্মত হিসেবে গণ্য করা হচ্ছে ঔপনিবেশিক ব্রিটিশদের রেখে যাওয়া ১৯০৮ সালের দেওয়ানি কার্যবিধির ১৫১ ধারার সূক্ষ্ম মারপ্যাঁচের কারণে। ১৫১ ধারায় বলা হয়েছে। 'এই ধারা আদালতকে বিপুল ক্ষমতা দিয়েছে। আইনের যেখানে সুনির্দিষ্ট প্রতিকারের কথা বলা নেই সেখানে বিচারক তাঁর স্বীয় বিবেচনামূলক সিদ্ধান্ত তথা আদালতের অন্তর্নিহিত ক্ষমতা Inherent power প্রয়োগ করবেন।'

আইনের এই সূক্ষ্ম মারপ্যাঁচের কারণে বিচার বিভাগের দুর্নীতির সুস্পষ্ট চিত্র আমরা কখোনাই পাইনা। অর্থাৎ কোন বিচারক যদি আইন ভঙ্গ করেন বা অন্য কোন পন্থায় দুর্নীতি করেন তা সত্ত্বেও তা প্রকাশ করা বা সমালোচনা করা যাবে না। কেউ প্রকাশ করলে ১৯২৬ সালের আদালত অবমাননা আইন দিয়ে তার টুটি চেপে ধরা হবে। অথচ এই আইনটিতে অপরাধের সুনির্দিষ্ট কোন সংজ্ঞা না থাকায় দণ্ডিতরা কেউ জানতে পারছেন না যে কি অপরাধে তিনি দণ্ডিত হলেন?

নিয়ন্ত্রণহীন ক্ষমতা সিস্টেমকে দায়িত্বহীন, দুর্নীতিপরায়ণ ও বেপরোয়া করে তোলতে পারে। সমালোচনার সুবাতাসে একজন মন্দ বিচারকও হতে পারেন সুবিচারক। সমালোচনার উর্ধ্বে রাখলে নির্লিপ্তভাবে অবিচার করার সুযোগ দেয়া হয়। নিভৃতে কেঁদে মরে সুবিচার। অথচ যে ব্রিটিশরা আমাদের বিচারকের সমালোচনা নিষিদ্ধ করার ছবক দিয়েছিল, তারা তাদের স্বদেশে বিচারকদের অহরহ সমালোচনা করছে। এজন্যই ব্রিটেন উন্নত আর বাংলাদেশের দারিদ্র্যতা শেষ হচ্ছেনা। ব্রিটিশরা মনে করে সমালোচনা করতে না দেয়ার অর্থ হলো ভুলকে প্রশ্রয় দেয়া। ভুলকে প্রশ্রয় দেয়ার অর্থ সুবিচারকে বাধাগ্রস্ত করা। আর যে দেশে সুবিচার নেই সে দেশে সমস্যারও সমাধান নেই।

'আদালত অবমাননা আইনের উৎপত্তি যে দেশে সেই ব্রিটেনের উচ্চাদালত সংবেদনশীলতা প্রদর্শনের সর্বোচ্চ সংযমের পরিচয় দিচ্ছেন। গত ৭০ বছরে ব্রিটেনে কাউকে আদালত অবমাননার দণ্ড পেতে হয়নি। বিংশ শতাব্দীর অনন্য শ্রেষ্ঠ বিচারক ইংল্যান্ডের লর্ড ডেনিং ট্রেড ইউনিয়নের বিরুদ্ধে একটি রায় দেয়ার পরদিন একটি ট্যাবলয়েড পত্রিকা ব্যানার হেড লাইনে লেখে ডেনিং একটা গাধা। ডেনিং অবজ্ঞাভরে তা হজম করেন। যে ধরনের ঔদার্য তিনি দেখিয়েছেন, আমাদের দেশের প্রেক্ষাপটে নিশ্চয় এতটা কেউ আশা করবেন না। এছাড়া ১৯৪১ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিচারপতি ব্লাক সুপ্রীমকোর্টে তাঁর মেজরিট জাজমেন্টে বলেন, কেবলই আদালতের ভাবমর্যাদা রক্ষার নামে মিডিয়া যদি কার্যকরভাবে নীরবতা পালন করে চলে তবে তা শুভ লক্ষণ নয়। এটা আদালতের প্রতি শ্রদ্ধাবৃদ্ধির পরিবর্তে অসন্তোষ, সংশয় এবং অবমাননারই জন্ম দেবে। মার্কিন আদালতগুলো এই সিদ্ধান্তে পৌছেছেন যে আদালত অবমাননার

www.pathagar.com

শাস্তি প্রয়োগ হবে শুধু ব্যতিক্রমী পরিস্থিতিতে যে অবমাননা সুস্পষ্ট এবং এই মুহূর্তেই বিপজ্জনক।'[১৮]

বিচারপতিরা কি জনসমালোচনার উর্ধ্বে : মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সুপ্রীম কোর্টের বিচারপতি ফ্রাংকফার্টার এ সম্পর্কে প্রদত্ত রায়ে বলেন, বিচারপতি বা প্রতিষ্ঠান হিসেবে আদালতের সমালোচনায় এমন কোন দায়মুক্তি (Immunitys) থাকা উচিত নয় যা অন্য কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের নেই। বিচারপতিদের ন্যায়বিচারের প্রতীক হিসেবে গণ্য করা হয়। এর অর্থ এই নয় যে তারা সাধারণ মানুষের মত ভ্রমপ্রবণ বা নৈতিক দুর্বলতাগ্রস্ত নন। বিচারপতিদের মধ্যে কঠোর নিয়মনিষ্ঠ ব্যক্তিও আছেন আবার ক্ষমতার দম্ভ দেখানোর মত ব্যক্তিও আছেন যিনি নিজ সম্মান রক্ষা করতে ক্ষমতা ব্যবহার করেন। বিচারপতিদের উচিত এই মানবিক সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে মনযোগী হওয়া তাদের সর্বশেষ দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন হতে হবে। সমালোচনা যত কঠিনই হোক না কেন তার মুখোমুখি হতে হবে।[১৯] বাংলাদেশের বিচারপতিরা কি উপরোক্ত মত গ্রহণ করতে পারবেন? করলেও এটা কি তাঁরা কথায় ও কাজে দেখাতে পারবেন? (দৈনিক প্রথম আলো-৭ মে ২০০৪)।

ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতায় বিচার বিভাগের স্বাধীনতা

আমাদের বিচারকগণ বিচারক্ষেত্রে সীমাহীন স্বাধীনতা ভোগ করে থাকেন। এই স্বাধীনতা সম্পূর্ণ শর্তহীন-দায়বদ্ধহীন-জবাবদিহীতাহীন। এর বিপরীতে অপরাধ ক্ষেত্রে ততোধিক স্বাধীনতা ভোগ করে থাকে সমাজের প্রভাবশালী সমাজপ্রভু ও শক্তিধর অপরাধীগণ। তারা আইন আদালতকে পরোয়া করেনা এবং প্রচলিত আইনের ফাঁকফোকর বা আইন প্রয়োগের দুর্বলতার কারণে সাধারণত শাস্তির উর্ধেই বিবেচিত হয়ে থাকেন। বিশেষ করে পুলিশ ও আমলাতন্ত্রের অসাধু কর্মকর্তারা সরকারী ক্ষমতার অপব্যবহার করে আইনের প্রতি অশ্রদ্ধা পোষণ এবং আদালতের প্রতি তোয়াক্কাহীন থাকেন। ম্যাজিস্ট্রেট কোর্ট, জজ কোর্ট ও হাইকোর্টে অতীতে ঘটে যাওয়া এমন অবিশ্বাস তিনটি সত্যিকার ঘটনা ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে নিম্নে পত্রস্থ করা হলো-

আমার বাবা আবদুল লতিফ তালুকদার ব্রিটিশ আমলে ভূমি মন্ত্রণালয়াধীন সেটেলমেন্ট কানুনগো পদে চাকরি করতেন। পাকিস্তান আমলে সি,ও, রেভিনিও পদে চাকরি করাকালীন উর্ধ্বতন অফিসারের আক্রোশের শিকার হয়ে ১৯৬৩ সালে চাকরি থেকে বরখাস্ত হন। এই বরখাস্ত আদেশের বিরুদ্ধে ঢাকা সাবজজ কোর্টে মামলা করে দোতরফা শুনানীতে তিনি জয়ী হন। বরখাস্ত আদেশটি অবৈধ এবং বাবার সরকারি চাকরির ধারাবাহিকতা অক্ষুণ্ন আছে বলে এ মামলায় সরকারের বিরুদ্ধে রায় ও ডিক্রি ঘোষণা করা হয়।[২০]

প্রচলিত ১৯০৮ সালের তামাদি আইনমতে পরবর্তী ৩০ দিনের মধ্যে আপিলের সুযোগ থাকায় আড়াই মাস পর বাবা ১৮-১২-১৯৬৭ ইং তারিখে এক দরখাস্তে তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তান ভূমি জরীপ অধিদপ্তরের পরিচালক তফাজ্জল হোসেন ওরফে টি. হোসেনের

www.pathagar.com

কাছে চাকরিতে যোগদানের আবেদন করেন। কিন্তু টি হোসেন ২৪-১-১৯৬৮ ইং এক পত্রে বাবাকে জানান সাবজজ কোর্টের ৩০/৬৫ নং স্বত্ব মামলার বিরুদ্ধে তিনি আপিল করবেন। প্রতিউত্তরে এক দরখাস্তে বাবা তাকে জানান প্রচলিত তামাদি আইন মতে ইতিমধ্যে ৩০ দিনের মধ্যে আপিল মেয়াদ অতিক্রান্ত হওয়ায় কোন আদালতে সরকার পক্ষে আপিল করার কোন সুযোগ নেই, অতএব তাকে যেন চাকরিতে যোগদান করার সুযোগ দেয়া হয়। কিন্তু উক্ত টি. হোসেন আমলাতান্ত্রিক আক্রোশ বজায় রেখে পরবর্তী প্রায় ৯ মাস পর্যন্ত বাবাকে হয়রানিতে ব্যতিব্যস্ত রেখে অবশেষে ঢাকা জেলা জজ আদালতে জালিয়াতির মাধ্যমে সাবজজ কোর্টের রায়ের বিরুদ্ধে প্রথম আপিল দায়ের করেন। আপিলটি দায়ের করতে গিয়ে টি. হোসেন জনৈক আদালত কর্মকর্তার যোগসাজসে ৩০/৬৫ নং স্বত্ব মামলার রায়ের প্রকৃত তারিখ ২১-৯-১৯৬৭ ইং রাবার দিয়ে মুছে তদস্থলে ২৪-৫-১৯৬৮ ইং তারিখ বসিয়ে দেন। আপিলের শুনানীপর্বে বাবা এই জালিয়াতি ও তামাদি আইন ভঙ্গের বিষয়টি লিখিতভাবে আদালতে তুলে ধরে বেআইনী আপিলটি বাতিলের প্রার্থনা করেন। কিন্তু মাননীয় জজ এখতিয়ার বহির্ভূতভাবে আপিলটি মঞ্জুর করেন এবং রায় প্রদান কালে ২১-৯-১৯৬৭ ইং তারিখে ৩০/৬৫ নং স্বত্ব মামলার রায় হয়েছে স্বীকার করেন। স্ববিরোধী উক্তিতে ভরপুর এই রায়ে তিনি আবার মন্তব্য করেন- সরকার পক্ষে দাখিলকৃত সত্যায়িত ডকুমেন্টস দ্বারা প্রতীয়মান হচ্ছে তামাদি আইনের মেয়াদ রক্ষা করেই আপিলটি দায়ের হয়েছে। এই আপিল রায়ে অবশ্য সাবজজ আদালতের ৩০/৬৫ নং স্বত্ব মামলার রায়টিই বহাল রাখা হয়।[২১] এই আপিল রায়টি আমার বাবার পক্ষে হলেও জজ মহোদয় তামাদি আইন ভঙ্গ করে ৯ মাস পর দায়েরকৃত বেআইনি আপিলটি মঞ্জুর করে সজ্ঞানে জাল জালিয়াতিকে আদালতের মতো পবিত্র অঙ্গনে প্রশ্রয় শুধু দেননি; তিনি বাবাকে ভবিষ্যতের এক নিদারুণ ভোগান্তির দিকে ঠেলে দেন যা শেষ পর্যন্ত বাবার অকাল মৃত্যুর মধ্য দিয়ে পরিণতি লাভ করে।

এ রায়ের পর টি. হোসেন এক পত্রে বাবাকে জানান আদালত থেকে এই আপিল রায়ের ডিক্রি জারি করা ছাড়া তিনি কিছুতেই চাকরিতে যোগদান করতে পারবেন না। নিরুপায় বাবা অগত্যা টি. হোসেনের সরকারী জিপ ঢাকা ঘ-৪৩৩৩ নং গাড়িটি ক্রোক করার জন্য আদালতের দ্বারস্থ হন। খবর পেয়ে টি. হোসেন ঢাকা হাইকোর্টে ডিক্রি জারির বিরুদ্ধে তড়িঘড়ি এক স্থগিতাদেশ প্রার্থনা করলে উভয়পক্ষের শুনানী শেষে আদালত এ মর্মে আদেশ দেন যে, দু'সপ্তাহের মধ্যে সরকার পক্ষ সম্পূর্ণ ডিক্রির টাকা পরিশোধ করলেই কেবলমাত্র স্থগিতাদেশ কার্যকর থাকবে।[২২] টি. হোসেন অতঃপর নিজের জাল জালিয়াতি সৃষ্ট ঢাকা জজ কোর্টের ১৯৯/৬৮ নং প্রথম আপিল রায়ের বিরুদ্ধে ঢাকা হাইকোর্টে ৬৯৬/৬৯ নং দ্বিতীয় আপিল দায়ের করেন।

সরকারী অর্থের ঢালাও অপচয় ও নিজের পদ ক্ষমতার অপব্যবহার করে টি. হোসেনের পক্ষে এসব জালিয়াতি ও আইন বহির্ভূত মামলা পরিচালনা করা সম্ভব হলেও আমার

www.pathagar.com

দরিদ্র বাবার পক্ষে মামলার ব্যয়ভার বহন করা দুঃসাধ্য হয়ে পড়েছিল। অর্থাভাবে এ সময় আমরা প্রায়ই অভুক্ত থাকতাম, ভাইবোনদের পড়ালেখা বন্ধ হয়ে যায় এবং ছোট ভাইটি বিনা চিকিৎসায় মারা যায়।

টি. হোসেনের হয়রানিতে অতিষ্ঠ হয়ে বাবা ইতিপূর্বে এই জালিয়াতির বিচার চেয়ে ১৭-৫-১৯৬৮ ইং ঢাকার জেলা জজের কাছে দরখাস্ত দিলে তিনি ঘটনা তদন্তে ঢাকা'র তদানিন্তন অতিরিক্ত জেলা জজ আব্দুল হান্নান চৌধুরীকে নিয়োগ দেন। (অবসর জীবনে শেষ বয়সে সাবেক জজ আব্দুল হান্নান চৌধুরী সিলেটের ডাক পত্রিকার সম্পাদক মণ্ডলীর সভাপতি ছিলেন।) সে আমলের অত্যন্ত সৎ ও সাহসী বলে পরিচিত জজ আব্দুল হান্নান চৌধুরীর তদন্তে টি. হোসেন গং এর কারাদণ্ড অনিবার্য হয়ে পড়লে অজ্ঞাত কালো হাতের স্পর্শে তড়িঘড়ি এই তদন্তভার ঢাকা'র চতুর্থ অতিরিক্ত জেলা জজের কাছে হস্তান্তর করা হয়। ষড়যন্ত্র বুঝতে পেরে বাবা ১১-৭-১৯৬৯ ইং তারিখের দরখাস্তে এ বিষয়ে প্রধান বিচারপতির হস্তক্ষেপ প্রার্থনা করেন। এ প্রেক্ষিতে ঢাকা হাইকোর্টের তদানিন্তন রেজিস্ট্রার সাহাবুদ্দিন আহমদ (পরবর্তীকালে তিনি বাংলাদেশের প্রধান বিচারপতি ও ১৯৯১ সালে তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রধান ছিলেন)। ৩-৪-১৯৭০ ইং তারিখে প্রেরিত এক দাপ্তরিক চিঠিতে আমার বাবাকে তাঁর অফিসে জরুরীভাবে ডেকে নিয়ে টি. হোসেনের সাথে আপস মীমাংসার প্রস্তাব দেন। কিন্তু টি. হোসেনের মত একজন জালিয়াতের সাথে আপসের প্রস্তাব বাবা ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করেন। পরবর্তী ১৭ এপ্রিল ১৯৭০ ইং তারিখের এক পত্রে হাইকোর্টের রেজিস্ট্রার সাহাবুদ্দিন আহমদ বাবাকে জানান, 'প্রধান বিচারপতির কাছে আপনার প্রেরিত ১১-৭-১৯৬৯ ইং তারিখের অভিযোগটি বিচার বিভাগীয় তদন্তে প্রমাণিত হওয়ায় প্রধান বিচারপতির নির্দেশে ৩০/৬৫ নং স্বত্ব মামলার রায় জাল করার দায়ে দোষী সাব্যস্ত ঢাকা জজকোর্টের হেড কমপেয়ারিং ক্লার্ক ফজলুল হক খানকে চাকরি থেকে বাধ্যতামূলক অবসর দেয়া হয়েছে।[২৩] এখানে লক্ষ করার বিষয় হলো জালিয়াতির দায়ে জজকোর্টের প্রধান কেরানী চাকরিচ্যুত হলেও একই অপরাধের শক্তিমান অপরাধী টি. হোসেনকে এই বৈষম্যমূলক আইন স্পর্শ করেনি।

অন্যদিকে এ জাল রায়টি দিয়ে ঢাকা হাইকোর্ট টি. হোসেন গং পরিচালিত ৬৯৬/৬৯ নং দ্বিতীয় আপিলের শুনানীপর্বে আমার বাবা ৫-১-১৯৭০ ইং তারিখে সাত পৃষ্ঠাব্যাপী এক সুদীর্ঘ দরখাস্তে টি. হোসেন গংদের জাল জালিয়াতি দ্বারা জজকোর্ট ও হাইকোর্টকে প্রতারণার পুংখানুপুংখ বিবরণ তুলে ধরে এর বিচার প্রার্থনা করেন। এর বিচার না হলে তার জীবনের অপূরণীয় ক্ষতি হবে, আইন আদালতের প্রতি মানুষের আস্থা নষ্ট হবে এবং তামাদি আইন মতে চলতি আপিলটি যে বেআইনী সে বিষয়টিও তিনি হাইকোর্টে তুলে ধরেছিলেন। কিন্তু মহামান্য হাইকোর্টের দুই মান্যবর বিচারপতির হাতে-কলমে জালিয়াতির বিষয়টি অবগত হওয়া সত্ত্বেও রায়ে লিখিত মন্তব্য করেন এই বলে যে, 'বিবাদী এক দরখাস্তে আদালতের রায় জালিয়াতিতে জড়িত কয়েকজন অফিসারের

www.pathagar.com

বিরুদ্ধে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণের আবেদন করেছেন। কিন্তু আপিল আদালতের মধ্যে তামাদি আইনের সময়সীমা রক্ষা করেই প্রথম আপিলটি দায়ের করা হয়েছিল। দ্বিতীয় আপিলের এই পর্যায়ে আমরা এই প্রশ্নে আগ্রহী নই।[২৪] এভাবে হাইকোর্টেও জাল রায়টি আইনগত বৈধতা পেয়ে যায় আর আইনের নিশ্চিত শাস্তি থেকে রক্ষা পায় টি. হোসেন গং। সুস্পষ্টভাবে তামাদি আইন ভঙ্গ করে জালিয়াতির মাধ্যমে পরিচালিত প্রথম ও দ্বিতীয় আপিল রায়ে ৩০/৬৫ নং স্বত্ব মামলার রায়টি বহাল রাখা হলেও আমার বাবার কোনই লাভ হয়নি। হাইকোর্টের রায় সপক্ষে থাকা সত্ত্বেও বাবা কখনোই তার চাকরি ফিরে পাননি। কারণ একটা মিথ্যা জালিয়াতি যেখানে উচ্চআদালতে আইনগত বৈধতা পায় সেখানে ন্যায়নীতি কখনো স্থান পায়না।

এরপর প্রতিশোধের নেশায় উন্মত্ত টি, হোসেন ১৯৬৯ সালে পূর্ব পাকিস্তান সামরিক আইনের[২৫] ১০ (২) ধারার ক্ষমতাবলে আমার বাবাকে সেই ১৯৬৩ সালের অভিযোগে আবারো সাসপেন্ড করেন এবং বাংলাদেশের স্বাধীনতার পর শেখ মুজিব সরকারের গণতন্ত্রের মানসপুত্র হিসেবে পরিচিত ও বিশ্বভারতী প্রদত্ত 'দেশীকোত্তম' ডিগ্রীধারী প্রেসিডেন্ট বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরীর জারিকৃত কুখ্যাত কালো আইন পি.ও-৬৭ এর ক্ষমতাবলে ২৫-৯-১৯৭৪ ইং তারিখে সেই একই পুরানো অভিযোগে বাবাকে আবারো বরখাস্ত করা হয়। দ্বিতীয় বরখাস্ত আদেশ হাতে পাওয়ার সাথে সাথে বাবা হার্টফেল করে মারা যান। সংসারের একমাত্র উপার্জনক্ষম বাবার অকাল মৃত্যুর পর দারিদ্রের কাছে পরাভূত হয়ে আমাদের পরিবারটিও ধ্বংস হয়ে যায় আর বাবার চাচাতো ভাইয়েরা লুটে নিয়ে যায় আমাদের সহায় সম্পত্তি। আমার বাবা বিশ্বাস করেছিলেন রাষ্ট্রীয় আইনের শাসনকে। জীবদ্দশায় তাই বার বার ছুটে গিয়ে আশ্রয় চেয়েছিলেন আইনের শাসনের দুয়ারে। কিন্তু এই আইনের শাসন তাঁকে শুধু নিরাশ্রয় করে বিশ্বাসঘাতকতাই করেনি উপরন্তু তাঁর প্রাণটিও কেড়ে নিয়েছে। নজীরবিহীন বিস্ময় ও নিষ্ঠুরতায় ভরপুর এ ঘটনায় আমার বাবাকে একই চাকরি থেকে একই অভিযোগে দু'বার সাসপেন্ড ও দু'বার বরখাস্ত করা হয়েছে। যা প্রশাসনিক ইতিহাসের এক বিরল ঘটনা! জাল রায় তৈরিকারীর শাস্তি হলেও সেই জাল রায়টির কার্যকারিতা আজো বহাল আছে যা বিচার বিভাগীয় ইতিহাসের আর এক বিরল ঘটনা! আমার বাবার সপক্ষে থাকা সাবজজ কোর্ট, জজকোর্ট ও হাইকোর্টের রায় তিনটি অপ্রয়োজনীয় কাগজের টুকরা হিসেবেই সেদিন ব্যঙ্গ করেছিল আমার মৃত বাবার কফিনকে আর ৩৭ বছর ধরে উপহাস করছে আমাদের নিংড়ানো অস্তিত্বকে।

সাংবাদিকতার পেশায় আসার পর বহু অনুসন্ধানের পর ১৯৯১ সালে টি. হোসেনকে তার নিজস্ব রাজধানীর ধানমন্ডিস্থ ২৬ নং সড়কের ৩১নং আলিশান বাড়ী মিতালীতে খুঁজে পাই। আমি তার কাছে জানতে চাই জালিয়াতির মাধ্যমে জজকোর্ট ও হাইকোর্টকে প্রতারণা করে একটি অসহায় পরিবারকে ধ্বংস করে দিয়ে তার কোন লাভ হয়েছে কিনা?

www.pathagar.com

তিনি এর কোন সদুত্তর দেননি। ঘটনাটির বিচার চেয়ে প্রেসিডেন্ট, প্রধানমন্ত্রী, সাবেক দুর্নীতি দমন ব্যুরোসহ সম্ভাব্য সুবিচার পেতে পারি সরকারের হেন বিভাগ নেই যেখানে আবেদন না করেছি। ঘটনাটি পত্র-পত্রিকায় তুলে ধরা ছাড়াও জাতীয় সংসদের অধিবেশনেও আলোচিত হয়েছে। কিন্তু এই রাষ্ট্র ব্যবস্থার ঔপনিবেশিক যুগের বৈষম্যমূলক আইন ব্যবস্থা শক্তিমান প্রভাবশালী অপরাধীর বিচার করতে অক্ষম বলে এযাবৎ বার বার প্রমাণ করে আসছে।

এ ঘটনায় যে ফৌজদারী ও দেওয়ানি আইন ভঙ্গ করা হয়েছে

প্রচলিত দণ্ডবিধি আইনের ৪৬৬ ধারায় বলা হয়েছে কেউ আদালতের কোন নথি বা সরকারি কোন রেজিষ্ট্রার বা সরকারি কাগজপত্র জাল করলে সে ৭ বছর পর্যন্ত কারাদণ্ড ও অর্থ দণ্ডে দণ্ডিত হবে। ৪৬৮ ধারামতে প্রতারণার উদ্দেশ্যে জাল দলিল ব্যবহার করলে ৭ বছরের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হবে। ৪৭০ ধারামতে কোন দলিলের সম্পূর্ণ অংশ বা অংশবিশেষ জালিয়াতির দ্বারা প্রণীত হলে সম্পূর্ণ দলিলটি জাল বলে অভিহিত হবে। ৪৭১ ধারামতে কোন ব্যক্তি প্রতারণার উদ্দেশ্যে জাল দলিল ব্যবহার করলে সে যেন নিজেই দলিলটি জাল করেছে এমনভাবে দণ্ডিত হবে। ৩৫ ধারামতে সংঘটিত অপরাধমূলক কাজের প্রকৃত সম্পাদনকারীর সাহায্যকারী ব্যক্তি উক্ত কাজের জন্য এমনভাবে দায়ী হবে যেন সে নিজেই উক্ত কাজটি করেছে এবং দণ্ডবিধির ১০৯ ধারায় বলা হয়েছে, সহায়তা বা প্ররোচনার ফলে কোন কাজ অনুষ্ঠিত হয়ে থাকলে এবং উক্ত সহায়তা দানের জন্য শাস্তির স্পষ্ট বিধান না থাকলে সহায়তাকারী যে অপরাধে সহায়তা করেছে সেই অপরাধের জন্য নির্ধারিত দণ্ড ভোগ করবে।[২৬]

আইন বিশেষজ্ঞ মরহুম গাজী শামছুর রহমান তামাদি আইন সম্পর্কে লিখেছেন, ১৯০৮ সালের তামাদি আইন মতে ডিক্রী বা রায়ের তারিখের পরবর্তী ৩০ দিনের মধ্যে জেলাজজের আদালতে আপিল করতে হবে। তামাদি আইন স্বত্বের দ্বন্দ্বকে শান্ত করে, রোধ করে প্রতারণা। এমনকি সরকারও তামাদি আইনের বিধান থেকে অব্যাহতি লাভের অধিকারী নয়। বিচারকের ব্যক্তিগত ইচ্ছা দ্বারা তামাদি আইনের বিধানকে শিথিল বা কঠোর করা যায় না। আইন সুস্পষ্টভাবে যে ব্যাখ্যা দেয় তাই গ্রহণ করতে হয়। এতে কারো কষ্ট হবে বা কেউ যাতনা পাবে এমন চিন্তা বিচারকের মনের কোণেও স্থান দিবেন না। আইনে যে ভাষা ব্যবহৃত হয়েছে তার মধ্যে তিনি নতুন কিছু সংযোজন করতে পারেন না। অনুরূপভাবে যে দাবি তামাদি হয়ে গেছে আদালত তাকে পুনর্জীবন দিতে পারেন না। তামাদির পর আপত্তি উপস্থাপন না হলেও মেয়াদ অতিক্রান্ত হলে আদালত মামলা খারিজ করার বিশেষ অধিকার লাভ করে। কোন প্রচলিত প্রথা বা রীতি তামাদি আইনের স্পষ্ট নির্ধারণী বিধানসমূহ কোন অবস্থাতেই লংঘন করতে পারেনা। তামাদির জন্য আপত্তি উপস্থাপিত হোক বা না হোক মূল আদালত অথবা আপিল আদালত এই আইন প্রয়োগে করতে বাধ্য। তামাদির বিধি দূরপনেয়। তামাদির মেয়াদের পর উপস্থাপিত যে কোন মামলা বা অন্যবিধ শুনানী অবশ্যই খারিজ হবে।[২৭]

www.pathagar.com

দ্বিতীয় ঘটনা

চাঁদপুর জেলাধীন চাঁদপুর থানার সাবেক ওসি নজরুল ইসলাম জনৈক আব্দুল মান্নান বেপারীকে বাদী সাজিয়ে জননিরাপত্তা আইনে (বর্তমান আইনটি বাতিল) এ মর্মে চাঁদপুর থানায় নং ১৯/১৭-২-২০০০ ইং মামলা দায়ের করান যে স্থানীয় মোফাজ্জলসহ ১০ ব্যক্তি গত ১৫ ফেব্রুয়ারী তার দোকান ভাংচুর করেছে যা কারাদণ্ডযোগ্য অপরাধ। গ্রেফতার ও রিমান্ডে থাকাবস্থায় পুলিশের চাপের মুখে আসামীরা দোষের স্বীকারোক্তি দিলে সংশ্লিষ্ট ম্যাজিস্ট্রেট তা লিপিবদ্ধ করেন। ট্রাইব্যুনালে মামলাটির শুনানীকালে জেরায় বাদী মান্নান বেপারী স্বীকার করেন ওসি সাহেব একটি কাগজে তার দস্তখত নিয়েছিলেন। ওই কাগজে কি লেখা ছিল তা তাকে পড়ে শোনানো হয়নি। এ মামলার আসামীদের তিনি চেনেননা এবং তিনি কারো বিরুদ্ধে কোন মামলা করেননি। জেরায় আসামীরা পুলিশের ভয়ভীতির মুখে স্বীকারোক্তি দেয়ার কথা বলেন এবং সংশ্লিষ্ট ম্যাজিস্ট্রেট স্বীকার করেন যে আসামীদের এই স্বীকারোক্তি লিপিবদ্ধ করাকালে তিনি ফৌজদারী কার্যবিধি আইনের ১৬৪ ধারার ৩ উপধারা অনুসরণ করেননি। (উল্লেখ্য ১৬৪(৩) ধারায় বলা হয়েছে- 'আসামীর স্বীকারোক্তি লিপিবদ্ধ করার সময় ম্যাজিস্ট্রেট আসামীকে বুঝিয়ে বলবেন যে আপনি এই স্বীকারোক্তি করতে বাধ্য নন, তাঁহলে তা আপনার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য হিসেবে ব্যবহৃত হতে পারে। তাছাড়া আসামীর স্বেচ্ছাপ্রণোদিত স্বীকারোক্তি যুক্তিসঙ্গতভাবে লিপিবদ্ধ করবেন না') অতঃপর ট্রাইব্যুনাল জজ মামলার রায়ে আসামীদের বেকসুর খালাস দেন।[২৮]

বিনা অপরাধে দীর্ঘ কারানির্যাতন ভোগ ও লাখ লাখ টাকা খুইয়ে নিরীহ আসামীগণ মুক্তি পেলেও জননিরাপত্তা আইনের ১১নং ধারা শক্তিমান আইন ভঙ্গকারী ওসি'কে স্পর্শও করেনি। উল্লেখ্য এই আইনের ১১ নং ধারায় বলা হয়েছে- 'কেউ যদি কারো বিরুদ্ধে এ আইনে মিথ্যা মামলা দায়ের করেন বা করান তাহলে তিনি সর্বোচ্চ ৭ বছর কারাদণ্ডসহ অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হবেন।'

তৃতীয় ঘটনা

আমার চাঁদপুরের বাসার তত্ত্বাবধায়ক বাবুলের বিরুদ্ধে বাদি শওকত চাঁদপুর থানায় বিগত ২০-২-২০০০ তারিখের ৬৮০ নং জিডিতে অভিযোগ করে যে বাবুল হুমকি দেয়ায় সে পরিবার পরিজন নিয়ে আতংকে আছে। খবর পেয়ে তাদের এই বিরোধ মীমাংসার জন্য আমি ঢাকা থেকে চাঁদপুর যাই। থানার ওসি নজরুল সাহেব জানান জিডি'র ঘটনাটি তদন্ত করা ছাড়া মীমাংসা করা যাবে না। বিনীতভাবে নিজেকে সাংবাদিক পরিচয় দিলে তিনি কাউকে পরোয়া করেননা বলে জানান। জিডি'র তদন্ত কর্মকর্তা এ এস আই খলিলুর রহমান জানান তাকে ৫ হাজার টাকা না দিলে তিনি এ মামলায় আমাকেও জড়িয়ে দিবেন। মিথ্যা মামলা কিভাবে তৈরী হয় তা দেখার কৌতূহলে এবং ভবিষ্যতে লেখার খোরাকের জন্য বলি আপনারা যা ইচ্ছা খুশী করতে পারেন। এরপর এএসআই খলিল

www.pathagar.com

একটি কাল্পনিক গল্প তৈরি করে ওই বাবুলের সাথে আমাকেও জড়িয়ে চাঁদপুর ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে একটি প্রসিকিউশন রিপোর্ট দাখিল করেন। অশুদ্ধ ভাষায় সাজানো এই মিথ্যা রিপোর্টে তিনি এমনও মন্তব্য করেন যে 'আমার আক্রমণে বাদি শওকত অনুতপ্ত হইয়া যায়।' অর্থাৎ দারোগা সাহেব অনুতপ্ত শব্দের অর্থও জানেন না! আরো বিস্ময়কর হলেও সত্য এই যে গত ২০-২-২০০০ ইং তারিখে সন্ধ্যা ৬.৩০ মিনিটের সময় চাঁদপুর থানায় দায়েরকৃত উক্ত ৬৮০ নং জিডিতে আমার নাম বা কোন আক্রমণের ঘটনা উল্লেখ নেই। অথচ এই জিডি দায়েরের ৬ ঘণ্টা পূর্বে ঐদিন বেলা ১১.৪০ মিনিটের সময় এই আক্রমণ হয়েছে বলে তিনি প্রসিকিউশন রিপোর্টে দাবি করেন, যার স্থানীয় কোন সাক্ষীর নামও উল্লেখ নেই। অসংগতিপূর্ণ বক্তব্যে ভরপুর এই মিথ্যা রিপোর্টের ফলে চাঁদপুর জেলা ম্যাজিস্ট্রেট কোর্টে আমার বিরুদ্ধে ফৌজদারী কার্যবিধি আইনের ১০৭/১১৭ (সি) ধারায় নন-জি,আর ৫৬/২০০০ নং মামলা শুরু হয়। আদালতে গত ২৪ জুলাই ও ৭ নভেম্বর ২০০০ পৃথক দরখাস্তে প্রসিকিউশন রিপোর্টের ত্রুটি-বিচ্যুতি তুলে ধরে এই মিথ্যা মামলা থেকে অব্যাহতি প্রার্থনা করি। কিন্তু মামলার সমাপ্তিকাল পর্যন্ত কখনো এই দরখাস্ত দুটি শুনানী হয়নি। যখনই শুনানীর প্রস্তুতি নেয়া হয় তখনই মামলার পরবর্তী তারিখ ধার্য হয়। পরবর্তী প্রায় তিন বছর এ মামলায় আমাকে নিয়ে টানা-হ্যাঁচড়া চলে। এই সময়ের মধ্যে মামলায় সাক্ষ্য দিতে তদন্ত কর্মকর্তা খলিলের বিরুদ্ধে একাধিকবার সমন, নোটিশ ও গ্রেপ্তারী পরোয়ানা জারি হলেও তিনি তা অবজ্ঞা করে কখনোই আদালতে হাজির হননি। মামলার প্রতি ধার্য তারিখে ঢাকা থেকে চাঁদপুর যেয়ে মামলার হাজিরা, আইনজীবীর পারিশ্রমিক, যাতায়াত ভাড়া ইত্যাদিতে আমার প্রায় ৩০ হাজার টাকা খরচ হয়ে যায়। সামাজিকভাবে হেয় হওয়া ছাড়াও শারিরীক ও মানসিক ক্ষতির পরিমাণ অপূরণীয়। অবশেষে গত ২৯-৭-২০০৩ তারিখে এ মামলার রায় হয়। রায়ে মাননীয় ম্যাজিস্ট্রেট ঘোষণা করেন রাষ্ট্রপক্ষ সহেন্দাহীতভাবে এ মামলা প্রমাণে সক্ষম হওয়ায় আমাকে ও বাবুলকে এক বছরের শান্তি রক্ষার মুচলেকা দিতে হবে অন্যথায় আমাদের ১ মাসের বিনাশ্রম কারাদণ্ড ভোগ করতে হবে।[২৯]

তদন্ত কর্মকর্তার সাক্ষ্য ছাড়াই এ মামলা রায় দেয়া ছাড়াও চরম বিস্ময়ের বিষয় হলো আমার অনুপস্থিতিতে আইনজীবী ২০০৩ সালের ২৯ জুলাই আদালতে সময়ের প্রার্থনা করলে ম্যাজিস্ট্রেট মহোদয় সময় মঞ্জুর করেন। কিন্তু কতোদিনের জন্য সময় মঞ্জুর করলেন এবং পরবর্তী শুনানীর কোন তারিখ ধার্য না করেই তিনি তাৎক্ষণিকভাবে একই অর্ডারশীটে রায় দিয়ে দিলেন! পুনরায় অভিযোগ ও সময় ক্ষেপণের হয়রানীর ভয়ে আমি এই স্ববিরোধী রায়ের বিরুদ্ধে আর আপিল করতে সাহস পাইনি।

উল্লেখিত তিনটি ঘটনার প্রামাণ্য দলিলাদি আমার কাছে সংরক্ষিত আছে এবং এতে দেখা গেছে শক্তিমান অপরাধীরা আইন আদালতকে পরোয়া করেনা। আইনকে ব্যবহার করেন তারা নির্যাতনের হাতিয়ার হিসেবে। তারা আইন ভঙ্গ করেও আইনের শাস্তি এড়িয়ে

www.pathagar.com

যেতে সক্ষম। প্রথম ঘটনায় মাননীয় জজ প্রচলিত তামাদি আইন সুনির্দিষ্টভাবে ভঙ্গ করে কিভাবে বেআইনী আপিলটি মঞ্জুর করলেন এবং মান্যবর দুই বিচারপতি কিভাবে জ্ঞাতসারে জাল রায়টিকে আইনগত বৈধতা দিলেন, দ্বিতীয় ঘটনায় থানার ওসি এবং মাননীয় ম্যাজিস্ট্রেটের আইন ভঙ্গের বিষয়টি কিভাবে জজ মহোদয় বিনা জবাবদিহিতে মেনে নিলেন এবং তৃতীয় ঘটনায় সময়ের প্রার্থনা মঞ্জুর করে ও তদন্ত কর্মকর্তার সাক্ষ্য ছাড়াই সম্মানিত ম্যাজিস্ট্রেট কিভাবে রায় দিয়ে দিলেন এবং অধস্তন আদালতগুলোর এসব অনিয়মে মহামান্য সুপ্রীম কোর্টের কোন তদারকি ও খবরদারি ছাড়াই যুগের পর যুগ ধরে চলে আসছে আমাদের বিচারব্যবস্থা!? দীর্ঘদিনের প্রস্তুতি ও পর্যাপ্ত ডকুমেন্টস হাতে থাকায় আমার পক্ষে বিষয়গুলো লেখা সম্ভবপর হলেও বিচার বঞ্চিত মজলুম যারা লিখতে পারেনা তাদেরকে পাওয়া যাবে আইনজীবীর চেম্বারে, আদালতের বারান্দায় উদ্‌ভ্রান্তভাবে পায়চারিরত অথবা রাস্তাঘাটে হাড়কংকালসার ছিন্নমূল অবস্থায়। ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক আমল থেকে চলে আসা বৈষম্যমূলক আইন ও জবাবদিহিতাবিহীন এ বিচার ব্যবস্থা মানুষকে এমনভাবে নিরুপায় ও অসহায় করে রেখেছে যে তাদের পক্ষে প্রচলিত ব্যবস্থার বাইরে গিয়ে এ বিষয়ে সৃজনশীল নতুন কিছু চিন্তা করাও সম্ভব হচ্ছেনা। তাদেরকে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে রেখেছে প্রতারণাসর্বস্ব এক রাষ্ট্র ব্যবস্থা যা এদেশের দরিদ্র্যতার অন্যতম প্রধান কারণ।

বিচার ব্যবস্থার আধুনিকায়নে কিছু সুপারিশ

এই অধ্যায়টি লেখার সময় কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হবার আগেই নতুন নতুন জিজ্ঞাসা এসে হাজির হয়েছে। এতে এটা স্পষ্ট যে কোন একক ব্যক্তির পক্ষে দেশের অতি জটিল ও দুরুহ আইন এবং বিচার ব্যবস্থার উন্নয়নে পরিপূর্ণ সুপারিশ প্রণয়ন করা সম্ভব নয়। এটা একমাত্র সম্ভব হতে পারে ইতিহাস ও আইন বিশেষজ্ঞদের সমন্বিত প্রচেষ্টায়। তা সত্ত্বেও সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ ও সরকার নিম্ন বর্ণিত সুপারিশমালা বিবেচনা করে দেখতে পারেন।

আইন শক্তিশালীকরণ

আমাদের দেশে প্রচলিত আইন ব্যবস্থায় যে সব ফাঁকফোকর বিদ্যমান তা সবার আগে সংশোধন করতে হবে। যেসব ক্ষেত্রে আইনের শূন্যতা ও অপ্রতুলতা তা পূরণ ও দুর্বল আইনগুলো সবল করতে হবে। ১৮৬১ সালের পুলিশ আইন, ১৮৯৮ সালের ফৌজদারী কার্যবিধি, ১৮৭২ সালের সাক্ষ্য আইন, ১৯০৮ সালের দেওয়ানি কার্যবিধিসহ প্রাচীন আইনগুলোর ব্যাপক সংস্কারের প্রয়োজনে উন্নত দেশের আইনগুলো পর্যালোচনা করে বিজ্ঞানসম্মত ও যুগোপযোগী আইন ব্যবস্থা প্রবর্তন করতে হবে। 'সকল নাগরিক আইনের দৃষ্টিতে সমান' সংবিধানের ২৭ অনুচ্ছেদের এই প্রতিশ্রুতিটি সমুন্নত রাখতে ফৌজদারী কার্যবিধির ১৯৭ ধারা সহ যেসব বৈষম্যমূলক আইন প্রচলিত আছে তা বাতিল

www.pathagar.com

করতে হবে। শুধুমাত্র আপিলক্ষেত্র ছাড়া অন্য সকল ক্ষেত্রে তামাদি আইনের কার্যকারিতা রহিত করতে হবে। প্রচলিত ১৮৬০ সালের দণ্ডবিধি একটা বিধিবদ্ধ আইনগ্রন্থ যেখানে খুব সংক্ষিপ্তাকারে বিভিন্ন প্রকার অপরাধ ও শাস্তির বর্ণনা আছে। এছাড়া দেশে নারী নির্যাতন, এসিড নিক্ষেপ, বিস্ফোরক দ্রব্যাদি, দুর্নীতি নিরোধ, সন্ত্রাস দমনসহ বিভিন্ন ফৌজদারী অপরাধের বিরুদ্ধে বিক্ষিপ্ত ও বিচ্ছিন্নভাবে বলবৎ বহু আইন আছে যা প্রয়োজন মুহূর্তে খুঁজে পাওয়া কষ্টকর। তাই বিক্ষিপ্তভাবে ছড়ানো আইনগুলো বিধিবদ্ধভাবে সংক্ষিপ্তাকারে দণ্ডবিধি আইন গ্রন্থে সংযুক্ত করা যেতে পারে। ক্রমিক নাম্বার অনুসারে গ্রন্থটি একাধিক খণ্ডে প্রণীত হতে পারে। বিচারপ্রার্থী, আইনজীবী ও বিচারক একটি বিধিবদ্ধ গ্রন্থে প্রচলিত সকল ফৌজদারী আইন নাগালে পেয়ে উপকৃত হবেন নিঃসন্দেহে। ৮৫% ভাগ মুসলমানের এদেশে ইসলামী আইনের কল্যাণকর বহু বিষয় আছে যা প্রচলিত আইন ব্যবস্থার সাথে সমন্বয় করা যেতে পারে। বিনাবিচারে আটককারী আইন ও আদালতের দ্বারস্থ হওয়া নিষিদ্ধকারী আইনগুলো বাতিল করা উচিত। ফৌজদারী কার্যবিধির ৫৪ ধারা, বিশেষ ক্ষমতা আইনসহ যেসব অস্বাভাবিক আইনের ঢালাও অপপ্রয়োগ জনজীবনকে দুর্বিষহ ও সরকারের বিরুদ্ধে জনমত বিষিয়ে তোলে সেসব আইনের অপপ্রয়োগ রোধে আইন প্রয়োগকারী সংস্থাকে কঠোর ও কার্যকর আইনী জবাবদিহীর আওতায় আনতে হবে। আদালত অবমাননা আইনে অপরাধের সুনির্দিষ্ট সংজ্ঞা থাকতে হবে। আইনী হেফাজতে শারীরিক নির্যাতন বা হত্যা রোধে কোন দায়মুক্তি আইন থাকবেনা অর্থাৎ সাংবিধানিক ২৭ অনুচ্ছেদের প্রতিশ্রুতি মোতাবেক কাউকে আইনের ঊর্ধ্বে বিবেচনা করা যাবেনা। সংবিধানের আইনগুলো যেন কেউ খেয়ালখুশীমতো ব্যাখ্যা না করতে পারে সেজন্য সংবিধানের স্ববিরোধী ও পরস্পর অসংগতিপূর্ণ অনুচ্ছেদগুলো আইনসভায় সংশোধন করতে হবে।

আইন পেশার উন্নয়ন

দেশে প্রচলিত আইনগুলো সম্পর্কে সুশিক্ষিত, অভিজ্ঞ, দক্ষ ও সফল আইনজীবী আদালতের বিচারকর্মে সহায়তার জন্য অপরিহার্য। কর্মজীবনে সাফল্যের জন্য তিনি একজন সুদক্ষ ও দায়িত্বশীল বিচারক হবার যোগ্যতাও রাখেন। সুতরাং বিচারকের মতো তিনিও এ সমাজের একজন সম্মানিত ব্যক্তি। এমন একটা মর্যাদাবান পেশায় নবাগতদের বাস্তব অভিজ্ঞতা অর্জনে প্রত্যেক জেলা বার পরিচালিত প্রশিক্ষণ কেন্দ্র থাকার দরকার। এক বছরের প্রশিক্ষণে উত্তীর্ণ সনদপত্র ও সিনিয়র আইনজীবীর সাথে এক বছর প্রায়োগিক অভিজ্ঞতা অর্জনের প্রত্যয়নপত্র গ্রহণ করার পরই বার কাউন্সিল থেকে আইনজীবীকে আইন পেশার অনুমোদন দেয়া উচিত। কোন আইনজীবীর পেশাগত অসদাচরণের বিচারের জন্য কেন্দ্রীয় বার কাউন্সিলের অধীন প্রত্যেক জেলায় একজন অধস্তন বিচারক ও স্থানীয় বারের দু'জন জ্যেষ্ঠ সদস্যের সমন্বয়ে একটি বার কাউন্সিল ট্রাইব্যুনালের জেলা শাখা থাকা আবশ্যক। জেলা ট্রাইব্যুনালের রায়ের বিরুদ্ধে কেন্দ্রীয়

www.pathagar.com

ট্রাইব্যুনালে আপিল করা যাবে। এদেশের আইন পেশাটিও ব্রিটিশ আইন পেশার ঔপনিবেশিক সংস্করণ। ফলে নির্দিষ্ট ফি ধার্য না থাকায় মক্কেলের থেকে আইনজীবী ইচ্ছা খুশীমতো ফি আদায় করেন। খোদ ব্রিটেনে আইন পেশায় এরকম ফ্রি স্টাইল ফি আদায়ের নিয়ম নেই। সেখানে আইনজীবী বা মক্কেল পরস্পরের সাথে সরাসরি যোগাযোগ করেনা। সেখানে মামলা পরিচালনার জন্য বহু বেসরকারী (ল' ফার্ম) সংস্থা আছে। নির্দিষ্ট ফি দিয়ে মক্কেল তার পছন্দের ফার্মকে মামলা পরিচালনার জন্য চুক্তিতে নিয়োগ দেন। সংস্থা তার মামলা পরিচালনায় উপযুক্ত আইনজীবী নিয়োগ দেন। আমাদের দেশে পদ্ধতিটি প্রয়োগ করলে বিচার প্রার্থীরা বহু অনাকাংখিত হয়রানি থেকে রক্ষা পেতেন।

মামলা জট কমাতে

সারাদেশের আদালতগুলোতে লাখ লাখ মামলার জট তদুপরি নিত্য নতুন নতুন মামলা দায়েরের ফলে অচলায়তনের এক ক্রান্তিকাল চলছে বিচার ব্যবস্থায়। বরং এটাকে বিচার ব্যবস্থায় নৈরাজ্য বলা সঙ্গত হবে। এ সংকট নিরসনে অবসরপ্রাপ্ত বিচারকগণকে চুক্তিভত্তিক নিয়োগ দেয়া যেতে পারে যাঁরা শুধু বিচারাধীনে আদি মামলার সারসংক্ষেপ তৈরী করে তাঁদের অভিজ্ঞতার আলোকে মতামতসহ সংশ্লিষ্ট বিচারিক আদালতে প্রেরণ করবেন। বিচারিক আদালত ন্যায়বিচারের স্বার্থে এ মতামত গ্রহণ বা বর্জন করতে পারেন এবং সারসংক্ষেপ থেকে একটা ন্যায্য আইনী সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারবেন যাতে সময় ও পরিশ্রমের পরিধি কমে যাবে। মামলার প্রকার ও সংখ্যার ভিত্তিতে চুক্তিভিত্তিক অবসরপ্রাপ্ত বিচারকগণের পারিশ্রমিকের হার নির্ধারিত হবে। এছাড়া বিশ্বের অন্যান্য দেশে মামলা জট কমাতে গৃহীত পদক্ষেপগুলোও এ সাথে পর্যালোচনা করা যেতে পারে।

মামলা দ্রুত নিষ্পত্তিকরণ

এদেশের বিচার ব্যবস্থায় প্রতিটি মামলা অনির্দিষ্টকাল সময় পর্যন্ত চলায় বাদী বিবাদীর ক্ষতির পরিমাণ অপরিসীম। এ অব্যবস্থাপনায় বিচার প্রতিষ্ঠায় অন্যতম প্রধান প্রতিবন্ধক। সম্প্রতি ফৌজদারী মামলার সীমিত কিছু ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট মেয়াদে রায় দিতে সরকার দ্রুত বিচার আইন করেছেন। সুনির্দিষ্ট সময় বেঁধে দিয়ে আইনটি দেওয়ানি বিচার ও আপিল ক্ষেত্রে প্রয়োগের নিয়ম করলে তা মামলা দ্রুত নিষ্পত্তিকরণে কার্যকর ভূমিকা রাখবে। তবে এজন্য পর্যাপ্ত বেতনভাতা ও সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধি করে চাহিদানুপাতে দক্ষ বিচারক ও কর্মচারীর সংখ্যা বাড়াতে হবে। একই সঙ্গে মামলা তদন্তের সুনির্দিষ্ট সময়সীমা বেঁধে দিতে হবে এবং ইচ্ছাকৃত মিথ্যা তদন্ত রিপোর্ট প্রদানকারীর বিরুদ্ধে দণ্ডবিধি আইনের ২১৯ ধারাকে সক্রিয় করতে হবে। অনিবার্য কারণে সংশ্লিষ্ট আদালতের অনুমোদন সাপেক্ষে পরপর দু'বারের অধিক তদন্তকাল বর্ধিত করা যাবেনা। এরপরও আদালতে তদন্ত প্রতিবেদন জমা না দিলে অদক্ষতার জন্য তদন্ত কর্মকর্তা জবাবদিহী

www.pathagar.com

করবেন। জবাব সন্তোষজনক না হলে বিভাগীয় ব্যবস্থা গ্রহণক্রমে তার পদাবনতি বিবেচনা করা যেতে পারে। তদন্তকর্ম ছাড়া তদন্তকারি সংস্থাকে ভিন্ন কোন দায়িত্ব দেয়া যাবেনা। নির্দিষ্ট মেয়াদের মধ্যে মামলার বিচারে বিচারকগণও একটা সর্বসম্মত গ্রহণযোগ্য পদ্ধতির কাছে দায়বদ্ধ থাকবেন। ফৌজদারী মামলায় তদন্ত কর্মকর্তা, জবানবন্দী গ্রহণকারী ম্যাজিস্ট্রেট ও ময়না তদন্তকারী বা শারীরিক আঘাতের সনদ প্রদানকারী চিকিৎসক উপযুক্ত কারণ ছাড়া সাক্ষীর তারিখে আদালতে অনুপস্থিত থাকলে আদালতের নির্দেশ অবজ্ঞা করার দায়ে তার বিরুদ্ধে বিভাগীয় শাস্তির ব্যবস্থা থাকতে হবে। ন্যায্য কারণ ছাড়া অন্যান্য সাক্ষী নির্দিষ্ট তারিখে অনুপস্থিত থাকলে তারা স্বল্প মেয়াদে কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হবেন। অর্থাৎ বিচারকর্মে সহায়তা করতে সংশ্লিষ্ট সকলকে আইনতঃ দায়িত্বশীলতার পরিচয় দিতে হবে। আইনজীবীর গাফিলতি বা অনুপস্থিতির কারণে মামলার শুনানী মুলতবী রাখা যাবেনা। অর্থাৎ রোগ-ব্যাধি ও বিশ্বাসযোগ্য জরুরী কিছু কারণ ছাড়া আদালতের বিচার প্রক্রিয়ার স্বাভাবিক গতি কোন অজুহাতে ব্যাহত করা যাবেনা।

পক্ষগণের আইনজীবীরা আইনগত যুক্তিতর্ক পেশ ও জেরা করবেন এবং প্রয়োজনে বিচারক উভয় পক্ষকে জিজ্ঞাসাবাদ ও তাদের বক্তব্য শ্রবণ করবেন। যদি বিবাদি বা উভয়পক্ষের সাক্ষীদের সামনাসামনি জেরা করলে অনেক সত্য বেরিয়ে আসবে যা বিচারকদের সিদ্ধান্ত গ্রহণে সহায়ক হবে। বিচার বিভাগীয় তদারকিতে গ্রাম পঞ্চায়েত প্রথাকে উৎসাহিত করে সালিশ মিমাংসাকে অগ্রাধিকার দিলে আদালতের বাইরেই বহু বিবাদ খুব সহজে মিমাংসা করা যায়। ১৯২৩ সালে ব্রিটিশ সরকারের গঠিত 'সিভিল জাস্টিস কমিশন' এর প্রধান ছিলেন মিঃ র‍্যাংকিন। মামলা মোকদ্দমা নিষ্পত্তিতে অস্বাভাবিক বিলম্ব নিরসনে এ কমিশনকে সুপারিশ দিতে বলা হয়েছিল। দীর্ঘদিন পরিশ্রম করে কমিশন যে সুপারিশমালা প্রণয়ন করেছিল তা কখনো বাস্তবায়ন হয়নি। সরকারি মহাফেজখানায় অনুসন্ধান করে ওই সুপারিশমালা পাওয়া গেলে তা থেকে সরকার দিক নির্দেশনা নিতে পারেন। এছাড়া উন্নত দেশগুলোর দ্রুত বিচার নিষ্পত্তিকরণে প্রয়োগকৃত কৌশলকেও এদেশে কাজে লাগানো যেতে পারে।

মিথ্যা মামলা দমন আইন

এদেশে অহরহ দায়েরকৃত মিথ্যা মামলায় আদালতগুলো টালমাটাল কিংবা বলা যায় মিথ্যা মামলার জন্য দেশটি স্বর্গরাজ্য। মিথ্যা মামলার বিরুদ্ধে কার্যকর কোন কঠোর শাস্তির আইন না থাকা এর প্রকৃত কারণ। ভূমি বিরোধে দেওয়ানি বিবাদকে ফৌজদারি চেহারায় সাজিয়ে দায়েরকৃত মামলাগুলোতেই মিথ্যার আধিক্য দেখা যায়। মিথ্যা মামলার বিরুদ্ধে প্রচলিত দণ্ডবিধি ২১১ ধারা আইনটি সেকেলে, দুর্বল ও বর্তমান বাস্তবতায় অনুপযুক্ত। মিথ্যা মামলায় সর্বস্বান্ত ব্যক্তির দেওয়ানি আদালতে ক্ষতিপূরণ আদায়ের যে অবাস্তব বিচার প্রক্রিয়া বিদ্যমান তা শুধু কর্মঘণ্টা ও অর্থ অপচয় ছাড়া কিছু

www.pathagar.com

নয়। গুরুতর এই সমস্যা নিরসনে দেওয়ানি, ফৌজদারী, প্রশাসনিক, পারিবারিক, বাণিজ্য, শ্রম বা রাজস্ব যে ক্ষেত্রেই হোক না কেন আদালতে মিথ্যা মামলা প্রমাণিত হলে দোষী ব্যক্তি ৬ মাস থেকে সর্বোচ্চ ৫ বছর কারাদণ্ড একই সাথে ৫ হাজার টাকা থেকে সর্বোচ্চ এক লাখ টাকা অর্থদণ্ডের বিধান করে একটা 'মিথ্যা মামলা দমন আইন' কার্যকর করা এখন সময়ের দাবি। আদায়কৃত অর্থের অর্ধেক সরকারি কোষাগারে বাকি অর্ধেক ক্ষতিগ্রস্ত পক্ষ পাবেন। দেশে এমন একটা আইন বলবৎ করা হলে শাস্তির ভয়ে মিথ্যা মামলা দায়েরের প্রবণতা কমে যাবে এবং আদালতগুলোতে স্তূপিকৃত মিথ্যা মামলার জঞ্জালও অপরসারণ করা যাবে।

দেওয়ানি ফৌজদারি বিচারের যুগোপযোগী সংশোধন

ফৌজদারি অপরাধের তদন্তকালে পুলিশ হেফাজতে আহত আসামীর শারীরিক নির্যাতনের অভিযোগ কঠোরভাবে খতিয়ে দেখে বিচারক আইনগত পদক্ষেপ নিবেন এবং পুলিশ রিমান্ডে থাকাবস্থায় ম্যাজিস্ট্রেটের খাস কামরায় আসামীর স্বীকারোক্তি লিপিবদ্ধকালে তার আইনজীবীর উপস্থিতি বাঞ্ছনীয় হবে। আসামী স্বীকারোক্তি করুক বা না করুক তাকে আবার পুলিশী হেফাজতে দেয়া যাবে না। প্রকাশ্য এজলাসে বন্দি বিবাদীকে সামনাসামনি জেরা করলে ফৌজদারী দেওয়ানি উভয় ক্ষেত্রে বিচারক মামলার প্রকৃত কারণ সম্পর্কে একটা স্পষ্ট ধারণা পেতে পারেন যা বিচারকর্মে সহায়ক হবে। তবে পর্দানশিন বা শ্লীলতাহানি সংক্রান্ত মামলার জেরা বা জবানবন্দি বিচারকের খাস কামরায় করা যাবে। বর্তমান পদ্ধতিতে বাদি বিবাদীকে কাঠগড়ায় অনেকটা বোবার মতো দাঁড়িয়ে থাকতে হয় আর তাদের পক্ষে আদালতে বক্তব্য পেশ করেন আইনজীবী। বিচারকের সামনে বাদী বিবাদীকেও বক্তব্য পেশ করার সুযোগ দিতে হবে এবং বক্তব্য শেষে তাদের আইনজীবীগণ বক্তব্য ও আইনগত যুক্তিতর্ক তুলে ধরবেন। কোন জিজ্ঞাসার জবাব পেতে বিচারক নিজেও বাদী বিবাদীকে প্রশ্ন করবেন। মোবাইল ফোনে রেকর্ড, আলোকচিত্র, অডিও, ভিডিও এবং কম্পিউটার সহ বিজ্ঞানের অভিযাত্রার সাথে বিচার প্রক্রিয়াকে সম্পৃক্ত করতে হবে। প্রকাশ্য বিচারের কাঠগড়ায় আসামী অপরাধ স্বীকার করলে তাকে নির্ধারিত দণ্ডের অর্ধেক দেয়া যাবে। প্রথমবার ছোটখাট অপরাধের জন্য শর্তসাপেক্ষে আসামীকে মুচলেকা প্রদানের পর মুক্তি দেয়া যেতে পারে। দ্বিতীয়বার একই অপরাধ করলে প্রথমবারের অপরাধের দণ্ডসহ দ্বিতীয় অপরাধের নির্ধারিত শাস্তি সে ভোগ করবে। এতে আদালতের ওপর থেকে মামলার চাপ কমবে, অপরাধকর্মকে নিরুৎসাহিত করা হবে এবং অতিরিক্ত কারাবন্দীর ব্যয়ভার বহন না করায় সরকারী অর্থেরও সাশ্রয় হবে। ফৌজদারি কার্যবিধির ১৪৪ ও ১৪৫ ধারার রায় দেয়ার আগে অথবা দেওয়ানি কার্যবিধির ৩৯ আদেশের (২) ২ বিধানমতে স্থায়ী নিষেধাজ্ঞা বা রিসিভার নিয়োগের বিষয়টি কঠোরভাবে খতিয়ে দেখতে বিচারকের রায়পূর্ব তদন্ত প্রতিবেদন বিবেচনা করতে পারেন। এছাড়া বিচারকের কোন মামলার বিষয়ে সন্দেহ হলে সরেজমিনে তদন্ত করে সত্যমিথ্যা যাচাই করে সিদ্ধান্ত নিতে পারেন।

www.pathagar.com

৮০% ভাগ মামলা সমাপ্তের সূত্র

দেশে ভূমি বিরোধ সংক্রান্ত মামলার সংখ্যা শতকরা প্রায় ৮০ ভাগ। শুধুমাত্র একটি বিষয়ে আদালতের ধারণ ক্ষমতার অতিরিক্ত এসব মামলার ভারে দেশের বিচার ব্যবস্থায় অচলাবস্থা বিদ্যমান। এজন্য ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক আমলের অচল ভূমি সংক্রান্ত আইনগুলো উন্নত বিশ্বের ভূমি আইনের সাথে সমন্বয় করে যুগোপযোগী আধুনিক ভূমি আইন প্রণয়ন করতে হবে। ভূমির মালিকানা স্বত্ব ছাড়া আইন আদালতে শুধু দখল স্বত্বের কোন প্রকার বৈধ স্বীকৃতি বা প্রশ্রয় দেয়া যাবেনা। ভূমিদস্যুতা প্রতিহত করতে সর্বোচ্চ ১৪ বছরের কারাদণ্ডের বিধান করে সরকার একটা কঠোর আইন প্রণয়নের পদক্ষেপ নিয়েছিল। ২০০৪ সালের ১০ ফেব্রুয়ারী সচিব কমিটির ১২ দফা সুপারিশমালার প্রেক্ষিতে মন্ত্রিপরিষদের বৈঠকে প্রস্তাবিত আইনটির প্রাথমিক অনুমোদন হয়েছিল। তাতে বলা হয়েছে যে কেউ জেলা প্রশাসকের কাছে দরখাস্ত করলে তদন্তে অপরাধ প্রমাণিত হলে ভূমি জবরদখলকারীর ১৪ বছর পর্যন্ত বিভিন্ন মেয়াদের কারাদণ্ড এবং তার কাছ থেকে আদায়কৃত ক্ষতিপূরণসহ সম্পত্তির মালিকানা দখল প্রকৃত ভূমি মালিককে ফিরিয়ে দেয়া হবে। সংবিধানসম্মতভাবে বিচার বিভাগীয় কর্তৃত্ব আইনটি প্রয়োগ করা হলে দেশবাসী ও সরকার এতে যেমন উপকৃত হবে তেমনি দেশে বিচারাধীন ৮০ ভাগ মামলাও যাদুমন্ত্রের মতো সমাপ্ত হবে। তবে ভূমি বিরোধ সংক্রান্ত আদি বিচারাধীন স্বত্ব মামলাগুলোকেও এ আইনে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

আপিল, ডিক্রীজারী, কোর্ট ফি ও ক্ষতিপূরণ আদায়সহ বিচার প্রক্রিয়া আধুনিকায়ন

মামলার শুনানী প্রতি ধার্য তারিখে একটানা চলতে হবে। অনিবার্য ও যৌক্তিক কারণ ছাড়া শুনানী খেয়ালখুশী মতো মুলতবি রাখা যাবেনা। আদালত ৪ স্তর বিশিষ্ট না হয়ে ৩ স্তর বিশিষ্ট হবে। ফৌজদারী মামলা ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে ও দেওয়ানি মামলা দায়ের হবে জজ আদালতে। তামাদি আইন কেবলমাত্র আপিল ক্ষেত্র ছাড়া অন্য কোন ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবেনা। জজ ও ম্যাজিস্ট্রেট আদালতের রায়ের বিরুদ্ধে হাইকোর্টে প্রথম আপিল ও সুপ্রীম কোর্টে দ্বিতীয় আপিল দায়ের করা যাবে। দেওয়ানি-ফৌজদারী আপিল ও রীট মামলা শুনানীর জন্য হাইকোর্টে পৃথক পৃথক বেঞ্চ থাকবে। অধস্তন আদালতের রায় প্রথম আপিল আদালত বহাল রাখলে দ্বিতীয় আপিল করা যাবে না। দ্বিতীয় আপিল তখনই করা যাবে যখন অধস্তন আদালতের রায় প্রথম আপিল আদালত বহাল রাখেনি। এছাড়া মৃত্যুদণ্ডের মতো গুরুতর বিশেষ কিছু ক্ষেত্রে প্রাথমিক শুনানীতে যাচাই বাছাইর পর দ্বিতীয় আপিল বিচারের জন্য গ্রহণ করা যাবে। যেহেতু নির্দিষ্ট মেয়াদের মধ্যে প্রতিটি মামলার বিচার হবে সেহেতু অন্তর্বর্তীকালিন আদেশের বিরুদ্ধে কোয়াশমেন্ট অথবা রিভিশন হবেনা এবং মামলা শুনানীর স্বাভাবিক গতি যাতে কোন প্রকারে ব্যাহত না হয় এজন্য উচ্চাদালতের কোনপ্রকার স্থগিতাদেশ ও রিভিশন প্রথা বাতিল করা যায় কিনা বিবেচনা করা যেতে পারে। একই সাথে জামিন প্রক্রিয়া আরো সহজ করতে হবে।

www.pathagar.com

আদালত স্বউদ্যোগে তাঁর রায় ও ডিক্রী কার্যকর করতে আইন প্রয়োগকারী সংস্থাকে নির্দেশ দিবেন এবং সে নির্দেশ যথারীতি পালন না করলে ওই আইন প্রয়োগকারী সংস্থা আদালত অবমাননার দায়ে দণ্ডিত হবে। পেশাদার স্বভাবগত খুনি ছাড়া অঙ্গহানি ও নরহত্যার মতো গুরুতর অপরাধে দণ্ডযোগ্য ব্যক্তি প্রদত্ত ক্ষতিপূরণ পেয়ে যদি আহত ব্যক্তি বা নিহতের ওয়ারিশ সন্তুষ্ট হয় তাহলে মামলা আপস নিষ্পত্তি করা যাবে। তবে ফরিয়াদি সন্তুষ্ট না হয়ে বিচার প্রার্থনা করলে বিচারক অপরাধীকে আইনত: শাস্তি দিবেন। ইসলামী আইনে এই কল্যাণকর বিধানটি রয়েছে। অন্যান্য ক্ষেত্রে অপরাধীর অপরাধকর্মের দ্বারা ব্যক্তি বা সরকারের যে পরিমাণ আর্থিক ক্ষতি হয়েছে সেই অপরাধী তার দ্বিগুণ পরিমাণ অর্থদণ্ড না পরিশোধ করলে তাকে ৬ মাস থেকে ১২ বছর পর্যন্ত বিভিন্ন মেয়াদে কারাদণ্ডে দণ্ডিত করার বিধান করা যেতে পারে। আদায়কৃত অর্থের অর্ধেক ক্ষতিগ্রস্ত পক্ষ অপর অর্ধেক বিচার ব্যবস্থার ব্যয় নির্বাহের জন্য সরকারী কোষাগারে জমা হবে। দেওয়ানি আদালতে বিজয়ী পক্ষের উদ্ধারকৃত সম্পত্তির এক পঞ্চমাংশ থেকে এক দশমাংশ পর্যন্ত সম্পত্তির মূল্য বিচার ব্যবস্থার ব্যয় নির্বাহের জন্য আদায় করে রাষ্ট্রীয় কোষাগারে জমা হতে পারে। ভারতে মোঘল আমলের ইসলামী বিচার ব্যবস্থায় এ নিয়ম প্রচলন ছিল। বর্তমান বাস্তবতায় আদালত হবে গণ মানুষের সেবায় দাতব্য প্রতিষ্ঠান। যেখানে কোর্ট ফি প্রথা থাকবেনা। যে কেউ সরকারি হাসপাতালের মতো নামমাত্র ফি দিয়ে অথবা থানায় মামলা দায়েরের মতো একটা সাদা কাগজে দরখাস্ত করলেই মামলা গৃহীত হবে। শান্তি, ন্যায়বিচার, স্থিতিশীলতা প্রতিষ্ঠা ও দেশের সমৃদ্ধির স্বার্থে প্রয়োজনে সরকারকে বিচার ব্যবস্থা খাতে প্রয়োজনীয় ভর্তুকি দিতে হবে। এরকম একটা শক্তিশালী কার্যকর বিচার ব্যবস্থা প্রবর্তন করা গেলে তখন দুর্নীতি দমনের জন্য আলাদা কোন প্রতিষ্ঠানও সরকারকে পুষতে হবেনা।

বিচারকের স্বাধীনতা ও দায়বদ্ধতা

ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক আমল থেকে বিচারকদের প্রকৃত অর্থে বিচারকর্মে কোন জবাবদিহিতা নেই। এই অব্যবস্থা সদা বিদ্যমান। ফলে রায় প্রদানকালে বিচারক আইন ভঙ্গ করছেন কিনা, প্রভাবিত হয়ে ন্যায়বিচারের বদলে অবিচার করছেন কিনা তা তদারকিতে সুষ্ঠু কোন ব্যবস্থাও নেই। বর্তমান পদ্ধতিতে বিচারক আইন ভঙ্গ করে রায় দিলে ক্ষতিগ্রস্ত পক্ষকেই ব্যয়বহুল আপিলের ঘানি টানতে হয়। চূড়ান্ত আপিলে রায় সংশোধন হলেও আইন ভঙ্গ করে রায় প্রদানের দায়ে ওই বিচারককে তেমন জবাবদিহি করতে হয়না। বিচার ব্যবস্থায় বহুল ব্যবহৃত 'সরল বিশ্বাসে' শব্দটির ছত্রছায়ায় তিনি সহজেই পার পেয়ে যান। এজন্য সৎ অভিপ্রায় ও অন্তর্নিহিত নৈতিক সততার সুস্পষ্ট সংজ্ঞা দিয়ে 'সরল বিশ্বাস' শব্দটি গ্রহণযোগ্য ও অর্থবহ করতে হবে। আর আইন ভঙ্গ করে প্রদত্ত রায়ের বিচারককেও দায়বদ্ধতা ও জবাবদিহিতার আওতায় আনতে হবে। কারণ দায়বদ্ধহীন স্বাধীনতা সর্বদা সভ্য জগতের নীতি আদর্শের তোয়াক্কাহীন স্বৈরতন্ত্র

www.pathagar.com

যা গণ মানুষের শেষ ভরসাস্থল বিচার বিভাগে কাম্য নয়। ব্রিটিশদের প্রবর্তিত 'অবকাশ' প্রথা'র নামে বিচার বিভাগে যে অতিরিক্ত ছুটি'র নিয়ম আছে তা বাতিল করে সরকারের অন্যান্য বিভাগের মতোই বিচার বিভাগ স্বাভাবিক বাৎসরিক ছুটি ভোগ করবে।

ফ্রান্সের মতো পরাশক্তির দেশে অধস্তন আদালতের বিচারকদের ওপর উচ্চআদালতের নজিরের বাধ্যবাধকতা নেই। অধস্তন আদালত সেদেশে প্রয়োজন মনে করলেই কেবল মাত্র উচ্চআদালতের নজির অনুসরণ করে থাকেন। আমাদের বিচার প্রক্রিয়ায় এ ব্যবস্থা প্রবর্তন করা দরকার। অধস্তন আদালতের বিচারকদের স্বাধীনভাবে রায় প্রদানের সুযোগ দিতে হবে এবং তাদের সৃজনশীল প্রতিভাকে স্বীকৃতি দিতে হবে। কারণ বাংলাদেশ সংবিধানের ৯৪(৪) অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে– 'এই সংবিধানের বিধানাবলী সাপেক্ষে প্রধান বিচারপতি ও অন্যান্য বিচারক বিচারকার্য পালনের ক্ষেত্রে স্বাধীন থাকিবেন।' তবে সংবিধানে এমন একটি অনুচ্ছেদ সংযোজন করা প্রয়োজন যেখানে বলা থাকবে ৯৪(৪) অনুচ্ছেদের স্বাধীনতার অপব্যবহার করে বিচারকার্যে আইন ভঙ্গ করলে অভিযুক্ত বিচারককে সুপ্রীম কোর্টের শক্তিশালী বিচারকর্ম তদারক কমিশনের নিকট জবাবদিহি ও দোষী সাব্যস্ত হলে তাকে আইনামলে আসতে হবে।

শেষ কথা

দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। বিশ্বের উন্নত দেশগুলোর সমৃদ্ধির মূল চালিকাশক্তি হচ্ছে স্বদেশে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা। আমাদের বিচার ব্যবস্থাকে আন্তর্জাতিক মানে উন্নীত করতে সংবিধানের সংশ্লিষ্ট অনুচ্ছেদ ও ব্রিটিশ আইনগুলোর যুগোপযোগী সংস্কার এবং প্রয়োজনে বাতিল করে নতুনভাবে লিখতে হবে। খোদ বাংলাদেশে নিযুক্ত ব্রিটিশ হাই কমিশনার জেমস্ পাউলার বলেছিলেন– 'বাংলাদেশে সেই ব্রিটিশ যুগের পুরনো আইন ও প্রশাসনিক ব্যবস্থা আধুনিক যুগে একেবারে অচল।'[৩০] আজ স্বাধীন জাতি হিসেবে আমরা তখনি যুগপৎ ক্ষুব্ধ, লজ্জিত ও অপমানিত হই যখন দেখি খোদ ব্রিটিশ প্রতিনিধি তাদের পূর্ব পুরুষদের রচিত আইনগুলোর আধুনিকায়নের তাগিদ দেয়ার পরেও আমরা নির্লজ্জভাবে সেসব আইন দিয়েই সুবিচার প্রতিষ্ঠার পণ্ডশ্রম করে যাচ্ছি।

জবরদখলকৃত ভারতের ১৯০ বছরের ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক গবেষণাগারে তৈরি বিদ্যমান বৈষম্যমূলক আইন ও বিচার ব্যবস্থা শ'শ বিদ্রোহ, ১৮৫৭ সালের সিপাহী বিপ্লব, আন্দোলন, সংগ্রাম, প্রতিরোধ যুদ্ধ, ১৯৪৭ সালের প্রথম ও ১৯৭১ সালের দ্বিতীয় স্বাধীনতা মোকাবেলা করে আজো অপ্রতিরোধ্য অবয়বে অটুট আছে। দেশে বৈষম্যহীন বিচার ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা সুদূর পরাহতই রয়ে গেল উপযুক্ত সাহসী নেতৃত্বের অভাবে।

যুগ চাহিদার সাথে সমন্বয় রেখে আমাদের আইন ব্যবস্থাকে আরো কার্যক্ষম ও শক্তিশালী করা গেলে ন্যায়বিচারের পথ সুগম হবে। প্রত্যেক গণতান্ত্রিক সরকার স্থিতি পাবে।

www.pathagar.com

ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা হলে সমাজে শান্তি ও স্থিতিশীলতা প্রতিষ্ঠা হবে আর শান্তিতে থাকা দেশের ষোলআনা শ্রমশক্তি কর্মব্যস্ত হবে। তারা তখন বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, গবেষণা, উন্নয়ন, উৎপাদনে ঝাঁপিয়ে পড়বে। দেশে শিল্প ও কৃষি বিপ্লব ঘটবে। মানুষ তখন অন্যের অধিকারের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ও আইন আদালতের প্রতি আস্থাবান হবে। এজন্য আমাদের আইন কমিশন অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি ও আইন বিশেষজ্ঞ সদস্যদের সমাবেশ ঘটিয়ে আইন কমিশনকে আরো কার্যকর ও গতিশীল করতে হবে। তারাও আইন এবং বিচার ব্যবস্থা সংস্কারে তাদের সুচিন্তিত অভিমত সরকার ও দেশবাসীর সামনে পেশ করবেন। সর্বোপরি আমাদের এমন এক আপসহীন সাহসী ও দেশপ্রেমিক নেতার প্রয়োজন যিনি ঘুনে ধরা আইন ও বিচার ব্যবস্থার বদলে এদেশের মাটি ও মানুষের চাহিদা উপযোগী আইন ও বিচার ব্যবস্থা প্রবর্তন করবেন। আমাদের আইন ও বিচার ব্যবস্থা শক্তিশালী ও দক্ষ হলে জনমতের চাপে ভারত ও পাকিস্তান তা অনুকরণ করতে বাধ্য হবে প্রকারান্তরে যা উপমহাদেশে দারিদ্র্যদূরিকরণ ও শান্তি প্রতিষ্ঠায় কার্যকর ভূমিকা রাখবে। বিশ্ব দরবারে বাংলাদেশ আবারো সোনার বাংলা হিসেবে পরিচিতি পাবে।

আমরা কি এমন একটা সুখী সমৃদ্ধ বাংলাদেশের স্বপ্ন দেখতে পারিনা? তাহলে বিচারক, আইনজীবী, ছাত্র-শিক্ষক, বুদ্ধিজীবী, রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দ, সেনা, পুলিশ, আমলা, সর্বস্তরের পেশাজীবী ও সাধারণ মানুষসহ সকলেই আসুন আরেকবার ১৯৭১ সালের মতো বাংলাদেশকে ভালবাসি। আমাদের প্রাণপ্রিয় দেশে সাম্য ও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করি। একটা মর্যাদাবান জাতি রাষ্ট্র হিসেবে বিশ্ব মানচিত্রে মাথা উঁচু করে দাঁড়াই। লক্ষ যদি স্থির ও অটল থাকে তাহলে আল্লাহ অবশ্যই আমাদেরকে সফল করবেন এই বিশ্বাস রেখেই শেষ করছি।

www.pathagar.com

তথ্যসূত্র

১. JW Kaye: The Administration of the East India Company, A History of Indian Progress-London 1835, Page-162।
২. আজকের কাগজ: ২৫ মার্চ ২০০৬।
৩. দৈনিক ইত্তেফাক: ৩ জানুয়ারি ২০০৩।
৪. আলমগীর কবির: দৈনিক ইত্তেফাক, ৫ মে ২০০৬ সংক্ষিপ্ত।
৫. দৈনিক জনকণ্ঠ: ২ এপ্রিল ২০০৫।
৬. সূত্র: দৈনিক সংগ্রাম, ৬ ডিসেম্বর ১৯৯১।
৭. ইনকিলাব, ১৯ আগস্ট ১৯৯০।
৮. যুগান্তর, ৪ এপ্রিল ২০০০।
৯. যুগান্তর, ৬ ডিসেম্বর ২০০০।
১০. জনকণ্ঠ ১৫ সেপ্টেম্বর ২০০০।
১১. ইত্তেফাক, ১৬ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৩।
১২. যুগান্তর, ১৭ জুলাই, ২০০১।
১৩. যুগান্তর: ২২ জুন ২০০৬।
১৪. সূত্র সূরা নিসা, আয়াত ৫৮।
১৫. গেজেট বিজ্ঞপ্তি তাং ১মে, ১৯২৬ সাল।
১৬. State V. Abdul Latif, PLD 1961 (W.P) Lahore 51 (D.B).
১৭. State V. Ezaz Mahmood (1971) 23 D.L.R (Lah) 4.
১৮. দৈনিক যুগান্তর: ১০ ফেব্রুয়ারী ২০০৩।
১৯. Bridgs-Vs-California, 314, US.252 at 289-1941।
২০. সূত্রঃ ঢাকা সাব জজ কোর্টের স্বত্ব মামলা নং- ৩০/৬৫, রায় ২১-৯-১৯৬৭ ইং।
২১. সূত্রঃ ঢাকা জেলা জজ আদালতের প্রথম আপিল নং ১৯৯/৬৮, রায় ২৫-১১-১৯৬৮ ইং।
২২. সূত্রঃ ঢাকা হাইকোর্ট সিভিল রুল নং-১০১৭ (এস)/১৯৬৮, রায়ের তারিখ ২৪ অক্টোবর ১৯৬৯।
২৩. সূত্রঃ রেজিষ্ট্রার অব দি হাইকোর্ট জুডিকেটর নং ২০৫০, জি, তাং- ১৭ এপ্রিল ১৯৭০।
২৪. সূত্রঃ ২২ নং ঢাকা ল' রিপোর্টস-এর ৫৮৯ পৃষ্ঠা।
২৫. সূত্রঃ ঢাকা গেজেট, ৩ জুলাই ১৯৬৯।
২৬. সূত্রঃ দেশে প্রচলিত ১৮৬০ সালের দণ্ডবিধি আইন।
২৭. সূত্রঃ গাজী শামছুর রহমান প্রণীত ও বাংলা একাডেমী প্রকাশিত- 'তামাদি আইনের ভাষ্য, পৃ: ৫, ১৩, ১৪, ১৫ ও ১২৮।
২৮. সূত্রঃ চাঁদপুর জেলা জননিরাপত্তা বিঘ্নকারী অপরাধ দমন ট্রাইব্যুনাল মামলা নং-১/২০০০ রায় ২৬ জুন ২০০০।
২৯. সূত্রঃ চাঁদপুর জেলা ম্যাজিস্ট্রেট আদালতের নন জি.আর মামলা নং ৫৬/২০০০, রায় ২৯ জুলাই ২০০৩।
৩০. সূত্রঃ দৈনিক ইনকিলাব-১০ মে ১৯৯৪।

www.pathagar.com

সহায়ক গ্রন্থ

১. কাজী এবাদুল হক : বিচার ব্যবস্থার বিবর্তন।
২. মোঃ সিরাজুল ইসলাম তালুকদার : আইন প্রয়োগে বিচার সুলভ মন।
৩. এস. এস. বক্স : দণ্ডবিধি আইন সহায়িকা।
৪. কার্লমার্কস : ভারতীয় ইতিহাসের কালপঞ্জি।
৫. ড. সিরাজুল ইসলাম : বাংলাদেশের ভূমি ব্যবস্থা ও সামাজিক সমস্যা।
৬. গাজী সামছুর রহমান : বাংলাদেশের আইন ব্যবস্থা-তামাদি আইনের ভাষ্য-ইসলামী আইন।
৭. ফারুক মাহমুদ : ইতিহাসের অন্তরালে।
৮. সরকার সাহাবুদ্দিন আহমদ : আত্মঘাতি রাজনীতির তিন অধ্যায়
৯. আমাদের মুক্তি সংগ্রাম : ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার লাইব্রেরী, ভলিয়ম ২২১/২২-২২ জানুয়ারী ১৯৯০।
১০. সুপ্রকাশ রায় : ভারতের বৈপ্লবিক সংগ্রামের ইতিহাস।
১১. সুরজিত দাস গুপ্ত : ভারতবর্ষ ও ইসলাম।
১২. বাংলাদেশ সংবিধান।
১৩. আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সনদ।

বাংলাদেশে প্রচলিত বিভিন্ন আইন ছাড়াও সংশ্লিষ্ট সময়ের জাতীয় দৈনিক, সাপ্তাহিক, পাক্ষিক, মাসিক ও সাময়িকীসমূহ এবং বিভিন্ন গ্রন্থাগার থেকে বছরের পর বছর ধরে সংগৃহীত মূল্যবান তথ্যাবলী।

www.pathagar.com

বিচার বিভাগের
স্বাধীনতার ইতিহাস

প্রকাশনায়

বাংলাদেশ ইসলামিক ল'রিসার্চ এন্ড লিগ্যাল এইড সেন্টার

৫৫/বি, পুরানা পল্টন, নোয়াখালী টাওয়ার (১৩ তলা), ঢাকা।